বুদ্ধদেব গুহ

ঋজুদা সমগ্র ৩

ঋজুদা সমগ্র ৩

বুদ্ধদেব গুহ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০ থেকে দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০০
তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৫ মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
© বুদ্ধদেব গুহ

ISBN 81-7215-980-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

১৫০.০০

ভূমিকা

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আনন্দমেলার জন্মলগ্ন থেকে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উনি আমাকে দিয়ে ঋজুদার নানা অ্যাডভেঞ্চার এবং গোয়েন্দা কাহিনী লিখিয়ে নেন। পরবর্তী সময়ে আনন্দমেলা ছাড়াও অন্যান্য বহু কাগজে ঋজুদার কাহিনী লিখি। ঋজুদার জনপ্রিয়তার কারণ ছাড়াও ঋজুদার লেখা লিখতে আমার খুব ভাল লাগে বলেই আমি প্রতি বছরই এক বা একাধিক ঋজুদা কাহিনী লিখি।

'কাঙ্গপোকপি'র পটভূমি মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং মায়নামারও। পঞ্চাশের দশক থেকেই ও সব অঞ্চলে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল বহুবার। 'বাবলি' উপন্যাসটি এবং দু-একটি ছোটগল্প ওই পটভূমিতে লেখা ছাড়া অন্য কিছুই লিখিনি। 'কাঙ্গপোকপি' একটি নাগা শব্দ। এর মানে, মশার জন্মস্থান। এই নামে মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের সীমান্তে একটি জায়গা আছে। কাঙ্গপোকপি একটি গোয়েন্দা-উপন্যাস।

'ঋজুদার সঙ্গে স্যেশেলসে'-ও একটি গোয়েন্দা উপন্যাস। এর পটভূমি ভারত মহাসাগরের স্যেশেলস আইসল্যান্ডস। এই দ্বীপপুঞ্জর এলাকা এতই ছোট যে মানচিত্রে তা খুঁজে বের করাই মুশকিল। উনিশশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকা থেকে ফেরার সময়ে ওই দ্বীপপুঞ্জে আমি ছিলাম সপ্তাহখানেক। এই উপন্যাসটিও গোয়েন্দা উপন্যাস।

এ দুটি গোয়েন্দা উপন্যাস ছাড়াও আরও একটি গোয়েন্দা উপন্যাস আছে এতে, 'ঋজুদার সঙ্গে ম্যাকল্লাস্কিগঞ্জে'। কানাডার এক মুজ শিকারি সেখানে তার এক পরিচিতকে খুন করে পালিয়ে আসে দেশ থেকে। সেই খুনিই এই উপন্যাসের সূত্রপাত।

ঋজুদার কোনও কাহিনীই শিশুপাঠ্য ঠিক নয়। কিশোর এবং তাদের দাদা দিদি এবং মা-বাবাদেরও খুবই প্রিয় এই ঋজুদা-কাহিনীগুলি। অসমবয়সীদের কাছ থেকে অগণ্য চিঠি পাই বলেই এ কথা জানি।

আশা করি ঋজুদা সমগ্রর তৃতীয় খণ্ডও আপনাদের ভাল লাগবে। যদি একটি লেখাও খারাপ লাগে তবে দয়া করে নির্দ্বিধায় আমাকে খারাপ লাগার কারণ উল্লেখ করে চিঠি দিলে খুব খুশি হব। সময় থাকলে, বলতে পারি যে, উত্তরও দেব।

ইতি প্রীতিধন্য লেখক

পোস্ট বক্স নাম্বার ১০২৭৬
কলকাতা ৭০০ ০১৯

সূচি

ল্যাংড়া পাহান ১৩
ঋজুদার সঙ্গে বক্সার জঙ্গলে ৫৯
ঋজুদার সঙ্গে অচানকমার-এ ১১৩
কাঙ্গপোকপি ১৪১
ঋজুদার সঙ্গে স্যেশেলসে ২৯৭
ঋজুদার সঙ্গে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে ৩৭৫
ঋজুদার সঙ্গে পুরুণাকোটে ৪৩৩

গ্রন্থপরিচয় ৪৬৫

ল্যাংড়া পাহান

গরমের ছুটিতে বহু বছর পরে একসঙ্গে কোথাও এলাম আমরা। তাই না?

তিতির বলল।

যা বলেছ।

আমি বললাম।

পাশের কটেজ থেকে ঋজুদাও এসে যে কটেজে আমি আর ভটকাই রাতে ছিলাম তার বারান্দাতে উঠল, পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। লংক্লথের পাজামা আর আদ্দির পাঞ্জাবি। ঋজুদা কখনও স্লিপিং-স্যুট পরে না। পুরোপুরি বাঙালিয়ানাতে বিশ্বাসী সে, শুধুমাত্র পাজামা-পাঞ্জাবিটা ছাড়া। আজকাল অবশ্য খুব কম বাঙালিই ধুতি পরেন। কিন্তু ঋজুদা বলে, প্রত্যেক বাঙালির ধুতিই পরা উচিত। তামিলনাডু, কর্ণাটক এবং কেরালার মানুষেরা তো ধুতিই পরেন, পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী সকলেই নিজেদের পোশাক। তখন আমাদের এই সাহেবি অথবা জগাখিচুড়ি পোশাক পরার কোনও মানে হয় না।

তিতির, তার কটেজ থেকে আগেই এসে হাজির হয়েছিল।

ঋজুদা এসে আমাকে বলল, কী রে রুদ্র? চা আনতে বলেছিস?

তিতির বলল, কাল রাতেই তো বলে দিয়েছি সব কটেজেই ভোর ছ'টাতে বেড-টি দিতে। কিন্তু এখনও তো ছ'টা বাজেনি।

বাবাঃ। হল কী রে তোর রুদ্র? আজ কি সে সানরাইজ দেখবি নাকি? নাও। বাঙালি এবারে সত্যি সত্যিই জাগবে বলে মনে হচ্ছে।

কলকাতার সব পাড়ার চারদিকের দেওয়ালে কারা যেন লিখত না একসময়ে, "বাঙালি গর্জে ওঠো।"

তিতির বলল।

হ্যাঁ।

আমি বললাম, তার নীচে অন্য কারা আবার লিখে রাখত, "আঃ। কাঁচা ঘুম ভাঙিও না।"

ঋজুদা হেসে উঠল আমার কথাতে।

বলল, যাই বলিস, আমরা, মানে বাঙালিরা অনেক দোষেই দোষী, ভাগ্য আমাদের সহায় হয়নি, আর আমাদের নেতারাও আমাদের জন্যে করার মতো কিছুই করেননি এত বছরেও কিন্তু তবু এত দুর্দশার মধ্যেও এই সেন্স অফ হিউমার এখনও বেঁচে আছে বলেই বাঙালি বেঁচে আছে।

বলেই বলল, আরে! মিস্টার ভটকাই-কে তো দেখছি না! সে কোথায় গেল? একা একা অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে গেল না তো এই সাতসকালে! শেষে এই বান্দিপুরের অভয়ারণ্যে ভীরাপ্পানের হাতে পড়বে না তো?

পড়লেই হল। তা হলে তোমাকে বাধ্য হয়েই ভীরাপ্পানের কেসটা হাতে নিতে হবে। কিন্তু বেচারা ভটকাইকে বাগে পেলেও ভীরাপ্পান কিছু করবে না।

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, কেন?

কারণ সে মাথা ন্যাড়া করেছিল তামিল ব্রাহ্মণ সাজবার জন্যে, মনে আছে? আমরা মণিপুর আর নাগাল্যান্ডে সেই হত্যা-রহস্য সমাধান করতে যাওয়ার আগে?

হ্যাঁ। তা ঠিক।

তিতির বলল।

তুই তো সেই কাহিনী তোর 'কাঙ্গপোকপি' বইয়েতে ইতিমধ্যে লিখেই ফেলেছিস।

বাঃ। রুদ্র তো কাঙ্গপোকপি অভিযানের পরেও আমাদের বক্সার জঙ্গলের ট্রিপ নিয়েও লিখেছে "ঋজুদার সঙ্গে বক্সার জঙ্গলে।"

তিতির বলল।

এ কথা সত্যি যে ঋজু বোসকে বাংলা সাহিত্যে এই মিস্টার রুদ্র রায়ই বিখ্যাত করে দিয়েছে। নইলে, দেশে তো আমার মতো বনে-জঙ্গলে ঘোরা আর রহস্যভেদী কত মানুষই আছেন যাঁরা আমার চেয়ে কোনও অংশে কম যোগ্য ও নলেজেবল নন কিন্তু ঋজুদা কাহিনীগুলির মাধ্যমে রুদ্র শুধু আমাকে একাই নয়, তোকে, ভটকাইকে এবং নিজেকেও বাংলার ঘরে ঘরের কিশোর-যুবা-বৃদ্ধদের কাছে এত জনপ্রিয় করে তুলেছে। এই কারণেই আমাদের সকলেরই ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আমি আমার এত প্রশংসাতে একটু লজ্জা লজ্জা ভাব করলাম মুখে, যদিও খারাপ লাগছিল না। আমি যদি অতগুলি ঋজুদা কাহিনী না লিখতাম তবে ঋজুদা যেমন সাধারণের কাছে এত বিখ্যাত হত না, বাংলার পাঠক-পাঠিকারাও খুবই বঞ্চিত হতেন যে, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। ঘনাদা, টেনিদা, ফেলুদার পরে ঋজুদার মতো এমন চরিত্র তো বাংলা কিশোর-সাহিত্যে হয়নি। তা ছাড়া, অনেকেই যা জানেন না, তা হচ্ছে এই যে ফেলুদা আর ঋজুদা সমসাময়িক। দু'জনের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে প্রায় একই সময়ে। ভবিষ্যৎই বলবে এই দুই

দাদার মধ্যে কোন দাদা বেশিদিন বেঁচে থাকবেন বাঙালির মনে। সময়ের চেয়ে বড় পরীক্ষক আর নেই।

ওই যে চা আনছে।

তিতির স্বগতোক্তি করল।

ভটকাই খালি গায়ে শুয়েছিল। গায়ে, পাঞ্জাবিটা গলাতে গলাতে বাইরে বেরিয়ে বলল, দে দে, চা দে রুদ্র।

বাঃ। আমি কি তোর valet নাকি? কী ভেবেছিস নিজেকে?

ভাবিনি কিছুই। তোদের এত করে বললাম যে বান্দিপুরে হল্ট না করে চল উটিতেই চলে যাই, তা না...

সাহেবদের উটি নয় বা আমাদের উটাকামণ্ডও নয়, বল উধাগামণ্ডলম।

যা বলেছ!

তিতির বলল।

তারপর স্বগতোক্তির মতন বলল, সারা দেশটাই ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন হয়ে গেল।

মানে?

ঋজুদা বলল।

মানে, কলকাতার রাস্তার নাম বদল করা ছাড়া যেমন তাঁদের আর কোনও কাজ আছে বলে মনে হয় না, তেমন সারা দেশেই এই নাম বদলের ধুম-ধাড়াক্কা পড়ে গেছে যেন।

ভটকাই ফুট কেটে বলল, যা বলেছ তিতির। কোনওদিন দেখব আমার বাবার নামও বদলে দিল ওরা।

ঠিকই বলেছ। আমি বললাম, বম্বে হল মুম্বাই, মাদ্রাস হল চেন্নাই, উটি হল উধাগামণ্ডলম!

যাকগে, থামা এবার তোদের কচকচানি, বেশ কড়া করে এক কাপ চা ঢালত দেখি। রাতে তো ঘুমই হয়নি।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা পাতলা চা খায়। ঋজুদারটা আগে ঢালি, তারপর আমাদেরটাও ঢেলে তোকে সবচেয়ে শেষে কড়া চা দেব। প্রথমেই চা কড়া হবেটা কী করে?

ঠিক আছে। কাজ কর। বাতেল্লা করিস না।

ভটকাই বলল, মুখ ভেটকে।

রাতে ঘুম হয়নি কেন রে?

ঋজুদা জিগ্যেস করল।

হবে কী করে? সারা রাত যদি বাংলোর চারপাশে খচরমচর করে পালে পালে হরিণ চরে আর খায়, তবে কি ঘুম আসে! এই সব কারণেই আমার এই সব অভয়ারণ্য-টন্য ভাল লাগে না। অরণ্যে যদি ভয়ই না থাকল, না বন্যপ্রাণীদের, না

দু পেয়ে মানুষের বা অন্য চারপেয়ে বন্যপ্রাণীদের কাছ থেকে, তবে পুরো ব্যাপারটাই আর্টিফিসিয়াল বলে মনে হয় আমার। তুমিই বলো ঋজুদা, কাজিরাঙ্গার গণ্ডার, বা বান্ধবগড়ের বাঘ, বা হলং-জলদাপাড়ার বা পালামৌর বাইসন, মানে গাউর, অথবা কানহার বাঘ বা বারাশিঙাদের কি বন্যপ্রাণী বলা চলে? তারা তো প্রায় গৃহপালিতরই মতন ব্যবহার করে। বন্যপ্রাণীর মধ্যে যে স্বাভাবিক বন্যতা, মানুষের প্রতি ভয়, বা বনে মানুষের বন্যপ্রাণী থেকে যে ভয়, তার কিছুমাত্রই তো থাকে না।

তা ঠিক। পূর্ব আফ্রিকার সেরেঙ্গেটির সিংহ বা লেক—মানিয়ারার চিতাবাঘেরই মতো তাদের দেখতে কোনওই চমক নেই।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে তিতির বলল, ঋজুকাকা তুমি চুপ করে যে!

ঋজুদার পাইপটা ভরা হয়ে গেছিল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, যাই বলিস, এই নীলগিরির চা খেয়ে আনন্দ নেই। আমাদের দার্জিলিঙের চায়ের মতো চা ভূ-ভারতে পেলাম না। মকাইবাড়ি, লপচু, আরও কত বাগানের চা। গন্ধ আর স্বাদই আলাদা।

চা খেয়েই কিন্তু আমাদের সেই মার্ফিগঞ্জের মানুষখেকো বাঘ 'ল্যাংড়া পাহানে'র গল্পটা বলতে হবে। শোবার আগে আরম্ভ করেছিলে, এবারে শেষ করতে হবে ব্রেকফাস্টের আগে।

তোরা এই বান্দিপুরের জঙ্গলে গেলি না অন্ধকার থাকতে, হাতির পিঠে অথবা জিপে করে?

না।

কেন না?

বান্দিপুর আর মুদুমালাই-এর জঙ্গল আমার ভাল লাগে না।

আমি বললাম।

কেন?

কেন, তা এক কথাতে বলতে পারব না। লাগে না, এইটুকুই বলতে পারি।

আমি বললাম।

তবে এলি কী করতে? না কি ভীরাপ্পানের ভয়ে জঙ্গলে যেতে চাস না?

ঋজুদা বলল।

না, তা নয়। এলাম তো উটি দেখতে। সেই ছেলেবেলা থেকে মায়ের কাছে গল্প শুনে আসছি উটির। দাদু তো মধ্যজীবনে বেশ কিছুদিন ছিলেনও এখানে।

ভটকাই বলল, মধ্যে পড়ে, তুই বাগড়া দিস না, ঋজুদাকে শুরু করতে দে। মার্ফিগঞ্জের "ল্যাংড়া পাহানের" গল্প।

ভারী মজার নামটা, না? ল্যাংড়া পাহান। একবার শুনলে আর ভোলার নয়।

তিতির বলল।

তা ঠিক।

আমি বললাম।

ল্যাংড়া পাহান কি জিম করবেট-এর Temple Tiger-এরই মতন?

ভটকাই অধৈর্য গলাতে বলল।

আহা শোনই না। অত অধৈর্য কেন তুই?

আমি বললাম।

তোর নাম রুদ্র না হয়ে ধৈর্যশীল হলে ভাল হত।

"ওরে ওরে ভটকাই আয় তোরে চটকাই।"

হঠাৎ বলে উঠল ঋজুদা, ভটকাই-এর পাড়ার ছেলেরা যেমন করে বলে তেমন করে।

আমরা হেসে উঠলাম।

তিতির বলল, নাও ঋজুকাকা চা-টা শেষ করো, আর এক কাপ আমি বানিয়ে দিচ্ছি। এবার কিন্তু পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে শুরু করতে হবে।

ওক্কে। যা তোমরা করতে আজ্ঞা করবে, তাই করব।

চা-টা ঢাল কাপে। এবারে শুধুই লিকার কিন্তু। চা-টা কড়া হয়ে গেছে। ওটা ভটকাইকে দিয়ে দে। আর এক পট চা আনতে বল রুদ্র।

বলছি।

আমি বললাম।

কিন্তু ল্যাংড়া পাহানের গল্পটা শুরু করে দাও।

তিতির বলল।

ঋজুদা তার সুললিত, ব্যক্তিত্বমণ্ডিত কণ্ঠস্বরে শুরু করল:

"মার্ফিগঞ্জে ঢুকতে হলে তখন সিজুয়াবাগ হয়ে ঢামনা অবধি আসতে হত ফিলফিলার পিচ-রাস্তা দিয়ে। তারপরই অনেকটা টাঁড়মতো জায়গা, লাল মাটির মস্ত তেমাথা। সেই তেমাথা থেকে অসমান কাঁচা রাস্তা চলে গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

এক ফার্লং মতো গিয়েই পথের পাশে একটা মস্ত বড় গাছ। বনস্পতি। বট না অশ্বত্থ, এতদিনে আর মনে নেই। অনেকইদিন আগের কথা।

জঙ্গলে-জঙ্গলে অনেকখানি গিয়ে পথের ডানদিকের ফরেস্ট বাংলো পেরিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে এক গভীর উপত্যকা। ঘন জঙ্গলে ভরা। সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ঝরনা পেরিয়ে ছোটবড় পাহাড়ের দোলায়-দোলায় দুলতে-দুলতে বড়-বড় গাছের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে থাকা পাকদণ্ডী। এই পাকদণ্ডীর মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সেই উপত্যকার দিকে মুখ করে পেছনে তাকালে দেখা যেত উঁচু পাহাড়টার চুড়োর কাছে "মার্ফিজ নোজ"। অর্থাৎ, মার্ফি সাহেবের নাক। মস্ত, কালো কোনও মানুষের মুখের আকৃতির পাথরটার সামনে-বেরিয়ে-থাকা ন্যাড়া পাথরটাকে একটি অতিকায় নাকের মতোই দেখতে লাগত।

যে-সমস্ত লোকের খুব গর্ব থাকে, অথবা যাঁরা বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণ, তাঁদের নাক

যেমন দেখতে হয়, মার্ফি'জ নোজও তেমনই দেখতে ছিল।

মাঝে-মাঝেই "টপিং-হাউস" থেকে বেরিয়ে, মাইল-চারেক হেঁটে "মার্ফি'জ নোজ"-এর কাছে এসে পথের পাশের বড় পাথরটাতে বসে থাকতাম। ভারী শান্তি ওখানে। দিনমানে বা রাতে গাড়ি বা জিপ যায় একটি বা দুটি। বাস যায় একটিই। সকালে রাঁচী গিয়ে সন্ধেতে ফিরে আসে। মানুষজনেরও যাতায়াত নেই বিশেষ। কখনও-সখনও একলা বার্কিং-ডিয়ার জঙ্গলের এদিক থেকে ওদিকে সাবধানে ইতিউতি চেয়ে সেই লালমাটির পথটি পেরোত। নইলে পাখির ডাক, হাওয়ার শব্দ, পাতার সঙ্গে পাতার কানে কানে কানাকানি। ব্যাস্‌স্‌। নিস্তব্ধ, সুনসান।

কখনও গরমের দিনের বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে চিত্রল হরিণদেরও সেই পথ পেরোতে দেখা যেত, লাফাঝাঁপি করে আমলকী বনে, আমলকী খাওয়ার পর।

এক দারুণ শীতের সকালে ওই গভীর জঙ্গলাবৃত উপত্যকাতেই দেখেছিলাম প্রথমবার "ল্যাংড়া পাহান"কে।

"পাহান" শব্দটির মানে কী ঋজুদা?

তিতির শুধোল।

'পাহান' শব্দটার মানে হচ্ছে পুরোহিত, 'ওঁরাও' ভাষাতে। প্রতি গ্রামেই একজন করে পুরোহিত থাকে। তাকে মান্যও করে সকলে। বাঘের মতো বাঘ ছিল সে। মান্য করারই মতো। তাই সাতগাঁয়ের মানুষে ভালবেসে তার নাম রেখেছিল "ল্যাংড়া পাহান"।

জঙ্গলের মধ্যে সেই জায়গাটিতে গত শীতে ক্লিয়ার-ফেলিং হওয়াতে কয়েকশো বর্গগজ মতন এলাকাতে একটিও গাছ ছিল না। সেই পুরো এলাকাটিই ঘনঘোর বর্ষার জল পেয়ে ঝকঝকে-জেল্লা-দেওয়া কচি-কলাপাতা-রঙা সবুজ ঘাসে ভরা ছিল। "ল্যাংড়া পাহান" ধীরে-সুস্থে সেই ঘাসে-ভরা সবুজ প্রান্তরটি পেরোচ্ছিল। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে, এদিক-ওদিক দেখছিল মাথা ঘুরিয়ে। তখনও তার গায়ে রাতের শিশির লেগে ছিল। প্রথম সকালের সোনারঙা রোদ তার গায়ে পড়ে, তাকে সত্যিই দেখাচ্ছিল রাজারই মতো। রাজা তো নয়! পুরোহিত-রাজা।

কে ওর নাম দিয়েছিল জানি না। তবে পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা মার্ফিগঞ্জে তো বটেই তার চারদিকের পুরো এলাকার সব বস্তির মানুষেরাই "ল্যাংড়া পাহান" বললেই এক ডাকেই তাকে চিনত। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সকলেই। চেনবার কারণও ছিল।

যদিও সেই সময়ে আমাদের বনে-জঙ্গলে বড় বাঘের অভাব ছিল না কিন্তু অত বড় বাঘ সে সময়ে এ-অঞ্চলে আর দ্বিতীয় ছিল না। অনেক দূর থেকে এবং অনেক উঁচু থেকে তাকে দেখেছিলাম, তাই বহুদিন ধরে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনে আসা সত্ত্বেও সে যে "ল্যাংড়া পাহান"ই সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হতে পারিনি। কিন্তু বাংলোতে ফিরে মালীর কাছে তার নিখুঁত বর্ণনা দিতে সে সঙ্গে-সঙ্গেই বলেছিল যে, ও বাঘ ল্যাংড়া পাহান না হয়েই যায় না।

ওর জন্ম হয়েছিল নাকি সেই জঙ্গলের গহনের বনদেওতার ভাঙা দেউলে। ও যখন ছোট ছিল, তখন সামনের বাঁ পায়ে কোনও চোট পেয়ে থাকবে। কী করে পেয়েছিল তা জানা নেই। কিন্তু ও খুঁড়িয়ে হাঁটত। তাই ওঁরাও শিকারিরা আদর করে ওর নাম দিয়েছিল "ল্যাংড়া পাহান"। ল্যাংড়া পাহান কখনও কারও ক্ষতি করেনি! সিজুয়াবাগ থেকে মার্ফিগঞ্জ এবং ঢামনা থেকে ফিলফিলা অবধি ছড়ানো গভীর জঙ্গলের মধ্যে-মধ্যে যেসব গ্রাম ছিল, সেসব গ্রামের একটি থেকেও কখনও সে বর্ষাকালেও গোরু-মোষ নেয়নি। এমন কী, বাঘেদের ঘুঘনি বা চাট যে দিশি ঘোড়া, যা ওরা বড় ভালবেসে খায়, সেই ঘোড়াও ধরেনি একটাও। যদিও গগর, ফুলাটোলি এবং বতরু গ্রামের মুসলমান চাষিদের অনেকেরই টাট্টু ঘোড়া ছিল। কোনও মানুষেরও ক্ষতি করেনি কখনও সে। তাই পথ চলতে বা কাঠ কাটতে গিয়ে বা হাটবারে হাট সেরে রাত করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিজের নিজের দূর গ্রামে ফিরে যাবার সময়ে তার সঙ্গে হঠাৎ কখনও কারও নির্জনে দেখা হয়ে গেলে, এ তল্লাটের সব মানুষই সহর্ষে 'ল্যাংড়া পাহান'! 'ল্যাংড়া পাহান'! বলে চেঁচিয়ে উঠত অনেকটা, আদর করেই। যেমন করে পোষা অ্যালসেশিয়ান বা গ্রেট ডেন কুকুরকে মানুষে ডাকে।

"ল্যাংড়া পাহানে"র চোখে এবং নখেও কোনও পাপ ছিল না।

॥ ২ ॥

সেই প্রথম দেখার প্রায় বছর পনেরো পরের ঘটনা।

এখন আর আগের সেই জঙ্গল নেই, আবহাওয়া নেই, পুরনো লোকজনও নেই। পুরো জায়গাটাই দ্রুত বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি, কাঁচা রাস্তাটাও নাকি পাকা হয়ে যাবে। তবে একথা শুনে আসছি প্রায় গত দশ বছর হল। আসলে কবে হবে, তা ঈশ্বরই জানেন। জঙ্গলের জাদু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন কিছু নতুন বড়লোক আর আপস্টার্টদের ভিড়ও ক্রমশই বাড়ছে। এত জায়গা থাকতে তারা মরতে এমন জঙ্গলের জায়গায় বাড়ি করে কেন, ভেবে পেতাম না। করে হয়তো, রাঁচী শহরের থেকে বেশি দূরে নয় বলেই। জমি-বাড়ির মতো ইনভেস্টমেন্ট তো হয় না। অনেকে থাকেও না। অনেকেই জায়গা নিয়ে নতুন বাড়ি করেও সে বাড়ি ফেলে রাখছে। তাতে অবশ্য আমি অসুখী হইনি। মানুষ যতদিন কম আসবে, থাকবে, পরিবেশ অমলিনই থাকবে। ট্রানজিস্টর, টিভি বাজবে না।

মাঝে, বহুবছর বাইরে বাইরেই ছিলাম।

এটুকু বলে ঋজুদা থামল। পাইপটা নিভে গেছিল। ধরিয়ে নিল। তারপর বলল, স্টেটস-এ, কানাডাতে, স্পেইন-এ। ভারতে পৌঁছেই সময় করে এসেছি মার্ফিগঞ্জে অনেক নেমন্তন্ন ও মিটিং-টিটিং ক্যানসেল করে।

এক শেষ বিকেলে, বাংলোর বাইরে বসে আছি, পেয়ারাগাছগুলোর তলায়।

মালী-বউকে দিয়ে খুব ভাল করে গোবর-নিকিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করানো হয়েছে, যাতে সাপ-খোপ না আসে। একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। বাংলোর কম্পাউন্ডের পাশের নালা থেকে তিতির ডাকছে ঘন ঘন। চিঁহা-চিঁহা-চিঁহা করে।

এমন সময়ে ডগলাস এসে হাজির।

"গুড ইভনিং" মিস্টার বোস। বলে, সে আমাকে "উইশ" করে নিজেই বেতের চেয়ার টেনে বসল।

"গুড ইভনিং"।

বিরক্ত গলায় বললাম, আমি।

এই ডগলাস লোকটাকে আমি পছন্দ করতাম না। ভীষণ পরনিন্দা-পরচর্চা করে। আর সব বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সকলের হাঁড়ির খবর নিয়ে বেড়ানোই ওর কাজ ছিল। বউ মরে গেছে অনেকদিন আগে। কিছু করারও ছিল না। যখন বউ ছিল, তার সঙ্গে ঝগড়া করে অনেকটা সময়ই কেটে যেত ওর। ডগলাস প্রায়ই বলত, বউ মরে যাওয়াতে বুঝি, ঝগড়া করার আর দ্বিতীয় কোনও লোক নেই। পরের সঙ্গে ঝগড়া করে সুখ নেই একেবারেই।

ডগলাস বলল, এক কাপ কফি হবে?

কফি আনতে বললাম মালীর বউকে।

ও না চাইলে খাওয়াতাম না। কফি খাওয়া মানেই আরও কিছুক্ষণ বসে থাকা।

ডগলাস বলল, মিঃ বোস, তোমার বন্দুক কোথায়?

কেন? বন্দুক-রাইফেল সবই গান-স্ট্যান্ডেই আছে। যেখানে থাকার। সবসময়েই কি বন্দুক-রাইফেল কাঁধে করে বসে থাকব নাকি? আমি তো ব্যাঙ্কের দ্বারী নই!

তারপর বললাম, কী ব্যাপার বলো তো? হঠাৎ এই প্রশ্ন?

সে কী! তোমাকে কেউই বলেনি এখনও? মালীও না?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম। নাঃ। কী বলবে? তা ছাড়া আমি তো মাত্র কয়েকদিন হল এসেছি।

মালীর বউও বলেনি?

না। বলেনি। কী? তা বলবে তো?

আমাদের গুড ওল্ড "ল্যাংড়া পাহান" ম্যান ইটার হয়ে গেছে। গত ছ' মাসে দশজন মানুষ ধরেছে। তোমার এমন করে খালি হাতে বাইরে বসে থাকা ঠিক নয়। অন্ধকারও তো হয়ে এল।

আমি অবাক হলাম। বললাম, বলো কী? পেট্রোম্যাক্স-আলো জ্বলছে বাড়ি-বাড়ি। প্রত্যেকের বাবুর্চিখানাতে রান্না হচ্ছে। এর মধ্যে বাড়িতে আসবে বাঘ? টাইগার? মার্ফিগঞ্জের সব বাড়ি কি সুন্দরবনের জেলে-মউলে-বাউলেদের নৌকো হয়ে গেল নাকি?

ডগলাস আমার কথার উত্তর না দিয়ে ওর খাঁকি ট্রাউজার্সের পকেট থেকে

টর্চটা বের করে জ্বেলে বার-কয়েক চারপাশে ঘুরিয়ে দিল। অন্ধকার হয়ে গেছে ততক্ষণে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে ওর বুক পকেট থেকে আধখানা-খাওয়া সিগারেটটি বার করে, ইঙ্গিতে আমার সামনের গোল বেতের টেবলের উপরে রাখা লাইটারটি চাইল।

লাইটারটি এগিয়ে দিতেই আগুন জ্বেলে সিগারেটটি ধরিয়ে এক রাশ ধুঁয়ো ছেড়ে বলল, তুমি যা ভাবছ, তা নয়। ল্যাংড়া পাহান মার্ফিগঞ্জের বাংলো থেকেও মানুষ নিয়েছে।

কাকে?

হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস্ করলাম আমি।

মিসেস ভাওয়ালের মালীর ছেলেকে। এবং মিস্টার জনসনকেও।

কোন জনসন? রোনাল্ড জনসন?

ইয়েস স্যার! তবে আর বলছি কী! চলো, আমরা ভেতরে গিয়ে বসি।

এতই যদি ভয়, তা হলে খালি হাতে অন্ধকারে তুমি এতটা হেঁটে এলে কী করে তোমার বাংলো থেকে?

বিরক্ত হয়ে বললাম, আমি।

ডগলাস হাসল। অন্ধকারেও সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁতদুটো ঝিলিক মেরে উঠল।

বলল, লুক! মিস্টার ঋজু বোস। আমার কথা আলাদা। আমি তো মরতেই চাই। জেনিফারই চলে গেল আমাকে ফেলে, আমার জীবনে বাকি আর কী আছে। আমি মরতে চাই বলেই অন্ধকারে একা-একা ঘুরে বেড়াই। আত্মহত্যা করলে মানুষে কাপুরুষ বলবে। কিন্তু বাঘে খেলে তো আর বলবে না। জঙ্গলে যাই। রাতের বেলাও। কিন্তু পাহান তো আমাকে নেবে না। যে যা চায়! বুঝলে মিস্টার বোস, সে, তা ছাড়া, আর সবই পায়। গড ইজ ভেরি মীন। ইয়েস! দ্যাট জেন্টলম্যান ইজ ভেরি মীন ইনডিড!

তুমি এক সেকেন্ড বোসো, আমি রাইফেলটা নিয়েই আসি।

আমি বললাম, ডগলাসকে। বসব বাইরেই। হাতের কাছে রাইফেল থাকতেও আমাদের তুলে নিয়ে যাবে এমন মানুষখেকো বাঘ এখনও ভারতে জন্মায়নি।

ভিতরে গিয়ে প্রথমেই বাবুর্চিখানার দিকে এগোলাম। বাবুর্চিখানাটা খাওয়ার ঘরের সঙ্গে একটি ঢাকা প্যাসেজ দিয়ে জোড়া। বাবুর্চিখানাতে গিয়ে দেখি, ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ। মালী আর তার বউ ঘরের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে। প্রেসার কুকারে মুরগি সেদ্ধ হচ্ছে। তার সিঁ-সিঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দরজায় টোকা মারতেও ওরা দরজা খুলল না। তারপর ডাকতেই ধড়ফড়িয়ে উঠে দরজা খুলল।

শুধোলাম, বাঘোয়া হিঁয়েপর? আদমি...?

হাঁ মালিক। বড়া তংক করলথু। বড়কা বাঘোয়া।

মালী বলল।

মালীর বউ যোগ করল, "ল্যাংড়া পাহান"।

আমাকে বলোনি কেন?

না মালিক। ভয়ে বলিনি। যদি আপনি ল্যাংড়া পাহানকে মারতে যান।

তার মানে? তাতে ভয়ের কী? আমি কি বাঘ কখনও দেখিনি? না মারিনি?

না সাহাব। বনদেওতা কা দোয়া হ্যায় উসকো পর, গোলিসে কুছ ভি নেহি কিয়া যায়গা। এ পর্যন্ত তিনজন শিকারি মারতে গিয়েছিল। তিনজনকেই ল্যাংড়া পাহান মেরেছে। একজনকে খেয়েও নিয়েছে। সেই শিকারি রাতে একা বসে ছিল মাচাতে, পাহানকে মারবে বলে। আর মারল পাহানই তাকে। ও, সেই লাশ যদি দেখতেন মালিক!

বললাম, ডগলাস সাহেবের জন্যে কফির জল চড়াও। আমিও খাব এক কাপ। তবে, ব্ল্যাক।

সে বলল, নিয়ে যাচ্ছি কফি হয়ে গেলেই। তারপর বলল, যেমন উনি ভালবাসেন, কফির সঙ্গে ওমলেটও করব কি?

করো।

আমি বললাম।

তারপর বললাম, তোমরা আমাকে ল্যাংড়া পাহানের কথা বলোনি কেন?

ভয়ে।

ভয়ে! কীসের ভয়ে?

আপনার ভয়ে।

মানে?

ওই বাঘ কেউই মারতে পারবে না। ও বন-দেওতার বাঘ। মধ্যে দিয়ে আপনারই প্রাণ যাবে। আপনার প্রাণ গেলে আমাদের কী হবে সাহেব?

যত্তসব বাজে কথা।

ধমকে বললাম আমি।

ওমলেটও ভেজে নিয়ে যাচ্ছি।

মালী বউ বলল।

তা হলে দরজাতে খিল লাগিয়েই থাকবে। আর আরও একটা পেট্রোম্যাক্স ধরিয়ে পেছনের বারান্দাতে রাখো।

বলে, থ্রি-সেভেন্টি-ফাইভ ম্যাগনাম রাইফেলটা এবং দু-রাউন্ড গুলি নিয়ে বাইরে গেলাম। পাঁচ-ব্যাটারির টর্চটাও নিয়ে গেলাম। যদিও আমার বাংলোর চারপাশে বড় গাছ নেই, বড়গাছ সব কম্পাউন্ড-এর সীমানার কাছাকাছি। তবু একটা পাহাড়ি নালা আছে বাংলোর কম্পাউন্ডের চারধার দিয়ে। যে-কোনও জানোয়ারের পক্ষেই নালার ভিতরে এবং কম্পাউন্ডের সীমানার বড় বড় হরজাই

গাছেদের ছায়াতে লুকিয়ে থাকা খুবই সহজ। গত বছরই মালীর কুকুরটাকে নিয়ে গিয়েছিল একটা চিতা, সন্ধে লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই। ওই নালাতেই লুকিয়ে ছিল সেটা।

বাইরে এসেই, চমকে উঠলাম। ডগলাস নেই চেয়ারে। টর্চটা চারধারে ঘুরিয়ে ডাকলাম, ডগলাস, ডগলাস, হোয়ার আর উ্য?

সাড়া নেই। টর্চটা এবার উলটো দিকে ফেললাম।

দেখলাম প্যান্টের বোতাম আটকাতে-আটকাতে ডগলাস অন্ধকার ফুঁড়ে আমার দিকে আসতে-আসতে বলল, সুইচ ইট অফফ মিস্টার বোস। মাই মেডালস আর শোয়িং।

এর উত্তরে আর কী বলা যায়! জঙ্গলের জায়গাতে "ছোট বাইরে" করতে পুরুষেরা বাথরুমে যানই না। রাতে তো নয়ই!

রাইফেলটাকে কোলের উপর আড়াআড়ি করে রেখে, গুলি দুটি টেবলের উপরেই রাখলাম। মার্ফিগঞ্জে নিজের বন-বাংলোতে সন্ধেবেলা গুলি-ভরা রাইফেল হাতে বসে থাকতে হবে এমন ভাবনাও নিজেকে বে-ইজ্জৎ করল।

ডগলাস কাছে এসে চেয়ারে বসলে, বললাম, তোমার কথা সব দেখছি সত্যিই! মালী তো তাই বলল। তুমি কিন্তু এমন কোরো না। প্রিকশান নিয়ো।

ডগলাস ইংরিজিতে যা বলল, তার সারাংশ করলে দাঁড়ায়: ও যমেরও অরুচি। তাই যমের নৈবেদ্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দারিদ্র্য, আর একাকিত্বর জীবন ও আর বইতে পারছে না। তবু যম তাকে দয়া করছে কোথায়?

রাতে তুমি যেয়ো না। আমার এখানেই থেকে যাও। আমি বললাম।

মাথা খারাপ! জেনিফার বুঝি রাগ করবে না? আমি সময়ে না ফিরলে! ও খুব চিন্তা করে আমি সময়মতো না ফিরলে। ওর খাটটা, ওর চেয়ারটা সব আমাদের বেডরুমে যেমন থাকার তেমনই আছে। ওই চেয়ারে বসেই ও উল বুনত, লেস বুনত, বাইবেল পড়ত। আর ওই খাটেই ও শুত। ও চলে গেছে বটে, কিন্তু ও আমার কাছে-কাছেই থাকে সবসময়।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা, মিস্টার বোস, মানুষ মরে কোথায় যায় বলতে পারো?

জানি না। ভাবিনি, তেমন করে কখনও। নিজে মরলে বলতে পারব।

আমি কিন্তু সবসময়ই ভাবি। তুমিও একটু ভেবো। জেনির সঙ্গে আমার কি দেখা হবে? আমি যদি তাড়াতাড়ি যাই?

মালীর বউ, কফি, আর ওমলেট নিয়ে এল।

বললাম, ডগলাস, আজ আমার সঙ্গে ডিনার খেয়ে এখানে থেকেই যাও রাতটা।

ডগলাস কথা বলার সময়ে বাঁ হাতটাকে হাতপাখার মতো নাড়িয়ে-নাড়িয়ে কথা বলত সবসময়। হাত নাড়িয়ে বলল, আউট অফ দ্যা কোয়েশ্চেন।

তা হলে, তুমি আমার একটা বন্দুক নিয়ে যাও সঙ্গে। গুলি ভরে দিচ্ছি।

আই ডোন্ট নিড ওয়ান। আমি তো মরতেই চাই। ল্যাংড়া পাহানের হাতে মরলে, ডেথ উইল বি অ্যাজ শিওর অ্যাজ ডেথ অ্যালোন ক্যুড বি। পাহান আমাদের ওল্ড চ্যাপ। নোন চ্যাপ। নাইস-গাঈ।

তারপর বলল, আ গান টু অ্যাভয়েড ডেথ?

তারপরই বলল, ওর কি দয়া হবে? আমার উপরে?

এই কথা বলে ও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। আমিও চুপ করে রইলাম। অনেকক্ষণই।

অনেক বছর পরেই এসেছি আমার এই বড় প্রিয় জায়গায়। মাঝে চার বছর বাইরে বাইরেই ছিলাম। দেশে ফিরেছি মাত্র দেড় মাস হল। সপ্তাহখানেক হল এসেছি মার্ফিগঞ্জে। স্বদেশের সঙ্গে কোন দেশের তুলনা?

ভাবছিলাম, ডগলাসের বোধহয় একটু মাথার গোলমাল হয়েছে। পরে মিঃ হল্যান্ডকে জিজ্ঞেস করতে হবে। মিঃ সেটনই ডগলাসের বাড়ির সবচেয়ে কাছে থাকেন যদিও।

ওর ওমলেট আর কফি খাওয়া হয়ে গেলে বললাম, তোমাকে আমি এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না। চলো, তোমার বাংলো অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ডগলাস হেসে উঠল।

বলল, ইটস ভেরি সুইট অব ইউ ইনডিড টু হ্যাভ সেইড দ্যাট। জোকস এপার্ট, আই রিয়্যালি ওয়ান্ট টু ডাই! আমি সত্যিই মরতে চাই। মিস্টার বোস।

মরতে চাও, সে খুউব ভাল কথা। কিন্তু আমি তোমার খুনের দায়ে পড়তে রাজি নই। তোমার বাড়ির পথ গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে প্রায় দু-ফার্লং। যেখানে ম্যানইটার বাঘ অপারেট করছে, সেখানে অমন পথে কেউ রাতে যায়?

ডগলাস বেগতিক দেখে একটু ভেবে বলল, চলো, তা হলে। তুমি যখন মরতে দেবেই না।

উঠলাম আমরা। মালীকে ডেকে সাবধানে থাকতে বললাম বাবুর্চিখানার দরজা বন্ধ করে। আমি না-ফেরা অবধি।

আমার বাংলোর কম্পাউন্ড প্রায় কুড়ি বিঘার। নানা জংলি গাছও আছে। তবে এখন এপ্রিলের শেষ, গাছগুলোর পাতা প্রায় সবই ঝরে গেছে। তবে আমাদের বনে প্রায় সব গাছই পর্ণমোচী যদিও, সব গাছেরই পাতা যে একই সময়ে ঝরে, তা কিন্তু নয়। কিছুর পাতা ঝরে শীতে, কিছুর বসন্ত-শেষে, কিছুর আবার শরতে। প্রকৃতির এমন নিতুই-নব-লীলা পৃথিবীর আর কোথায় আছে?

নীচেও আর আগাছা নেই এখন। অনেক দূর অবধি পরিষ্কার দেখা যায়। কোনও জানোয়ার, বিশেষ করে বাঘের মতো বড় জানোয়ার এমন ফাঁকা জায়গাতে এলে, যার কিছুমাত্র শিকারের অভিজ্ঞতা আছে, তার চোখ বা কান এড়িয়ে আসতে পারবে না। পারবে না বলব না। বাঘের মতন এমন 'ক্যামোফ্ল্যাজ'

করার ক্ষমতা পৃথিবীর খুব কম প্রাণীরই আছে। এমন নিঃশব্দে চলাফেরাও আর কোনও জানোয়ারই করতে পারে না। তবু যদি পারেও, তবে তারও মুশকিল হবে। বাঘও শিকারি কিন্তু শিকারিও তো শিকারি। বাঘের কিছু গুণ তো তাদেরও আছে!

সেদিন বোধহয় শুক্লপক্ষের অষ্টমী কি নবমী হবে। ক্রমশই চাঁদটা জোর হচ্ছে। মার্চের শেষে দোল গেছে। এপ্রিলের পূর্ণিমাও বনে-জঙ্গলে এবং আমার এই মার্ফিগঞ্জে বড় চমৎকার। নেশা লাগে দমক-দমক হাওয়ায় মহুয়া আর করৌঞ্জের। আর বাংলোগুলির হাতার মধ্যে মধ্যে লাগানো আম-কাঁঠালের মঞ্জরী আর মুচির গন্ধে।

চলতে চলতে ডগলাস বলল, আমি তো চাকরির কারণে মধ্যপ্রদেশে ছিলাম এত বছর। গভীর জঙ্গলে। যত ম্যানইটারের কথা শুনেছি সেখানে, লেপার্ডের কথা বলছি না, টাইগার, তারা তো দিনের বেলাই মানুষ ধরত। রাতে ধরতে তো বিশেষ শুনিনি।

ল্যাংড়া পাহান তো তার ছেলেবেলা থেকেই এই বস্তিগুলোর আর মার্ফিগঞ্জের চারপাশের জঙ্গলেই বড় হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের লোকজনকে এবং তাদের অভ্যাস-অনভ্যাস ল্যাংড়া পাহানের লেপার্ডদের মতোই ভাল করে জানা হয়ে গেছে। মানুষের ভয়-ডরও আর ওর নেই। সে কারণেই বোধহয়...।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, ইটস আ গেসস ডগলাস। তুমি যা বলেছ, তাই ঠিক। বড় বাঘ মানুষখেকো হলে দিনেই মানুষ ধরে সাধারণত। রাতে যে একেবারেই ধরে না, তা যদিও নয়।

ছোট, জরাজীর্ণ ওর দু'কামরার বাংলোতে পৌঁছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাকে গুডনাইট করল ডগলাস। আমিও গুডনাইট করে ফিরলাম।

কিছুটা আসার পরই সেই জঙ্গলে এসে পড়লাম। জঙ্গলটার মধ্যে দিয়ে সাবধানে ফিরছিলাম। হঠাৎ হিস্‌স্‌স্‌ শব্দ শুনে চমকে উঠে টর্চ ফেললাম। মস্ত একটা অশ্বত্থ গাছ এখানটাতে। কখনওই এর পুরো টাক পড়ে না মাথায়। পিছনে একটা নালা থাকায় অনেক পাতাই সবুজ থাকে। আশ্চর্য। তার ঠিক গুঁড়ির কাছেই একজোড়া বিরাট শঙ্খচূড় সাপ প্রায় এক মানুষ উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাটি থেকে। ফণায়-ফণায় জড়াজড়ি করে। শঙ্খ লেগেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ওরা নিজে থেকেই সরে গেল। আমি আবার আমার পথে এগোলাম। জংলি লোকেরা বলে, এমন ভাবে সাপকে দেখলে নাকি মানুষ রাজা হয়।

আমিও হব হয়তো কোনওদিন, কে বলতে পারে?

চলতে-চলতে ভাবছিলাম, ডগলাস এরকম নির্জন জায়গাতে একেবারেই একা থাকে। ওর নিয়ারেস্ট নেবার সেটন। কিন্তু মার্ফিগঞ্জের প্রত্যেক বাংলোর সঙ্গেই দশ পনেরো কুড়ি তিরিশ বিঘা করে জঙ্গল থাকে। তা পরিষ্কার করে চাষাবাদও করেন খুবই স্বল্প মানুষে। তা ছাড়া জঙ্গল আছে বলেই না এত জায়গা থাকতে

আমি এখানের এই বাংলো কিনেছিলাম। যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকের ছিল বাংলোটি, তিনি অস্ট্রেলিয়াতে চলে যাচ্ছিলেন এটি বিক্রি করে দিয়ে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ বাংলোই এক সময়ে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদেরই ছিল।

প্রত্যেক বাংলোর সঙ্গেই বিরাট জঙ্গল থাকে বলেই পাশের বাংলোতে যেতে হলেও অনেকখানি পথ হেঁটে যেতে হয়।

তা ছাড়া, পথ তো জঙ্গলের আর পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই।

ডগলাসের বাড়িতে এখন আর কোনও চাকর-বাকর, মালীও নেই। ওদের একটিই মাত্র মেয়ে। সে একটি বিহারী আই. পি. এস. ছেলেকে বিয়ে করে, জব্বলপুরে। তার স্বামী পুলিশের ডি-আই-জি, বিহার ক্যাডারের। মেয়েও টাকা-পয়সা পাঠায় না কিছু। বছরে একটি চিঠি লিখেও খোঁজ নেয় না। জেনিফারের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তার পেনশানও বন্ধ হয়ে গেছে। ডগলাস যা পেনশান পায়, তাতে কুকুরেরই চলে না, তায় মানুষের! একা থাকে বলেই ওর জন্যে আমার চিন্তা হতে লাগল। এমন নির্জনে যখন-তখন যা-তা ঘটতে পারে, যদি ল্যাংড়া পাহান সত্যি সত্যিই মানুষখেকো হয়ে গিয়ে থাকে। কে জানে! কেন ও ম্যানইটার হল?

চারদিকের জঙ্গল কাটা হচ্ছে। শুয়োরের মতন, গিনিপিগের মতন বাড়ছে মানুষ। পৃথিবীর সব গাছ, সব মাঠ, সব ফুল, সব পাখি ধ্বংস না-করা অবধি এই খাই-খাই করা দুপেয়ে জন্তুরা থামবে না!

পরদিন সকালেই ব্রেকফাস্টের পরে রেঞ্জারের অফিসে গিয়ে পাহান কোথায়-কোথায়, কবে-কবে মানুষ নিয়েছে, তার সঠিক একটা বিবরণ বিস্তারিত লিখে নিলাম। একটা ম্যাপও এঁকে ফেললাম।

আমি আসার একদিন আগেই, তেরো বছরের একটি মেয়েকে নিয়েছে ফুলফুলিয়া গ্রাম থেকে। মেয়েটির মা অজ্ঞান হয়ে রয়েছে এখনও মেয়ের শোকে।

রেঞ্জার সাহেব বললেন, আমাকে নাকি কলকাতায় চিঠিও পাঠিয়ে ছিলেন। কনজারভেটর সাহেবকেও উনি গতকালই খবর পাঠিয়েছেন। জানিয়েছেন আমার আসার কথা। আমি এসে পড়ায়, অন্য কোনও শিকারিকে ওই বাঘ মারার পারমিট ওঁরা আপাতত দেবেন না।

বললেন যে, চিপাদুরার ঠিকাদার সর্দারজি গুরনাম সিংকে দিনদশেক আগে পারমিট দিয়েছিলেন। কিন্তু সর্দারজির এ বাঘ মারাতে বিশেষ উৎসাহ নেই। সে হরিণ-শম্বরের চোরা-শিকারি।

যে-তিনজন শিকারিকে ল্যাংড়া পাহান এ-পর্যন্ত মেরেছে, তাদের মধ্যে একজন চিপাদুরার, একজন সদরের আর অন্যজন এখানেরই।

রেঞ্জারসাহেবকে আমি শুধোলাম, কেউ কি এ পর্যন্ত বিট করিয়েছিল বাঘকে বের করার জন্যে?

রেঞ্জারসাহেব হাসলেন।

বললেন, ম্যানইটার বাঘ বা লেপার্ডকে বিট করতে তো রাজি হয় না গ্রামের লোক। তা ছাড়া, এ বাঘ, এদের সকলেরই ধারণা, এক বিশেষ বাঘ। যারাই তাকে ইদানীং দেখেছে, বা তাকে শিকার করতে গেছে সকলেই এ কথা বলে। আপনিও বিশেষ সাবধান হবেন বোসসাহেব। বহতই খতরনাগ হ্যায় ঈ বাঘোয়া। মামুলি বাঘোয়া মত শোচিয়ে ইসকো!

পরদিন সকালে পেয়ারাতলিতে বসে চা খেয়ে সবে জমিয়ে পাইপটা ধরিয়েছি, ঠিক এমন সময় প্রচণ্ড গতিতে সাইকেল চালিয়ে খাকি পোশাকের একজন ফরেস্ট-গার্ড গেট দিয়ে ঢুকল, চাকায় লাল ধুলো উড়িয়ে, লাল কাঁকুড়ে-মাটিতে কিরকির আওয়াজ তুলে।

এতই আচম্বিতে খোলা-গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছিল সে কারও অনুমতি না নিয়ে এবং এত জোরে সাইকেল চালাচ্ছিল লোকটা যে, তার বদতমিজীতে চটে গিয়ে মালীর কালো কুকুর কাল্লু তাকে ধাওয়া করে সাইকেলের পেছন পেছন আসতে লাগল তারস্বরে চেঁচাতে-চেঁচাতে।

গার্ড সাইকেল থেকে নেমেই সেলাম করল। একটা চিঠি দিল। রেঞ্জারের চিঠি।

তাড়াতাড়ি খুলে দেখি, লিখেছেন, কাল ভোরে একটা নতুন কিল হয়েছে মার্ফিজ নোজ-এর কাছে। কাল খুব দেরিতে জানতে পারায় গার্ড রেঞ্জ অফিসে এসে জানাতে পারেনি, রাতে জানিয়ে লাভও ছিল না। তার আসার সাহসও ছিল না। এই গার্ড "কিল" কোথায় আছে, তার আন্দাজ জানে। যা ভাল মনে করার করবেন। চিঠি পাওয়া মাত্র রওনা হতে পারেন। কিন্তু আবারও বলছি, খুব সাবধান। এ বনদেওতার বাঘ।

তক্ষুনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, মালী আর তার বউকে আমাদের দু'জনের জন্যে খুব তাড়াতাড়ি নাস্তা তৈরি করতে বলে, চান করতে চলে গেলাম। হাতে অনেকই সময় আছে।

গার্ডের নাম যুগলপ্রলাদ। জাতে সে কাহার। নাস্তা করতে করতে ও ল্যাংড়া পাহানের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে আমাকে অনেক কিছুই বলল। বলল, কীভাবে মানুষ নিচ্ছে, কী করে আমাদের নির্বিরোধী ভালমানুষ প্রতিবেশী ল্যাংড়া পাহান মানুষখেকো হল মানুষেরই দোষে, সেই সব গল্প।

যুগলপ্রসাদ এবং রেঞ্জারসাহেবেরও দৃঢ় ধারণা যে, বছরখানেক আগে রাঁচী থেকে যে একদল শিকারি জিপে করে রাতে ফরেস্ট-গেট ভেঙে এসেছিল স্পট-লাইট নিয়ে, চুরি করে শিকার করতে, তাদেরই এলোপাথাড়ি চালানো গুলিতে পাহান আহত হয়ে থাকবে।

এরা আসলে সব হরিণ-মারা, খরগোশ-মারা শিকারি। বাঘের মোকাবিলা করার সাহস বা ইচ্ছা এদের কোনওকালেই ছিল না। 'ল্যাংড়া পাহান' তাদের সামনে পড়ে যাওয়াতে " বাঘ-শিকারি" হওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে, জিপ-এর উপরেই দাঁড়িয়ে শটগান-এর এল-জি দিয়ে দু-তিনজন একসঙ্গে গুলি করে।

ল্যাংড়া পাহানের নাকি দাঁত ভেঙে যায় তাতে। এবং সামনের ডানদিকের পায়েও চোট পায়। বেচারার আর দোষ কী? স্বাভাবিক জীবন যদি যাপন করতে পারত তবে সে কেন মানুষ মারতে যাবে?

যুগলপ্রসাদ উষ্মার সঙ্গে বলল, প্রথমে ওইসব শিকারিদেরই গুলি করে মারা উচিত সাহেব আপনার। তার পরেই না হয় আমাদের বচপনকা সাথী ল্যাংড়া পাহানকে মারার তোড়জোর করবেন।

আমি বললাম, বলেছ তুমি ঠিকই।

রওনা হওয়া গেল। আমি যুগলপ্রসাদের সাইকেলের কেরিয়ারে বসলাম। রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে। বন্দুকটার ব্যারেল আর স্টক 'Lamb's Leg'*-এ পুরে ওকে দিলাম। আলাদা করে ঝুলিয়ে নিল যুগলপ্রসাদ, সাইকেলের হ্যান্ডলে। অন্য জিনিসপত্রও ওইভাবেই নিল।

মাইল-দুয়েক ঢামনার দিকে গিয়ে বড় কাঁচা রাস্তা ছেড়ে, একটা সরু পায়ে-চলা ফরেস্ট রোডে ঢুকে পড়ল যুগলপ্রসাদ। বলল, 'মার্ফি'জ নোজ-এ যাবার এটাই সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তা।

যাকে মেরেছে, সে ছেলে না মেয়ে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হুজৌর! সকাল বেলা দূর থেকে দেখেছে হুড্‌কু। দেখেছে, "ল্যাংড়া পাহান" তার বাবা লক্ষ্মণকে কিছুটা খেয়ে, তার লাশ টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

হুড্‌কু? হুড্‌কুটা আবার কে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

লক্ষ্মণই বা কে?

হুড্‌কু হচ্ছে আমাদের লক্ষ্মণ সিং শিকারির ছেলে। ল্যাংড়া পাহানকে মারবার পারমিট লক্ষ্মণ সিংকে দেওয়া হয়নি। ওর গাদা-বন্দুক আছে একটা। লক্ষ্মণের জিগরী দোস্ত ঝাবড়কে ল্যাংড়া পাহান মেরে খেয়ে ফেলার পরই ওই গাদা বন্দুক নিয়েই বাহাদুরি এবং বদলাও নেবার জন্যে তক্কে তক্কে ছিল লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের ওরকম মর্মান্তিক মৃত্যুর পর থেকেই হুড্‌কু ছেলেটা সারা দিন বাবার বন্দুকটা হাতে করে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়েছে।

হুডকুর বয়স কত?

কত আর হবে! তেরো-চোদ্দো।

অতটুকু ছেলে! ও কী করছে জঙ্গলে? এই বাঘ মারবে ও?

বন্দুকটার নল ওর প্রায় কাঁধ-সমান লম্বা। তাতে কী হয়? ছেলের উৎসাহ এবং সাহসের কমতি নেই। বাপকা বেটা সিপাহিকো ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া-থোড়া!"

---

* চামড়ার তৈরি ভিস্তির মতো জিনিস। তার মধ্যে শটগান এর ব্যারেল, স্টক আর লক খুলে ভরে নিয়ে সঙ্গের ব্যাগে করে কাঁধে ঝুলিয়ে বন্দুক বওয়া হয়।

তোমরা সব আশ্চর্য মানুষ তো! সদ্য বাবা-হারানো ছেলেটাকে একা ছেড়ে দিলে যমের মুখে!

যমের মুখে কে আর শখ করে যেতে চায় হুজৌর।

তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, শিকার করতে জানে হুডকু?

তা জানে। তবে, বড়-জোর খরগোশ বা কোটরা মেরে থাকবে দু একটা। বাপই শিখিয়েছিল। একটা মাত্র ছেলে। মা কেঁদে-কেঁদে মরছে। কারও কোনও কথাই শোনেনি। ও-ও মরবে। ওয়াক্ত হয়েছে। ও একেবারে ভোরভোর দেখেছে ল্যাংড়া পাহান কী যেন ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে, মার্ফিকা নাককা তল্লেমে। কিন্তু কারোকে জানায়নি। রেঞ্জারসাহেবকে, মোষের গাড়ি আসছিল চারটে সিজুয়া বাগ থেকে, সেই গাড়োয়ানেরাই সন্ধের মুখে মার্ফিগঞ্জে খবর দিয়েছে। মৃত্যুভয় বড় ভয় হুজৌর।

আরও মাইল-তিনেক গিয়ে যুগলপ্রসাদ বলল, এবার সাইকেল ছেড়ে আমাদের হেঁটে যেতে হবে হুজৌর।

সাইকেলটা একটা বড় শিমুল গাছের গোড়ায় রেখে, আমার হ্যাভারস্যাক, জলের বোতল আর ল্যাম্বস-লেগটাকে কাঁধে নিয়ে এগোল যুগলপ্রসাদ, পিছন-পিছন আমি, রাইফেল-হাতে।

অনেক অচেনা পথ, শুকিয়ে-যাওয়া পাহাড়ি ঝরনা দু'টি ছোট পাহাড় টপকে আমরা একটি চওড়া নদীর শুকনো বুকে এসে পৌঁছলাম।

নদীটিকে দেখেই চিনলাম। ঘুংঘটিয়া নদী। এ নদীটি এখন প্রায় শুকনো। মার্ফিগঞ্জের চারপাশ দিয়ে, মালার মতো গোল হয়ে ঘুরে গেছে। এবং মিশেছে গিয়ে সব-সময় জল-থাকা সিতাওন নদীতে।

মনে পড়ল, এই ঘুংঘটিয়া নদীরই পুবদিকে নদীর পাশের গুহার কাছে ভালুকের ছবি তুলতে গিয়েছিল একবার ডগলাস। তখন তার ফ্লানেলের প্যান্ট এবং পেছনের এক কেজি দু'শো গ্রাম মতো মাংস একটি পয়সাও না দিয়ে খুবলে নিয়েছিল অভদ্র কিন্তু রোগা-দুর্বল একটা ভালুক। সে অনেক বছর আগের কথা।

সেই মাংস দিয়ে সেই ভালুক ভিন্ডালু বানিয়েছিল, না কাবাব, তা অবশ্য জানা নেই।

এই এলাকাতেই হুডকু নাকি ল্যাংড়া পাহানকে দেখেছে।

বালিতে ভাল করে খুঁজতে লাগলাম আমরা বাঘের পায়ের দাগ।

কাল মাঝরাতে এক চোট ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে। থাবার দাগ-টাগ সব মুছে গেছে। ঝড়ে-ওড়া লাল-হলুদ-খয়েরি শুকনো পাতা আর কুটো ছড়িয়ে আছে বালির উপর। এখনও বেশ ঠাণ্ডাই আছে।

একটা বনমোরগ ডেকে উঠল হঠাৎই আমাদের সামনে থেকে কঁক কঁক করে। ভয়-পাওয়া ডাক। এখানে বাঁদর বেশি নেই। ময়ূরও নেই। টিটি পাখির একটি ছোট্ট দল হঠাৎ ওদের ল্যাগব্যাগে পা-দুলিয়ে উড়ে গেল আমাদের থেকে একশো

গজ দূরের একটি ঝোপ থেকে।

বন্দুকে গুলি ভরে আমি জায়গাটার দিকে সোজাসুজি না গিয়ে একটু ঘেরা পথে এগোলাম।

যুগলপ্রসাদকে ফিসফিস করে বললাম, নদীর পাড়ের একটা বড় পাথরের উপর বসে থাকতে। রাইফেলটা গুলি ভরে ওর হাতে দিলাম।

ও বলল, একবার চালিয়েছিল ও, ওর বড় সম্বন্ধীর টোপিওয়ালা-বন্দুক জেঠ-শিকারের সময়।

টোপিওয়ালা বন্দুক মানে, গাদা বন্দুক।

বললাম, বড় সম্বন্ধীর টোপিওয়ালা বন্ধুক ছুঁড়েছ, বেশ করেছ। বাঘ একেবারে তোমার ঘাড়ে এসে না চড়লে, এই যন্ত্র গুলি করবে না। আর পেছন দিকে নজর রাখবে।

যুগলপ্রসাদ বলল, কার পেছন দিকে?

আঃ তোমার পেছন দিকে।

ও বলল, জী হাঁ! অব সমঝা।

তারপরই আমার কী মন হওয়াতে রাইফেলটা 'সেফ' করে ওকে দিয়ে বন্দুকটাই আমি নিলাম। কারণ শর্ট-রেঞ্জে বন্দুক রাইফেলের চেয়ে অনেকই বেশি কার্যকরী। তা ছাড়া, ধাক্কাটাও বেশি লাগে। যার গায়ে গুলি লাগে তার।

ওকে সেই পাথরের উপরে চড়িয়ে দিয়ে খুব সাবধানে কিছুটা এগিয়েছি। কিল অথবা ড্র্যাগ-মার্ক কিছুরই হদিশ নেই। বাঘের পায়ের থাবার দাগেরও নয়।

হঠাৎই একটা শিস শুনে চমকে উপরে তাকালাম। একটা শিশু গাছের উপরের ডাল থেকেই শিসটা এল। কিন্তু ঠিক কোথা থেকে এল তা অনুমান করার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল ছেলেটাকে। ছেঁড়া, আধ-নোংরা ধুতি-পরা, খালি-গায়ের ছেলেটা আঙুল দিয়ে ওর সামনের, কিন্তু দূরের কোনও কিছুর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ও বারে বারে আঙুল তুলছিল। কিন্তু নিঃশব্দে। বেশ অনেকখানি সাবধানে, নিঃশব্দে এগিয়ে যাবার পর দেখলাম সামনে একটা বেশ বড় কালো পাথর। বেশ উঁচুও। তার উপরে খুব সাবধানে নিঃশব্দে উঠেই দেখি, বাঘটা! বাঘটার দিকেই ছেলেটা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল। বাঘটা যে "ল্যাংড়া পাহান", তা দেখেই বুঝলাম। অদ্ভুতভাবে একটু সামনে ঝুঁকে ও এগিয়ে চলেছিল। তবে অনেকই দূরে ছিল বাঘ। হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল আমার রাইফেলটা যুগলপ্রসাদকে দিয়ে বন্দুকটা আনলাম বলে। ল্যাংড়া পাহান বন্দুকের রেঞ্জের বাইরে ছিল, যখন প্রথম দেখলাম তাকে, তখনও।

ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে-মধ্যে ঢাল বেয়ে চলে-যাওয়া ল্যাংড়া পাহানের দিকে তাকিয়ে কী করব ভাবছি, এমন সময়েই ব্যাপারটা ঘটল। গদ্দাম করে, গাছে-বসা হুড্‌কু তার হাতের একনলা গাদা-বন্দুক দিয়ে আমার পেছন থেকে বাঘের দিকে গুলি করে দিল।

গুলির শব্দে চমকে উঠে আমি ওর দিকে তাকালাম। ওকে দেখা গেল না কিন্তু পরক্ষণেই প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে ঝোপ-ঝাড় ভাঙার আওয়াজ হল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আড়াল নিল বাঘ। আড়াল নিয়ে অতি দ্রুত "ল্যাংড়া পাহান" কানাডিয়ান স্টিম ইঞ্জিনের মতো জঙ্গল-পাহাড় গাছ-পাথর ভেঙে তছনছ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। হুড্কুর বন্দুকের আওয়াজ গাছের ওপর থেকে হয়েছিল। তবু শিকারি কোথায় ছিল তার একটা আন্দাজ "পাহান" করেছিল সঙ্গে সঙ্গেই।

বেশ কিছু দূরে চলে গিয়ে আবারও গর্জন করল একটা। সারা বন পাহাড় থরথর করে কেঁপে উঠল তাতে। এবং সেই দ্বিতীয় গর্জনের দাপটেই বোধহয়, পাকা ফলেরই মতো হুড্কু গাছ থেকে সোজা নীচে পড়ল ধুপ করে। তখুনি দৌড়ে তার কাছে গেলাম। নীচে বালি ছিল বলে, সে-রকম চোট লাগেনি। তা ছাড়া, সে তো আর শহুরে "মাখনবাবু" নয়। কিন্তু লাফিয়ে পড়াতে বন্দুকটার নল পাথরে ঠুকে গেছিল। বন্দুকটার নলের মুখের উপর নিশানা নেবার জন্যে যে মাছি থাকে, সেটা দুমড়ে মুচড়ে বেঁকে গেছে দেখলাম। ততক্ষণে যুগলপ্রসাদও দৌড়ে এসেছে।

ল্যাংড়া পাহানের গর্জন আরও একবার শোনা গেল। সিতাওন উপত্যকার দিক থেকে। মনে হল, আরও দূরে চলে গেল সে।

বুঝলাম যে, কপালে অশেষ দুর্ভোগ আছে আমার!

যুগলপ্রসাদ হুড্কুকে অনেক করে জিজ্ঞেস করল। কোনও উত্তরই দিল না হুড্কু। চোখ বড়-বড় করে আমার দিকে ফিরে যুগলপ্রসাদ বলল, "বোবা হয়ে গেছে ছেলেটা। সেদিনও আমার সঙ্গে কত্ত কথা বলল!"

হুড্কুর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল, আর ও আঙুল দিয়ে ল্যাংড়া পাহান যে দিকে গেছে, সেদিকেই দেখাচ্ছিল বারবার। ওর মনের মধ্যে ওর মৃত বাবার প্রতি ওই ভালবাসা আর বাঘের প্রতি প্রতিহিংসা মিলে এক আশ্চর্য ভাব ফুটে উঠেছিল।

ভারী কষ্ট হল ছেলেটাকে দেখে। বেপরোয়া, সাহসী এবং পিতৃভক্ত ছেলে যে-বাবার থাকে, সে বাবা ভাগ্যবান নিশ্চয়ই!

যুগলপ্রসাদ বলল, "মড়ি কোথায়?"

হুড্কু আঙুল দিয়ে, পাহান যেদিকে গেছে, সেদিকেই দেখিয়ে দিল।

যুগলপ্রসাদ যখন ওর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছিল, আমি উঠে রাইফেলটা যুগলপ্রসাদের হাত থেকে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। বেশি দূর যেতে হল না। হঠাৎই সকালের সুগন্ধি হাওয়াটা ফিরল। এবং ফিরতেই দুর্গন্ধে নাক ভরে উঠল। বমি পেতে লাগল। একটু গিয়েই একটা দোলামতো ছায়াতে দেখা গেল দেহটা। জুতো-মোজা সুদ্ধ অক্ষত মানুষের একটি পা বেরিয়েছিল অদ্ভুত ভঙ্গিমায়।

অবাক কাণ্ড। ভাবলাম অবশ্যি, এখানের গাঁয়ের মানুষেরা তো জুতো পরে না। কাছে গিয়ে দেখি, শরীরের প্রায় পুরোটাই খেয়ে গেছে। কিন্তু মুখটা অবিকৃত। বাঁ গাল থেকে এক খাবলা মাংস খেয়েছে শুধু। আর বাঁ কানটা। আরও কাছে যেতেই চমকে উঠলাম আমি। এ কী। এ যে ডগলাস!

চেঁচিয়ে ডাকলাম যুগলপ্রসাদকে। ও দৌড়ে এল। কিন্তু হুড়কু যেমন বসেছিল, তেমনিই বসে রইল।

বললাম, "দ্যাখো কে?"

" হা রাম! ইয়ে তো ডগলস সাব! হা রাম!"

চেঁচিয়ে উঠল যুগলপ্রসাদ।

ডগলাসকে ওরা "ডগলস সাব" বলত। যেমন ম্যাকফার্সনকে বলত ম্যাকফু। ওই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কলোনিতে সাহেবদের ছড়াছড়ি। যদিও এখন বেচারাদের মধ্যে অনেকেই উপোসি।

এতক্ষণ ল্যাংড়া পাহানের সঙ্গে আমার ঝগড়াটা ছিল ন্যায়-অন্যায় নিয়ে। এখন ঝগড়াটা হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিগত আক্রোশের। ডগলাস-এর মুখটা মনে পড়ল।

"মরতেই তো চাই। আমি তো তাই চাই।"

কানে ভেসে উঠল ওর গলার স্বর।

ভেবে পেলাম না ডগলাস কী করতে রাতের বেলা জঙ্গলে ঢুকেছিল? এবং এতদূর এসেছিল। পাহান তাকে মার্ফিগঞ্জে ধরলে, এত কষ্ট করে তাকে টেনে আনবে কেন? একজনকে যখন ধরে কাছাকাছিই খেয়েছে।

ডগলাস যেখানে পড়ে আছে, সেখানে ল্যাংড়া পাহান খুব সম্ভব আর ফিরবে না গুলির শব্দের পর। মাথার মধ্যে চক্কর উঠল। ডগলাসকেই যদি মারল পাহান তবে লক্ষ্মণ শিকারি কোথায় গেল? তার লাশ?

ফুলদাওয়াই আর জিরহুল সবে ফুটতে আরম্ভ করেছে এ দিকের জঙ্গলে। আমরা সকলে অনেক ফুল মুঠো করে এনে মৃতদেহের উপর ছড়িয়ে দিলাম।

ওদের দু'জনকে তক্ষুনি চলে যেতে বললাম আমি। যাতে সন্ধের আগে আগেই মার্ফিগঞ্জে পৌঁছতে পারে। এখন প্রায় একটা বাজে। সকালে আমরা কম পথ আসিনি। সবটাই প্রায় চড়াইয়ে। হ্যাভারস্যাক আর রাইফেলটা যুগলপ্রসাদের কাছ থেকে নিয়ে দোনলা বন্দুকটাতে একটা বল আর একটা এল-জি পুরে হুড়কুর হাতে দিলাম।

সে, কথা না বলে ফিরিয়ে দিল বন্দুকটি আমারই হাতে।

যুগলপ্রসাদকে বললাম, কাল সকালে মালীর কাছ থেকে কিছু খাবার আর ফ্লাস্কে গরম চা নিয়ে রিহানতোড়ির বড় মহুয়াগাছটার নীচে অপেক্ষা করতে। আর বললাম, বন্দুকটাও যেন সঙ্গে আনে আসার সময়। খালি হাতে আমার অপেক্ষায় না-বসে থাকে। আর কাল বেলা বারোটার মধ্যে যদি আমি না ফিরি, তা হলে যেন রেঞ্জারসাহেবকে খবর দেয় আমার লাশের খোঁজ করার জন্যে।

হুড়কু ঘোলা দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকাল। আশ্চর্য! একটাও কথা বলল না আমাদের কারও সঙ্গেই।

যুগলপ্রসাদ বলল, "লওট চালিয়ে হুজৌর! ইয়ে শের তো নেহি হ্যায়, ইয়ে বন-দেওতাকা...।"

আমি উত্তর না দিয়ে, ওদের চলে যেতে বললাম, হাত দিয়ে।

ওরা চলে গেল। আমিও হ্যাভারস্যাকটা কাঁধে তুলে জলের বোতলটা নিয়ে এগোলাম। মনটা বড়ই খারাপ লাগছিল ডগলাসের জন্যে।

ডগলাস একসময় মার্ফিগঞ্জে আমার বাংলোর কেয়ারটেকারও ছিল। অনেকদিনেরই পরিচয়। অনেক স্মৃতি, সুখ-দুঃখের।

যে কোনও মানুষই, মরে গেলে বোধহয় তার দোষগুলো আর মনে পড়ে না, শুধু গুণগুলোর কথাই স্মৃতিতে ভাসে।

মন খারাপ লাগছিল হুড্‌কুর জন্যেও। আর অবাক লাগছিল ওর সাহসের কথা ভেবে। অতটুকু ছেলে! ভাল করে বন্দুক ওঠাতে পর্যন্ত পারে না হাতে, সে কিনা বাবার মৃত্যুর বদলা নেবার জন্যে এমন সাংঘাতিক মানুষখেকোর পেছনে একনলা গাদাবন্দুক সম্বল করে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে! যার হাতে তিন-তিনজন ঝানু শিকারি ঘায়েল হয়েছে, সেই বাঘের কাছে ও তো নিতান্ত শিশুই। তার জীবন, তার পরিবেশ, তার চারদিকের প্রতিকূল অবস্থা এবং শত্রুতাই তাকে জেদি আর সাহসী করেছে। নইলে, এমন দুর্জয় সাহসের কথা ভাবা যায় না। এ তো সাহস নয়, এ তো জেনেশুনে আত্মহত্যা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের এয়ারফোর্সের 'কামিকাজে' পাইলটরা যেমন করত, তেমনই।

হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন। প্রথম গ্রীষ্মের বিকেলের জঙ্গলে যে একটা গরম ভাপ ওঠে, সেই ভাপ উঠছে এখন। যদিও কাল বৃষ্টি হওয়াতে গরম ততটা নেই।

একদল চিতল হরিণ দৌড়ে চলে গেল পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকার দিকে। বন্দুক হাতে, খুব সাবধানে চারধার দেখতে দেখতে আমি খুব আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। কিছুদুর যাবার পর একটা প্রকাণ্ড বেজি দৌড়ে পায়েচলা পথটা পেরুল। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে গেল। তিতির আর কালি তিতিরের ডাকে চারপাশ সরগরম হয়ে আছে। সিতাওন উপত্যকা থেকে সম্বরের গম্ভীর ঢাংক-ঢাংক আওয়াজ এল। আশ্চর্য। দিনের বেলা!

পাহান অবশ্য ওই দিকেই গেছে।

শেষ বসন্তের বনের সকালের মিশ্র গন্ধে আমার নাক ভরে গেল। কী শান্তি, কী সুখ এখানে। আমাদের ওই সুন্দর দেশের বন-পাহাড়ের নানা জায়গাতে যে কী গভীর আনন্দময়, শান্তি আছে তা আমরা নিজেরাই জানলাম না। সারা পৃথিবী ঘুরেছি বলেই আমি জানি যে, আমার দেশ কী সুন্দর!

হুড্‌কু যেখানে গুলিটা করেছিল, সেখানে পৌঁছে কিন্তু রক্ত পেলাম না। কিন্তু তার একটু পরেই রক্ত পেলাম। পিটিসের ঝোপে, সাবাই ঘাসে, লেগেও আছে। নীচেও দাগ আছে মাঝে-মধ্যে। গাদা বন্দুকের গুলি। ঢুকেছে, কিন্তু বেরোয়নি। রাইফেলের গুলি হলে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়ই করে দিত। অতদূর থেকে ছোঁড়া

বন্দুকের গুলি শরীরে ঢুকলেও গভীরে যে ঢোকেনি তা জানাই ছিল। কতখানি বারুদ গেদেছিল এবং সীসের কতবড় বল দিয়েছিল কিছুই জানা নেই। তবে কাঁধে নয়। গুলিটা সম্ভবত লেগেছে শরীরের নীচের দিকে। ওপরে যদি লাগত, তবে রক্তের দাগ গাছগাছালির লতাপাতার আরও উপরে থাকত। পেছনের পায়ে লাগলে, পেছনের পায়ের থাবার চিহ্নে তা একটু অন্তত বোঝা যেত। তা হলে, পা টেনে, বা উপরে তুলে চলত। লাগল তো লাগল সামনেরই পায়ে?

গুলি করার সময় নিশ্চয়ই পাহান হুড়কুর দিকে ঘুরে ছিল, নইলে, পেছন থেকে গুলি করলে সাধারণত পেছনের পায়েই লাগার কথা।

কাল রাতের বৃষ্টির পরে ছায়াচ্ছন্ন জায়গায়, যেখানে-যেখানে মাটি বা বালি ভিজে আছে, যেখানে-সেখানেই দাগ পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে অনেকখানি পথ দাপাদাপি লণ্ডভণ্ড করে গেছে পাহান।

কী আর করবে বেচারা! ডগলাসও যেমন আমার বহুদিনের বন্ধু ছিল, পাহানও তাই। ছোটবেলাতেই কোনও নিষ্ঠুর আনাড়ি শিকারি তার সামনের পায়ে চোট করে দেয়। তবু সে এতদিন মানুষের ক্ষতি করেনি। তারপরও যখন তাকে একেবারে অক্ষম করে দিল মানুষ, কী ও করবে? বেঁচে তো থাকতে হবে!

আগে আমাদের এই সব বন-জঙ্গল অনেকই গভীর ছিল। অনেক বেশি এবং অনেকরকমের জানোয়ার ও পাখি ছিল। পথে বেরোলে মনে হত ওপেন-এয়ার চিড়িয়াখানায় বেড়াতে এসেছি। এখন জঙ্গল পাতলা হয়ে গেছে, হয়ে যাচ্ছে প্রতি বছরই। পশু-পাখি কমে আসছে। সব কেমন ন্যাড়া, ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। এ জঙ্গলে শুক্লপক্ষের রাতের বনে ছমছম করবে ছায়া-ভরা জ্যোৎস্না।

এবার সিতাওন উপত্যকার মুখে এসে পৌঁছলাম। এখানে নদীটা গভীর এবং জলও থাকে সবসময়ই। এক জায়গায়, নদী থেকে বেরুনো নদীর একটি প্রশাখাতে, পাথরের মধ্যে, দেখলাম, জমা-জল রক্তে লাল হয়ে আছে। বুঝলাম, পাহান এখানে বসেছিল, নিশ্চয়ই। জলও-খেয়েছিল।

নদীটা পেরোতেই অনেকগুলো সম্বরের খুরের দাগ দেখলাম। এইখানেই সম্বরগুলো পাহানকে আসতে দেখে চিৎকার করেছিল যে, তা বোঝা গেল।

সেখানটায় দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। এবারে আবার রক্তের অথবা পায়ের দাগ পাওয়া যাবে। যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ ওকে "পিছা" করা যাবে। তবে রাত হলেও চিন্তা নেই। কারণ, পূর্ণিমা সামনেই। এপ্রিলের শুক্লপক্ষের রাতের বনে আঁচল ওড়াবে ডাইনি জ্যোৎস্না।

হ্যাভারস্যাকটাকে নদীর পারে একটা আমলকী গাছের শুকনো ডালে ঝুলিয়ে দিলাম। জল খেয়ে, ওয়াটার বটলটাকেও। ডগলাস-এর ওই মূর্তি দেখে কিছু খাওয়া-দাওয়ার স্পৃহা আমার মনে জাগেনি।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে আর ছুরিটা বেল্টে ঝুলিয়ে এগোলাম। এদিকের জঙ্গলটা সারান্ডা ডিভিশনের শাল-জঙ্গলের মতো। গরমের দাপটও এখনও পুরো হয়নি,

তাই এদিকে আন্ডারগ্রোথ এখনও যথেষ্টই আছে। যে মাসে হয়তো জ্বলে পুড়ে মরে যাবে এসব। ঘাস-পাতা ঝোপ-ঝাড়। সিতাওনের এই ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকাতে গরমও তেমন নেই। চোট-খাওয়া পাহানের পক্ষে লুকিয়ে থাকার আইডিয়াল জায়গা।

ভাবলাম, ছায়াচ্ছন্ন আন্ডারগ্রোথ বেশি বলেই পায়ের দাগ এখানে এসেই হারিয়ে গেল। রক্তের দাগও দেখা গেল না। অবাক হলাম আমি। ঘন আন্ডারগ্রোথের জন্যে ভাল করে দেখাই যায় না। গুলি খাওয়া পাহান যে-কোনও মুহূর্তেই লাফিয়ে উঠতে পারে। খুবই সাবধানে বন্দুকটা আড়াআড়ি ধরে ট্রিগার-গার্ডে আঙুল রেখে এগোতে লাগলাম উত্তেজনাতে টানটান হয়ে। উত্তেজনায় এবং ভয়েও হাতের পাতা ঘেমে উঠতে লাগল।

আধ মাইলটাক যাওয়ার পরই মনটা যেন কেমন করে উঠল। শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। আমার তিরিশ গজ দূরে একটি ছাতারে পাখির পরিবার শব্দ করে উড়ে গেল। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ময়ূর ডেকে উঠল প্রচণ্ড ভয় পাওয়া কর্কশ স্বরে। ডেকেই, লম্বা লেজ নিয়ে আধো-অন্ধকার বনের চাঁদোয়ার নীচে শপ-শপ আওয়াজ করে উড়ে গেল।

সামনেই ঘন শালবনের মধ্যে কতগুলো পাথরের স্তূপের মতো ছিল। যেন কেউ এনে, একটার পর একটা সাজিয়ে দিয়েছে। পুব-আফ্রিকার সেরেঙ্গেটির KOPJE-র মতো। খুব মোটা একটা শালগাছের আড়াল নিয়ে আমি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার পায়ে পাতলা রাবার-সোলের কাপড়ের জুতো জঙ্গলে নিঃশব্দে চলা-ফেরা করার অভ্যাসও আছে ছেলেবেলা থেকেই। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, একেবারে নিঃশব্দেই এবং পরিবেশে কোনওরকম আলোড়ন না-ঘটিয়েই সেখানে পৌঁছেছিলাম। আমাকে দেখে ছাতারে এবং ময়ূর অবশ্যই ভয় পায়নি।

তবে?

কী দেখে ভয় পেল?

ভাবলাম, এখন বনের কী বলার আছে আমাকে, তা মনোযোগ দিয়ে শোনা দরকার। নইলে, আমার অবস্থাও ডগলাস এবং হুড্‌কুর বাবা লক্ষ্মণের মতোই হবে। প্রায় মিনিট-পাঁচেক সেখানে নিঃশব্দে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনও আওয়াজ নেই, পিছনের নদীর একটানা কুলকুলানি আওয়াজ ছাড়া। ঝিরঝির করে একটা হাওয়া বইছে। চৈত্রশেষের বিকেলের হাওয়া। বনের মধ্যে এই সুগন্ধি হাওয়া যে কী সুখ বয়ে আনে আগন্তুকের মনে, তা কী বলব। বছরের এই সময়ে জঙ্গল দাবদাহতে আধ-পোড়া কিন্তু তবুও একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ পাচ্ছি নাকে।

আরও অপেক্ষা করতাম। কিন্তু অধৈর্য লাগল। কোনও আওয়াজ শুনলাম না, কোনও নড়াচড়াও চোখে পড়ল না। তাই আবারও এগোলাম। এবং এগোতেই বিস্ময়ে এবং ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখলাম ওই পাথরগুলোর মধ্যে একটি বাঘ আরামে

দু-থাবার মধ্যে মুখ রেখে নাক লম্বা করে শুয়ে আছে। তার পেটটা একবার উঠছে, একবার নামছে। পাশের একটা বড় সাদা পাথরের চাঙড় থেকে একটা লতা নেমে এসেছে। তাতে নীলরঙা জংলি ফুল। হলুদ-কালো ডোরাকাটা বাঘ, জঙ্গলের চাঁদোয়া ছেদ করে আসা নরম আলোর টুকরো-টাকরা, এইসব মিলিয়ে এক অদ্ভুত ছবি হয়েছে। মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই মুগ্ধতা রইল না। পরক্ষণেই আমার চোয়ালের পেশি শক্ত হয়ে এল। বন্দুকটা তুলে নিলাম কাঁধে।

গুলি করতে যেতেই হঠাৎ মনে হল, ও তো পাহান নয়। পাহানের তো এখন ঘুমোবার কথা নয়। তা ছাড়া, বাঘটার শরীরের কাছাকাছিও কোথাও রক্ত নেই। বাঘটা গভীর ঘুম ঘুমুচ্ছে।

পাহান নয়, তা বুঝতে পেরেই আবার সাবধানে পিছু হটে এলাম পায়ে-পায়ে হাতে একটি আহত নরখাদক আছে, তাই-ই যথেষ্ট। অক্ষত কোনও বাঘকে গুলি করার সময় এটা আদৌ নয়, তা ছাড়া তাকে মারবার পারমিটও আমার নেই।

তা ছাড়া যখন দেশে বাঘ প্রচুর ছিল যথেষ্টই মেরেছি বাঘ। কোনও খেদ নেই। আমার অন্তত নেই। আমার মতো শিকারিকে শিকার করতে পারেনি বলে বাঘেদের খেদ ছিল কিনা তা অবশ্যই জানা হয়নি। থাকতে পারে।

তা হলে, পাহান কি নদী না-পেরিয়ে নদী বরাবর গেছে? সে কারণেই সিতাওন উপত্যকাতে ঢুকে রক্ত অথবা পায়ের দাগ কিছুই দেখিনি! আর যদি তাই-ই গিয়ে থাকে, তবে সে তো মার্কিগঞ্জের দিকেই গেছে! তার শক্তির শেষ বিন্দুটিও কি মার্কিগঞ্জের প্রতি ঘেন্না দেখিয়ে তার ওপর প্রতিশোধ নিয়ে সে খরচ করবে?

নদীর কাছে ফিরে এলাম। ফিরে এসেই নিজের ভুল বুঝলাম। পাহান নদী পেরিয়েছে ঠিকই সিতাওন উপত্যকার কাছে, কিন্তু নদী ধরেই চলে গেছে। এবং মার্কিগঞ্জেরই দিকে। হুড়কুর গাদা বন্দুকের চোট যে গুরুতর কিছু হয়নি, তা এখন বোঝা যাচ্ছে। হবার কথাও ছিল না। পাহান যদি বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যেই থাকত, তবে তো আমার গ্রিনার বন্দুক দিয়েই গুলি করতে পারতাম। ঘৃণাতে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে হুড়কু তাকে গাদা-বন্দুকে গুলি করেছিল, আর পাহানও বোধহয় মানুষের প্রতি ঘৃণাবশে যতটা রাগ দেখিয়েছিল, ততটা যন্ত্রণার কারণে দেখায়নি।

এদিকে বেলা পড়ে আসছে দ্রুত। এবং এ জঙ্গলে দেখছি মানুষখেকো এবং সদ্য-আহত পাহানই নয়, তার একজন জাতভাইও আছে। নাকি সঙ্গিনী? পায়ের দাগ না দেখতে পেলেও, চেহারা দেখে বাঘিনী বলেই মনে হয়েছিল। পাহান কি এ-জঙ্গলে থাকে না? হয়তো থাকে না। থাকলে জেনেশুনেই অন্য বাঘের এলাকাতে ঢুকে পড়ত না। অথবা ওই-ই থাকে। ওই বাঘিনীই বে-এক্তিয়ারে ঢুকে পড়েছে হয়তো। যাই-ই ঘটে থাকুক, এখান থেকে বেলা থাকতে-থাকতে মার্কিগঞ্জে ফেরা সম্ভব নয়। রাতে পাহানকে খুঁজে বেড়ানোও সম্ভব নয়। খুঁজলে পাহানই আমাকে অনেকই সহজে খুঁজে পাবে হয়তো। তার এই চোট যখন

মারাত্মক হয়নি, তখন তার সম্বন্ধে খুবই সাবধানে থাকতে হবে।

এই সব ভেবে রওনা হলাম নদী বরাবরই। কী করব, চলতে-চলতে ঠিক করা যাবে। এখনও সন্ধে হতে ঘণ্টাখানেক বাকি আছে।

নদীটা সামনেই বাঁক নিয়েছে একটা। সেই বাঁকের মুখে দেখি কয়েকটা নীল-গাই জল খাচ্ছে চক-চক শব্দ করে। আর সে জায়গার উজানে, একশো গজ দূরে একদল শুয়োর জমিয়ে চান করছে জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে। আমাকে নীলগাইদের প্রহরীটি দেখতে পেতেই ওরা সকলেই খুরে-খুরে খটাখট আওয়াজ তুলে পালিয়ে গেল। কিন্তু শুয়োরের বাচ্চারা তখনও নির্বিকার। আরও এগোতে তারাও সিংগল-ফাইলে পড়ি কি মরি করে লেজগুলো উপরে তুলে দৌড়ল। ওদের দেখে আফ্রিকার ওয়ার্টহগসদের কথা মনে পড়ে গেল আমার। সেই সঙ্গেই আফ্রিকার এবং তোদেরও অনেকই কথা মনে পড়ে গেল। শিগগিরি যাব আরেকবার।

এবারে ভটকাইকে নেব না। তুমি রাম অথচ হনুমানকেই চিনলে না।

ভটকাই বলল, শুয়োরগুলো যখন দৌড়ে চলে গেল, তখন আমার মনে পড়ল যে, পাহান যদি মার্ফিগঞ্জের দিকেই গিয়ে থাকে, অথবা এখানেই কোথাও জল খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে, জখমের জায়গা জিভ দিয়ে চেটে চেটে পরিষ্কার করার পরই যদি রাতে আবার নতুন শিকার ধরার জন্যে ওই দিকেই যায়, তবে ও মার্ফিগঞ্জের থেকে আধমাইল দূরে নদীটা যখন সরু হয়ে এসে ফরেস্ট রোডের উপর দিয়েই বয়ে গেছে, হয়তো ঠিক সেখানে গিয়েই ফরেস্ট রোড ধরে মার্ফিগঞ্জে ঢুকবে। ঢোকাটা স্বাভাবিক অন্তত। সেইখানে কোনও গাছে যদি বসে থাকতে পারতাম, তবে নির্ঘাত তার সঙ্গে দেখা হতে পারত।

এসবই অবশ্য ইন্টেলিজেন্ট—গেস-ওয়ার্ক। বাস্তবের সঙ্গে মিলতেও পারে, নাও মিলতে পারে।

হয়তো মার্ফিগঞ্জের দিকেই যাবে। কারণ ডগলাস-এর শরীরে তার একদিনের খাবার জন্য বিশেষ কিছু নেই। দৈনিকও যদি খায়, তবে বাঘের দশ থেকে পনেরো কেজি মাংস হলেই চলে যায় কিন্তু দৈনিক খেতে না পেলে বেশি লাগে। পেট ভরে গেলে, সে দু একদিন না-খেয়েও থাকতে পারে এবং থাকেও। এ দিকের বাঘ।

আমি কিন্তু নদীর পারের ঘাসের উপর দিয়েই চলেছি। ল্যাংড়া পাহানের পায়ের দাগ যেন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে নদী পেরিয়েই। সামনেই নদীটা আরেকটা বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকে পৌঁছে ভাবলাম যে, এখানে নদী পেরিয়ে সিতাওন উপত্যকাকে পেছনে ফেলে একটা পাহাড় টপকে গেলেই নদী আর ফরেস্ট-রোডের জাংশানে গিয়ে পৌঁছব। এ কথা ভেবেই নদী পেরোলাম জলে ছপ ছপ শব্দ করে এবং পেরিয়েই দেখলাম, নদীর বালিতে বাঘের থাবার দাগ। বাঘটা একটু আগে জল পেরিয়ে আমি যেদিকে যাব ভাবছি, সেদিকেই

গেছে। বালি তখনও ভিজে। থাবার দাগ অন্য কোনও বাঘের নয়, ল্যাংড়া পাহানেরই। সামনের ডানদিকের থাবাটাতে যে জখম আছে, তা বালির উপরের স্পষ্ট দাগ থেকে বোঝা যাচ্ছে।

ডগলাসের ছিন্নভিন্ন লাশ দেখার পর থেকে আমার মাথার ঠিক ছিল না। তার উপর আবার চোখের সামনে একটা বারো-তেরো বছরের সবে বাবা-মরা বোবা ছেলেকে দেখলাম। হাতে বড় কাজ থাকলে অনেক ব্যাপার নিয়েই তখন মাথা ঘামালে চলে না। কিন্তু পরে ভাবলে মাথার মধ্যে মাদল বাজে, শিঙা ফোঁকে যেন কারা। কান ঝাঁ-ঝাঁ করে।

আমার মনে হল, আমি একেবারেই প্রকৃতিস্থ নই। মাথার গোলমালই হয়ে গেছে যেন। সকালের পর কিছু খাইওনি। এদিকে হ্যাভারস্যাক ও জলের বোতল, দূরে গাছে টাঙিয়ে রেখে এসেছি। এক্ষুনি পাহান জল পেরিয়ে গেছে, জলে বা বালিতে এখানে কিন্তু কোথাও একটুও রক্তের দাগ নেই। নানা রকমের ম্যাজিক হচ্ছে যেন সকাল থেকে। ডগলাস, যাকে সেদিন সন্ধেবেলা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলাম, তাকে এইভাবে আবিষ্কার করার পর থেকে হুড্‌কুর অবিবেচকের মতো গুলি করা, হুড্‌কুর বোবা হয়ে যাওয়া, পাহানের বন-পাহাড় গুঁড়ো করা গর্জন-তর্জন, তারপরও এই হঠাৎ-আসা বাঘিনী। এত সব ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যাওয়াতে সত্যিই মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

প্রচণ্ড জলপিপাসা পেল আমার। ওয়াটার বটল ফেলে এসেছি সত্যি, কিন্তু এই বহতা নদী সিতাওনের পাশে-পাশেই হেঁটেও আসছি এতক্ষণ! পিপাসাতে বুক ফাটলেও, জলের কথা একবারও মনে হয়নি। আশ্চর্য!

আমার মাথার মধ্যে কে যেন বলে উঠল; আমি তো মরতেই চাই।

কে? ডগলাস?

গালের মাংস খুবলে-নেওয়া গলা-কাটা ডগলাস বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে চেয়েছিল। ওই দৃশ্য যে কত বীভৎস, তখন বুঝিনি। অথচ কত চেনা ডগলাস। আমার মধ্যের পিপাসাটা হঠাৎ ভীষণ তীব্র হয়ে উঠল।

কে যেন আমার মাথার মধ্যে আবার বলল: আমি তো মরতেই চাই। মরতেই চাই!

কেন? কে?

চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ করতে-করতে একদল সবুজ টিয়া অস্তগামী সূর্যের অয়ন পথের হদিস নিতে আমার মাথার মধ্যের 'কেন'র উত্তরটাকে ওদের লাল ঠোঁটে তুলে নিয়ে চলে গেল।

বন্দুকটাকে আমি নদীর পারের একটা বড় বেঁটে মহুয়া গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রেখে, নদীর দিকে ফিরে গেলাম খুব নিশ্চিন্ত হয়ে। যেন এখানে কোনও

বিপদ নেই, যেন বাঘে কোনও মানুষ ধরে না এখানে, যেন ডগলাস বা হুড্কু, বা হুড্কুর বাবা এবং আরও দু'জন শিকারির পরিণতির ঘটনা সত্যি নয়। আমি জলের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে জল খেতে লাগলাম আঁজলা ভরে। ঠিক সেই সময় কে যেন আবার আমার মাথার মধ্যে বলে উঠল, হরিণরা কি এমন ভাবে জল খায়?

হরিণদের কি হাত থাকে? জিভ দিয়ে চক-চক করে খায়।

অমনি আমি যন্ত্রচালিতের মতো দু-হাত পিছনে মুঠো করে ধরে, জিভ বের-করা কুকুর বা হরিণদের মতোই চক-চক শব্দ করে জল খেতে লাগলাম। মুখ নীচে নামিয়ে জলের সঙ্গে মুখ ছুঁইয়ে।

ঠিক সেই সময়ে আবার কে যেন বলল মাথার মধ্যে, তুমি হরিণ, তোমার ঘাড়ে এক্ষুনি বাঘ লাফাবে।

অমনি আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়িতে হরিণের মতো চারপায়ে পিছন ফিরতেই বালির মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। এবং পড়ে গিয়েই দেখলাম, বড় মহুয়া গাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে যেখানে বন্দুকটা রেখেছিলাম, ঠিক সেইখানেই বন্দুকটাতে প্রায় লেজ ঠেকিয়ে দিয়ে একটি সুন্দরী বাঘিনী কায়দা করে বসে আছে। তার মুখে মৃদু-মৃদু হাসি। একটু আগেই যাকে দেখে এলাম সেই বাঘিনীটাই! যাকে আমি ঘণ্টাখানেক আগে পাথরগুলোর মধ্যে নীল জংলি ফুলের আর রোদের টুকরো-টাকরার মধ্যে দেখেছিলাম।

বাঘিনী কথা বলল না। তেড়েও এল না। শুধু হাসতে লাগল মিটি মিটি, আমার গুলি-ভরা বন্দুকটাতে লেজ ঠেকিয়ে।

আমার মাথার মধ্যে অনেক লোক একসঙ্গে কথা বলে উঠল। তিরিশ বছর আগে যে মা আমার চলে গেছেন, সেই মা ডাকলেন, বললেন, খোকন আয়। আজ জন্মদিন, তোর জন্যে পায়েস করেছি। খাবি আয়। সাদা পাথরবাটিতে খেজুরের পাটালি আর লাল-চালের ঘন পায়েস। আয়, খাবি আয়।

আমার ঘুম পেতে লাগল। আজ যে আমার জন্মদিন। আমার গুলিভরা ডাবল-ব্যারেল বন্দুকের কাছে বসে-থাকা বাঘিনীর হাসি-হাসি মুখের দিকে মুখ করে আমি মায়ের হাতে পায়েস খাওয়ার আনন্দে, জন্মদিনের আনন্দে, ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি জানি, তোরা ভাবছিস এ কী গাঁজাখুরি গল্প শোনাচ্ছি কিন্তু শেষ অবধিই শোন।

আজ আমারও তা-ই মনে হয়।

কিন্তু যা ঘটেছিল, তাই-ই বলছি।

প্রচণ্ড গর্জনে আমি ঘুম ভেঙে চমকে উঠলাম। কাছেই কোথাও একটি বাঘ আর একটি বাঘিনী একই সঙ্গে গর্জন করছে। মনে হচ্ছে গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সব ভেঙে পড়বে।

চাঁদ উঠেছে চমৎকার। পরিষ্কার আকাশ। হাওয়া বইছে ঝিরঝির করে। করোঞ্জ আর নানা রকম ফুলের গন্ধে ভরে আছে সে হাওয়া। পিউ-কাঁহা পাখি ডাকছে। মাথা খারাপ করে দেবে। সাধে কি সাহেবরা এদের নাম দিয়েছে 'ব্রেইন ফিভার'। আমি নদীর পাশে বালির উপরে শুয়ে আছি। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় অবাক হয়ে দেখতে পেলাম, আমার বন্দুকটা মহুয়া গাছের গুঁড়িতে হেলান দেওয়া আছে। কে যে এখানে বন্দুকটা আনল, কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

কী ব্যাপার তা ভাল করে বোঝার আগেই আমি রাইফেলটার কাছে দৌড়ে গিয়ে ওটাকে তুলে নিলাম। কেন, কোন আক্কেলে যে আমি নদীর পাশে এমন রাতে নদীর বালিতে ঘুমিয়ে ছিলাম, বন্দুকটাকে পনেরো কুড়ি হাত দূরে এমনভাবে রেখে, কিছুতেই তা ভেবে পেলাম না।

গরমের দিন। জলের পাশে, সাপ, বিছে তো বটেই, সমস্ত জন্তু-জানোয়ারেরই আনাগোনা। আমি কেন এখানে এসেছিলাম? আমার হাতে বন্দুকই বা কেন? শত চেষ্টা করেও মনে পড়ল না। শুধু মনে পড়ল যে, মালীর বউ বলেছিল, সন্ধের আগে-আগে ফিরবেন সাহেব। শুয়োরের ভিণ্ডালু রাঁধব আজকে।

যা বাঘ আর বাঘিনীর কাছে খেলা, তাই-ই সমস্ত বনের জানোয়ার, পাখি, পোকামাকড় সকলের নাভিশ্বাস। মনে হচ্ছিল, তর্জনে-গর্জনে পাহাড় চৌচির হবে বুঝি, গাছ পড়ে যাবে, ভূমিকম্পে যেমন পড়ে। অন্যরা সব শান্ত। চুপচাপ। আমি যেন ঘোরের মধ্যে হেঁটে যেতে লাগলাম সেই বাঘ-বাঘিনীর আওয়াজের বিপরীত দিকে। কিন্তু বন্দুক কাঁধে নিয়ে। হাতে পর্যন্ত নিয়ে নয়।

আমি এখানে রাইফেল হাতে কী করতে যে এসেছিলাম, তাও মনে পড়ল না আমার।

চাঁদনি রাত ছিল বলে তাই রক্ষে। নিজের মনে, চাঁদের বনে বিভোর হয়ে নদী ধরে হাঁটতে-হাঁটতে এগোচ্ছিলাম আমি। এ সব নদী, বন, পাহাড় আমার সম্পূর্ণ অচেনা। এ কোন দেশের, কোন গ্রহের রাত? তবু নদী ধরেই হাঁটতে লাগলাম গন্তব্যহীনভাবে। রাত তখন বেশ গভীর। অথচ কত রাত তা দেখতেও ইচ্ছে করল না হাত-ঘড়িতে। আমি নিজেকেই নিজে বললাম, অনেক রাত!

চলতে-চলতে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। যেখানে নদীটা একটা কাঁচা লাল মাটির ফরেস্ট রোডের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে। সেইখানে পৌঁছেই আমি ডান দিকে মোড় নিলাম। অথচ কেন নিলাম জানি না। কিছু ভেবে নিইনি। পথও চিনি না। আমাকে চলতে হবে বলেই যেন আমি চলছি। ডানদিকে কেন?

ডানদিকে চলতে হবে বলেই যেন আমি চলছি। ডানদিকে কেন? ডানদিকে কী আছে?

আরও আধ মাইল চলার পর যখন ডগলাসের সাদা-রঙা ছোট্ট বাংলোটা চোখে পড়ল, চাঁদের আলোয় ধবধবে, দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে, তখন হঠাৎ একই সঙ্গে সকাল থেকে ঘটা সব ঘটনার কথা আমার হুড়মুড় করে মনে পড়ে গেল। মনে পড়তেই ডগলাসের বাঘের নখে-কাটা বীভৎস মুখখানির কথাও মনে পড়ে গেল। তখন ভীষণই গা ছম-ছম করে উঠল। হঠাৎই এক দারুণ ভয় আমাকে আছন্ন করে ফেলল।

ওখান থেকে বড়-বড় পায়ে এগিয়ে, জঙ্গলটা পেরোতেই আমার বাংলো দেখা গেল। বাইরের বারান্দাতে একটি লণ্ঠন জ্বলছে। মালী রেখেছে। সারা রাতই জ্বলবে। মালীর ঘরের সামনে গিয়ে ওদের বন্ধ দরজায় একবার ধাক্কা দিলাম। তখন আমার আর দাঁড়াবার মতো জোরও গায়ে ছিল না। শরীর আর মনও ভেঙে পড়েছিল।

দরজায় ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ভিতর থেকে হাঁউমাঁউ আওয়াজ শোনা গেল। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই গুডুম করে একটি গুলি হল। গুলিতে, মালীর খাপরার চালের ঘরের দু-তিনটে খাপরা উড়েও গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের শোরগোল আরও বাড়ল। কিন্তু গুলির শব্দ হবার পরেও মার্ফিগঞ্জে যে একজনও জীবন্ত মানুষ থাকে এবং অন্তত পাঁচজনের বাড়িতে দো-নলা বারো বোরের টোটা-বন্দুকও আছে, এ-কথা মনে হল না। তখন আমি মালী আর তার বউয়ের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। কোমর থেকে টর্চ খুলে আলো ফেললাম দরজার দিকে। তারই পরে ওরা জবাব দিল।

বিরক্ত গলায় বললাম, এসো তোমরা। চলো, এখানে এতই ভয় পাও তো খাবার ঘরের মেঝেতে শোবে আজ থেকে। ঘর, তালা বন্ধ করো।

আসলে ভয়টা ওদের নয়। আমার নিজের ভয়টাই তখনও কাটেনি। অবশ্য ভয়টা বাঘের নয়। ভয়টা ভূতেরও নয়। তবে ভয়টা কীসের? ভয়টা স্মৃতিনাশের। ভয়টা আমার ভয় না-পাওয়ার কারণে। এমন অবস্থাতে তো জীবনে পড়িনি কখনও এর আগে!

মালী বউ বাংলোর ভিতরে ঢুকে বলল, কিছু খাবেন সাহেব?

বললাম, জল। শুধু জল।

কফি? কফিও না?

না।

বলেই, মনে পড়ল; পোর্ক-ভিন্ডালুর কথা। ওকে বললাম, আচ্ছা! তুমি না আজ শুয়োরের ভিন্ডালু রান্না করবে বলেছিলে?

ও অবাক হল। ওর স্বামীর দিকে একবার তাকাল।

তারপর আড়ষ্ট ভাবে বলল, সে তো গতবারে যখন এসেছিলেন, তখন

বলেছিলাম। আর আমিও বলিনি। ডগলাস সাহাব খেতে চেয়েছিলেন, তাই আপনি রান্না করতে বলেছিলেন। কত্তোদিন আগে!

মালীর বউ-এর চোখে বিস্ময় আর মুখে ভয় ফুটে উঠল।

আমি পাগলের মতো হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম, শুয়োর? কী শুয়োর? বুনোশুয়োর?

না সাহাব!

অবাক হয়ে, মালীর বউ বলল, বস্তির শুয়োর। শুক্রবারের হাট থেকে মালী কিনে এনেছিল। চারবছর আগে তো আপনি এসেছিলেন, শেষ।

বলেই, সে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল।

বলল, হুঁ-উ-উ ডগলাস সাহাব।

কে বলেছে? যুগলপ্রসাদ?

হাঁ সাহাব?

বলেই বলল, যুগলপ্রসাদ তো পাগল হয়ে গেছে!

পাগল হয়ে গেছে? কবে, মানে কখন?

যখন ফিরে এল আপনাকে জঙ্গলে ছেড়ে। নিজের বাবার নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে। নিজের নামও ভুলে গেছে। খালি নেচে-নেচে বলছে, হাঃ! হাঃ! যিসকা বান্দারিয়া, ওহি নাচায়ে! হাঃ! হাঃ! যিসকা বান্দারিয়া, ওহি নাচায়ে!

আমার মুখের মধ্যে থুথু ক্রমশ ঘন হয়ে আসছিল। বুঝতে পারছিলাম যে, এবার আমার পাগল হবার পালা! বললাম, যুগলপ্রসাদের সঙ্গে আর কেউ ছিল? ছিল না?

হাঁ। ছিল তো? হুড়কু। লখমন ওরাওঁয়ের বেটা। উও ভি বোবা-কালা হয়ে গেছে বিলকুল। আপনি ঠিক আছেন তো সাহাব?

বিলকুল!

ধমক দিয়ে বললাম ওদের। কিন্তু ওদের মুখ দেখেই মনে হল যে, ওরা বোধ হয় বিশ্বাস করছে না আমাকে।

আমাকে জল খাওয়াও এক গ্লাস। আর এক বোতল জল মাথার কাছে রেখে তোমরা শুয়ে পড়ো। কাল কথা হবে।

মালী যখন জলটা নিয়ে এল, তখন বললাম, আজ ল্যাংড়া পাহান কি এদিকে এসেছিল?

না তো? বাঘোয়ার কোনও খবর নেই।

ভাল। এবার ভাল করে দরজা-টরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো তোমরা। বন্দুকটা কাছেই রেখো। কিন্তু সেটা আমাকে মারবার জন্যে তোমাকে দিইনি। একটু আগেই গুলিটা দরজার দিকে নল করে করলেই তো দরজা ফুটো করে ফর্দাফাঁই করে দিত আমাকেই! এমন গুলিখোর আমি হতে চাই না। তোমার মতন শিকারির হাতে মরলে আমার নরকবাস নিশ্চিত।

ও বলল, খুউব দোষ হয়ে গেছে সাহাব। হা রাম।

শোবার সময়ে একবার টর্চ জ্বালিয়ে হাতঘড়িটা দেখলাম। সকাল পৌনে তিনটে। মালীকে বললাম, আলো ফুটলেও আমাকে চা দিয়ে ঘুম ভাঙাবে না। যখন ওঠার, তখনই উঠে চা চাইব। কারও সঙ্গে দেখাও করব না, চান না করে।

শোবার পরও আধ ঘণ্টা ঘুম এল না। তারপর আবার বাংলোর উজ্জ্বল কম্পাউন্ডের পরিচিত গন্ধ ও শব্দ এক-এক করে সব নাকে ও কানে আসতে লাগল ধীরে-ধীরে, খুবই ধীরে-ধীরে, বালির মধ্যে জল যেমন করে চুঁইয়ে যায়, তেমনি করে। ক্রমশ আমি স্বাভাবিকতার দিকে ফিরতে লাগলাম অনেক পথ মাড়িয়ে এসে। কাল সকাল থেকে এখন অবধি কী করে যে কাটল, তার হিসেব-নিকেশ, পারলে, দিনের আলোতেই করা যাবে। তারপর চোখ বুঁজে এল এক সময়।

॥ ৪ ॥

যখন ঘুম ভাঙল, তখন অনেক বেলা। বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি জুতো-মোজা পরেই শুয়েছিলাম। জামা-কাপড়ও ছাড়িনি। উঠেই, বন্দুকটা থেকে গুলি খুলে, মুখ হাত ধুয়ে, চান করে, পেয়ারাতলিতে এসে বসলাম।

মালী চা দিয়ে গেল।

ওকে বললাম, বুধন, সামসের, নিয়ামত এবং মংলু শিকারিদের একই সঙ্গে খবর দাও। তারা যেন এক্ষুনি সব কাজ ফেলে এখানে চলে আসে। আমার সঙ্গে নাস্তাও করবে এবং সারাদিন থাকবে। সাতদিনের রোজ আমি দেব। সাতদিন আমার কাজ আছে খুবই ওদের সঙ্গে। সব কাজ ফেলে যেন আসে। বুঝিয়ে বলবে, আমার নাম করে। আর যুগলপ্রসাদের কাছ থেকে আমার বন্দুকটাকেও নিয়ে আসতে হবে।

এই শিকারিদের ডেকে পাঠালাম, কারণ, এরা খুবই সাহসী এবং এক সময়ে আমার সঙ্গে অনেক শিকার-টিকার করেছে। এ অঞ্চলের সব জঙ্গল এদের নখদর্পণে। কিন্তু সকলেরই মাঝ-বয়েস হয়ে গেছে। ঘরসংসার কাজকর্ম নিয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে চুরি করে হরিণ-শুয়োর-খরগোশ যে মারে না তা নয়, তবে বিপদের শিকারে আর যায় না। আমি জানি, এদের মধ্যে দুজনের লাইসেন্সড আর অন্য দুজনের আন-লাইসেন্সড গাদা বন্দুকও আছে।

আমার প্রথম কাপ চা খাওয়া শেষ হতে না হতে মালীর বউ গরম-গরম পরোটা আর মেটের চচ্চড়ি করে নিয়ে এল। কাল সারাদিনই প্রায় কিছু খাওয়া হয়নি, তা ও জানে। শিকারিদের সকলের জন্যেও নাস্তা তৈরি করতে বলে বললাম, পুরো এক পট চা দিয়ে যেতে। চা আর পাইপ খেয়ে বুদ্ধি আর সাহসের গোড়ায় ভালমতো ধোঁয়া না দিলে কালকের কোনও রহস্যই পরিষ্কার হবে না।

এখানে খবরের কাগজ-টাগজের ঝামেলা নেই। পুরো মার্কিগঞ্জে তিনজন কাগজ রাখেন। অন্যরা চেয়ে-চিন্তে পড়েন। তবে কাগজ আসেও পুরো দু দিন পর। রাঁচি থেকে অনেক ঘোরা পথে।

এক পট চা আর দু-ফিল পাইপ শেষ করার পরও যখন মালী এল না, তখন আবার ঘুমিয়ে পড়লাম পেয়ারাতলির ইজিচেয়ারে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মালীর বউ ঘুম ভাঙিয়ে বলল, সাহাব, রেঞ্জার সাহাব আয়া।

চেয়ে দেখি, রেঞ্জার ভূপতনারায়ণ মিশ্র সামনে দাঁড়িয়ে। ওঁকে বসতে বলে, ওঁর জন্যে চা-নাস্তা আনতে বলে সোজা হয়ে বসলাম।

যুগলপ্রসাদ কেমন আছে রেঞ্জার সাহাব।

ভাল। মানে ও'রকমই আছে। ওর চেয়ে খারাপ কিছু হয়নি। আমি আসলে একটা কথা বলার জন্যে এলাম। পথে, মালীর কাছে সব শুনেছি আমি। এ বাঘ আপনি মারতে পারবেন না। সকলের কপালে যা আছে, তাই-ই হবে। আপনি এখানে থাকেন না, কেন মিছিমিছি হয় পাগল হবেন, নয় মারা যাবেন? আমাদের জন্যে?

আমিও পিঠটা যথাসম্ভব চেয়ারের পেছনে করে সোজা হয়ে বসে বললাম, ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন।

রেঞ্জার মিশ্রসাহেব বললেন, এটা বনদেওতার বাঘ। একে কেউই মারতে পারবে না বোধহয়। কাছ থেকে রাইফেলের গুলি খেলেও ওর কিছু হয় না। গুলিতে বুক এ-ফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায়। রক্তে বনের পথ ভেসে যায়। তারপর সিতাওন নদীতে আর একবার চান করে নেয় ও। ব্যস! সঙ্গে-সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। শরীরের আর কোনওই কষ্ট থাকে না। হুড়কুর বাবা গুলি করেছিল একেবারে মাথায়, মাত্র পাঁচ গজ দূর থেকে।

তবু গাছে লাফিয়ে উঠে ওকে মুখে করে নিয়ে চলে গিয়েছিল সে। হুড়কু'র মামা সেই গাছের উঁচু মগ ডালে বসে ছিল। তার নিজের চোখে দেখা। সেও পরদিন নিজের গ্রামে চলে গেছে। খবর এসেছে যে, সেও নাকি পাগল হয়ে গেছে।

কী যে সব গাঁজাখুঁরি গল্প বলেন আপনারা! এ-সব জেনে-শুনেও হুড়কু বা যুগলপ্রসাদ কেন গেল তাহলে ওই বাঘের কাছে? আমার সঙ্গেই বা যুগলপ্রসাদ কোন সাহসে গেল?

ওদের সাহস! যুগলপ্রসাদ একা হাতে একবার দশজন ডাকাত ঠেকিয়েছিল। তা ছাড়া ও ভূত-ভগবান মানে না। আর হুডকু গিয়েছিল তার বাবার মৃত্যুর বদলা নিতে। লাভ কী হল? একজন বোবা-কালা আর একজন পাগল হয়ে গেল। এবার আপনি কলকাতা ফিরে যান বোস সাহেব। নইলে এবার কিন্তু আপনার পালা!

আমি মানি না। কিন্তু বনদেওতার বাঘ হলে এই বাঘ এমন করে মানুষ ধরে খেত না। বনদেওতার বাঘের কথা আমি নানা জায়গা থেকে শুনেছি। নিজেও

একবার গুলি করেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্যভাবে সেই ওড়িশার জঙ্গলের বাঘ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাঘ কখনও মানুষের কোনও ক্ষতি করেনি। কোনওদিনও না।

তা আপনি কী করবেন ঠিক করলেন? আপনাকে আমিই কাল এই বাঘ মারতে অনুরোধ করেছিলাম। আজ আমিই এসে বারণ করছি।

শিকারিদের খবর দিয়েছি। তারা আসুক। পরামর্শ করব। আচ্ছা আমাকে বলুন তো মিশ্রসাহেব, সিতাওনের উপত্যকাতে আর কতগুলো বাঘ-বাঘিনী আছে?

রেঞ্জার সাহেব বললেন, এক এলাকায় তো একটার বেশি বাঘ সচরাচর থাকে না। তবে কখনও-সখনও খেলা করতে আসে, সংসার পাততে, অল্পদিনের জন্যে, বাঘের কাছে বাঘিনী, বাঘিনীর কাছে বাঘ। কিন্তু এখন এ জঙ্গলে পাহান ছাড়া দ্বিতীয় বাঘ নেই কোনও। কুড়ি-পঁচিশ মাইল এলাকার মধ্যেই নেই। আমার ফরেস্ট গার্ডরা তা হলে আমায় জানাত। কোনও বাঘিনী থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

বাঘিনী নেই?

গত তিন বছরে কোনও বাঘিনী আসেনি। পাহান এ জঙ্গল ছেড়ে অন্য জঙ্গলে দেখা করতে গেছে তাঁদের সঙ্গে হয়তো, কিন্তু তারা কেউ আসেনি।

আমার চোখের সামনে নীল জংলা ফুলের পাতা আর রোদের সোনালি টুকরো-টাকরায় মোড়া বাঘিনীটির চেহারা কালো পাথরের উপর আবার ভেসে উঠল। তারপর মহুয়া গাছে হেলান-দেওয়ানো আমার রাইফেলের সামনে হাসি-হাসি মুখে বাঘিনীটার চেয়ে থাকার কথাও।

না, আমিও বোধহয় পাগল হয়ে যাব, যদি এখনও না হয়ে থাকি।

কিছুক্ষণ পরে মালী ফিরল। সঙ্গে কেবল মংলু একা।

কী ব্যাপার?

ওরা কেউ এল না। বলল, ওদের প্রাণের ভয় আছে। আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে ঘর করে। ওদের পক্ষে এই ভূতুড়ে বাঘ মারতে আপনাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।

আর মংলু কী বলে?

বলেই, মংলুর দিকে তাকালাম আমি।

মংলু নমস্কার করে বলল, পরনাম সাহাব। আমি আপনার সঙ্গে অনেক শিকার করেছি। সাহস আমার কমতি নেই। সাহাবেরও নেই। আমি জানি। কিন্তু এই বাঘ মারতে আপনি যাতে না যান, তাই-ই আপনাকে বারণ করতে পাঠিয়েছে ওরা সবাই আমাকে। ওরা সকলেই আপনাকে ইজ্জত দেয়। আপনার ভাল চায়।

আশ্চর্য তো! তোমরা সবাই কুসংস্কারের বশে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে, আর পাহান মানুষের পর মানুষ মেরেই যাবে।

এ যে এমনি বাঘ নয় সাহাব। বড় টাইগার, মানুষ-খেকো হলে দিনেই যখন সহজে মানুষ ধরতে পারে তখন রাতে মানুষ নেয় শুনেছেন কখনও? তাও মানুষ নেয়, বাংলোতে-বাংলোতে ঘুরে বেড়িয়ে?

নেবে না কেন? তোমরা আর কতটুকু জানো। জিম করবেট সাহেবের লেখা পড়লে জানতে।

তবে ওর মৃত্যুর বন্দোবস্ত হচ্ছে।

মংলু বলল।

কী ভাবে? হাড্ডিতোড়িতে আমরা এই পূর্ণিমার দিনই জোর পুজো চড়াচ্ছি বনদেওতার থানে। পাঁচটা পাঁঠা বলি দেব। দেওতাকে পাহানের সব হরকতের কথা জানালে, তাকে শাস্তি দিতেন উনি এতদিনে। আমরা পুজো চড়িয়ে সব কথা বলে দেব তাঁকে। দেওতাই ওর ঘাড় মটকাবেন। দেওতা আমাদের উপর চটতে পারেন। শাস্তিও দিয়েছেন সেই জন্যে। কিন্তু এতদিনেও কি শাস্তি পুরো হল না?

বললাম, শোনো, আমি এক্ষুনি সিতাওন উপত্যকার দিকে আবার যাব। আমার সঙ্গে যাবে মংলু?

না সাহাব।

শক্ত অথচ বিনয়ী গলার মংলু বলল।

আমার জীবনের ভয় আছে। পাগল হয়ে গেলেই বা আমার বাল-বাচ্চা কে দেখবে? আমরা তো বড়লোক নই!

যাবেন না বোস সাহাব।

রেঞ্জার মিশ্র আমার হাত ধরে বললেন।

আমি বললাম, কী! টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে বাস করেও আপনারা লেখা-পড়া শিখে এমন আশ্চর্য সব দেবতা-ভূতের কথা বলেন কী করে, ভাবতেও পারি না। ওরা বলে বলুক, আপনিও?

রেঞ্জারসাহেব চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়লেন।

বললেন, শুনুন সাহাব, আপনারা ভারী শহরে থাকেন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা চষে বেড়ান, আর মাঝে-মাঝে শখ করে জঙ্গলে আসেন। আমরা, যারা, সারা জীবন জঙ্গলে-জঙ্গলেই কাটিয়ে দিলাম, আমরা যা বিশ্বাস করি, তা না করে উপায় নেই বলেই করি। ভূত বা দেওতা যেমন ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে ছিল, তেমনি টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতেও আছে। এই জঙ্গলে-পাহাড়ে আছে। ফ্লুরোসেন্ট, হ্যালোজেন আর মার্কারি-ভেপারের আলোতে তারা থাকে না। আপনি অনেক জানতে পারেন, সব জানেন না।

ভূপতনারায়ণ মিশ্র রেঞ্জারসাহেব চলে যেতেই আমি উঠে চান করতে গেলাম। মালীর বউকে ফ্লাস্কে করে চা দিতে বললাম। সঙ্গে নিয়ে যাব। ফোর-সেভেন্টি ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা বইতে বড়ই অসুবিধে। রাইফেলটা কিন্তু যুগলপ্রসাদ মালীকে দিয়ে গেছিল। থ্রি-সিক্সটি-সিক্স ম্যানলিকার শুনার রাইফেলটা পুল-থ্রু দিয়ে পরিষ্কার করে ছ'টি নতুন সফট-নোজড গুলি বেছে রেখে, খাঁকি শর্টস আর ফুলশার্ট পরে বেরিয়ে পড়লাম।

মালী আর মালীর বউ এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল। বলল, হামলোঁগোকো

কেয়া হোগা হুজৌর?

কুছ নেহি হোগা। ম্যায় রাতমে লওটেঙ্গে, খানা-কামরামে শো যনা তুম দোনো। খিচুড়ি বনাকে রাখনা হামারা লিয়ে। বন্দুকভি বগলমে রাখনা। ম্যায় গ্যায়া, ঔর আয়া।

ওরা দু'জনে, জী মালিক! হাঁ মালিক! বলে উঠল।

গেট পেরিয়ে, কাল যে পথে গিয়েছিলাম সেই পথেই গিয়ে পাকদণ্ডী ধরলাম। জায়গাটা চিনে গেছি। যুগলপ্রসাদ ভেবেছিল, আমার অতখানি হাঁটতে কষ্ট হবে, তাই সাইকেল করে নিয়ে গেছিল যতটা পারে। কিন্তু সে পথে অনেকই ঘোরা হয়ে ছিল।

আজকে আমি একা। রাইফেলটা সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু এটা কি কাজে লাগবে? অনেক জঙ্গলেই অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে দেখেছি কিন্তু আমার নিজেরই বন-বাংলোর পাশে, এমন গোছানো, সাহেবসুবো-ভরা মার্ফিগঞ্জের মতন জায়গাতেও এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা অভাবনীয়। মার্ফিগঞ্জে এতগুলো বন্দুক থাকা সত্ত্বেও এবং এত ভাল-ভাল শিকারি থাকা সত্ত্বেও কেন পাহানকে মারতে গেলেন না কেউ! অথবা গেলেও, কেন পারলেন না মারতে এখন একটু-একটু বুঝতে পারছি।

প্রথমেই বাঘিনী-রহস্যটা ভেদ করতে হবে। তারপর ডগলাস-রহস্য।

ভাবছিলাম যে, যে-ডগলাসকে, মানে তার অবশিষ্টাংশকে, আমরা তিনজনে মিলে কবর দিলাম, সে কিনা ডগলাস নয়! ডগলাস কিনা, তার শোওয়ার ঘরের স্কাইলাইটের সঙ্গে ঝুলে মরেছে। তবে যাকে কবর দিলাম সে কে? হাওয়া? কী করে হয়?

যে-বাঘিনীর পেট কালকে ওঠা-নামা করতে দেখলাম পর্যন্ত গুহামতো জায়গাটায়, যে আমার রাইফেল পাহারা দিয়ে শুয়ে-শুয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসছিল, সেই-ই বা কে? সেও কি হাওয়া? চোখের ভুল?

আর বনদেবতার ভাঙা দেউলের মধ্যে ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে ওঠা আমাদের সকলেরই এক সময়কার প্রিয় ল্যাংড়া পাহান? যাকে যেতে দেখলাম নিজের চোখে, যাকে হুডকু চোখে দেখেই গাদা-বন্দুক দিয়ে গুলি করল, যার রক্তের ও পায়ের দাগ সিতাওন নদী অবধি এসেই মুছে গেছিল আশ্চর্যভাবে, সেই-ই বা কে? সেও কি বাঘ নয়? এত সব ভাবতে-ভাবতে মোহগ্রস্তর মতে সিতাওন নদীর দিকে চলতে লাগলাম। ডগলাসকে যেখানে খেয়েছিল সে-জায়গাটাও ঘুরে যাব, মন বলল।

এপ্রিলের সকালবেলা আমাদের এদিককার বন-পাহাড় বড় সুন্দর দেখায়। পলাশ শিমুলের লাল পতাকা এখন দিগন্তে-দিগন্তে ওড়ে। মহুয়াও শেষ হয়নি এখনও। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইতে থাকে। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ। ঘুম পেয়ে যায়।

পাকদণ্ডী দিয়ে আসতে খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেলাম ডগলাসের লাশটা যেখানে পড়েছিল সেই জায়গাতে। সেখানে পৌঁছে, খুব সাবধানে এগোতে

লাগলাম, রাইফেল হাতে। ওই নরখাদক বাঘের এতই কুকীর্তি হয়েছে যে এদিককার বনে বহুদিন হল কেউই আসে না। বহুদিন হল ওই বাঘের সঙ্গে এই জায়গাতে দিনের বেলাতেই হয়তো মোলাকাত হয়ে যেতে পারে। তবে যে-জায়গাতে ডগলাসকে খেয়েছিল, সে জায়গাটা ফাঁকা আর নয়। তবুও ওই জায়গাটা দেখা দরকার। কিছুই যে বুঝতে পারছি না! ধাঁধার পরে ধাঁধা।

সাবধানে আড়াল নিয়ে-নিয়ে নিঃশব্দে এগোতে লাগলাম।

সেই জায়গাটার কাছাকাছি এসে, মনে হলো একটা আওয়াজ পেলাম। আমার নিশ্বাস দ্রুত পড়তে লাগল। পাথর ও গাছের আড়ালে আড়ালে ওই দিকেই এগোতে লাগলাম রাইফেল হাতে নিয়ে।

কোনও জানোয়ার কড়মড়িয়ে কিছু খাচ্ছে। শব্দটির কাছাকাছি গিয়েই আড়াল নিয়ে বসে পড়লাম। একটা ময়ূর আমাকে দেখতে পেয়েই কেঁয়া-কেঁয়া-আ-আ করে ডেকে উঠল। ডাকতেই, দেখলাম একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ মাথা উঁচু করে আমার দিকে তাকাল। রক্তে তার বুক, মুখ, গোঁফ, নাক সব লাল হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে দেখামাত্র এক লাফে ডানপাশে জঙ্গলে উধাও হল। তাকে মারারও কোনও ইচ্ছা আমার ছিল না। চিতাটা উধাও হতেই দু-পাশের গাছে এতক্ষণ অদৃশ্য ও নিথর হয়ে বসে-থাকা শকুনগুলো একে-একে উড়ে এসে বসতে লাগল নীচে। চিতাটা কী খাচ্ছিল, তা দেখার জন্যে এগোতেই দেখি একটা বড় শিঙাল চিতল হরিণ। ভোরবেলার দিকে মেরেছে। কিন্তু দিনের বেলায় এরকম অপেক্ষাকৃত অগভীর জঙ্গলের জায়গায় মড়ির উপরে খোশমেজাজে বসে থাকবে চিতা, এটাও অভাবনীয়।

এই জঙ্গলে এখন যা কিছুই ঘটেছে, সবই অভাবনীয় ব্যাপার-স্যাপার।

পড়ে-থাকা এবং পেট-চেরা চিতলটার কাছে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কাল যে-পথে পাহানকে অনুসরণ করেছিলাম, সে পথেই নেমে গেলাম তাড়াতাড়ি।

যখন সিতাওন নদীর পারে পৌঁছলাম, তখন প্রায় একটা বাজে। ক্লান্তও হয়ে গেছিলাম। সকালে যে বেরিয়েছি নাস্তা করে তারপর চলছি তো চলছিই। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা ভাবটা চলে গেছে। তবে এসময়ে জঙ্গলে পথ চলতে তেমন কষ্ট হয় না। এত রঙের বাহার, চারদিকে এত ফুল, এত পাখির ডাকাডাকি, এত হরজাই বনগন্ধ যে, পথ যেন উড়িয়ে নিয়ে যায় এখন পথিককে।

নদীর পারে একটা বড় অর্জুন গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে চা খেলাম। কালকের হ্যাভারস্যাকে স্যান্ডউইচ আর জলের বোতল কালকের জায়গাতেই পড়ে আছে দেখলাম। মানুষের কথা আলাদা, ও জিনিস কোনও জানোয়ারই ছোঁবে না, এক বাঁদর আর ভালুক ছাড়া। তাদের বিষমই কৌতূহল।

কুল-কুল করে জল বয়ে যাচ্ছে সিতাওন নদী দিয়ে। ওপাশের গভীর জঙ্গলের মধ্যে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে এই দুপুর বেলাতেও।

চা খেতে-খেতে এর পরে কী করা যায়, তাই-ই ভাবছিলাম। পাইপ ধরিয়ে,

বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়াও দিয়ে নিলাম। কালকের রক্তের দাগ এবং খাবার দাগ আজও পেলাম। পুরনো হয়েছে, এই-ই যা।

এমন সময় জঙ্গলের গভীর থেকে প্রচণ্ড জোরে বাঘ ডাকতে লাগল। মনে হল, যেন নদীর জলও সেই ডাকে ভয় পেয়ে আরও জোরে দৌড়তে লাগল। থার্মোফ্লাস্কটার মুখ বন্ধ করে ধীরেসুস্থে আমি আওয়াজের দিকে এগোলাম নদী পেরিয়ে। জুতো মোজা পরেই পেরোলাম। গরমের দিনে জুতো মোজা শুকোতে সময় লাগে না। বিশেষ করে গলফ-শু বা অন্য কাপড়ের জুতো। যতক্ষণ ভিজে থাকে, পায়ে আরামই লাগে। শব্দও কম হয়। জঙ্গলে ঢুকেই বুঝলাম কালকের ওই পাথরগুলোর দিক থেকেই আসছে আওয়াজটা। বাঘ একটা কি দুটো, তাও অজানা। কাল যেখানে বাঘ-বাঘিনীকে খেলা করতে দেখেছিলাম, সেখানে আজ গিয়ে পায়ের দাগ আছে কি নেই, তা দেখা হয়নি।

অত্যন্ত সাবধানেই এগোতে লাগলাম। আধমাইল পথ, এ-ভাবে এক-পা এক-পা করে এগোতে কম সময় লাগল না এ-গাছের আড়াল থেকে ও-গাছের আড়ালে আড়ালে চলে। তারপর পাথরগুলোর কাছাকাছি আসতেই মস্ত একটা শালগাছের গুঁড়ির পেছনে একেবারে থিতু হয়ে বসলাম। ভাবলাম, জঙ্গলের কী বলার আছে শুনি।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে এ-গাছ থেকে ও-গাছে হাওয়ার দোলনায় দুলে সবুজ টুঁই, হলুদ-বসন্ত এবং ব্রেইন-ফিভার পাখি আসছে-যাচ্ছে। অদূরেই একটা কাঠঠোকরা কাঠ ঠুকতে লাগল। বাঘের গর্জনে ভয় পেয়ে বোধহয় চুপ করে ছিল এতক্ষণ। কিন্তু বাঘ কোথায় আছে, বোঝা যাচ্ছে না। অথচ আছে, কাছেই। হাওয়ায় গন্ধ আসছে বাঘের গায়ের। দু-পাশের অনেক গাছে বাঘের নখ-আঁচড়ানোর দাগ স্পষ্ট। বাঘের শরীর থেকে যে, তীব্র-গন্ধী তরল মার্কার পিচকিরির মতো বাঘ ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে, তার এলাকা নির্দেশ করে, তারও গন্ধ আসছে, তীব্র।

এমন সময়ে হঠাৎ একটা চাকুম-চাকুম আওয়াজ শোনা গেল। বাঘ কিছু খাচ্ছে।

কিন্তু বাঘ একটা, না দুটো?

নিশ্বাস বন্ধ করে প্রায় বুকে হেঁটে-হেঁটে আবার এগোলাম। একটা ঝোপের আড়ালে পৌঁছে, রোদ আর ছায়ার ডোরাকাটা শতরঞ্জির মধ্যে একেবারেই মিশে-যাওয়া বাঘের ডোরাকাটা শরীরটা চোখে পড়ল। বাঘটা আমার দিকে পিছন ফিরে ছিল। তার ডান কাঁধের একটু নীচে একটা মস্ত ঘা। রক্ত জমে কালো হয়ে আছে। অথচ জিভ পৌঁছয় না বলে, জায়গাটা চাটতেও পারেনি। পোকাও বসছে উড়ে-উড়ে। আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। এই যে মানুষখেকো পাহান, সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না।

কিন্তু খাচ্ছেটা কী সে?

মানুষ?

আবারও?

ঠিক সেই সময়েই বাঘের মুখোমুখি মস্ত ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা থেকে অসংখ্য ধাড়ি-বাচ্চা, মাদি-মদ্দা বাঁদর একসঙ্গে ডেকে উঠল। আমার সঙ্গে বাঁদরের সর্দারের হঠাৎই চোখাচোখি হয়েছিল। ডেকে উঠল ওরা আসলে আমাকে দেখেই, কিন্তু বাঘ বিরক্ত হল, ভাবল ওকে দেখেই অমন করছে, কারণ ল্যাংড়া পাহানের মুখটা ওদের দিকেই ছিল। বাঘ উঠে দাঁড়িয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, আবার প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল। মনে হল কানের কাছে বাজ পড়ল। চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ করতে করতে দু-তিনটে ছোট বাঁদর বাঘের বোমা-ফাটা গর্জনে ভয় পেয়ে হাত-আলগা হয়ে নীচে পড়ে গেল পাকা ফলের মতো, আর বাঘটা এক লাফে এগিয়ে গিয়ে দু-হাতে দু-থাপ্পড় মেরে দুটি বাঁদরকে সঙ্গে-সঙ্গে মেরে ফেলল। তৃতীয়টি চ্যাঁ-চ্যাঁ করতে-করতে দৌড়ে গিয়ে আবার গাছে উঠল। উঠতে গিয়েও, তার হাত পা ভয়ে পিছলে-পিছলে যাচ্ছিল। সদ্য-মরা বাঁদর দুটোর শরীর তখনও থরথর করে কাঁপছিল।

ল্যাংড়া পাহান যখন উঠে দাঁড়াল, তখনই তার পায়ের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, তার পায়ের কাছে একটা ময়ূর লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে আছে। ভীষণ রোগা হয়ে গেছে পাহান।

মনে হল, ওর স্বাভাবিক শিকার ধরতে পারে না বোধহয় অনেকদিন থেকেই ভাল করে। নইলে কি বেচারির শুধু মানুষ বা ময়ূর ধরেই খেতে হয়!

এবার পাহান আমার দিকে ফিরবে। ময়ূর শেষ করে বাঁদর দুটোকে খাবে হয়তো। আমাকে দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। ছিঁড়ে-খুঁড়ে ছ্যাদরা-ভ্যাদরা করে দেবে। থ্রি-সিক্সটি-সিক্স রাইফেলটা না এনে, কেন যে, হেভি-বোরেরটা আনলাম না, তা মনে করে নিজের ওপর ভীষণ রাগ হতে লাগল। কিন্তু পাহান আমার দিকে ফেরবার আগেই আমি ঝোপের মধ্যে মড়ার মতো শুয়ে পড়লাম রাইফেলটাকে সামনে করে।

পাহান ফিরে এসে, আবার ময়ূরটাকে খেতে লাগল। চাকুম-চাকুম শব্দ শুনে বুঝলাম, সে আবার পিছনে ফিরেছে। অত কাছ থেকে, একেবারে নিরুপায় না হলে, খুব হেভি রাইফেল দিয়েও বাঘের মুখোমুখি গুলি করতে নেই। করলে, বিশেষ করে বাঘ যদি শিকারিকে দেখে ফেলে, তবে মরবার আগেও তাকে একেবারে মণ্ড করে দিয়েই মরবে। কিছুক্ষণ সময় যেতে দিয়ে এবার আবার আস্তে-আস্তে মাথা তুললাম। পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসে সে ময়ূর খাচ্ছিল।

ময়ূরের মতো সুস্বাদু হোয়াইট-মিট পৃথিবীতে নেই। কী চমৎকার কাবাব হত ময়ূরটার! আর পাহান তাকে কী-ভাবে খাচ্ছে!

নষ্ট করার মতো সময় নেই আর। পাহান আমার কাছ থেকে খুব বেশি হলে, পনেরো গজ দূরে বসে আছে। রাইফেল তুলে, খুব ভাল করে তার ঘাড়ে এইম

করলাম।

এই রাইফেলটা আমার বড় প্রিয় রাইফেল। এ দিয়ে ওড়িশাতে আমি রোগ-বাইসনও মেরেছি।

বুকের ওঠা-নামা একটু কমলে, নিশ্বাস বন্ধ করে ট্রিগারে চাপ দিলাম। রাইফেলের আওয়াজ গভীর বনে গমগম করে উঠল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে, বাঁদরের দল এবং ভয়-পেয়ে-ওঠা নানা পাখির ডাকের আওয়াজের মধ্যে এক লাফ মেরে, পাহান সামনের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। বসা-অবস্থা থেকেই আহত এবং দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বড় বাঘ যে কত বড় লাফ দিতে পারে, তা যারা নিজের চোখে না দেখেছেন, তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না।

ভেবেছিলাম, লাফ দিয়ে যেখানে পড়বে, সেখানেই মরবে। কিন্তু সে অবলীলায় আরও একটি লাফ দিয়ে ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে জঙ্গলের আরও গভীরে অনেক দূরে চলে গেল।

আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম। ব্যাপারটা সম্পূর্ণই অভাবনীয়। কিছুক্ষণ আমি ওখানেই বসে থাকলাম। তারপর মনে ও গায়ে জোর করার জন্যে আবার ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে চা খেলাম একটু। পাইপও টানলাম কিছুক্ষণ। সফট-নোজড গুলিতে ওর শ্বাসনালি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার কথা ছিল। ঘাড়ও। মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল। অত শর্ট-রেঞ্জে মারা! কী করে যে লাফের পর লাফ মেরে সে এত দূরে চলে গেল, সত্যিই তা ভেবে আমার বুদ্ধি আরও ঘোলা হয়ে গেল।

মিনিট-পনেরো পর, সদ্য-আহত বাঘের রক্ত-ঝরিয়ে দুর্বল হয়ে যাবার সময় দিয়ে, ফ্লাস্কটা একটা ডালে ঝুলিয়ে রেখে, রাইফেল রেডি-পজিশনে ধরে আবার এগোলাম আমি।

প্রথম লাফে যেখানে গিয়ে পড়েছিল পাহান, সেখানে এসে পৌঁছলাম। প্রথম লাফেই প্রায় পঁচিশ গজ এসেছে। রক্ত ছিটকে পড়েছে সেখানে পিচকিরির রঙের মতো। সেখান থেকে আরও সাবধানে এগোলাম। কিছুটা এগোতেই সেই পাথরের স্তূপ। সেখানে গিয়েই আশ্রয় নিয়েছে কি? খুবই সাবধানে সেখানে পৌঁছে দেখলাম, নাঃ। রক্তের দাগ নেই কোনও। আরও আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সেই স্তূপের মাথার উপর কিছুটা টাটকা রক্ত পড়ে আছে। তার মানে, এক লাফে বাঘ ওই আহত অবস্থাতেও সেই পাথরের স্তূপটি পেরিয়ে গেছে। স্তূপটি কম করে দু-মানুষ উঁচু হবে।

আস্তে-আস্তে খুবই সাবধানে ওই পাথরের স্তূপের উপর গিয়ে উঠলাম। উঠেই শুয়ে পড়লাম। নীচের সেই জংলি লতার নীল ফুলগুলি আমার দিকে অবাক চোখে নীরবে চেয়ে রইল।

দম ফিরে পেয়ে, রাইফেলের নল সামনে করে, খুবই সাবধানে এবং অত্যন্ত আস্তে-আস্তে মাথা তুললাম। মাথা তোলবার সময়ে আমার রাইফেলের নলের সঙ্গে পাথরের ঘষা লেগে টং করে শব্দ হল একটা। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, পাহান!

আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, সামনে যেখানে সে বসেছিল, সেখান থেকে বিদ্যুৎচমকের মতন উঠে বসে। ঘুরে দাঁড়িয়েই, লাফাবার জন্যে তৈরি হল। এ সমস্তই ঘটে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। ওর সারা ঘাড় ও পিঠ রক্তে লাল হয়ে গেছিল। আর এক সেকেন্ডও দেরি না করে গুলি করলাম আমি একেবারে ওর বুক লক্ষ্য করে। পর পর দু'টি গুলি করলাম। যাতে এবার আর কোনওরকম ভেলকি না দেখাতে পারে ও। একবার ওঠার চেষ্টা করেই ল্যাংড়া পাহান পড়ে গেল। তারপর সামনের পা-দুটো জড়ো করে দু-থাবার উপরে মাথাটা রেখে যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক বছর আগে কোনও গুহার মধ্যে তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল। তখনও তার চোখ ফোটেনি। গুহার অন্ধকারে সে বোধ হয় এমনি করেই সামনের দু-পায়ের থাবার উপর মাথা রেখে তার জীবনের প্রথম ঘুম ঘুমিয়েছিল। তারপরও বন-দেওতার ভাঙা দেউলের চাতালে আর গভীরে সে এমনি করে কতবারই না ঘুমিয়েছিল! আর, আজ ঘুমোল শেষ ঘুম।

মনটা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার সব কীর্তি-কলাপ মনে পড়ে যাওয়ায় আনন্দও হল খুব।

আমি পাহাড়ের স্তূপ থেকে নেমে এসে, যেখানে ফ্লাস্কটা রেখেছিলাম সেখানে ফিরে এলাম। ওখানেই বসে আবার চা খেলাম। তারপর একটা শালগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে-শুয়ে পাইপ খেলাম। কাল থেকে মনের মধ্যে যে টেনশান, টানটান শরীরের মধ্যে যে ক্লান্তি জমে উঠেছিল, সে সমস্ত সরে গেলে, শরীরের পেশী সব আবার ঢিলেঢালা বোধ করলে, ধীরেসুস্থে রাইফেলটা কাঁধের স্লিং-এ ঝুলিয়ে পাহানের কাছে ফিরে গেলাম। স্তূপটাকে বাঁ পাশে রেখে আন্দাজ-আন্দাজে জায়গাটাতে গিয়ে পৌঁছলাম। কিন্তু পাহান ঠিক কোথায় যে আছে, তা ঘন আগাছার জন্যে দূর থেকে ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না।

পাথরের স্তূপের উপর থেকে সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। নীচের ঘন আন্ডারগ্রোথের জন্যে নীচে থেকে জায়গাটা ঠাহর করতে পারছিলাম না কিছুতেই। তাই আবার ফিরে গিয়ে পাথরের স্তূপটার উপরে উঠলাম। এবং উঠেই, প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

পাহান নেই। না, পাহান যেখানে পড়েছিল, সেখানে তার চিহ্নমাত্র, নেই। তার রক্তে যেখানে মাটি ভিজে লাল হয়ে ছিল, ঠিক সেইখানে একটি লাল ফুলদাওয়াই-এর ঝাড় কে যেন পুঁতে দিয়ে গেছে। অজস্র লাল ফুলদাওয়াই ফুটে আছে তাতে, যেন, ঝাড়টি চিরদিন ওখানেই ছিল। সকালের হাওয়ায় ফুলগুলো দোলাদুলি করছে। সিতাওনের ওই উপত্যকাতে কোথাও ফুলদাওয়াই নেই। ফুলদাওয়াই ফোটে আলো যেখানে বেশি পড়ে, সেই সব জায়গায়। এখানে ফুলদাওয়াই-এর ঝাড় কোথা থেকে এল, কে জানে!

আমার সমস্ত বুদ্ধি জড়ো করেও ব্যাপারটার কোনও কূল-কিনারা পেলাম না। হঠাৎ চারিদিকের গাছ থেকে নানা রকম পাখি, ময়ূর, বাঁদর, কাঠঠোকরার মিলিত আওয়াজ উঠল। এবং সেইরকম হঠাৎই ভীষণ জোরে হাওয়া বইতে লাগল জঙ্গলের মধ্যে শ্রাবণের ঝড়ের মতো, এই বৈশাখের ভোরে। অথচ আকাশে খটখটে রোদ। হাওয়াটা যে মিথ্যে নয়, বুঝলাম গাছগাছালি থেকে মরা কুটো, ফুল, পাতা সব উড়ে এসে যখন আমার গায়ে মাথায় পড়তে লাগল।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল। এত মানুষের নিজেদের পাওয়া ভয় এবং আমাকে দেখানো ভয় সবই যেন একসঙ্গে আমার বুকে ফিরে এল। মনে হল, অজ্ঞান হয়ে যাব আমি।

দৌড়ে পাথরের স্তূপ থেকে নেমে যে পথে এসেছিলাম, সেই পথেই দৌড়ে ফিরতে লাগলাম। যেখানে ময়ূরের পালক ও লেজ পড়ে ছিল এবং মরা বাঁদরদুটো, সেখানে এসেও আরেকবার অবাক হলাম। কোনও চিহ্ন নেই তাদের। না রক্তের, না ছিন্নভিন্ন পালকের। না, কোনও কিছুরই চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। একঝাঁক লাল-কালো বন-মুরগি সেখানে চড়ে বেড়াচ্ছিল। আমাকে আসতে দেখেই কঁক-কঁক করে উড়ে ছড়িয়ে গেল ঝুমকো-জবার মতো চারপাশে। ফুটে উঠল লাল-কালো তারার মতো ফুল হয়ে আলোছায়ার ডোরা-কাটা শূন্যে।

আমি দৌড়তে লাগলাম। দৌড়ে নদী পার হলাম। তারপরও দৌড়তে লাগলাম। স্কুল-কলেজের স্পোর্টস এবং ক্রিকেটের ফিল্ডিং করার পরে, এত জোরে এবং এতক্ষণ ধরে আমি কখনওই দৌড়ইনি। আমার পিছনে পিছনে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে ভয়টা তাড়া করে আসতে লাগল। আমার মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছিলাম বক্সার জো-লুই-এর কথা: "You can run but you cannot hide"।

ঘোরের মধ্যে দৌড়তে-দৌড়তে আমি বাংলোতে ফিরে এলাম। মালী হাওয়ায়-ঝরা মরা-পাতা ঝাঁট দিচ্ছিল বাংলোর সামনের হাতাতে। আমাকে ওইভাবে আসতে দেখেই চেঁচিয়ে সে তার বউকে ডাকল। ওর বউ দৌড়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেই কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। কী দেখল, আমার মধ্যে তা ওই-ই জানে। ওরাই জানে। নিজে তো আমার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে মুখ দেখার কোনও ইচ্ছাও ছিল না আমার।

সোজা গিয়ে ঘরে ঢুকলাম। বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে শুয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ বা কতদিন যে ঘুমিয়ে ছিলাম মনে নেই। ঘুম যখন ভাঙল তখন অনেকই বেলা। বালিশের তলা থেকে রিস্টওয়াচ টেনে বের করে দেখলাম, দুটো বাজে।

বাইরে এসে দেখি, অনেকই লোক বসবার ঘরে, পেয়ারাতলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গোমড়া মুখে বসে নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছে।

রেঞ্জার মিশ্রসাহেব, আমার পেয়ারের সব শিকারিরা, সকলেই আছেন ও আছে।

মংলু বলল, আমার জন্যে চিন্তিত হয়ে ফিলফিলা থেকে হেকিমসাহেবকে আনবার জন্যে টাট্টুঘোড়া এবং বন্দুক সঙ্গে দিয়ে পাঁচজন লোক পাঠিয়েছেন রেঞ্জার সাহেব, যাতে মারিজের ইলাজের কোনও রকম ত্রুটি না হয়।

কেমন আছেন? তবিয়ৎ ঠিক্কে না হ্যায় হুজৌর?

ইত্যাদি সব প্রশ্নের জবাবে "ভাল ভাল" বললাম বটে সকলকেই, কিন্তু শরীর ভাল মোটেই ছিল না। মাথা ভার। কেউ যেন ঝিকা-গাছের ডাল দিয়ে আমাকে খুব পিটিয়েছে। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। অথচ হাড়গোড়, মাংস যেন সব আলাদা হয়ে গেছে। তবু বনদেওতার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ ছিলাম আমি। যা-কিছুই ঘটে গেল আমার জীবনে গত দু'দিনে, তার অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা হয় না বুদ্ধি দিয়ে।

মালী এসে বলল, কালকে আমরা সকলে পুজো চড়াতে যাব বনদেওতার থানে। মার্ফিগঞ্জ এবং আশেপাশের বস্তির সমস্ত ঘর থেকে একজন করে যাবে।

কোন থানে? উদাসীন গলায় আমি শুধোলাম।

সিতাওনের উপত্যকার গভীরে যে থান আছে, সেই থানে। আপনি যাবেন তো? আমরা চাঁদা তুলছি সকলের কাছ থেকে।

সিতাওনের উপত্যকার নাম শুনেই আমার গা ছমছম করে উঠল।

বললাম, না। আমার যাওয়া হবে না। আজই বিকেলে আমি সিজুয়াবাগ থেকে বাস ধরে রাঁচী যাব। কাল কলকাতা চলে যাব। জরুরি কাজ আছে।

আমি যে ভয় পেয়েছি, সেটা ওরা সকলেই বুঝল। আমিও ভয়টা গোপন করলাম না। গোপন করার প্রয়োজনও বোধ করলাম না।

রেঞ্জারসাহেব পান-জর্দা খাওয়া ঘোরতর লাল ও কর্কশ একটা জিভ বের করে চুক-চুক করে একটা শব্দ করলেন। সমবেদনা। বললেন, আপনি যে প্রাণে বেঁচে, পাগল-না-হয়ে, বোবা-কালা না হয়ে ফিরেছেন এইই ঢের।

নিয়ামত অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতো বলল, পাগল বা বোবা-কালা হয়ে যাওয়ার এখনও সময় যায়নি। যুগলপ্রসাদ তো কত পরে...।

মংলু ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল।

রেঞ্জার সাহেব বললেন, আপনি কলকাতায় ফিরে, কোনও ম্যাগাজিনে এই আশ্চর্য ঘটনা নিয়ে লিখুন। খবরের কাগজের লেটার্স ট্যু দ্য এডিটর কলামে চিঠি লিখুন।

চুপ করে থাকলাম আমি।

ভাবছিলাম, শহরের লোকে কতটুকু বোঝে বনকে? কতটুকু জানে বন সম্বন্ধে? কোথাওই এ গল্প ছাপা হবে না। উলটে আমাকেই পাগল বলবে, টিটকিরি দেবে। বলবে, মশাই, মানুষ যখন চাঁদে পা দেব-দেব করছে বিজ্ঞানের দৌলতে, তখন আপনি যত গাঁজাখুরি ভূতের গল্প চালাচ্ছেন?

মিশ্রসাহেব যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বললেন, ওঁরা ভগবান বা ভূত মানেন না বলেই কি ভূত-ভগবান নেই? মানুষের বড়ই গর্ব হয়েছে।

মংলু খৈনি টিপতে-টিপতে বলল, উও সব শহরবালোঁকো লে আইয়ে না সাহাব হিঁয়েপর ইক মরতবা। ছোড় দিজিয়ে ল্যাংড়া পাহানকা হরকতকো সামনা সামনা করনে দিজিয়ে। হুঁঃ সামনা! লম্বে-লম্বে বাঁতিয়া সবেব বিত যায়েগা। ঘামণ্ড বিলকুল লুটা যায়েগা। বড়া হিম্মতদার ঔর পড়েলিখে শোচতা না উনলোগোঁনে খুদলোগোঁকো!

নিয়ামত বলল, "খুদা হাফিজ। কে জানে কী হবে? বনদেওতার অভিশাপ শহরের লোকের উপরও পড়বে। খরা হবে, ভূমিকম্প হবে, বন্যা হবে। বন, বনের প্রাণী নষ্ট করার অপরাধ বনদেওতা কখনও ক্ষমা করবেন না। আমাকেও না, আপনাকেও না, শহরের ওঁদেরও না।"

খুশি হয়ে-দেওয়া আমার মোটা চাঁদা নিয়ে ওরা সকলে চলে গেলেও, পেয়ারাতলিতে বসে ছিলাম একা। ভাবছিলাম, আমার বিদ্যা, শিক্ষা, আধুনিকতা, পৃথিবী-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, সব কিছুরই গর্বকে সিতাওনের উপত্যকাতে পুঁতে দিয়ে কলকাতার দিকে রওয়ানা হব আজ বিকেলে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, জঙ্গল সম্বন্ধে জ্ঞান, নিজের সাহস এবং রাইফেলের উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান এই ঋজু বোস নামের মানুষটা এইখানেই মরে রয়ে গেল। এখন থেকে যুগলপ্রসাদ, হুড্‌কু, বা মংলুর সঙ্গে আমার কোনওই তফাত রইল না। এক গভীর প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল আমার নিজের সম্বন্ধে। দেওয়াল ও মেঝে-জোড়া এইসব সার-সার ট্রফি...।

"ঘামণ্ড" শব্দটার মানে, আমি যতটুকু জানি, তা হচ্ছে গর্ব, অহঙ্কার। ভাবছিলাম, মানুষখেকো ল্যাংড়া পাহানকে মারতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু আমার বুকের মধ্যের আলো-ছায়ায়, পাহাড়-নদীতে সযতনে যে "ঘামণ্ড" শব্দটিকে এতদিন পুষে বড় করেছিলাম নিজের অজানিতে, সেই ভয়ঙ্কর মানুষখেকো শব্দটি যে বিনা-গুলিতে, বুকের মধ্যেই মরে গেল, এইটেই মস্ত বড় লাভ। পুরোপুরি ব্যক্তিগত লাভ।

ডগলাস বলত, "হোয়াটেভার হ্যাপেনস, হ্যাপেনস ফর গুড!"

হয়তো ও ঠিকই বলত।

আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

ঋজুদা পাইপটাকে আবার ভরল, কথা না বলে।

ভটকাই হঠাৎ বলল, "There are many things in heaven and Earth, Horatio??..."

আমি বললাম, চুপ কর। বেশি শেকসপিয়ার ফুটোস না।

তিতির বলল, আমি চানে যাব।

ঋজুদা বলল, আমিও। ব্রেকফাস্ট অ্যাট এইট-থার্টি। ডাইনিং-রুমে।

তিতির আর ভটকাই উঠে গেল। তিতির তিতিরের ঘরে আর ভটকাই আমার ঘরে।

ঋজুদা পাইপটাতে আগুন দিয়ে বলল, ভটকাই কিন্তু শেকসপিয়ার আউড়ে খুব একটা অন্যায় করেনি। সত্যিই! কত কিছু থাকে এই ভূলোক-দ্যুলোকে বুদ্ধিতে যার সত্যিই কোনও ব্যাখ্যা চলে না।

আমি বললাম তুষারকান্তি ঘোষ মশায়ের বই ছিল না? "বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না" এই নামে?

ছিল বুঝি? আমি তো পড়িনি। পড়াস তো আমাকে কলকাতা ফিরে।

বলেই, ঋজুদা উঠে পড়ে তার নিজের ঘরের দিকে এগোল।

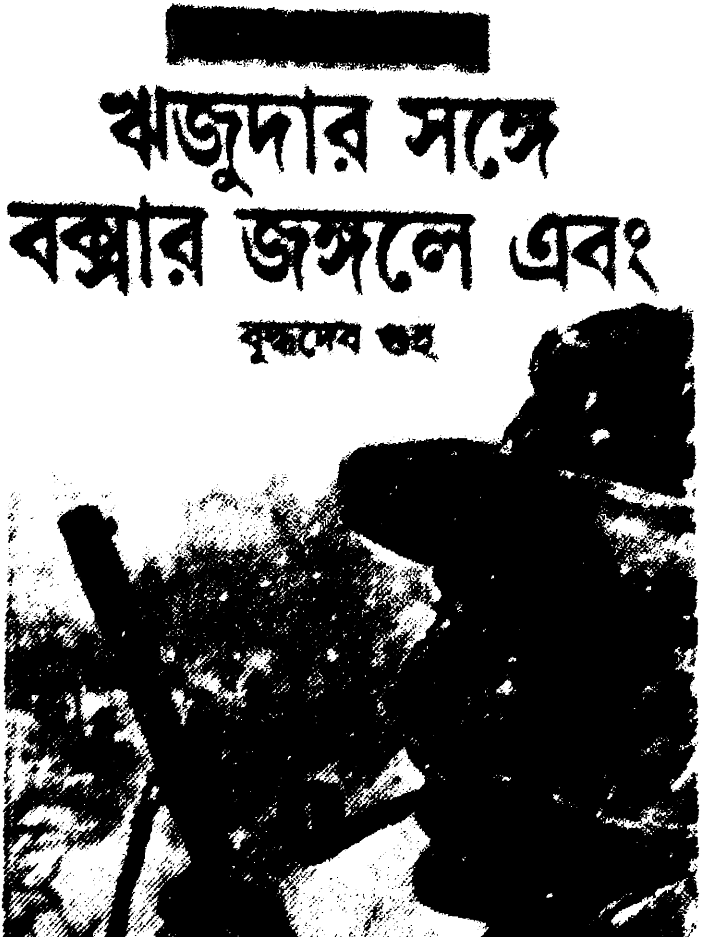

ঋজুদার সঙ্গে বক্সার জঙ্গলে

কী রে রুদ্র !

ভটকাই মনমরা হয়ে বলল, ঋজুদা কি শুধু শুধুই বেড়াতে যাবে ! এবারেও ? সেবারে বলল, ভীরাপ্পানের খোঁজে যাবে নীলগিরি পাহাড়ে কর্ণাটক আর তামিলনাড়ুর সীমান্তে, শেষ অবধি তাও গেল না, মধ্যে দিয়ে আমার মাথাটাই ন্যাড়া করতে হল । মিছিমিছি । ছিঃ ।

তাতে আর ক্ষতি কী হল ! তোর মাথার ভিতরে যে গোবরের ঢিবি তা তো আর লোকে দেখতে-জানতে পায়নি । চুল ফেলে বিশেষ ক্ষতি তো করিসনি নিজের ।

ঋজুদার উপরে ভটকাই এতটাই বিরক্ত ছিল যে আমার এই কথার একটা লাগসই পাল্টাই দেবারও ইচ্ছে দেখাল না ।

ভাবলাম, ভেরী মাচ আনলাইক ভটকাই !

ঋজুদা একটু বাথরুমে গেছিল । আমি আর ভটকাই ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোডের বসার ঘরে বসে কথা বলছিলাম ।

বললাম, সেবারে নীলগিরিতে আমাদের নিয়ে যায়নি বটে ঋজুদা কিন্তু তার বদলে মণিপুরে যে গেলাম আমরা ! ইম্ফলে এবং নাগাল্যান্ডেও । কোহিমা, তাদুবী, মাও এবং কাঙ্গপোকপি । মণিপুর আর মাইনমারের সীমান্ত 'মোরে'তে ? আর কাঙ্গপোকপির রহস্যর জট খোলাতে কি কম অ্যাডভেঞ্চার ছিল ? ঋজুদার গোয়েন্দা-কাহিনীর মধ্যে তো শুধুই "অ্যালবিনো" আর "কাঙ্গপোকপি" । কত যে নাম হল আমাদের । তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি ।

ঋজুদা ফিরে এল । বলল, কী হল ? মিস্টার ভটকাই-এর মুখ গোমড়া কেন রে রুদ্র ?

তারপর বলল, এবারে অ্যাডভেঞ্চার করতে, খুনিকে খুঁজে বের করতে বা নিনিকুমারের বাঘের মতন মানুষখেকো বাঘ বা লবঙ্গীর পাগলা হাতি মারতে যাওয়া নয় । এবারে বক্সার জঙ্গলে এমনিই যাব । শুধুই জঙ্গল দেখতে । যে-কোনও জঙ্গলের মধ্যে, যে-কোনও পাখির ডাকের শব্দে, ইশারা করে চলে

যাওয়া অচেনা নদীর বাঁকে বাঁকে যে কত গভীর গোপন সব রহস্য, কত কিছুর আবিষ্কার, তার সঙ্গে কি কোনও একটিমাত্র রহস্যের বা রহস্য উদ্‌ঘাটনের তুলনা চলে রে! বক্সাতে এমন অনেক গাছপালা, পাখি, নদী দেখতে পাবি, যা সব তোরা আগে তো দেখিসইনি, এমনকী আমিও দেখিনি। তবে পড়েছি। ছবি দেখেছি সেই সব গাছ-গাছালির, পাখ-পাখালির।

তারপর একটু থেমে বলল, আমি তো উত্তেজনাতে অধীর হয়ে আছি, সেই জঙ্গলে, সেই টাইগার প্রজেক্টে যাব বলে, আর তোরা অত মনমরা কেন? ইচ্ছে না করলে, যাস না। আমি তো জোর করিনি। কৌশিক, সুশান্ত, বামা, মধুমিতা এরা সব আমার সঙ্গে যেতে পারলে খুশিতে একেবারে ডগমগ করত। এখন মনে হচ্ছে আমার যে, আমি ভুল করেই চেলা বানিয়েছি তোকে আর ভটকাইকে। তোরা আমার চেলা আসলে নোস, চামুণ্ডা।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, আমি নই ঋজুদা, আমি কিন্তু মনমরা নই। বরং আমি তো লাফাচ্ছিই যাব বলে। আমি তোমার চেলা ছিলাম, চেলা আছি। ভটকাইটাই চামুণ্ডা।

॥ ২ ॥

ডিমা আর নোনাই নদীর আঁচলের শহর আলিপুরদুয়ারের সার্কিট-হাউসের হাতার লন-এ ঋজুদা বসেছিল পাইপ-মুখে একটি চেয়ারে। আর ঋজুদার পায়ের কাছে বাধ্য বাঁদরের মতন বসেছিল ভটকাই। তেল কিছু লাগাতে পারে বটে! আমি চান করতে করতে বাথরুমের খোলা জানালা দিয়ে দেখছিলাম।

একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার, ভটকাই আসুক এভাবে আমাদের সঙ্গে এই বক্সার জঙ্গলে। তিতির দিল্লীতে গেছে জে. এন. ইউ-তে কী কাজে, তাই যেতে যে সে পারবে না, তা আগেই জানিয়েছিল।

ভটকাইটা আগে ভাগেই গন্ধ পায় প্রতিবারে ঋজুদা কোথাওই গেলে। গন্ধগোকুল হয়েছে আজকাল। কিন্তু ও জানে না যে, আমিও ওর গন্ধ পাই I can very well smell a rat. তাও, কী নছল্লাটাই করল আসার আগে! ঢঙ।

আজ দুপুরে কামরূপ এক্সপ্রেস থেকে আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নামার পরই খুব ঝড় উঠেছিল। সারা রাত উথাল-পাথাল করেছে হাওয়া। তবে ঝড়টা ওঠাতে আবহাওয়া ভারী মনোরম হয়েছে দুপুরের পর থেকেই। দুপুরে সার্কিট-হাউসেই মুরগির ঝোল আর ভাত খেয়ে ঘুম লাগিয়েছিলাম আমরা। রাতে ট্রেনে ভাল ঘুম তো হয়নি!

চান করতে করতেই দেখলাম একটা মোটর সাইকেল ঢুকল গেট পেরিয়ে। দেখলাম, তপনদা আর বিদ্যুৎদা এলেন। সঙ্গে কোলবালিশ-এর মতন বড় দুটি টিফিন ক্যারিয়ার। আমাদের সার্কিট-হাউসের খাওয়া রাতে খেতে দেবেন না বলেছিলেন ওঁরা। বিদ্যুৎদার বাড়ি থেকে এখন রান্না করা খাবার এল তাই।

ভারী মজার এই দুই ভদ্রলোক। তপনদা, মানে তপন সেন, আলিপুরদুয়ার কোর্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিক্যুটার। ঋজুদার একেবারে অন্ধ ভক্ত। আলিপুরদুয়ারে নন্দাদেবী ফাউণ্ডেশান আছে। মিনি পর্বতারোহীদের ক্লাব। তপনদারা সে ক্লাবের সভ্য। সেখানে বিকেলে ঋজুদাকে ধরে নিয়ে গেছিলেন ওঁরা। "ঋজুদা ফ্যান ক্লাব"ও করেছেন একটা। দেখে খুব ভাল লাগল যে, শুধু আমরাই ঋজুদার ভক্ত নই। বইয়ের দোকান 'লিপিকা'-তেও গেছিলাম। মালিক বিজুবাবু চা খাওয়ালেন। দারুণ ঝাল ঝাল সিঙ্গারাও। ঋজুদার অনেক বইই রাখেন যে। আমার একটু গর্ব হল। বইগুলি লেখাতো রুদ্র রায়েরই।

পশ্চিমবঙ্গর এই বক্সার জঙ্গলে কোনওদিনও হয়তো আসাই হত না ঋজুদার। যদি বক্সা টাইগার প্রজেক্টের ডিরেক্টর এস. এস. বিস্ত সাহেব ঋজুদাকে একাধিকবার ফোন না করতেন। অবশ্য তাঁর উৎসাহের পেছনে আমার অর্থাৎ এই রুদ্র রায়ের লেখা "ঋজুদা কাহিনী"গুলিই!

তিনি ঋজুদার ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন বটে কিন্তু বিস্ত সাহেবের আমন্ত্রণের পেছনে তপনদাদের উৎসাহও অবশ্যই ছিল। বিস্ত সাহেব দেরাদুনের মানুষ অথচ চমৎকার বাংলা বলেন এবং বাংলা পড়তেও পারেন।

রাজাভাতখাওয়া ইনফরমেশান সেন্টার উদ্বোধন করতে কিন্তু ঋজুদা যেতে পারেনি। বম্বেতে খুবই জরুরি কাজ পড়ে গেছিল। কিন্তু তখনি বিস্ত সাহেবকে কথাও দিয়েছিল যে, পরে একবার অবশ্যই যাবে। অবশেষে আসার সময় যখন করতে পারল বক্সা টাইগার রিসার্ভ-এ ততদিনে বিস্ত সাহেব নিজেই বদলি হয়ে দার্জিলিং পাহাড়াঞ্চলের কনসার্ভেটর হয়ে দার্জিলিং-এ চলে গেছেন।

এবারে সুশান্তদার খুব ইচ্ছে ছিল আমাদের সঙ্গে আসার। কিন্তু জিরাফের বাচ্চা হবে সেই টেনশন-এ আসা হল না। সুশান্তদা কলকাতার চিড়িয়াখানার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। ঋজুদার একজন ভক্ত। ব্যাচেলর। ঋজুদা বলে যে, জীব-জানোয়ার, পাখি এবং গাছ-গাছালি সম্বন্ধে সুশান্তদার সত্যিকারের আগ্রহ এবং ভালবাসা আছে। অনেক জানে-শোনে, পড়াশুনোও করে। সুশান্তদাকে ঋজুদা ডাকেন "পাগলা" বলে। তিনি বন-জঙ্গল পাগল তো বটেই, ঋজুদা-পাগল বলেও। সুশান্তদাকে একবার বেতলাও ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছিল ঋজুদা বছর তিনেক আগে।

বিদ্যুৎদা, গ্রামীণ স্কুলমাস্টার। বিদ্যুৎ সরকার। আরেক পাগল। সার্কিট-হাউসের ডাইনিং-রুম থেকে বেরিয়ে দুই কোমরে দু হাত রেখে হাঁক দিলেন, আরে ও তপনদা! আপনারা করেনটা কী! খাবার লাগাইয়া দিছে যে। তাড়াতাড়ি আসেন। ফ্যান ঘোরতাছে বাঁই বাঁই কইর‍্যা। সবোই ঠাণ্ডা হইয়া যাইবনে।

তপনদা আমাদেরই মধ্যে থেকে বিদ্যুৎদার এজেন্ট হয়ে তাড়া লাগালেন। বললেন, চলো দাদা, চলো।

ডাইনিং-রুমে সকলে পৌঁছে দেখি ইলাহি ব্যাপার।

ঋজুদা শুঁটকি মাছ খেতে ভালবাসে তাই লইট্টা শুঁটকি রান্না হয়েছে।

ভটকাই, ল্যাব্রাডর গান-ডগ-এর মতন মুখ ছুঁচলো করে নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে দূরে চলে গেল। এক কোণে চেয়ার টেনে বসে বলল, আমি হলুম গিয়ে নর্থ-ক্যালকাটার বনেদি পরিবারের ছেলে। এই সব বাঙালের খাদ্য খেয়ে জাত খোয়াতে মোট্টে রাজি নই। বমি হয়ে যাবে।

ঋজুদা বলল, তুই দূরেই বোস।

তারপর বলল, বাঃ বাঃ! এ করেছ কি বিদ্যুৎ? এ যে ফাঁসির খাওয়া। কত্ত পদ! এত পদ মানুষে খাবে কী করে?

তা কী করন যাইব। মায়ে রাঁইধলো দুই পদ, বৌ-এ রাঁইধলো এক, আর ভাই বৌ-এ রাঁইধলো আর এক। হক্কলেই যে আপনের ভক্ত। নৈবেদ্য। বোঝলেন কিনা!

কথা তো শিখেছ খুব।

ঋজুদা বলল।

তপনদা বলল, উকিলে আর মাস্টারে যদি কথাই না কইতে পারব তাইলে তো না খাইয়াই থাকন লাগব।

তা অবশ্য ঠিক।

খাওয়া শুরু করার আগে ঋজুদা বলল, কী কী আছে বল দেখি বিদ্যুৎ?

কইতাছি। শুরু তো করেন। ঠাণ্ডা হইয়া যাইবনে।

আগে বলই শুনি।

আছে, ভাত, কাতল মাছের মাথা-দেওয়া ভাজা মুগের ডাইল, শিলবিলাতি আলু ভাজা।

শিলবিলাতি আলু? সেটা আবার কী জিনিস?

ভটকাই পাকার মতন বলল। অবশ্য "মতন" আর কী! ও তো পরম পাকাই!

হ। তাইলে আর কই কী? এই আলু আমাগো এই অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও পাওনই যাইব না।

আমি দেখলাম, মিনি আলু ভাজা। সাইজ যা, চার-পাঁচটা আলু যোগ করলে একটি বড় আঁশফল-এর সাইজ হবে। এমন আলু সত্যিই দেখিনি আগে কোথাওই। নতুন আলু ছোট ছোট হয়, যখন ওঠে। কিন্তু এই পুঁটকি পুঁটকি শিলবিলাতি আলু সত্যিই অবাক করল।

ঋজুদা বলল, গাড়োয়ালে একরকমের আলু খেয়েছিলাম তার নাম যোশীমারী আলু। সেগুলো অবশ্য ছোট নয়। কিন্তু শিলবিলাতি কখনও খাইনি।

ভটকাইকে বললাম, নে রে খা। এ তোর বনেদি নর্থ-ক্যালকাটাতে পাবি না। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে ফুরিয়ে যাবে।

ঋজুদা বলল, বলো, বলো, কোনটা কী তা বলে দাও বিদ্যুৎ।

হ্যাঁ। এই তো হইল শিলবিলাতি আলু, ওই লইট্টা শুঁটকি। আর এইটা হইতাছে তেকাটা মাছের ঝালচচ্চড়ি।

তেকাটা মাছটা আবার কী মাছ ?

তেরে কেটে তেরে নাক !

বলল, ভটকাই। আমি ওর মধ্যে নাই। একেবারে লাল যে ! এই বুনো বাঙালদের রাজত্বে বেচারি ঘটি কি মারা যাবে ? পেকৃতই মারা যাবে ? নিনিকুমারীর বাঘ-এর জাল থেকে বেঁচে এসে শেষে কি বাঙালদের ঝালে মৃত্যু হবে র‍্যা আমার ? কী রে মিস্টার রুদ্র রায় ?

আমি বললাম, বিহেভ। বিহেভ। তোর এই সব রসিকতা পুরনো হয়ে যাচ্ছে ভটকাই। এঁরা বোরড হয়ে যাচ্ছেন।

এই তেকাটা মাছও কিন্তু অন্যত্র পাওয়া যায় না। শুধু এই অঞ্চলের নদ-নদীতেই হয়। বোঝলা দাদা।

তপনদা বললেন।

আর এইটা হইল গিয়া বোরোলি মাছের ঝোল। কাতল মাছের ঝোলও আছে।

বোরোলি মাছটা কী মাছ ?

এও এখানকার নদ-নদীতেই পাওয়া যায়।

কী কী নদী আছে এখানে ? মানে নদ এবং নদী ?

ভটকাই শুধোল।

গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। কয়বচ্ছর আগেইত শ্যাষ কইর‍্যা দিছে এই হক্কল অঞ্চল। কী বন্যা, কী বন্যা ! কী কম্যু ! মানুষ মরে নাই বটে কিন্তু বাড়ি-ঘর ভাইস্যা গেছে মেলাই। গরু মরছে কত্ত। ইস রে ! ল্যাখাজোখা নাই। আলিপুরদুয়ার শহরে কার বাড়িতে জল ঢোকে নাই তখন ? ঈঃ ! সে এক ন্যাচারাল ক্যালামিটি যারে কয়, তাই আর কী !

কোন নদীতে বান ডেকেছিল ?

আমি বললাম।

সব নদীতেই। ডিমা, নোনাই, জয়ন্তী, সংকোশ, ফাসখাওয়া, রায়ডাক, কালচিনি। এক নদী ফুইল্যা গেলেই তো অন্যে ফুইল্যা যায় অটোম্যাটিকালি। বোঝলেন কি না !

এখন এতরকম অদৃষ্টপূর্ব এবং অনাঘ্রাত খাবার সামনে সাজিয়ে রেখে বন্যা-শাস্ত্র নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। নে রুদ্র। শুরু কর। এদিকে এসে বোস ভটকাই, ফাজলামি না করে।

ঋজুদা বলল।

আরে ওইটা আবার কী পদ ?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

কই ? কোনটার কথা কন ? ওঃ। ওইটা হইল গিয়া এক্কেরে শ্যাষে খাওনের। রুসগুল্লার লগ্যে খাইবেন অনে।

আরে জিনিসটা কী তা বলবে তো !

ইটা আমাগো বাণেশ্বরের দই।

বাণেশ্বরটা কোথায় ?

এতরকম পদের মধ্যে রীতিমতো দিকভ্রান্ত হয়ে ঋজুদা বলল।

কুচবিহার জেলাতে পড়ে।

তাই ?

ইয়েস।

বিদ্যুৎদা বললেন।

॥ ৩ ॥

আজ সকালে ব্রেকফাস্টের পরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা। ব্রেকফাস্টের বর্ণনাও আর নাই-বা দিলাম, দিলে সকলেই মনে করতে পারে আমরা শুধু পেটুকই নই, রাক্ষসও বটে !

রাজাভাতখাওয়ার রেঞ্জার সাহেব নীল-রঙা জিপ পাঠিয়েছিলেন আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে। সঙ্গে অনুপ দাস ফরেস্ট গার্ড। আর তাঁর সুন্দর ছেলে। সে পরীক্ষা দিতে এসেছিল শহরে। পথে তাকে আমরা নামিয়ে দিলাম অনুপবাবুর বাড়িতেই।

দশ মিনিটের মধ্যেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম। নিবিড় জঙ্গল বললে সব বোঝায় না। উত্তর বাংলার হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলের নিবিড়তার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য বহু জায়গার জঙ্গলের তো বটেই, আফ্রিকার জঙ্গলেরও তুলনা হয় না। এমন নিশ্ছিদ্র বন এখানে যে, দৃষ্টি বাধা পায়। মন খারাপ হয়ে যায়। ঠিক এই ধরনের জঙ্গল আমি আসাম আর তেরাই অঞ্চল ছাড়া আগে দেখিনি। ঋজুদা অবশ্যই দেখে থাকবে।

অনুপ দাস বললেন, এই যে স্যার, ডানদিকে দেখুন মধু গাছ।

মধু গাছ মানে ?

মানে জানি না। এর নীচে ঢিল-খাওয়া ঠাকুর আছেন।

তাই ?

ভটকাই বলল, বিজ্ঞের মতন।

ঋজুদা কিছু বলল না।

এইখানে প্রায়ই ছিনতাই হয়।

অনুপবাবু বললেন।

কী করে ?

জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। গাড়ি বা স্কুটারের শব্দ শুনলেই বেরিয়ে এসে ছিনতাই করে জঙ্গলে পালায়। কিন্তু জিপের শব্দ শুনলে আসে না। জানে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা পুলিশের গাড়ি হবে।

এই ছিনতাইবাজেরা কারা ?

অধিকাংশই নেপালি উদ্বাস্তু। ভুটান থেকে তাড়া খেয়ে এসে এই সব করে।

মাত্র আধঘন্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম রাজাভাতখাওয়াতে

রাজাভাতখাওয়াতে ঢোকার পথেই পড়ল, ডানদিকে, বক্সা টাইগার প্রজেক্টের "ইনফরমেশান সেন্টার"।

মালপত্র সব নামিয়ে রেখে তারপর এখানে আসা যাবে। কী বলিস ?

ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, হুঁ।

কী নাম রে বাবা ! রাজাভাতখাওয়া।

লাগাতার কথা বলা ভটকাই বলল।

ওর কথার তোড়ে মাথা ধরে যাওয়ার জোগাড় হল আমার।

হ্যাঁ। কোচবিহারের রাজা আর ভুটানের রাজার মধ্যে অনেকদিন আগে যুদ্ধ লেগেছিল। সেই যুদ্ধে সন্ধি হয়। তখন দুই রাজাই এখানে একসঙ্গে ভাত খেয়েছিলেন। অনুপবাবু বললেন।

তাই ?

আমি বললাম।

একটি ছোট লাইনের লেভেল-ক্রসিং পেরিয়ে সুন্দর এবং ছোট্ট জনপদ রাজাভাতখাওয়াতে এসে পৌঁছলাম আমরা। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক স্কোয়ার কিমি, মতন জায়গা জুড়ে এই জনপদ।

বন-কেটে করা। তবুও বন যেন ঝুঁকে পড়ে চারপাশ থেকে ঘাড়ের উপরে নিঃশ্বাস ফেলছে। বাঁদিকে একটি সুন্দর একতলা বাংলো। অনুপবাবু বললেন, এখন এটা রেস্ট হাউস। আগে ছিল ডি. এফ. ও-র বাংলো। বক্সা ডিভিশানের ডি. এফ. ও.-র হেড কোয়ার্টার্স যখন রাজাভাতখাওয়াতে ছিল।

এখন কোথায় ?

এখন টাইগার প্রজেক্ট হয়ে যাবার পরে আলিপুরদুয়ারে চলে গেছে। টাইগার প্রজেক্টের হেডকোয়ার্টার্সও তো সেখানেই।

আমরা কি ওই বাংলোতেই থাকব ?

ভটকাই শুধোল।

না। এটা ভি. আই. পি.-দের জন্যে।

ভি. আই. পি. কারা ? ঋজুদা কি ভি. আই. পি. নন ?

কিছু মনে করবেন না স্যার।

উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে ভি. আই. পি. হচ্ছেন গিয়ে শুধু হাতি আর কনসার্ভেটর অফ ফরেস্টস। এখন পালিত সাহেব আছেন বাংলোতে।

তিনি কে?

তিনি সিলিভিকালচারের কনসার্ভেটর।

সিলিভিকালচারটা কী জিনিস?

আমি বললাম।

ঋজুদা যেন কী বলতে গেল কিন্তু বলার আগেই অনুপবাবু বললেন, গাছপালা এই সবের কালচারকে বলে সিলিভিকালচার। মাছেদের বেলা যেমন পিসি কালচার। শোনেননি?

হ্যাঁ।

ভটকাই বলল, মাসি কালচারও আছে নাকি?

তারপরই দ্বিতীয় বাংলোটা দেখিয়ে বলল, এই বাংলোটাতে থাকব আমরা?

না, এটাতেও নয়। এটা ডর্মিটরি। এখানে প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে যে সব ছাত্র পড়াশুনো করেন তাঁরা থাকেন। ডক্টরেট-এর জন্যে হাতে-কলমে বন ও বন্যপ্রাণীদের যাতে জানতে পারেন, সেজন্যেই কিছু ছাত্র এসে আছেন এখানে এখন। খালি থাকলে, বাইরের লোকও অবশ্য পেতে পারেন।

তবে কি আমরা ওই দোতলা বাংলোটাতে থাকব?

হ্যাঁ। ওইটা ছিল অ্যাডিশনাল ডি. এফ. ও.-র কোয়ার্টার্স আগে।

বাঃ!

ঋজুদা স্বগতোক্তি করল।

বন্ধ গেট-এর সামনে জিপ দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার ডাকল, নর্বু, নর্বু।

তারপর হর্ন বাজাল।

ভিতর থেকে একটি বেঁটেখাটো নেপালি লোক, বছর পঁচিশেক বয়স হবে, দৌড়ে এসে গেট খুলল।

ও কি চৌকিদার?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ স্যার। চৌকিদার-কাম-কুক-কাম-সবকিছু।

ওর পুরো নাম কী?

নর্বু তামাং।

গেট বন্ধ করে রেখেছে কেন?

গোরু ঢুকে বাগানের ফুলের গাছ খেয়ে ফেলে। ঘাস বা পাতা-টাতা তো এখানে অঢেল। রাজাভাতখাওয়ার গরুরা খুব ফুল-বিলাসী।

ওদের দুধে কি ফুলের গন্ধ হয়?

ওরিজিনাল মিস্টার ভটকাই প্রশ্ন করলেন।

আমি জোরে হেসে উঠলাম।

বিরক্ত হয়ে ও বলল, হাসার কী আছে বোকার মতন? ঋজুদা বলে না যে, ইনকুইজিটিভনেসই শিক্ষিত মানুষের লক্ষণ। সব কিছুই জানতে দোষ কী? তোর মতন কোনও পাঁঠা আমাকে বোকা ভাববে এই ভয়ে কি আমি আমার জ্ঞানলাভের সদা-সজাগ ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মারব?

ঋজুদা বলল, জানার বা জ্ঞানের ইচ্ছাকে এককথায়, মানে এক শব্দে কী বলে?

জ্ঞানপিয়াসা।

ওভারস্মার্ট ভটকাই সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল।

আমাদের নামিয়ে একতলা দোতলা ঘুরিয়ে দেখিয়ে অনুপবাবু চলে গেলেন।

॥ ৪ ॥

আমরা দোতলার বারান্দাতে বসে ছিলাম।

ভটকাই বলল, প্রায় এগারোটা বাজে। ছিন-ছিনারি দেখতে দেখতে এক এক কাপ করে চা হয়ে গেলে জমে যেত, না?

তা যা বলেছিস। নীচে গিয়ে বলে আয় তবে।

সঙ্গে সঙ্গে ধ্বপ ধ্বপ শব্দ করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ভটকাই নেমে গেল নীচে।

একতলাতে থাকার ঘর নেই। একটাই ঘর। সেটি খাবার। লাগোয়া কিচেন। দোতলায় দুটি ঘর পাশাপাশি। বিরাট বিরাট চানঘর। একটি ড্রয়িং-রুম। তিন দিকে অগণ্য জানালা আছে। চমৎকার। আর ড্রয়িং-রুম আর বেড-রুম দুটির সামনেই এই মস্ত চওড়া বারান্দা। যেখানে আমরা এখন বসে আছি।

একটু পরেই আবারও ধ্বপ ধ্বপ করতে করতে ভটকাই উঠে এসে বলল, টি ইজ কামিং। দুপুরের মেনুটাও জেনে এলাম।

কী?

বাসমতি চালের ভাত, বেগুন ভাজা, বিউলির ডাল, স্যালাড আর মুরগির মাংস হচ্ছে। ব্রয়লার চিকেন নয়। বড়কা, দিশি মুরগি। ছাইয়ে আর সাদায় মেশা রং ছিল।

কী করে জানলি?

আমি বললাম।

পালক দেখেই বুঝলাম। যেমন তোকেও তোর পালক দেখেই চিনি ইডিয়ট। আর তার সঙ্গে তোর জন্যে একটু গাছ-পাঁঠারও বন্দোবস্ত করে

এলাম। ওঃ। বাংলোর পেছনেই একটি কাঁটাল গাছে যা এঁচড় এসেছে না! গাছ-কাঁচা রিয়্যাল কাঁচা-এঁচড়। তোর মতন এঁচড়ে-পাকা নয়।

তারপরই বলল, ঠিক করিনি? বলো, ঋজুদা?

ঠিক। উ্য আর ওলওয়েজ রাইট।

ঋজুদা সত্যিই খুবই বদলে গেছে। ভাবছিলাম আমি। আফ্রিকার রুআহাতে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের শেষে আমিই ঋজুদার হাতে-পায়ে ধরেই প্রায় রাজি করিয়েছিলাম ভটকাইকে দলে নিতে আর এখন ভটকাইই ঋজুদার "ব্লু-আইড বয়" হয়ে গেল! সংসারে কারওই ভাল করতে নেই। বাঙালির তো নয়ই! ন'জ্যাঠাইমা ঠিকই বলেন।

বাঃ। এখানে চেয়ার পেতে বসে থাকলেই দিব্যি দিন কেটে যাবে।

আমি বললাম।

কেন? তুই কি রিটায়ার্ড জজসাহেব?

ভটকাই ফুট কাটল।

আমার পক্ষে ওকে আর সহ্য করাই সম্ভব হচ্ছে না।

বললাম, হঠাৎ জজসাহেব হতে যাব কেন? তা ছাড়া, জজসাহেবরা ছাড়া আর কেউই কি চেয়ার পেতে দোতলার বারান্দায় বসেন না?

হয়তো বসেন কিন্তু রিটায়ার্ড জজসাহেবরা বসেনই। বসতে হয়ই!

কেন?

পথের দিকে চেয়ে, জনস্রোতের দিকে চেয়ে ভাবেন ঈসস। যে-মানুষগুলোর জেলের বাইরে থাকার কথা ছিল না, তোরই মতন, তাঁর দেওয়া রায়-এ তারাই সকলে বাইরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর যারা নিরপরাধ তারাই সব জেলে পচছে।

ঋজুদা বলল, জজসাহেবদের কী দোষ? দোষ তো দেশের আইনের। এই সব আইন বাতিল করে নতুন সব আইন করা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন না কমলাকান্তর দপ্তরে? পড়েছিস রুদ্র?

কী?

সেই যে রে! "আইন! সে তো তামাশামাত্র। বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।"

সত্যি! আমাদের দেশে যার পয়সা আছে, কোনও আইনই তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না।

সংস্কৃতে বলল ভটকাই, "কেশাগ্র"।

শুধু আমাদের দেশে-ই বা কেন? এমনটা হয় হয়তো আজকাল সব দেশেই।

ঋজুদা বলল, চল, চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। সার্ভে করে আসি জায়গাটা। এখানে থাকব তো মোটে এক রাত। কাল দুপুরেই তো চলে যাব

জয়ন্তী ।

ঠিক ।

জয়ন্তী না একটা নদীর নাম ?

তাইতো !

ঋজুদা বলল ।

আবার জায়গারও নাম ?

তাও ঠিক । তুই কি প্রথম শুনছিস এমন ভটকাই ? ভারতের বনে-পাহাড়ের আনাচে-কানাচে এমনই গ্রাম আছে হাজারে হাজারে যাদের নাম নদী বা "ঝোরা" বা "নালা" বা খোলার নামে । আরে আগে নদী না আগে গ্রাম ? নদী কোথা দিয়ে বইছে তা দেখেই তো জলের সুবিধের জন্যে তার আশেপাশেই বা উপরে নীচে গ্রামের পত্তন হয় আস্তে আস্তে ।

তাই ?

হ্যাঁ ।

এগুলো কী গাছ ঋজুদা ? বাবাঃ কী বিরাট বিরাট গাছ ! আর গাময় লাল লাল পাতা এসেছে, কুসুম গাছের মতন ।

ভটকাই জিজ্ঞেস করল ।

আমি বললাম, বাসনাকুসুম ।

সেটা আবার কী ?

একটা উপন্যাস, মা পড়ছিলেন সেদিন ।

ঋজুদা বলল, চিনতে পারলি না গাছটাকে ? তা পারবিই বা কী করে ! তুই তো এদের দেখেছিস, হয় শুধুই শান্তিনিকেতনে, নয় অন্য কোনও বড়লোকের বাড়ির বাগানে । এগুলো শিরিষ । পড়িসনি ? "প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায়..."

গাছগুলো এইখানে এইরকম বিশাল বিশাল কেন ঋজুদা ? এতবড় শিরিষ তো আগে দেখিনি ।

আমি বললাম ।

এসব যে ভার্জিন ফরেস্টস রে বোকা । এসব কি আর বনবিভাগের লাগানো প্ল্যানটেশানের গাছ ? না, বড়লোকের মালীর ? দ্যাখ চারধারে আরও কত রকমের গাছ । সবই প্রাচীন । শাল, সেগুন, শিশু, চিকরাসি, আকাতরু । আর ওই দ্যাখ, দূর থেকে শালের মতন দেখতে অথচ অনেকই উপরে সোজা উঠে তারপর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে, ওগুলোর স্থানীয় নাম গোকুল । এমন বনে এলে গা ছমছম করে । না ?

কী সব নাম রে বাবা ! চিক্‌রাসি ।

গাছগুলো আমাকে ভাল করে চিনিয়ে দেবে কে ?

ভটকাই বলল ।

কেন ? তোর জিগরী-দোস্ত রুদ্রই ।

আমার বয়েই গেছে। তা ছাড়া এখানকার সব গাছ আমি নিজেই খোরি চিনি।

আমি বললাম।

হবে হবে। বৎসগণ। সব হবে। শনৈঃ শনৈঃ।

ঋজুদা বলল।

তারপরই বলল, শাল, সেগুন, কিন্তু এই অঞ্চলের স্বাভাবিক বাসিন্দা নয়। বন-বিভাগেরই লাগানো।

কী বলো তুমি। কী বিরাট বিরাট সব গাছ।

বন-বিভাগও তো বহু পুরনো। আরে বোকা! প্রাচীন আর আদিম শব্দ দুটোর মধ্যে তফাত আছে। এই শাল-সেগুনেরা এই সব বন প্রাচীন অবশ্যই কিন্তু প্রাকৃত নয়। "বাসিন্দা" আর "আদিবাসীদে"র মধ্যে যা তফাত তাই আর কী। দেখেছিস, ওই দ্যাখ, ওই শিরিষ গাছটার ডালে অর্কিড এসেছে।

এই উচ্চতাতেই অর্কিড? হয় বুঝি?

উচ্চতা কম হলেও আবহাওয়ার আর্দ্রতার কারণেও হয়। এসবই তো হিমালয়ান ফুটহিলস।

ভটকাই বলল, দেখতে পাচ্ছিস না? মেঘের মতন দেখা যাচ্ছে, ঢেউ-এর পরে ঢেউ, পাহাড়শ্রেণী।

বলেই, আবার চেঁচিয়ে উঠল ভটকাই, দ্যাখ দ্যাখ রুদ্র। ময়ূর। ময়ূর।

দেখেছি। অত চেঁচাচ্ছিস কেন?

দ্যাখ, আমাদের বাংলোর দিকেই আসছে। ঢুকবে মনে হয়।

স্বাভাবিক।

আমি বললাম।

কেন? স্বাভাবিক কেন?

স্বাভাবিক এই জন্যে যে, সাপ দেখেছে।

সাপ? কোথায়?

চমকে উঠে বলল, ভটকাই। বলেই, চেয়ার ছেড়ে রেলিং-এ দু হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে বাংলোর হাতার এদিকে-ওদিকে দেখতে লাগল। হাতার মধ্যেটাতে গাছ-গাছালি বিশেষ নেই। কাঠটগর, রঙ্গন, কাঁঠালিচাপা ইত্যাদি গাছ, যে-সব গাছ বিনা যত্নে বড় হয়। গেট-এর পাশেই একটি গাছ আছে, এই দু মানুষ মতন উঁচু। জংলি গাছ। ফুলও এসেছে হলদেটে-লাল। চিনতে পারিনি এখনও।

বাংলোতে, নীচে, নেই তো রে সাপ? এই বাংলোর একতলার কাঠের পাটাতনের নীচেও যতখানি জায়গা ফাঁকা, সাপ তো কিসস্যুই নয়, বাঘও থাকতে পারে।

ভটকাই বলল। উত্তেজিত গলায়।

তা পারে। কিন্তু ময়ূর সাপ দেখেছে বাংলোর কাঠের পাটাতনের নীচে নয়,

দোতলার বারান্দাতেই।

মানে?

বললাম, ঢোঁড়া সাপ। এইমাত্র চেয়ারে এসে বলল।

ভটকাই ঋজুদার দিকে ফিরে বলল, ঋজুদা, তোমার চামচে রুদ্র রায়কে বলে দাও সবসময়ে যেন এইরকম না করে।

আমি চামচে আর তুই হলি হাতা। তোকে আমি ঋজুদার হাতে-পায়ে ধরে দলে ঢোকালাম আর তুই সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোলি। আর যেই ছাড়ুক, তোকে আমি ছাড়ছি না। তুই একটা বহুতই বাজে লোক।

এই যে, চা এসে গেছে। এবার থামা তোদের কিচির-মিচির। তোরা দুটোই বাঁদর।

ঋজুদা বলল।

নর্বু তামাং টি-কোজিতে মোড়া পট-এ করে চা এবং দুধ চিনি আলাদা আলাদা করে ট্রেতে করে এনে ঝকমকে পেয়ালা পিরিচ চামচ সব সাজিয়ে সেন্টার-টেবিলের উপরে রাখল। কায়দা-কানুন জানে।

ঋজুদা বলল, চা কর রুদ্র।

ভটকাই বলল, আমার তিন চামচ চিনি। মনে থাকে যেন। তুই তো কেবলই ভুলে যাস। তারপরই বলল, ঋজুদা, দ্যাখো, ওই গাছটার কাঁধ থেকে একটি সম্পূর্ণ অন্য প্রজাতির গাছ বেরিয়েছে। এটা কীরকম হল? হলই বা কেমন করে?

ঋজুদা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বলল, এরকম তো হয়! প্রকৃতির রাজ্যে কত কিছু হয়। শিরিষ গাছের মধ্যে রাধাচূড়ো।

কিন্তু হল কী করে?

হয়তো ওই শিরিষ গাছের কাণ্ডর জায়গাতে একটা ফোকর ছিল। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ছিল। কোনও পাখি হয়তো বীজ এনে ফেলেছিল রাধাচূড়া গাছ থেকে। অনেক সময় হাওয়াতেও ফুলের পরাগ উড়ে আসে। ফোকরটার মধ্যে বৃষ্টির জল পড়ে নরম হয়ে-যাওয়া ফোকরের নোংরার সঙ্গে ঝড়ে ও হাওয়ায় ওড়া পাতাগুলোও পড়ে পচে। সেই পচন-ধরা কাঠ ও পাতার বীজ ধারণের মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই বীজ পড়তেই প্রকৃতির অদৃশ্য নিয়মে গাছ জন্মাল। অন্য গাছের কাঁধ বা উরু বা কোমর থেকে।

এমন করেও জন্মায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম, অবাক হয়ে।

অবশ্যই। আর এই প্রক্রিয়াকে বলে symbiosis.

উচ্চারণ কী? বটানিক্যাল আর মেডিক্যাল নাম কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে ঠিকমতন উচ্চারণ করা সম্ভবই নয়। থাইসিস, নিউমোনিয়া এই সব বানানের আগেও একটা 'P' বসবে। কোনও মানে হয়? গভীর চক্রান্ত।

ভটকাই বলল, উত্তেজিত হয়ে।

ঋজুদা হেসে বলল, তুই যে দেখি, জ্যোতি বসু হয়ে গেলি ! সবেতেই গভীর চক্রান্ত দেখছিস। উচ্চারণটা সীমবাওসিস।

নাও, চা খাও।

বলে, ঋজুদাকে আমি পিরিচসুদ্ধু পেয়ালাটা এগিয়ে দিলাম। পাতলা লিকার, কম দুধ, এক চামচ চিনি। ইদানীং সকালের প্রথম কাপের পরে চা খেলে দুধ-চিনি ছাড়া শুধুই পাতলা লিকার খায় ঋজুদা। তাই বললাম, দুধ-চিনি দিয়েই দিলাম।

দে। যা তোর দয়া।

চায়ে চুমুক দিয়ে ঋজুদা বলল, এই প্রকৃতির মধ্যে, বন-জঙ্গল নদীর মধ্যে কত যে রহস্য ! যতই জানবি, ততই অবাক হবি। কতরকম মানুষ এই পৃথিবীতে, কতরকম গাছ, ফুল, ফল, কত হাজার রকমের পাখি, সাপ, পশু, কতরকম প্রজাপতি, কত কোটি বছর ধরে আমাদের এই পৃথিবী এবং সূর্য, চন্দ্র, অগণিত গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্র নির্ভুল সময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডে আবর্তিত হচ্ছে। কে যে অদৃশ্য থেকে অলক্ষ্যে এই বিরাট ক্রিয়া-কাণ্ড পরিচালনা করছেন তা আমরা বুঝি, মনে মনে জানি, কিন্তু স্বীকার করতে চাই না। আমরা যে বিজ্ঞান-বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের সঙ্গে যে এই অদৃশ্য পুরুষের কোনও ঝগড়া নেই এ কথা যে সবাই মানতে চায় না।

চলো এবারে বেরোই। চা তো খাওয়া হল।

হ্যাঁ।

বাংলোর হাতার গেট-এর কাছে যে গাছটাকে চিনতে পারিনি, তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঋজুদাকে বললাম, এটা কী গাছ ঋজুদা ?

এটা গামহার রে। চিনতে পারলি না ? গামহার তো তুই দেখেছিস আগে।

কোথায় ?

বাঃ। অ্যালবিনো বাঘের ডেরা হাজারীবাগের মুলিমাঁলোয়ার জঙ্গলে। শুধু একটা দেখেছিস ? গামহার তো সে অঞ্চলে, গদাধরের "বনবিবির বনে" যাকে বলে "টিপ্পি' নেগে রয়েচে", সেইরকমই ছিল।

কিন্তু এটাকে দেখে তো গামহার বলে চেনা যায় না।

আমি বললাম :

যাবে কী করে ! এর যে বালক বয়স ! তুমি যখন ক্লাস থ্রি-তে পড়তে তখন যেমন দেখতে ছিলে, আজও কি তেমন দেখতে আছ সোনা ?

ঋজুদা আমার প্রতি এই ঠাট্টাতে ভটকাই পরম খুশি হয়ে গলা আর নাক দিয়ে ঘোঁৎ আর হোঁৎ-এর মাঝামাঝি একটা শব্দ করল আমার দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়ে।

আমি ইগনোর করলাম।

চল, রেল স্টেশানে যাই। ছোট লাইনের ট্রেন।

চলো।

হেঁটে হেঁটে আমরা চললাম। স্টেশানটা ছোট্ট। ঘুমন্ত। সকালে বিকেলে দুটি করে প্যাসেঞ্জার ট্রেন যায় এখন। দেশভাগের আগে এই স্টেশানই গমগম করত! স্টেশান দেখে আমরা ইনফরমেশান সেন্টারের দিকে এগোলাম। পথে বন-বিভাগের নানা কর্মীর কোয়ার্টার। হাতির ভয়ে এখানে সব বাড়িই দোতলা। কাঠের বাংলো অবশ্য। সিমেন্ট-কংক্রিটের উপরে ভারতীয় বুনো হাতিদের খুবই রাগ। আফ্রিকার হাতিদের কথা জানি না।

এগুলো কী গাছ ভটকাই? জানিস?

ঋজুদা বলল।

না জানলে, চলবে কী করে! এটা জারুল। অর ওই যে সিঁদুরে-লাল ফুল ফুটেছে উঁচু গাছটাতে ওটার নাম পারুল।

পারুল মানে? "ওরে বকুল পারুল শাল পিয়ালের বন?"

হ্যাঁ। যিনি বকুল পারুল পিয়াল কোনওদিন দেখেনইনি চোখে, শাল দেখলেও দেখে থাকতে পারেন হয়তো, তিনি রবীন্দ্রনাথের গান গাইবেন কী করে? চোখের সামনে চিত্রকল্প না ফুটে উঠলে কী ভাব ফুটবে গানে? ফুটবে না বলেই আজকালকার তাবড়তাবড় রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়কের গানের অমন ছিরি। কাষ্ঠং শুষ্কং স্বরলিপি পাঠ করা।

পারুলের ফুলগুলো অগ্নিশিখার মতন না অনেকটা?

ভটকাই বলল।

তুই অগ্নিশিখা কোথায় দেখলি?

বা রেঃ। শান্তিনিকেতনে!

শান্তিনিকেতনে যে গাছে ওইরকম ফুল দেখেছিস সেগুলো আসলে আফ্রিকান টিউলিপ।

আফ্রিকান টিউলিপ? তা হলে মন্টিদাদু বললেন যে অগ্নিশিখা!

দুইই ঠিক। রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন ওই নাম। অনেক ফুলেরই দিয়েছেন। সাহিত্যিক বনফুল, মানে, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ও যেমন পাখিদের সুন্দর সুন্দর নাম দিতেন নিজের ইচ্ছেমতন। ওঁরা কবি-সাহিত্যিক। ওঁরা দিতেই পারেন। কিন্তু তোর আমার মতন সাধারণ মানুষের তো আসল নাম আর ভালবেসে-দেওয়া নাম এই দুইই নামই জানতে হবে। কত গাছ, কত পাখি আছে আমাদের দেশে, তাদের কত বিচিত্র সব নাম, রাজ্য ভেদে, লোকালয় ভেদে। ইংরেজি নামই আমি জানি, যাদের নাম জানি, কিন্তু তাদের দিশি নামগুলোও তো কম মজার নয়। কি গাছেদের আর কি পাখিদের।

যেমন?

ভটকাই বলল, যেন ঋজুদাই কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র আর ও ক্লাসটিচার।

যেমন ধর, Short Toed Eagle বলে আমি যে পাখিকে জানি তার নাম

বাংলাতে "সাপমারিল"। কেন না, সাপ মেরে খায়। কেউটে-শঙ্খচূড় সব বিষধর সাপ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারে এরা। আবার ধর, যে পাখির মেঠো ইঁদুর না হলে লাঞ্চ খাওয়াই হয় না, যার ইংরেজি নাম বাজার্ড, তার দিশি নাম "চুহামার"।

কী নাম বললে ?

আমি বললাম।

চুহামার। ঋজুদা বলল।

লাল্লুপ্রসাদ যাবদের রাজ্যের বাসিন্দা ?

ভটকাই বলল।

তারপরই বলল, দারুণ লাগে কিন্তু আমার।

কী দারুণ লাগে ? চুহামারকে না। লালুপ্রসাদ যাদবকে ?

লাল্লুবাবুকে।

কেন ?

আরে কথা বলে কি মানুষটা ! একেবারে দিলচস্‌পি।

কীরকম ?

সেদিন টি.ভি.তে দেখলাম, একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন ওঁকে, "আপনার রাজত্ব আর কতদিন ?"

তা উনি চোখ পিটপিট করে বললেন, "যবতক সামোসামে আলু রহেগা, তবতক বিহারমে লাল্লু রয়েগা"।

আমি আর ঋজুদা হেসে উঠলাম কথা শুনে ।

বললাম, সত্যি ?

সত্যি।

ভটকাই বলল, জোরের সঙ্গে।

বুঝলি। একেই বলে সেল্ফকনফিডেন্স। তুড়ি মেরে রাজত্ব না করতে পারলে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে, "আমাকে দয়া করো" "আমাকে দয়া করো" বলে ভোট ভিক্ষা যারা করে, তারা কি নেতা নাকি ?

থামা এবার তোদের নেতাতত্ত্ব। ওই দ্যাখ সামনে একটা মিনি-চিড়িয়াখানা। অনেক জানোয়ার আছে মনে হচ্ছে। ঋজুদা বলল। তারপরই বলল, নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে। পরে জঙ্গলে ছেড়ে দেবেন হয়তো কর্তৃপক্ষ।

আমরা পায়ে পায়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছতেই জানোয়ারগুলোর যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করছেন তিনি বললেন এটা Rescue Centre। "Rescue Centre" কেন নাম হল বুঝলাম না।

দেখলাম, একটা অল্পবয়সী চিতা, একটা হগ-ডিয়ার, একটা বার্কিং-ডিয়ার (কোটরা) এবং একটা ক্লাউডেড লেপার্ড আছে। ক্লাউডেড লেপার্ডটিকে দেখে

কষ্ট হল। এদের বাস ঠান্ডা আবহাওয়ায়। অথচ এখানে তার খাঁচার মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। মাথার উপরের পাতার আস্তরণ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে রোদের তাপও কিছু কম নয়। তা ছাড়া, যে খাঁচাটিতে তাকে রাখা হয়েছে, সেটি এতোই ছোট যে, সে বেচারি নড়াচড়াই করতে পারছে না। অত্যন্ত নোংরাও হয়ে ছিল সেই খাঁচা। দেখে, কষ্ট হল। শুনলাম, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে কখন এবং কোথায় সে ব্যাপারে উপরওয়ালাদের কাছ থেকে এখনও কোনও স্পষ্ট নির্দেশ আসেনি। কবে আসবে, জানাও নেই কারও। তবে যত শিগগির আসে, ততই মঙ্গল। প্রাণীটি বেঁচে যাবে! তাকে কিছুদিন আগেই ধরা হয়েছিল—। জঙ্গলের গ্রামের এক বুড়িকে নাকি কষে থাপ্পড় কষিয়েছিল। জানি না, সেই বুড়ি কষতে-দেওয়া অঙ্ক পারেনি, না অন্য কোনও অপরাধে দোষী ছিল।

ভটকাই বলল, দ্যাখ দ্যাখ ল্যাজটা কী লম্বা। নিজের শরীরের দৈর্ঘ্যের প্রায় দুগুণ।

ওদের লেজ অমন লম্বাই হয়। তবে সবচেয়ে লম্বা লেজ হয় স্নো-লেপার্ডের।

আমি বললাম, বিজুর মতন।

এমন সময়ে উল্টোদিক থেকে এক লম্বামতন ভদ্রলোক এসে ঋজুদার নাম করে বললেন, চলুন 'ইনফরমেশান সেন্টার'-এ নিয়ে যেতে এলাম আপনাকে।

আপনার নাম?

আমার নাম প্রদীপ ভট্টাচার্য। আমি রাজাভাতখাওয়ার বীট-অফিসার।

নমস্কার।

বলল, ঋজুদা। রেঞ্জার সাহেব কোথায়?

তিনি ব্যস্ত আছেন। কনসার্ভেটর পালিত সাহেব এসেছেন তো। তাঁর সঙ্গে থাকা, তাঁর খাওয়া-দাওয়া সবকিছুই তো দেখাশোনা তাঁরই করতে হয়।

ইনফরমেশান সেন্টারে পৌঁছবার আগেই সম্ভবত আমার আর ভটকাই-এর লাগাতার প্রশ্নবাণে তিতিবিরক্ত তো বটেই কিঞ্চিৎ ভীতও হয়ে (এটা কী গাছ? ওটা কী ফুল? এটা কী লতা? সেটা কী অর্কিড? ওটা কী পাখি?) ভটচায্যি মশায় অন্য একজনকে ডেকে আমাদের দায়িত্ব তাঁর উপরে দিয়ে বললেন, আমার একটু যেতে হবে। ইলেকট্রিক-এর পোল মেরামতি হচ্ছে তো।

বলেই, পালালেন।

ঋজুদা পাইপটা মুখ থেকে বের করে হেসে বলল, কী বিপদেই যে তোরা ফেলেছিলি ভদ্রলোককে! অনেক মানুষের কাছেই গাছের নাম, গাছই! পাখির নাম পাখিই। নদীর নাম নদী। এইরকম উত্তরেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত তোদের। তার চেয়ে বেশি জানতে চাওয়া সবসময়েই অপরাধের।

রাজাভাতখাওয়া টাইগার প্রজেক্ট-এর ইনফরমেশান সেন্টারটি সত্যিই

চমৎকার। এটি এস. এস. বিস্ত সাহেবই করে গেছেন। অভিনন্দন তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। এই এলাকার নানা পাখি, জানোয়ার, ফুল এবং অর্কিড ইত্যাদির কিছু কিছু নিদর্শন রাখা আছে। অডিও-ভিজুয়াল ডিসপ্লের বন্দোবস্তও। মালায়ান জায়ান্ট স্কুইরেল, ওড়িশার লবঙ্গীর জঙ্গলের স্থানীয় মানুষেরা যাদের বলতেন 'নেপালি মুসা' অর্থাৎ নেপালি ইঁদুর। পায়েড হর্নবিল, অর্থাৎ আমাদের দেশের ধনেশ পাখি। ওড়িশার জঙ্গলে এদেরই আবার বলে বড়কি (গ্রেটার) ধনেশ আর ছোটকি (লেসার) ধনেশ। আরও নাম আছে। কুচিলা খাঁই ও ভালিয়া খাঁই। এত খাই খাই ওদের বেশি খাঁই-এর জন্যে কিন্তু আদৌ নয়। বড়কি ধনেশ "কুচিলা" গাছে আর ছোটকি ধনেশ "ভালিয়া" গাছে বসে সেই সব গাছের ফল খায় বলেই ওদের এরকম নামকরণ হয়েছে। ইন্ডিয়ান বাইসন বা গাউরও আছে। ময়ূর, ময়ূরী, পরিযায়ী কালো সারস, নানারকম সাপ, পাইথন, মোলারাস এবং রেটিকুলেট পাইথন, হগ-ডিয়ার, চাইনিজ প্যাঙ্গোলিন, হাতি, লেপার্ড, ক্লাউডেড লেপার্ড ইত্যাদি।

যিনি সেন্টারের চার্জ-এ ছিলেন তিনি বললেন, হাতির কথা না বলাই ভাল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দলে হাতি দেখা যায় এখানে। এই তো কলকাতা থেকে সেদিন মস্ত দল নিয়ে এসেছিলেন ওয়াইল্ডলাইফ-এর কনসার্ভেটর অতনু রাহা, চিফ গেম ওয়ার্ডেন সুবিমল রায় এবং আলিপুরদুয়ার থেকে বনবিভাগের কয়েকজন কর্মী ক'দিন আগেই। ওঁরা একটি বড় হাতিকে ঘুমপাড়ানি ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গলায় রেডিয়ো কলার লাগিয়ে দিয়ে গেছেন। ওই হাতির গলার বিপ-বিপ-বিপ আওয়াজ শুনেই পুরো দলের রাহান-সাহান জানা যাবে এবার থেকে।

এ দলে কতগুলো হাতি ছিল?

শুনেছি, আশিটা।

ভটকাই বলল, এই ঘুম-পাড়ানি ওষুধটা কী ব্যাপার বলো তো ঋজুদা? ঘুম পাড়ানো হল তা নয় ঠিকই আছে কিন্তু ঘুমটা ভাঙায় কী করে?

ঋজুদা বলল, সে অনেক গোলমেলে ব্যাপারস্যাপার। তবে তোদের অল্পকথাতে বলছি, শোন।

তারপর ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, রুদ্র, তুই তো আমার সঙ্গে আফ্রিকাতে গেছিলি, 'রুআহা' আর 'গুগুনোগুম্বারের দেশে'তে। তখন তো আফ্রিকান আদিবাসী ওয়াম্ডারাবো চোরাশিকারিদের কথা জেনেইছিলি। তারা যেমন Blow Pipe দিয়ে বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ে হাতির মতন বড় জানোয়ারকেও শিকার করে, তেমনই আর কী। তবে ওরা মারে। এঁরা ঘুম পাড়ান এই তফাত। ঘুমপাড়ানি ওষুধের ডার্ট BLOW GUN দিয়েও ছোঁড়া হয় কাছাকাছি থেকে। ধর, চিড়িয়াখানার কোনও অসুস্থ জানোয়ারকে চিকিৎসা করার জন্যে বা অন্য চিড়িয়াখানায় চালান দেওয়ার জন্যে তাদের ঘুম পাড়ানোর

প্রয়োজন হয় অনেকই সময়। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে BLOW GUN-এ ভাল কাজ হয় না। কারণ দূর থেকে ছুঁড়তে হয়। সেখানে Blow Rifle দিয়ে ডার্ট ছুঁড়ে ঘুম পাড়ানো হয়। রাইফেলের রেঞ্জ তো অনেকই বেশি গান-এর চেয়ে। তা ছাড়া, ব্যারেলের উপরে 'রিয়ার সাইট' থাকাতে তা ঠিক মতন বেশি বা কম উঠিয়ে নিয়ে অ্যাডজাস্ট করে বেশ দূর থেকেও ছোঁড়া যায় সেই ডার্ট।

কোথায় মারে ? মানে শরীরের কোন অংশে ? রাইফেল বা শট-গান দিয়ে শিকার করতে হলে আমরা জানোয়ারের যে-সব ভাইটাল জায়গায় মারতে চাই, সেইসব জায়গাতেই কি ?

আরে না, না। সেখানে নয়। রাইফেল-এ বন্দুকের মার তো জানোয়ারকে একেবারে মেরে ফেলারই জন্য। এবং তাও যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এবং যথাসম্ভব কম কষ্ট দিয়ে। ভাল শিকারি মাত্ররই তাই করণীয়।

হঠাৎই ভটকাই গেয়ে উঠল—

"তোমায় গান শোনাব।
ও মোর ঘুমপাড়ানিয়া
    তোমায় গান শোনাব
ও মোর ঘুমভাঙানিয়া
    তোমায় গান শোনাব।"

ভাগ্যিস সেন্টারে তখন আর কেউই ছিলেন না আমরা ছাড়া। ইন-চার্জ ভদ্রলোক অবশ্য ওই ভটকাই-এর আচমকা কায়দায় ছোঁড়া বোমার মতন গান শুনে হেসে ফেললেন জোরে।

আমি ভটকাই-এর এহেন কদাকার চ্যাংড়ামিতে অপরিচিতের সামনে লজ্জা পেয়ে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঋজুদাও পিছু পিছু এল।

ঋজুদা কিছু লিখল Visitors Book-এ বেরিয়ে আসার আগে।

বাইরে এসে বললাম, আচ্ছা ঋজুদা, ঘুম তো পাড়ান এঁরা কিন্তু জাগান কেমন করে ? নিজের থেকেই জেগে যায় কি ঘুমন্ত জানোয়ার ?

তা হয়তো জাগে কিন্তু ওই অবস্থাতে তাদের ফেলে রেখে গেলে নানারকম ক্ষতি হতে পারে। তাই প্রায় সবসময়েই কাজ হয়ে গেলে অন্য ইনজেকশান দিয়ে ওষুধের ঘোর ভাঙানো হয়।

শরীরের কোথায় মারতে হয় ডার্ট গান দিয়ে বললে না তো ?

নাছোড়বান্দা ভটকাই বলল।

ও হ্যাঁ। সাধারণত মারে সামনের দু পা যেখানে শরীর থেকে বেরিয়েছে সেইখানে, মানে গলা, ঘাড়, হার্ট এবং লাংস-এর নীচে। নয়তো মারে, পেছনের দু পা যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে শরীরে, ঠিক সেইখানে। মানে যে জায়গাকে ইংরেজিতে আমরা বলি 'Rump'। মোদ্দা কথা, মাংসল জায়গাতে মারে।

কী ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ায় ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম। আর এইসব বন্দুক রাইফেল পাওয়াই বা যায় কোথায় ?

এই সব বিশেষ বন্দুক, রাইফেল বানায় জার্মানি, স্টেটস এবং সুইটজারল্যান্ড। আরও হয়তো অনেক দেশই বানায়। আমি জানি না। সেইসব দেশ থেকেই ইমপোর্ট করতে হয়। আর ওষুধ তো অনেকই রকম আছে। ওষুধও স্পেশ্যাল ইমপোর্ট লাইসেন্স-এর জোরে আমদানি করতে হয়।

কী নাম ওষুধের ?

ওষুধটা হচ্ছে জাইলাজাইন হাইড্রোক্লোরাইড কিন্তু রমপান (Rompun) ট্রেড নেম-এ বাজারে ছাড়ে প্রস্তুতকারীরা। Bayer Company। পাউডারের মতন, জলে গুলে নিয়ে ডার্ট-এ ভরতে হয়। "ইম্মোবিইলন" নামেরও অন্য ওষুধ আছে। Immobile, মানে চলচ্ছক্তিহীন করে, তাই এই নাম।

এখন Immbobilon বা Rompun এই দুই ঘুমপাড়ানো ওষুধ কোথায় পাব তা কি বলবে ?

ভটকাই সিরিয়াস মুখ করে বলল।

কেন ?

আমি একটা জানোয়ারকে ইম্মোবাইল করব।

কী জানোয়ার ?

তার প্রজাতিতে মাত্র একটিই প্যায়দা করেছিলেন মিস্টার ব্রহ্মা।

নাম কী ?

রুদ্র রায়।

ঋজুদা জোরে হেসে উঠল।

আমি বালখিল্য ভটকাইকে উপেক্ষা করে বললাম, আচ্ছা! এই যে ঘুম-পাড়ানো—ঘুম-ভাঙানো হয় এসব কীসের জন্যে ?

বাঃ। বললামই তো। কত কিছুর জন্যে।

যেমন ?

চিড়িয়াখানাতে কত জানোয়ার অসুস্থ হয়। তার মধ্যে বাঘ, সিংহ, চিতাও যেমন আছে আবার গণ্ডার, জলহস্তী, হাতি, জিরাফও থাকে। ধর, গণ্ডারের কানে ঘা হয়েছে বা জিরাফের ঠ্যাং ভেঙে গেছে, তা তাদের ঘুম না পাড়ালে ভেটারিনারি সার্জন অপারেশনটা করবেন কী করে ? টুঁ-এ এবং চাট-এ তো ডাক্তারের পেট ফেঁসে যাবে, নইলে মুণ্ডু গড়াবে ভুঁয়ে। তা ছাড়া, বন্য প্রাণীদের মধ্যেও যখন কোনও প্রাণী হঠাৎ বন ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসে বা মানুষ অথবা গবাদি পশুর ক্ষতি করে তখনও তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে, হয় খাঁচায় পোরা হয়, নয় চিড়িয়াখানাতে দিয়ে দেওয়া হয়। কখনও বা আবার বনেই ছেড়ে দেওয়া হয়। দেখিস না এইসব খবর-কাগজে ?

আমি কাগজ পড়ি না। সব গুলতাল ছাপে, পড়ে কে সময় নষ্ট করে!

আচ্ছা ঋজুদা, বিপজ্জনক জানোয়ারেরা কখনও চিকিৎসা করার বা কলার-পরানোর আগেই ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে না? তখন কী হয়?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঋজুদার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ভটকাই বলল, আবার কী হয়? অন্য কী হতে পারে? কেলো হয়! গ্রেট কেলো।

এমন ঘটনা ঘটে বইকী! আবার এও ঘটে যে, ওষুধের ডোজ বেশি হয়ে যাওয়াতে বা কোনও বন্য প্রাণীর হৃদয় দুর্বল থাকাতে বা হঠাৎ "শক"-এই তারা মারা যায়। ঘুম আর ভাঙেই না।

কই? এমন খবর তো পড়িনি কাগজে।

কাগজে যা ছাপা হয় বা পড়িস তোরা তা আসল খবরের এক সামান্য ভাগ মাত্র। প্রত্যেক কাগজই এক-একটি আইসবার্গ, হিমবাহ। এক-অষ্টমাংশ দেখা যায় আর বাকিটা অগোচরে থাকে।

কিন্তু এও তো এক ধরনের খুনই হল। শিকারিরা মারলেও মরল আর এঁরা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে মারলেও মরল! মরবে?

এঁরা তো আর ইচ্ছা করে মারেন না! অনেক সময় ভাল করতে গিয়েও খারাপ হয়ে যায়। তার আর কী করা যাবে? ইটস ওল ইন দ্যা গেম।

যারা মরে, তারা কি জানতে পায় যে, তাদের ভালর জন্যেই তারা মরল? ইটস্ অল ইন দ্যা গেম?

ভটকাই গম্ভীর মুখে বলল।

ঋজুদা হেসে উঠল ভটকাই-এর কথা শুনে। বলল, ফাজিল।

ভটকাই বলল, দ্যাখ রুদ্র, তোকে যখন আমি ঘুম পাড়াব তখন তুই মরে গেলেও যেন ভাবিস না যে, তোর খারাপের জন্যেই মারলাম তোকে। সবসময়ই আমি তোর ভালই চাই।

ওরে, সাড়ে বারোটা যে বেজে গেল। রোদ চড়া হয়ে যাবে। চল এবারে "Whispering Trail'-এ একটু হেঁটে, বাংলোতে ফিরে যাই।

ঋজুদা বলল।

ইনফরমেশান সেন্টারের হাতা থেকে বেরোতে বেরোতে ভটকাই বলল, আবার উল্টোদিকে হাঁটাবে ঋজুদা? এই রোদে? চাঁদি যে ফেটে যাবে। এমনিতেই তো বহুদূর হাঁটতে হবে শুধু গাছ দেখতে দেখতে এমন 'গেছো দাদার' মতন হাঁটতে কি ভাল লাগে?

চল চল। এত সব পদ রান্না হল, ক্ষিদে না হলে সব নষ্ট হবে যে। তা ছাড়া সব জায়গাতেই "কাঙ্গপোকপির" ইবোচবা সিং আর 'নিনিকুমারীর বাঘ' থাকতে হবে নাকি! আরে দ্যাখ দ্যাখ...।

ঋজুদা বলল।

আমরা দেখলাম ইনফরমেশান সেন্টারের একদিকের দেওয়ালে দারুণ একটি রঙিন ছবি। রাজাভাতখাওয়ার। দুই রাজা মহা সমারোহে ভাত খাচ্ছেন।

ভারী কালারফুল কিন্তু। তাই না?

ঋজুদা বলল।

সত্যি!

সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন, কলকাতা থেকে আর্টিস্ট আনিয়ে আঁকানো হয়েছে।

নাম জানেন কি?

তা বলতে পারব না। আর্টিস্ট।

বাইরে বেরিয়ে Whispering Trail-এ একটু ঢুকতেই দু পাশের জঙ্গল যেন গলা টিপে ধরল। সত্যি!

আক্ষরিকার্থে যাকে বলে Suffocating! এরকম জঙ্গল আমার ভাল লাগে না। সরু পায়ে-চলা পথ দেড় কিমি. মতন চলে গেছে গহন বনের মধ্যে দিয়ে। দু পাশেই আন্ডারগ্রোথ, মানে, গাছেদের পায়ের কাছে ঝোপ-ঝাড় লতা-পাতা এই মার্চ মাসেও এত নিশ্ছিদ্র যে, রীতিমতো একধরনের ভয়মিশ্রিত অসহায়তার বোধ জন্মায় মনে।

আমাদের ভয় একরকমের, আর সঙ্গী ভদ্রলোকের, মানে, ভটচায্যিবাবু যাঁকে আমাদের সঙ্গে দিয়েছিলেন, তাঁর ভয় অন্যরকমের। সেকেন্ডে সেকেন্ডে এটা কী গাছ? ওটা কী লতা? এটা কী ঝাড়? সেটা কী ঝোপ? শুনতে শুনতে এবং প্রায় কোনওটারই উত্তর না দিতে পেরে উনি দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আমারে এবারে বাড়ি যেতে হবে স্যার। ছেলেটার খুব জ্বর। ওষুধ আনতে হবে।

ঋজুদা বলল, হ্যাঁ, আপনি যান। এতক্ষণ বলেননি কেন? আশ্চর্য মানুষ তো আপনি। আমরাও ফিরছি। রোদও খুব চড়া হয়ে গেছে। তবে এখানে আমরা আবারও আসব। Whispering Trail-এ শেষ অবধি যাব। তখন খবর দেব আপনাকে, মানে ভটচায্যিবাবুর মাধ্যমে।

ভদ্রলোকের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আপাতত। বললেন, আমার চেয়ে ভাল অনেকেই আছেন, যাঁরা সব গাছ-মাছ চেনেন। তেমনই কারোকে পাঠিয়ে দেব তখন।

ঠিক আছে।

উনি প্রায় দৌড়েই আমাদের মায়া কাটালেন।

ঋজুদা বলল, এই ভদ্রলোক কী কাজ করেন জানি না। বন-বিভাগের কোনও কর্মীর বেড়াতে-আসা শালা বা ভগ্নিপতিও হতে পারেন। কিন্তু কনসার্ভেটরেরা সব গাছ ঝোপ লতা পাতা না চিনলেও না চিনতে পারেন, তাঁদের অনেকটা সময় ঘরে বসে কাজ করতে হয় কিন্তু রেঞ্জাররা, ফরেস্ট-গার্ডেরা বা বীট-অফিসারেরা, যাঁদের কাজই হল জঙ্গলের গভীরে সারাবছর থাকা, তাঁরা কেন সব গাছ ঝোপ ঝাড় পাখি প্রজাপতি চিনবেন না?

আসলে বুঝলি না, ভালবাসাটা অনেকেরই নেই।

আর্টিস্টও চেনা উচিত।

ভটকাই বলল।

মানে ?

রাজাদের ভাত খাওয়ার ছবির আর্টিস্ট।

আমি বললাম, এমার্সনের সেই কবিতাটার কথা মনে পড়ে ?

কোনটা ?

"Bold as the engineer
Who fells the wood
Love not the flower they pluck
Know it not,
And all their Botany
Is Latin names !"

বাঃ !

ঋজুদা বলল।

ভটকাই বলল, তোর স্মৃতিশক্তি খুবই ভাল। কবে ঋজুদার মুখে একবার শুনেছিলি, হুবহু মনে রেখেছিস। নাঃ, তুই ছেলেটার অনেকই গুণ। শুধু আমার পেছনে সবসময় লাগিস, এই যা দোষ।

তারপরই বলল, থাকগে ! ভদ্রলোক পালিয়ে বাঁচার আগে দুটো নতুন গাছের নাম তো জানলাম। চিনলামও।

কী কী ?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

লালি আর দুধে লালি।

বাঃ ! চিনিয়ে দে রুদ্রকে।

ভটকাই বলল, আমাদের পাড়ার ভুট্টাদার ছোট বোনের নাম লালি। ভুরু-টুরু চেঁচে, আইব্রো পেনসিল ঘষে সে নিজেকে ইন্দ্রাণী হালদার ভাবছে আজকাল। কিন্তু গায়ের রং কেলে-হাঁড়ির মতন আর মুখটাও হাঁড়িচাঁচার মতন। ফিরে গিয়েই ওকে একটা আয়না প্রেজেন্ট করব আর ওর নাম দেব দুধে লালি।

ঋজুদা বলল, ভটকাই, তুই মহা ফক্কড় হয়েছিস।

ভটকাই বলল, না হলে তোমাদের এনটারটেইন করত কে এখানে ? গুণ্ডা হাতি নেই, মানুষ-খেকো বাঘ নেই, খুনি নেই কোনও, শুধু গাছ আর পোকা আর ছারপোকা। বোরড হয়ে যেতে যে একেবারে !

আমি ভটকাইকে বললাম, ছারপোকার বৈজ্ঞানিক নাম জানিস ?

নাঃ।

বিরক্ত হয়ে বলল, ভটকাই।

আমাদের সর্বজ্ঞ ভটকাই উত্তর হিসেবে 'না'কে বড়ই অপছন্দ করে। 'না' বলা মানেই যে, হেরে যাওয়া। হারতে একদমই ভালবাসে না ভটকাই।

একদিন ঋজুদা বলেছিল আমাকে, এইটাই মস্ত গুণ ভটকাই-এর। যারা হারতে ভালবাসে না, দেখা যায়, জীবনে তারাই শেষ পর্যন্ত জেতে।

ভটকাই বলল, তুই জানিস, তো তুইই বল। আমি ছারপোকাবিশারদ নই।

নাছোড়বান্দা ভটকাই বলল।

হেটেরোপটেরা।

কী বললি ?

হেটেরোপটেরা। অর্থাৎ ছারপোকার বংশ। আমি বললাম।

ছারপোকার আবার জ্ঞাতি-গুষ্ঠিও আছে নাকি ? আমি তো জানতাম সে একাই একশো !

আছে বইকী ! এই বক্সা বাঘ প্রকল্পের এলাকাতেই আছে তেষট্টি রকমের।

উরিঃ ফাদার !

তবে নাম না জানলেও তোর ক্ষতি নেই। পশ্চাৎদেশ, নাম জানলেও যেমন জ্বলবে, নাম না-জানলেও তেমনই জ্বলবে।

কী জ্বালাতন ! ছারপোকারও এতো জ্ঞাতি গুনল কারা ? কোন অকর্মারা ?

সে সব সাহেবরাই গুনে-গেঁথে গেছে। যে-ইংরেজদের রাজত্বে একসময়ে সূর্য কখনও অস্ত যেত না, সেই ইংরেজদের অনেকই গুণ ছিল রে !

ঋজুদা বলল।

॥ ৫ ॥

বিকেলেও আমরা চা খাওয়ার পরে হাঁটতে বেরিয়ে ছিলাম। নর্বু বলল, জঙ্গলের ভিতরে যাবেন না।

কেন ?

হাতি আছে। আর ছিনতাই পার্টিও আছে।

হাতিরা ছিনতাই পার্টিদের কিছু বলে না ?

দেখি না তো বলতে।

হাসি পেল আমার নর্বুর কথা শুনে। বেঁটেখাটো, পিটপিটে চোখের নর্বু তামাং ভারী ইন্টারেস্টিং মানুষ।

ভটকাই বলল, হাতিরা আমাদের পোষা।

তাই ?

নর্বুর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যেন ও বলছে যে, ব্যাটারা হাতি নাতি খেয়ে মরলে খুবই খুশি হই।

জঙ্গলের মধ্যে বেড়িয়ে শেষ বিকেলে ফিরে এসে সবাই ভাল চান-টান করে আমরা পরদিন জয়ন্তী জায়গাটা কেমন হবে সেই আলোচনাতে উত্তেজনায় মশগুল হলাম। জয়ন্তীর নাম শুনেছি সেই কবে থেকে! কী সুন্দর জায়গা নাকি! এতদিনে সত্যি সত্যিই যাওয়া হবে।

পায়ে পায়ে সঙ্গে চল। সঙ্গে থেকে যাব।

ঋজুদা বলল, কাল সকাল সকাল জয়ন্তীর পথে বেরিয়ে পড়া যাবে।

কতক্ষণ লাগবে যেতে?

জানি না। যতক্ষণ খুশি লাগুক। আমাদের হাতে অনেক সময়।

যা বলেছ! সময় দিয়ে গোলা পাকিয়ে ঢিল মারা যায়।

ভটকাই বলল।

যত উদ্ভট উদ্ভট আইডিয়া তোর মাথাতেই আসে।

এমন সময় ওয়্যারলেস টেলিফোনে খবর এল যে, জয়ন্তীর রেঞ্জার বিমান বিশ্বাস জিপ পাঠাবেন দুপুরের খাওয়ার পরে আগামীকাল আমাদের নিয়ে যেতে। সকালে নয়।

ভটকাই বলল, যাক। কাল দুপুরেও তা হলে পাছ-পাঁঠা খাওয়া যাবে। যাই বল আর তাই বল এখানের এঁচোড়গুলোর স্বাদই আলাদা। তা হলে কাল ব্রেকফাস্টের পরে হুইসপারিং-ট্রেইলের শেষ অবধি যাওয়া যাবে।

কালকের কথা কালকে। রাতে কী মেনু করে এসেছিস রে ভটকাই?

আমি বললাম।

হ্যাঁ। তুইই তো আমাদের কোয়ার্টার-মাস্টার!

ঋজুদাও বলল।

রাতে বিশেষ কিছু বলিনি। নর্বুকে বলেছি এই সাহেবকে, মানে ঋজুদাকে ভাল করে খাওয়াও। সাহেব সারা পৃথিবীর বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। আর আরও যত্ন করে খাওয়াও ওই রুদদরবাবুকে, কারণ, তাঁর হাতে কলম এবং দারুণই নিন্দুক সে। যত্ন-আত্তির একটু খামতি হয়েছে তো সঙ্গে সঙ্গে নাম উঠে যাবে খাতায়। পরে কেঁদে কূল পাবে না।

আহা, মেনুটা কী বল না?

ঋজুদা বিরক্ত হয়ে বলল।

সিম্পল। ভটকাই বলল, এই জঙ্গলে বিশেষ কিছু তো পাওয়া যায় না। তাই ও মুগ-মুসুরি মেশানো খিচুড়ি করবে, মধ্যে জম্পেশ করে গাওয়া ঘি ঢেলে, কড়কড়ে করে আলু ভাজা, মুরগি ভাজা, লেড়ো বিস্কুটের ক্র্যাম দিয়ে, পাথালি করে বেগুন ভাজা, মানে, যজ্ঞিবাড়িতে আগে যেমন হত আর কী। এঁচড়ের চপ, টোম্যাটো-প্যাঁজ-কাঁচালঙ্কা দেওয়া স্যালাড আর শুকনো লঙ্কা ভাজা। এই। সিম্পল-এর উপরেই করতে বললাম আর কী।

ঋজুদা বলল, পশ্চিমবঙ্গের বন-বিভাগের নেমন্তন্ন এই প্রথম এবং এই

শেষ। আর নেমন্তন্ন করবেন না ওঁরা। জঙ্গলের কোনও হাতিও বোধহয় এত খায় না!

ভটকাই বলল, খাও রেলিশ করে তোমরাই আর আমি খাই তোমাদের গালাগালি।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা বারান্দাতে সব আলো নিভিয়ে দিয়ে চাঁদের আলো উপভোগ করছি। বিজলি আছে এখানে। বিজলি আলো থাকলে আলো-পাখার আরাম পাওয়া যায় অবশ্য কিন্তু জঙ্গলকে জঙ্গল বলে মনে হয় না। আজ সপ্তমী বা অষ্টমী হবে। শুক্লপক্ষ। চাঁদটা, মেঘ-মেঘ ভুটান পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। আকাশ মাঝে মাঝেই মেঘলা হয়ে যাচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের কাল রাতের সেই পাগলা হাওয়াটা আমাদের পিছু নিয়ে এখানেও এসে দাপাদাপি করছে। দিনে বেশ গরমই ছিল। রাতে বাইরে বসলে ভারী প্লেজেন্ট। কী সাবান দিয়ে চান করেছে জানি না ঋজুদা, গা দিয়ে ভুরভুর করে চন্দনের গন্ধ বেরুচ্ছে।

ভটকাই বলল, হাতিরা তোমার গায়ের গন্ধেই চলে আসবে কিন্তু বাংলোর কাছে।

আমি বললাম, ওই গন্ধের জন্যেই হয়তো আসবে না।

কেন?

ভাবতেও পারে তো চন্দনবনের চোরা শিকারি ভীরাপ্পানের কাজিন!

আমার বাক্যটিও শেষ হয়েছে আর সঙ্গে পটকার আওয়াজ, ক্যানেস্তারা বাজানোর আওয়াজ, কাঁসর-ঘণ্টা ও শাঁখ বাজানোর আওয়াজে রেললাইনের ওদিকটাতে, স্টেশানের কাছকাছি একেবারে সরগরম হয়ে উঠল। মশালে আগুন জ্বেলে লোকজন চিৎকার করতে করতে ছুটে বেড়াতে লাগল ওইদিকে। আমরা উঠে রেলিং-এ হাত রেখে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারতর চলমান কোনও স্তূপ দেখা যায় কি-না তা দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। ভটকাই দৌড়ে তার ফ্ল্যাশ-লাগানো ক্যামেরাটা নিয়ে এল। যদিও ফ্ল্যাশের রেঞ্জ মাত্র পনেরো ফিট। কিন্তু হাতি যে যায়নি, যাচ্ছে না, তা বোঝা গেল।

এমন সময় দেখলাম নর্বু তামাং পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে বাংলোর দিকে আসছে।

"চিট্টি আয়ে না।
মেনো মায়ালুকো মলাই চিট্টি আয়ে না।
চিট্টি আয়ে না।"

গানের মানে না বুঝলেও ভারী চমৎকার লাগছিল শুনতে নর্বুর গান ওই পরিবেশে। বাংলোর পাশেই একটা ছোট্ট সরু নালা। তার ওপারে একটি দোতলা বাংলোতে অনেক নেপালিরা রয়েছেন সংসার নিয়ে। সেদিক থেকেই আসছিল সে।

ভটকাই উত্তেজিত হয়ে নর্বুর ভালর জন্যেই চেঁচাল, নর্বু! নর্বু! বি কেয়ারফুল। এলিফ্যান্ট! হাতি!

নর্বু বলল, গণেশটা। ওইটা প্রায়ই আসে তো। কলা খাইতে।

কলা খেতে? হাতি? হাতি কি হনুমান?

ভটকাই না-দমে বলল।

কখনও হাতিও খায়। কলাগাছও খায় ডালবহিস্যা।

নর্বু বলল।

থোড় খায়? বেড়ে তো! রাঁধে কী দিয়ে? তাতে নারকোলও কুরিয়ে দেয়? আহা!

কিছুক্ষণ পর শোরগোল ধীরে ধীরে কমে এল। মশালও নিভে এল।

নর্বু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসে বলল, এই জন্যেই আপনাদের জঙ্গলে যাইতে মানা করছিলাম। রাজাভাতখাওয়ার চারধারেই হাতি। দিন রাত বলিয়া কিছু নাই। বাইরাইলেই হইল। ভালবাসিয়া একখান পা তুইল্যা দিলেই তো শ্যাষ। অথবা শুঁড় দিয়া উঠাইয়া একখান আছাড়। মাইনষের জানের থিক্যা তো ইঁদুরের জানও শক্ত।

পরদিন বেড-টি খাওয়ার পরই যেদিকে কাল রাতে হাতি এসেছিল সেই দিকেই হেঁটে রওয়ানা দিলাম। কাক-উড়ান-এ যেতে পারলে সামান্যই দূরত্ব কিন্তু এঁকে বেঁকে হেঁটে গেলে আধ মাইলটাক পড়ে। যেখানে পৌঁছে দেখা গেল নর্বুর কথাই ঠিক। হাতিটা একটা কুঁড়েঘরকে প্রদক্ষিণ করেছে অতি সামান্য জায়গার মধ্যে দিয়ে ওই বিরাট শরীর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর ছোট্ট একখানি চষা ক্ষেতের উপরে দাঁড়িয়ে একটা কলাগাছ উপড়ে নিয়ে ফিরে গেছে পেছনের জঙ্গলে রেলের হাসপাতালের একেবারে গা ঘেঁষে। সেই কুঁড়েতে তখন একজন বুড়ি আর একটি বছর বারো-তেরোর মেয়ে ছিল। মেয়েটি আমাদের চেয়ে অনেকই সাহসী। গত রাতের অতিথির কথা বলছিল নির্বিকারভাবে। চষা ক্ষেতে তার পায়ের পাতার গোলাকার ছাপ পড়েছে।

ভটকাই ফটাফট ছবি তুলল। বলল, আমাদের বাগবাজারের পাড়াতে ফিরে গেলে পরেশ, নান্টা, অভিষেক, দীপু বিশ্বাসই করবে না যে হাতির সঙ্গে এনকাউন্টার করে এলাম।

আমি বললাম, ওরা তোকে জানে ভাল করেই। তোর এনকাউন্টার যে কী প্রকারের হতে পারে সে সম্বন্ধে...

নিনিকুমারীর বাঘ-এর চামড়াটার বোঁটকা গন্ধ কি ওরা নিজ নিজ নাসিকাতে শোঁকেনি? ভটকাই যে কী জিনিস তা ওরা জানে। তুই আমাকে চেপে রাখার চেষ্টা করলে কী হবে!

হাতিটার পেছনের একটা পায়ে চোট আছে কোনওরকম।

পায়ের দাগ লক্ষ করে বলল ঋজুদা।

কিন্তু হাতিটা গণেশ কি না তা কী করে জানা যাবে ?

আমি বললাম।

পায়ের দাগ দেখে শুধু গণেশ কেন, কার্তিকও বোঝা যাবে না। যারা হাতিটাকে কাছ থেকে কখনও দেখেছে তারাই নিশ্চয় দেখেছে যে সেটা গণেশ।

গণেশ কাকে বলে ?

ভটকাই শুধোল।

যে পুরুষ-হাতির একটা দাঁত থাকে তাকে বলে গণেশ। আর মাকনা হল, সেই হাতি, যে পুরুষ-হাতির দাঁতই থাকে না, থাকে না মানে, বাইরে থেকে দেখা যায় না।

কী সব অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার !

হাতির দলের যে নেতা তার দাঁত নিশ্চয়ই বিরাট হয়।

হাতির দলের নেতা সাধারণত পুরুষ-হাতি হয়ই না। মেয়ে-হাতি হয়। তবে বিরাট হাতি।

মেয়ে-হাতিদের দাঁত থাকে ?

না। মানে বাইরে থেকে দেখা যায় না। তবে, আফ্রিকার হাতিদের মধ্যে মেয়েদেরও দাঁত দেখা যায়।

অসভ্য মেয়ে।

ভটকাই বলল।

॥ ৬ ॥

শিলিগুড়ি থেকে সিলিভিকালচারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডি. এফ. ও. ভগবান দাস সাহেব এসেছিলেন পালিত সাহেবের সঙ্গে। উনিই বলে গেছিলেন আমাদের বাংলোতে এসে যে, জয়ন্তীতে যাওয়ার সময়ে যেন বনের মধ্যের কাঁচাপথ দিয়ে 'ওয়াচ টাওয়ার' হয়ে যাই।

ভটকাই বলল, আচ্ছা ঋজুদা, কনসার্ভেটর পালিত সাহেব তো তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন না ?

কেন আসবেন ? আমি তো ওঁর উপরওয়ালা নই। সরকারি আমলাও নই। তাছাড়া আমি কে এমন মানুষ যে আমার সঙ্গে সকলের এসে আলাপ করতেই হবে ? আমি বন-বিভাগের উপদেষ্টা-টেষ্টা হলেও না হয় কথা ছিল। বন-জঙ্গলকে ভালবাসি, এটুকু ছাড়া অন্য কোনও পরিচয়ই তো আমার নেই ! যার পদাধিকার নেই তাকে এদেশে কেই-বা চেনে বা মান্য করে, বল ? তা ছাড়া, উনি এসেছেন নিজেরই কাজে। কাজ নিয়েই আছেন। আর ওঁদের কাজ তো ঘড়ি-ধরাও নয়। খাওয়া-দাওয়ারও ঠিক থাকে না কোনও। পরে কোনওদিন

আলাপ নিশ্চয়ই হবে, বনে অথবা কলকাতাতেই।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা যখন বেরোলাম তখন মেঘলা করেছিল আকাশ। রেললাইনটা পেরিয়ে স্টেশানের পাশ দিয়ে একটু গিয়েই ঘন বনের মধ্যের কাঁচাপথে ঢুকে পড়ল পথটা। দু পাশে হাজার হরজাই গাছ উপরে চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেছে। অধিকাংশ গাছই আমার অচেনা। ঋজুদাও দেখি মনোযোগ দিয়ে দেখছে দু পাশে। বলল, ওই দ্যাখ, ওই সবক'টা মহীরুহই শিরিষ। চাঁপ গাছ আর জারুল আছে। দ্যাখ, হালকা সবুজ নতুন পাতা এসেছে। মনে হচ্ছে সবে যেন বসন্ত এল।

ভটকাই বলল, ও মা! কী সুন্দর লাল ফুল ফুটেছে ওই মস্ত গাছটাতে! ওটা কী গাছ ঋজুদা?

গতকাল সকালে দেখালাম না তোকে ইনফরমেশান সেন্টারে যাওয়ার পথে! পারুল রে!

ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে গেছিলাম।

এই গাছগুলো কী গাছ? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড।

ড্রাইভারই বলে দিলেন ঋজুদা বলে দেবার আগেই, চাঁপ গাছ।

চাঁপা?

ঋজুদা বলল, চাঁপা না রে চাঁপ।

একী! কলকাতার মুসলমানী খাবার সাবির বা সিরাজের চাঁপ? মাটন বা চিকেন?

সেগুলো চাঁব। চাঁপ নয় রে দিগগজ। অনেক বাঙালিই অবশ্য বলেন চাঁপ।

তাই?

ভটকাই অবাক হল তার প্রিয় খাবারের নাম এতদিন ভুল জানত বলে।

ওগুলো কী ফুল বল তো? এই যে গাছগুলোতে, মানে, ঝাড়ে পর্যন্ত হয়েছে?

ঋজুদা আমাদের জিজ্ঞেস করল।

খুব চেনা। চেনা লাগছে কিন্তু চিনতে পারছি না।

আমি বললাম।

ভটকাইও বলল, সত্যিই খুব চেনা চেনা।

জানে না বললে ও যে আমার চেয়ে কম জানে এই কথাই প্রমাণিত হয়ে যাবে এই জন্যেই চেনে যে না, তা কবুল করল না।

ঋজুদা বলল, ঘেঁটু ফুল। এটা তো আর বিহার ওড়িশা কি মধ্যপ্রদেশ নয় রে, এই যে আমাদের বঙ্গভূমি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতে পড়িসনি ঘেঁটু ফুলের কথা? নামটা আনরোম্যান্টিক হলে কী হয়, বিভূতিভূষণের কলম, বাংলাসাহিত্যে অমর করে দিয়ে গেছে এই সাধারণ গ্রাম্য ফুলকেই।

আমি চুপ করে রইলাম।

ভাবছিলাম, আমি এই অধম রুদ্র রায়ও যে ঋজু বোসকে বাংলাসাহিত্যে অমর করে দিয়ে গেলাম এটা যেন কোনও ঘটনাই নয়!

মুখে বললাম, ঋজুদা, গাছগুলো চিনিয়ে দাও না।

আরে আমিই কি সব চিনি? ড্রাইভার ভাইকে বল, এঁরা রোজ এই পথে দিন রাত যাতায়াত করছেন, এঁরাই ভাল জানবেন। আমরা তো শহরের মানুষ, উড়ে-আসা চিড়িয়া।

তোমার নাম কী ভাই?

অভয়।

তবে আর চিন্তা কী? কোনও ভয়ই নেই আমাদের।

ড্রাইভার ভাই বললেন, না ছার। আমি ঋজুদার সব বইই পড়ছি। আপনে কত বনে বনে ঘোরেন। আমরা আর কতটুকু জানি! আপনে তো সবই জানেন।

ঋজুদা হেসে বলল, ওই আশীর্বাদটা কোরো না ভাই। অমন অভিশপ্ত যেন আমাকে কোনওদিনও হতে না হয়। তুমিও কি চাও আমিও আরেকজন সর্বজ্ঞ হই, আমিময় মুকুজ্যের মতন? সর্বজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা আমার সাধারণ বাবা আমাকে দেননি।

তিনি আবার কিনি? আমিময় মুকুজ্যে?

ভটকাই বলল।

আমি বললাম, আছেন, আছেন। তিনি এক চিজ! পরে তোকে বলব।

বাইসন! বাইসন!

বলে, চাপা গলাতে চেঁচিয়ে উঠলেন অভয়। চাপা গলাতেও যে চ্যাঁচানো যায়, সেই প্রথম জানলাম।

একটি দলে তারা পথ পেরোল ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। সঙ্গে একটি বাচ্চাও ছিল। সবসুদ্ধু আটটি। একটি আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শিং বাগিয়ে। যতক্ষণ না পুরো দলটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সকলকে নিরাপদে রাস্তা পার করিয়ে দিয়ে সকলের শেষে সেও গেল।

ওরা চলে গেলে, ভটকাই বলল, সাদা মোজা পরে রয়েছে যে হাঁটু অবধি!

হ্যাঁ। ভগবানই মোজা পরিয়ে পাঠিয়েছেন ওদের। দু পায়ে হাঁটু অবধি সাদা মোজা, কপালেও সাদা সিঁদুর লেপা। এও বিধাতারই কারসাজি।

ঋজুদা বলল।

এই মোষগুলো, এক একটা কত কেজি করে দুধ দেবে বলো তো ঋজুদা? উরিঃ ফাদার! 'মাদার ডেয়ারি' এদের ধরে নিয়ে যায় না কেন?

ঋজুদা হেসে উঠল।

তারপর বলল, এরা বুনো মোষও নয়, বাইসনও নয়।

বাইসন নয় ?

ড্রাইভার সাহেব একটু অবাক হয়ে বললেন।

নয়। বাইসন, উত্তর আমেরিকার প্রাণী। তারা অনেকেই ছোট হয় এদের চেয়ে। তাদের এমন সাদা পা এবং কপালও থাকে না। এদের দেখা, শুধুমাত্র ভারতেই মেলে। পুব ভারতের নানা জঙ্গলে, দক্ষিণ ভারতের নীলগিরিতে এদের দেখা যায়। মধ্যভারতে আছে। তবে কম। এদের নাম গাউর।

কী বানান ?

Gaur। এরাই হাতি গণ্ডারের পরেই সবচেয়ে বড় ভারতীয় তৃণভোজী প্রাণী। শম্বর, বারাশিঙা ইত্যাদিও বড় হয় বটে কিন্তু গাউরদের ধারে কাছে আসে না। তবে বুনো মোষও বড় হয়।

'টাঁড়বারো'।

ভটকাই বলল।

সেটা কী জন্তু হল ?

অভয় বললেন।

ভটকাই, ঋজুদা জবাব দেবার আগেই বলল, সেটা কোনও জন্তু নয়, বুনোমোষদের দেবতা। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসে আছে। 'আরণ্যক' কি পড়েছেন ?

না।

পড়বেন পড়বেন। আরণ্যকই পড়েননি আর আপনি অরণ্যচারী ! এ কী প্যারাডক্স !

শুধু অরণ্যচারীই কেন ? বাংলা যাঁরা পড়তে পারেন তেমন প্রত্যেক মানুষেরই 'আরণ্যক' পড়া উচিত। সে তো উপন্যাস নয়, বনবাণী।

তা ঠিক। আমি বললাম।

ওই দ্যাখ, চিক্‌রাসি, আর ওইদিকে ময়নার ভিড়।

ঋজুদা বলল।

ময়না ? গাছের নাম ? আমি তো জানতাম পাখিরই নাম।

হ্যাঁ রে।

ময়নাগুড়ি জায়গার নাম কি এই গাছেরই জন্যে ?

তা জানি না। তবে নট আনলাইকলি। এই ময়না গাছগুলোও দ্যাখ, শিমুলেরই মতন দুদিকে সমান্তরালে শাখা ছড়ায়। কাণ্ডর মূলেও শিমুলেরই মতন ভাগ ভাগ থাকে। তবে ময়নার গায়ে কিন্তু শিমুলের মতন কাঁটা থাকে না। খুব বড় বড় হয় এ গাছগুলো। থোকা থোকা ফুল ফোটে হালকা বেগুনি-রঙা, মার্চ-এপ্রিলে।

এটা কী গাছ ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ড্রাইভার ভাই বললেন, এটা লাটোর।

লাটোর ?

হ্যাঁ। এর শক্ত কাঠ দিয়ে ভাল তক্তা হয়।

আরে ! এটা কী গাছ ? চেনা চেনা লাগছে অথচ...

আমি আবারও বললাম।

পাঁচটি করে পাতা এক একটি থোকাতে ?

ভটকাই বিশদ করে বলল।

এটাই তো ছাতিম।

ও হ্যাঁ। শান্তিনিকেতনের পত্তন তো এই গাছের জন্যেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গ্রীষ্মে পালকি করে যেতে যেতে বীরভূমের সেই বিশ্বটাঁড় জায়গাতে ছাতিম গাছের ছায়াতে বিশ্রাম করবার জন্যে যখন থামেন, তখনই তো...

ভটকাই-ই বলল।

আঃ ! তুই বড্ড কথা বলিস ভটকাই। কত গাছ অজানা অচেনা চারদিকে, চিনে নে ভাল করে।

ঋজুদা বলল।

এখানে কিন্তু ছাতিম কয় না ছার। বন-বিভাগেও ছাতিম কয় না। এর নাম ছইতান বা ছাতিয়ান।

ঠিক ঠিক। গোয়ালপাড়ার ধুবড়ি শহরেও একটি পাড়া আছে। তার নামই ছাতিয়ানতলা, ইতু পিসি, রুবী কাকিমারা থাকেন।

ফুল ফোটে ছাতিয়ান গাছে ?

আমি শুধোলাম।

হ্যাঁ। ফোটে বইকী ! ছোট ছোট সাদা ফুল ফোটে, এপ্রিল-মে-তে।

হ্যাঁ। এপ্রিল-মেতেও একবার আসতে হবে "গন্ধ বিধুর সমীরণের" বাস পেতে।

আমি বললাম।

যা বলেছিস।

এটা কী গাছ ভাই ?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

দেখলাম, ঋজুদার চোখ-মুখের ভাব অন্যরকম হয়ে গেছে। ঋজুদারও অচেনা এতরকম গাছ দেখে ঋজুদা অভিভূত, বিস্মিত। যে সব গাছ অচেনা, সেগুলির নাম জানবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

এটার নাম কাটুস।

কাটুস ?

হ্যাঁ।

আবার ওই দেখেন ওই গাছটা, ওইটার নাম কাটুস।

কাটুস ?

হ্যাঁ। বটানিকাল নাম Hystrix।

আর কাটুসের বটানিকাল নাম।

Castanopsis।

বাঃ। তুমি ভাই কতদূর পড়াশুনো করেছ ? Botany নিয়ে পড়েছ না কি ভাই ?

হাঃ। এতগুলান মানষের সংসার চালাম্যু কামনে হেই চিন্তাতেই সব চুল পাইক্কা গেল গিয়া। ক্লাস নাইনেই পড়াশুনার ইতি করছি। কুচবিহারে এক গাড়ির মেরামতির কারখানায় হেল্পার আছিলাম। তারপর হাতে-পায়ে ধইর‍্যা ড্রাইভারি শিখ্যা এই অবধি আসছি। তবে ইংরাজি বাংলা পড়তে তো পারিই। তাই সাহেবগো লগ্যে ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা যেটুকু পারি শিইখ্যা লইছি। ডিগ্রির সঙ্গে শিক্ষার কী সম্পর্ক কয়েন ছার ? আমি তো অশিক্ষিত ডেরাইভার।

বাঃ।

মুগ্ধ হয়ে বলল, ঋজুদা।

তারপর বলল, তোমার মতন অশিক্ষিত আমাদের দেশে আরও অনেক থাকলে দেশের উন্নতি হত। ডিগ্রির সঙ্গে শিক্ষার যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনওই সম্পর্ক নেই একথা আমিও বিশ্বাস করি।

আপনারাও য্যান কেমনধারা মানুষ।

অভয় বললেন।

কেন ?

আমি বললাম।

কত সাহেব গো লইয়াই তো এইসব জঙ্গলে ডিউটি করি কিন্তু কই কারোরেই দেখি না ঘেঁটু ফুল বা ছাইতন বা কাটুস লইয়া এমন মাথা ঘামাইতে। আমাগো ফরেস্ট ডিপার্টের অনেক সাহেবদেরও দেখি না।

ভটকাই বলল, আমরা যে ভালমানুষ নই একেবারেই।

বলেই রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীর গান গেয়ে দিল :

'ভালো মানুষ নইরে মোরা ভালো মানুষ নই—
গুণের মধ্যে ওই আমাদের, গুণের মধ্যে ওই ॥
দেশে দেশে নিন্দে রটে, পদে পদে বিপদ ঘটে—
পুঁথির কথা কই নে মোরা, উলটো কথা কই ॥
গুণের মধ্যে ওই
ভালো মানুষ নই রে মোরা ভালো মানুষ নই।"

গান শেষ করেই ভটকাই চেঁচিয়ে উঠল, দাঁড়ান! দাঁড়ান অভয়দা। কাঁটাল গাছ। একটা গাছ-পাঁঠা পেড়ে নিয়ে যাই। জয়ন্তীতে যদি পাওয়া না যায় ?

অভয় হেসে উঠে বললেন, ওগুলো বন-কাঁটালের গাছ। এঁচড় বা কাঁটাল কিছুই ফলে না ওই সব গাছে। ও গাছের কাঠ দিয়ে ভাল আসবাব হয়, মানে ফার্নিচার।

তাই ?

ভটকাই বলল।

ওগুলো কী লতা ঋজুদা ?

ও। ওগুলো তো আসামী লতা। সংকোশ নদীর পাশের যমদুয়ারেও অনেক আছে। আর ওই দ্যাখ, ওই লতাটার নাম আরারিকাটা। এদের আবার তিনরকম আছে। Mimosa Himalayana...

ড্রাইভার সাহেব বললেন, তাদের নাম, আকাসিয়া পেনাল্টা আর আকাসিয়া এসেসিয়া—জংলি। বটানিকাল নাম।

বাঃ।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ঋজুদা।

তারপর বলল, তুমিই আমাদের সব জায়গাতে এবার থেকে নিয়ে যাবে অভয়। তোমার রেঞ্জার সাহেবের নাম যেন কী বললে ?

বিমান বিশ্বাস।

হুঁ, তাকে বলব।

এই দ্যাখ রুদ্র, আবার শিরিষ। আসলে শিরিষের পাঁচরকম আছে।

কী কী ?

টাটা, হররা, সেতো, কারকুর, কালো।

শিরিষের বটানিকাল নাম কী ঋজুদা ?

পাঁচ ভ্যারাইটির পাঁচ নাম।

ALBIZZIA LUCIDA, ALBIZZIA IIAMGLEI, PROCERA, PDORATISSIMA, আর NARCINATA—পঞ্চকন্যার পাঁচ নাম।

কী সব হিজবিজবিজ নামরে বাবা !

ভটকাই বলল।

আমরা কতরকম আকাসিয়া, আলবিজিয়া সব দেখেছিলাম আফ্রিকাতে, না ঋজুদা ? জলের পাশে পাশে, ইয়ালো-ফিভার আকাসিয়া ! মনে আছে ? ন্যাবা-ধরা হলুদ।

আমি বললাম।

হ্যাঁ।

ঋজুদা বলল।

ও সব তো আছে ঋজুদা সমগ্রর প্রথম খণ্ডে নয় দ্বিতীয় খণ্ডে। পড়েছি আমি। তাছাড়া পড়েছি পঞ্চম প্রবাস এবং গুগুনোগুম্বারের দেশেও।

আমিও পড়েছি আফ্রিকার 'পঞ্চম প্রবাস' আর 'ইলমোরানদের দেশে'।

অভয় বললেন।

আমি বললাম, শেষ দুটো বইতে ঋজুদার কাহিনী তো নয়। আমার লেখাও নয়। অন্যের লেখা।

যাই বলো ঋজুদা, আমার বন্ধু রুদ্র কিন্তু তোমার কীর্তি-কুকীর্তি সব লিখে তোমাকে বিখ্যাত করে দিয়েছে।

ভটকাই আমার সঙ্গে শান্তিস্থাপনের জন্যে বলল।

ঋজুদা চাপা হাসি হেসে বলল, রুদ্র তোর বন্ধু বুঝি ? জানতাম না তো ! বিখ্যাত কি কুখ্যাত তোরা জানিস। তবে রুদ্রর লেখার হাত যে ভাল সে কথা সকলেই বলে।

আমি দু হাতে শার্টের কলারটা তুলে দিয়ে বললাম, হুঁ হুঁ।

এ যাত্রায় আমাদের সকলেরই হাত তো খালি। বন্দুক রাইফেল পিস্তল কিছুই তো সঙ্গে আনিনি ! এই বক্সা বাঘ-প্রকল্পের সীমানার মধ্যে সেসব আনাও তো বে-আইনি। জেলে যেতে হবে। কিন্তু দুটি হাতই মুক্ত বলেই নতুন অভিনেতাদের মতন দুটি হাত কোথায় রাখি, তাদের নিয়ে কী করি, এই এক সমস্যা হয়েছে।

এই দ্যাখ রে আবার লালি। এইটা দুধে লালি আর ওইটা এমনি লালি। দ্যাখ দ্যাখ, কেমন মিনিয়েচার মাকাল ফলের মতন লাল লাল গোল গোল ফল ধরেছে লালি গাছে। দারুণ সুইট।

ভটকাই বলল।

অভয় বললেন, ওই ফলগুলো বছরের এই সময়েই পাড়া হয়। পেড়ে রেখে দেওয়া হয় বীজের জন্যে। বনের যেসব অঞ্চলে এই লালি লাগানো দরকার সেই সব অঞ্চলে এই বীজ থেকে গাছ করবেন বন-বিভাগ পরে।

ঋজুদা, এই যে, আবারও পেয়েছি।

ভটকাই চেঁচিয়ে উঠল।

কী ?

আকাতরু ?

জামগাছের মতন মস্ত গাছ কিন্তু পাতাগুলো পাকুড় গাছের মতন। ঋজুদা বলল। সাদা-রঙা আমের বোলের মতন ফুল ফোটে মার্চ-এপ্রিল মাসে। এই গাছেদের বটানিকাল নাম হেইনি ট্রিজুগা (Heynce Trijuga), রক্স-সাহেবের দেওয়া নাম, B. Rox।

লালি গাছের ফল তো দেখলাম। ফুল কখন হয় ?

ভটকাই বলল।

ফুল তো ফলের আগেই হয়। তাও কি জানো না বৎস ?

আমি বললাম।

লালি গাছে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর অবধি লাল লাল ফুল ফোটে।

ফুলগুলো সুপুরির খোলার মতন খোলা দিয়ে ঢাকা থাকে।

ড্রাইভার অভয় বললেন।

তাই ? একবার আসতে হবে তো সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে লালির ফুল দেখতে।

আরে ! সামনে পথের মধ্যে ওটা কী ?

ওটাই তো ওয়াচ-টাওয়ার।

ড্রাইভার অভয় বললেন।

আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ওয়াচ-টাওয়ারে। কংক্রিটের তৈরি গোলাকৃতি, চার-মানুষ সমান উঁচু টাওয়ার। বনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্যে সবজে-হলদে রং করা। ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। ছোট্ট বারান্দা আছে, চেয়ার পেতে বসে বনের প্রাণী দেখবার। টাওয়ারের জন্য চারেক নেপালি ফরেস্ট গার্ডও দেখলাম। তাঁরা নাকি দিনে এবং রাতেও থাকেন। সেখানেই রান্নাবান্না করে খান। একজন সাইকেল নিয়ে রাজাভাতখাওয়া গেছেন রসদ আনতে। সামনেই একটি 'নুনী' বানানো হয়েছে জঙ্গল সাফ করে এবং বস্তা বস্তা নুন ফেলে। নানা তৃণভোজী জানোয়ার আসে সেই নুন চাটতে। হাতিও আসে প্রায়ই। গার্ডরাই বলল। তৃণভোজীদের পেছনে পেছনে আসে মাংসভোজীরা। কখনও-সখনও।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। দেখলাম, চারদিক থেকে চারটে কাঁচাপথ এসে যে চৌমাথাতে মিশেছে, সেখানেই এই টাওয়ার। জঙ্গলে ওয়্যারলেস ফোন আসার আগে এই টাওয়ারই হয়তো লোক মারফৎ চারদিকে খবর লেনদেন-এর ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিত। কে জানে !

টাওয়ার থেকে নেমে, সেই মোড় থেকে আমরা বাঁ দিকে ঘুরে চললাম জয়ন্তীর পথে।

ড্রাইভার ভাই বললেন, আপনারা রেঞ্জার সাহেবরে কইবেন, আপনাগো সংহাই রোডে লইয়া যাইবেন উনি।

সেটা কী ব্যাপার ?

সি এক সাংঘাতিক পথ। ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হইব। দেখনোর মতন জঙ্গল। দিনমানেও গা ছম-ছম করবঅনে। আর যখন জয়ন্তী থিক্যা ভুটান ঘাটে যাইবেন তখন যাইবেন পীপিং-এও। ভুটান ঘাট থিক্যা।

পীপিং মানে ? বেজিং-এ ?

ভটকাই অবিশ্বাসের গলাতে বলল।

না, না। পীপিং হইতাছে ভুটান আর ভারতের বর্ডার। সেইখানেই তো রাইডাক নদী পাহাড় থিক্যা সমতলে নামছে। আহা ! কী ছিন-ছিনারি কী কমু ছার আপনাগো ! অবশ্যই যাইবেন। আপনে তো পিরথিবী ঘুইরাই আইছেন। আমাগো বক্সার জঙ্গলেও ভাল কইর‍্যা ঘুইরা যান। বক্সাও ফ্যালনা নয় আমাগো।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, রুদ্রবাবু যদি জঙ্গলেতে ফির‍্যা আমাগো লইয়া কিছু ল্যাখেন তাইলে তো বইর্তা যামু গিয়া

লিখবেন। লিখবেন। অবশ্যই লিখবেন

ভটকাই আমার লোকাল গার্জেনের মতন বলল, অভদ্র ভাইকে আশ্বস্ত করে।

॥ ৭ ॥

জয়ন্তীতে যখন আমরা গিয়ে পৌঁছলাম তখন আকাশে ঘন কালো মেঘ

বন-বিভাগের কর্মীদের কোয়ার্টার-টোয়ার্টার পেরিয়ে গিয়ে যেন পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তেই গিয়ে পৌঁছলাম বলে মনে হল। ছেলেবেলাতে ডুয়ার্সের সরস্বতীপুর বাগান থেকে ভরা-বর্ষার এক গোধূলিবেলায় প্রলয়ঙ্করী তিস্তার পারে দাঁড়িয়ে আপালচাঁদ-এর জঙ্গল আর কাঠামবাড়ির রূপ, বিধুর কমলা আলোয় দেখেছিলাম। সেই ছবিটি ফিরে এল মনে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। সরস্বতীপুর চা বাগান তিস্তার যে পাড়ে, সেদিকটা অবশ্য খুবই উঁচু। উল্টোদিকে নদী পাড় ভাঙছিল। ঢেউ-এর কী শব্দ আর মাটি ধ্বসার! বড় বড় মহীরুহকে তিস্তা দেশলাই-এর কাঠির মতন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল।

জয়ন্তী বাংলোটিও উঁচু পাড়ে। নদীর খাত বেশ নীচে, তবে তিস্তার সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়। তা ছাড়া, নদী এখন শুকনো। শুধু উল্টোদিকের পাড় ঘেঁষে দুটি শীর্ণ জলের ধারা বইছে। বাংলোর ঠিক বিপরীতেই উঁচু পাহাড় একটা। আকাশ ঢেকে আছে। বাংলোর পাশে নদীর উপরে বসার জায়গা আছে একটি। প্রলয়ঙ্করী বন্যাতে পি. ডাব্লু. ডি.র বাংলোটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে নদী, নিশ্চিহ্ন করে। ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মস্ত শক্ত-পোক্ত লোহার ব্রিজও। যে ব্রিজ পেরিয়ে পাহাড়-জঙ্গল এবং চা বাগানের মধ্যে দিয়ে চলে গেছিল পথ।

জয়ন্তী বাংলোর কাছাকাছি প্রায় সবই শালের গাছ। দুটি কাঠগোলাপের গাছ আছে। হাতার বাইরের পাশাপাশি ময়না গাছে র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গোদের বাসা আছে কয়েকটি। তারা ফুরুৎ ফুরুৎ করে ওড়াউড়ি করছে। এই র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গোরা ভীষণ ঝগড়াটে আর মারকুট্টে পাখি। এদের চেয়ে আকারে অনেক বড় পাখিও, যেমন দাঁড়কাক, ওদের ভয় পায়।

একটু পরে জয়ন্তীর রেঞ্জার বিমান বিশ্বাস দেখা করতে এলেন। বললেন, আজকের দিনটা জয়ন্তী নদীর শোভা দেখুন। কালকে আপনাদের বক্সাদুয়ারে নিয়ে যাব। সান্ত্রাবাড়ি হয়ে। সান্ত্রাবাড়িতে রেঞ্জ অফিস আছে। সেখানের রেঞ্জার গোপাল চক্রবর্তী মশাইও এসে যাবেন সকালে। আর রাতে আপনাদের সাংহাই রোডেও নিয়ে যাব। বক্সা টাইগার প্রোজেক্টের কোর এরিয়ার মধ্যে

দিয়ে। চেকো হয়ে ওই পথ গিয়ে একত্রিশ নং জাতীয় সড়কে মিশেছে। রাত আটটাতে আসব। সঙ্গে গার্ড এবং আর্মসও নিয়ে আসব।

আর্মস কী হবে ?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

এখানে বড় বড় বাইসন আছে। এক ঢুঁ মারলে কোথায় চলে যাবে জিপ। হাতিও আছে। তবে হাতি বা বাইসন কিছুই তো মারা যাবে না। ভয় দেখাবার জন্যে আর কী !

আর বাঘ ? টাইগার প্রোজেক্টে বাঘের কথাই কেউ বলছে না। কী ব্যাপার ?

এখানের বাঘেরা অসূর্যম্পশ্যা।

কারোকে দেখেও না, দেখা দেয়ও না। বাঘ তো ময়ূর নয় যে পেখম মেলে ট্যুওরিস্টদের মনোরঞ্জনের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ভটকাই দমে গেল। এমন জবাব পাবে আশা করেনি।

ঋজুদা বলল, কী আর্মস আনবেন ?

টুয়েলভ-বোর ডাবল-ব্যারেল শটগান এবং পয়েন্ট টু টু রাইফেল।

পয়েন্ট টু টু রাইফেল দিয়ে তো শুধু খরগোশ, ছোট হরিণ আর মানুষই মারা যাবে। ওসব দিয়ে হাতি আর গাউরকে কি ভয় দেখানো যাবে আদৌ ?

বিশ্বাস সাহেব বললেন, গভর্নমেন্ট থেকে যা দেয়। এ তো আর আমাদের পার্সোনাল সম্পত্তি নয়।

ওঁরা চলে গেলে ঋজুদা বলল, পাকামি করবি না ভটকাই। আমরা ওঁদের অতিথি। আর গভর্নমেন্ট থেকে কেনে বলেই দিশি বন্দুক রাইফেল কেনে। বিদেশি আর্মস আনতে গেলে আলাদা ইমপোর্ট লাইসেন্স লাগবে। তা ছাড়া কত দাম ?

আমরা বিদেশি কিনতেই বা যাব কেন ? ইন্ডিয়ান অর্ডনান্স কোম্পানির দোনলা, পয়েন্ট বারো বোরের বন্দুক খারাপই বা কী ?

আমি বললাম।

কিন্তু ইন্ডিয়ান অর্ডনান্স কোম্পানি তো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফাইভ রাইফেলও বানান। তাও তো কেনা যায়। পয়েন্ট টু টু দিয়ে কি ঘণ্টা হবে ?

আনডন্টেড ভটকাই বলল।

থাক সে কথা। আমরা তো শিকার করতে বা চোরা-শিকারিদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে আসিনি। জাস্ট বেড়াতেই এসেছি। বন্দুক-রাইফেল নিয়ে আলোচনার এখন দরকারই বা কী ?

জয়ন্তী বনবাংলোতেও বিজলী আলো আছে। তবে আমরা যখন বাংলোতে ঢুকলাম তখন লোড-শেডিং ছিল। জেনারেটর চালিয়ে চৌকিদার অজয় ছেত্রী জল তুলছিল তখন। অজয়ও নেপালি। এবং অত্যন্ত পলিশড। চমৎকার বাংলা বলে। ব্যবহারও খুব ভাল। পরে জেনেছিলাম যে, বাবুর্চিও সে অত্যন্তই

ডাক এবং টেবিল-এ কী করে খাবার-দাবার সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতে হয় তাও জানে।

বিকেলে যে চা খেলাম তা চমৎকার। রাজাভাতখাওয়াতেও ভাল চা খেয়েছিলাম। ভটকাইটার গরম জল পেলেই চা খাওয়া হয়। এ ব্যাপারে আমার তো বটেই, ঋজুদারও একটু খুঁতখুঁতানি আছে। চা-টা ভাল না হলে মন খারাপ হয়ে যায়।

চা খাওয়ার পরে আমরা নদীর উপরে যে বসবার জায়গাটা আছে, কাঠগোলাপ গাছ দুটোর নীচে, সেখানে গিয়ে বসলাম। ধু ধু করছে নদীর সাদা খাত। বাঁ দিকে গিয়ে একটি ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। তারপর মূল স্রোতের খাত ডান দিকে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে গভীর বনের মধ্যে।

অন্ধকার হয়ে এল। নানা পাখি ডাকতে লাগল। আর ডাকতে লাগল গ্রেকো। মানে, তক্ষক। ট্যাক-টু-উ-উ! ট্যাক-টু-উ-উ! করে বাংলোর ফলস-সীলিং-এর নীচেও আছে ওরা। নদীর ওপার থেকে একটা ডাকছে। এপারে তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে। ওরা ডাকবার আগে যেন গলা খাঁকারি দিয়ে নেয় একবার। ট্যাকটু-উ শব্দ করে ডাকে বলেই ওদের আরেক নাম "টাকটু"।

এত বড় তক্ষক এর আগে আর দেখিনি।

আমি বললাম।

আমিও নয়।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, ইন্দোনেশিয়া আর ক্রাকাটাও দ্বীপে দেখেছিলাম অবশ্য। তবে আমাদের দেশে দেখিনি। আছে হয়তো। আমি কি আর সর্বজ্ঞ, আমিময় মুকুজ্যের মতন?

ভটকাই উত্তেজিত হয়ে বলল, দ্যাখ দ্যাখ। দাবানল।

তাই তো!

তাকিয়ে দেখলাম, বাংলোর ঠিক সামনে নদীপারে যে উঁচু পাহাড়টি উঠে গেছে তার মাথার কাছে আগুনটা লেগেছে। মালার মতন জ্বলছে সোনারঙা আগুন।

দাবানল-এর পক্ষে ট্যু আর্লি, নয় কি?

ঋজুদা বলল।

হুঁ।

চারদিক থেকে নানারকম পাখি ডাকছিল। এখুনি রাত নেমে আসবে। সেই সব পাখির মধ্যে কিছু চেনা, কিছু অচেনা। র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গোরা ভোর রাত থেকে ডাকাডাকি শুরু করে। সন্ধেবেলাতে তারা অত সোচ্চার নয়। চেনাদের মধ্যে বুলবুল, মিনিভেট (এখানে নাকি "অ্যাশি" মিনিভেটও আছে),

ব্যাবলার ইত্যাদি ডাকছিল। এবং ওপার থেকে ওয়াটেলড ল্যাপউইং চমকে চমকে ডাকছিল বুকে চমক তুলে। তাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই বলতে পারব না, লাল না হলুদ।

শীতকালে ভুটানঘাটের দিকে কালো গলার সারসও নামে। শীতকালে অন্য অনেক পরিযায়ী পাখিই আসে এদিকের জঙ্গল আর নদীতে।

ঋজুদা বলল।

ভটকাই যথারীতি উধাও হয়ে গেছিল রান্নাঘরের দিকে। ফিরে এসে, যেন খাদ্যদ্রব্যের প্রতি ওর কোনও ইন্টারেস্টই নেই, এমনভাবে বলল, এই নদীটি কোথা থেকে এসেছে ঋজুদা ? এই জয়ন্তী নদী ?

ভুটানের সীমান্তের জয়ন্তী হিলস থেকে বেরিয়ে ভারতে ঢুকেছে জয়ন্তী। তারপর এই জয়ন্তী রেঞ্জ-এরই ফাসখাওয়া আর হাতিপোতা ব্লকের সীমানা চিহ্নিত করে বয়ে গেছে হাতিপোতার হরজাই Unclassed বনের মধ্যে দিয়ে আর কার্তিকার সংরক্ষিত বনের মধ্যে দিয়ে।

কার্তিকা জায়গাটা কোথায় ?

আমি বললাম।

কার্তিকা, নর্থ রায়ডাক রেঞ্জের একটি বীট।

ঋজুদা বলল।

এই বীট, রেঞ্জ এই সব কী ? ফরেস্ট গার্ড ? বন-বিভাগের এই সব গোলমেলে ব্যাপার-স্যাপার বোঝা দায় !

ভটকাই বলল।

কোনও গোলমাল নেই। বুঝিয়ে দেব তোকে একসময়ে। এখন বল, এখুনি যেদিক থেকে এলি সেদিকের খবরাখবর কী ?

ভটকাই ধরা পড়ে গিয়ে হাসবার চেষ্টার মতন একটা ভঙ্গি করে বলল, মন্দ নয়। আমাদের জন্যে আলিপুরদুয়ার থেকে বাসে পাঁউরুটি এসেছে। মুসুরির ডালের স্যুপ, স্যালাড, চিকেন রোস্ট, টোস্ট, কড়কড়ে করে, আর ক্যারামেল কাস্টার্ড পুডিং। নট ব্যাড। কী বলো ? এমন জঙ্গল-নদীর মধ্যে ?

ব্যাড কী রে ! অভাবনীয় বল ! তবে আমার মন আবারও বলছে যে, বন-বিভাগ আর আমাকে এখানে আসতে বলবেন না। তোর জন্যেই পেটুক বলে আমার বদনাম হয়ে গেল !

ছাড়ো তো ! পেটে খেলে পিঠে সয় ! হলে হবে।

আমি চুপ করে নদীর দিকে চেয়ে ছিলাম। এখন রাত নেমে এসেছে। চাঁদও উঠেছে। ধবধবে দেখাচ্ছে মস্ত চওড়া জয়ন্তী নদীর দুধ-সাদা বালিময় বুক, দাবানলের মালা বুকে-করে দাঁড়িয়ে-থাকা উঁচু পাহাড়শ্রেণীর পটভূমিতে সত্যিই দারুণ দেখাচ্ছে সেই দৃশ্য। একটু আগেই বাথরুমে চান করবার সময়ে আলো নিভিয়ে সব জানালা খুলে দিয়েছিলাম। কী অপূর্ব যে লাগছিল তা কী

বলব ! মনে হচ্ছিল, যেন নদীর মধ্যেই চান করছি। সামনে নদী, ডাইনে নদী। গ্রেকো ডাকছে থেকে থেকে ট্র্যাক-টু-উ ট্র্যাক-টু-উ আর মাঝে মাঝে ওয়াটেলড ল্যাপডইংগ-এর ডিউ-ড্যু-ড্যু-ইট। ডিউ-ড্যু ড্যু-ইট ডাক যেন সেই পাহাড়-নদীর নিস্তব্ধতাকে আরও গভীর, রহস্যময় করে তুলছে।

জয়ন্তী বাংলোর কাছে নদীর দিকে কোনও ঘরবাড়ি নেই তাই সেখানে নির্জনতাকে মনে হয় অসীম। শোওয়ার ঘর থেকেও দেখলাম, বিছানাতে শুয়েও মনে হয় যেন নদীতেই শুয়ে আছি। এরকম আশ্চর্য সৌন্দর্য অন্য কোনও বাংলোরই নেই। নদী এখন জানালার একেবারে পাশে চলে এসেছে, অবশ্য প্রলয়ংকরী বন্যারই জন্যে। যেন টাইগার প্রোজেক্টের ফিল্ড ডিরেক্টর এস. এস. বিস্ত সাহেবের নির্দেশেই জয়ন্তী নদী বাংলোটির পায়ে চুমু খেয়ে তাকে অক্ষত রেখে চলে গেছে গাছ পাথর মাটি এবং পি. ডব্লু. ডি.-র বাংলোটিকে ভাসিয়ে নিয়ে।

একটি জিপের শব্দ শোনা গেল। জিপটা এসে ঢুকল বাংলোতেই। কল্যাণ দাস, অ্যাডিশানাল ডি. এফ. ও. এলেন আলিপুরদুয়ার থেকে ঋজুদার তত্ত্বতালাস করতে। কোনওরকম অসুবিধা হচ্ছে কি না তা দেখতে।

ঋজুদা বলল, একটু বেশিই আদর-যত্ন হচ্ছে। অস্বস্তিতে আছি।

দাস সাহেব নানারকম গল্প করলেন চা খেতে খেতে। চোরা কাঠ ও বন্যপ্রাণী শিকারিদের নানা ক্রিয়াকলাপ। মাঝে ডাকাতরা একটি ব্যাঙ্ক লুঠ করে এই বক্সার জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল। তাদের সঙ্গে মোকাবিলার রোমহর্ষক কাহিনী, এইসব।

দাস সাহেব উঠলেন ঘণ্টাখানেক পর। ফিরে যাবেন জঙ্গলে জঙ্গলে পুরো পথ। রাতেই পৌঁছবেন আলিপুরদুয়ারে।

ভটকাই বলল, দারুণ। না ? দেখিস ! আমি কমপিটিটিভ পরীক্ষাতে বসব, গ্র্যাজুয়েশনটা করেই। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে ঢুকব। তখন দেখবি, আমার ডাঁট।

ঋজুদা বলল, এখনই তোর ডাঁট কম কী ? আমরা সকলেই তো তটস্থ। এবারে চল, খাওয়া-দাওয়া করে আবার ওখানে এসে বসি রাত বারোটা অবধি। কালই তো চলে যাব ভুটানঘাটে।

সাংহাই রোডে যাবে না ?

ফেরার সময়ে হবে'খন। এই নিস্তব্ধতা, এই নদীর রাতের বেলার সৌন্দর্যে মন ভরে নে। সবসময়ে দৌড়াদৌড়ি করতে নেই। শান্ত হলে তবেই না মনের মধ্যে শান্তি নামে।

ভটকাই গেয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের গান, "গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে আর কোলাহল নাই।"

নর্থ ভুটানঘাট-এর রেঞ্জার সুবীর বিশ্বাস সাহেব নিতে আসবেন আমাদের,

ওঁর জিপ নিয়ে। কাল ব্রেকফাস্টের পরে।

ঋজুদা বলল, ভটকাই-এর গানের পরে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে।

বাঃ বেশ চলেছে কিন্তু। আমরা যেন রিলে রেস-এর রুমাল। এর হাত থেকে ও নিয়ে নিচ্ছে আমাদের। আর নিয়েই দৌড়।

ভটকাই বলল।

বললাম, বাবাঃ। কী উপমা!

॥ ৮ ॥

পরদিন লেট-ব্রেকফাস্টের পরেই রওয়ানা হওয়া হল। প্রায় দশটা নাগাদ। ব্রিজ তো বন্যায় ভেঙেই গেছে। আবার কবে নতুন করে সে ব্রিজ বানানো হবে, তা ঈশ্বর আর পি. ডব্লু. ডি.র ঈশ্বরের মতন ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদারদেরই দয়া।

আমরা নদীর বুকে নেমে গেলাম জিপ নিয়ে, তারপর পথ কোনটা আর বিপথ কোনটা তা বোঝার কোনও উপায়ই রইল না।

জয়ন্তী নদীর শুকনো বালিময় বুকের মধ্যে মধ্যে অনেকখানি কোনাকুনি গিয়ে তারপর নদী পেরুনো হল। কিন্তু নদী কি একটা? কিছুদূর যাবার পরেই ফাসখাওয়া নদী পেরিয়ে, চুনিয়াঝোড়া নদী পেরিয়ে তুরতুরি চা বাগানের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ময়নাবাড়ি বীট অফিসে পৌঁছলাম মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে। ময়নাবাড়ি, নর্থ রায়ডাক রেঞ্জের একটি বীট। বীট অফিসার অভিজ্ঞ সুভাষচন্দ্র রায় জঙ্গলের পোকা। ময়মনসিংহ জেলাতে বাড়ি। আমাদের চা খাওয়ালেন। ভটকাই, ওরই মধ্যে আড়ালে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঋজুদার জন্যে শুঁটকি মাছের বন্দোবস্ত ফিট করে এল! এই নইলে, ঋজুদা ওকে তালেবর বলে!

সুভাষবাবু বললেন, আমার ফ্যামিলি এখানে থাকে না। তবে, শুঁটকির বন্দোবস্ত একটা হবে।

বীট অফিসের পাশেই একটি ছোট ডোবা মতন ছিল। তার পাড়ে পাড়ে রাশ রাশ টাটকা সবুজ কলমি শাক ফুটেছিল। ডোবাতে হাঁস চড়ছিল, সাদা আর বাদামিতে মেশা। স্বগতোক্তি করতে করতে। আমার ইচ্ছে হল একমুঠো শাক তুলে নিয়ে যাই। ভুটানঘাটের বাংলোতে পৌঁছে গরম ভাত দিয়ে খাওয়া যাবে। মেঘলা আকাশের নীচে সজনে গাছের ফিনফিনে পাতারা তিরতির করে কাঁপছিল। কোথায় যেন কে মুসুরির ডালে কালোজিরে শুকনো লংকা ফোড়ন দিল। গন্ধে ভরে গেল প্রলম্বিত সকাল। নীল আকাশ, চারধারে জঙ্গল, সহজ মন্থর জীবনযাত্রা। তাড়া নেই, টেনশান নেই, হাঁসের প্যাকপ্যাকানি, মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। দূরে মেঘ করে আসছে। মনে হয়, বৃষ্টি হবে। ভারী ভাল

লাগছিল।

ওইখানেই খবর পাওয়া গেল যে দার্জিলিং থেকে কনসার্ভেটর, হিলস, এস. এস. বিস্ত সাহেব একটু আগেই বীট অফিস পেরিয়ে ভুটানঘাটের বাংলোর দিকে চলে গেছেন ঋজুদার সঙ্গে আলাপিত হতে। তারপর লাঞ্চ খেয়ে আবার ফিরে যাবেন দার্জিলিং। চিঠি এবং ফোনেই কথাবার্তা হয়েছে দুজনের এ যাবৎ, চাক্ষুষ দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

দেখেছ কাণ্ডটা!

ঋজুদা বলল।

তারপরই বলল, হাউ নাইস অফ হিম।

ময়নাগুড়ি বীট অফিস থেকে বাঁয়ে ঘুরেই আমরা দুদিকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাউডারের মতন ধূলি-ধূসরিত পথে এগিয়ে চললাম।

জয়ন্তী থেকে রওয়ানা হবার সময় থেকে যখন এক ঘণ্টা দশ মিনিট মতন হয়েছে ঘড়িতে, তখন পথের ডান দিকে একটি দোতলা বাংলোর হাতার মধ্যে রেঞ্জার সুবীর বিশ্বাসের জিপটি ঢুকে পড়ল। দেখলাম, একটি লাল বাতি লাগানো সাদা অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে আছে।

বিস্ত সাহেব ছিপছিপে, ফর্সা, ছোট্ট-খাট্ট মানুষটি। কিন্তু একজোড়া জবরদস্ত পাকানো গোঁফ আছে। ভারী অমায়িক মানুষ।

ঋজুদা আর উনি দোতলার বারান্দাতে বসে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন আর আমি আর ভটকাই ঘুরে ঘুরে বাংলো এবং বাংলোর আশপাশ দেখতে লাগলাম রেঞ্জার সুবীর বিশ্বাসের সঙ্গে। বাংলোর হাতাতে শিশু ও আম গাছ আছে দেখলাম। একটি বেঁটে-মোটা জারুল গাছ। এমন জারুল সচরাচর দেখা যায় না। জারুলেরা সচরাচর ছিপছিপে ও লম্বা হয়। তাই হঠাৎ একে দেখলে জারুল বলে চেনাই যায় না। একটি শিশু গাছের গায়ে অর্কিড হয়েছে। যে-গাছটা আমরা চিনতাম না, তা চেনালেন বীট অফিসার সুভাষবাবু। জানি না, ঋজুদারও চেনা আছে কি-না। গাছটার নাম উদাল বা ওদাল। বাংলোর পাশ দিয়ে রায়ডাক নদীর দিকে যাবার যে রাস্তাটি আছে তারই বাঁ পাশে আছে গাছটি। সেদিকে পাম্প হাউসও আছে। সেই উদাল বা ওদাল গাছে এখন লাল লাল ফল এসেছে। ফুল ফোটে নাকি হলুদ ও বেগুনি-রঙা, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। এই গাছের বটানিকাল নাম হল Streculia Villosa। বললেন, সুভাষবাবু। দেশলাই কাঠি হয় এই কাঠ থেকে। নরম কাঠ। ছাল থেকে ফাইবার বা তন্তুও হয়। আঠাও হয়। তবে তেমন সুবিধের নয়।

তারপর সুভাষবাবু বললেন, খয়ের গাছ দেখেছেন কখনও?

ভটকাইকেই কেন জিজ্ঞেস করলেন, কে জানে! ওর চেহারাটা আমার চেয়ে ভারিক্কি আর হাবভাব জ্যাঠার মতন বলেই বোধহয়।

ভটকাই বলল, না। লজ্জার মাথা খেয়ে।

আমার সামনে মিথ্যেটা বলে কী করে ?

আমি বললাম, কেন ? নিনিকুমারীর বাঘ মারতে গিয়ে সেই "গড়"-এর নীচে তো খয়েরের জঙ্গলও ছিল রে। তুই একটা কানা।

ভটকাই, ফর আ চেঞ্জ, নিরুত্তর রইল।

খয়ের কী করে বানায় ?

আমাকে ইগনোর করে ভটকাই প্রশ্ন করল।

বলব এখন পরে আপনাদের।

সুভাষবাবু বললেন।

আমি বললাম, আমি জানি।

ভটকাইয়ের জন্যে আমার লজ্জা করছিল। ঋজু বোসের ইজ্জত ঢিলে করে দিল একেবারে তার এই নতুন চেলা। ওকে বললাম, "কোয়েলের কাছে" বলে একটা উপন্যাস আছে, পালামৌর পটভূমিতে লেখা। পড়ে নিস। তাতে কী করে খয়ের বানানো হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

ভটকাই সুভাষবাবুকে জিজ্ঞেস করল, বাবুর্চি-কাম-চৌকিদারের নামটা কী ?

মনবাহাদুর।

কেন ?

না। একটু আলাপ করে আসি।

বুদ্ধিমান সুভাষবাবু ভটকাই-এর মুখ দেখেই যা বোঝার বুঝেছিলেন। বললেন, এই জঙ্গলে তো কিছুই পাওয়ার জো নেই। তবু আপনাদের জন্যে মুরগি আর কাতল মাছ জোগাড় করেছি। মাছ আনাতে হয়েছে সেই আলিপুরদুয়ার থেকে।

ভেকাটা আর বরোলি মাছ বুঝি এ অঞ্চলে পাওয়া যায় না ?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

ওইসব মাছ বেশি পাওয়া যায় ডিমা, নোনাই, কালচিনি ইত্যাদিতে। জয়ন্তী বা রায়ডাকে হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু ধরে কে এই জঙ্গলে! বাঘ হাতি সাপ গাউরে ভরা যে ভীষণ জঙ্গল! থাকেই বা ক'জন মানুষ! সাপ্তাহিক হাটে মোরগা-আণ্ডা, পাঁঠা-শুয়োর ওঠে, ওই দিয়েই মুখ বদলানো আর কী!

এই সব অঞ্চলে মানুষ থাকে না ?

থাকে বই কী! মাঝে মাঝে বস্তি আছে। চা বাগানে তো মেলাই মানুষ।

তারা কি সাঁওতাল ?

না, সাঁওতাল নয়। এদিকের চা বাগানের কর্মীদের মধ্যে বেশিই মোদেশিয়া। তাদের ভাষার নাম সাদরী। টোটোরাও আছে। টোটোপাড়া বলে একটা বস্তিই আছে। রায়মাটাং-এর দিকে। রাভারাও আছে। মেচ আছে। এখানে বলে মেচিয়া। তবে কম। গারোরাও আছে।

সুবীরবাবু বললেন, আপনারা বুঝি Anthropology-তে ইন্টারেস্টেড ?

ভটকাই Anthropology শব্দটার মানে না বুঝে apologetically বলল, শুনেছিলাম হাতিদের একটা রোগ হয়, তার নাম Anthrax।

ভটকাই-এর নির্বুদ্ধিতায়, লজ্জায় মাথা কাটা গেল আমার।

নাঃ। ঠিক করলাম ঋজুদাকে বলতেই হবে যে, ওকে নিয়ে আর কোথাওই যাওয়া নয়।

সুবীরবাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে ভটকাই শব্দটার মানে বুঝতে পারেনি।

উনি বললেন, আমি নৃতত্ত্বের কথা বলছি।

বুঝেছি। আদিবাসীদের নৃত্যের কথা বলছেন তো !

ভটকাই আবারও স্মার্টলি কেলো করল।

আমি ধমকে বললাম, এখন চুপ কর। পরে তোর সঙ্গে আলোচনা করব।

দুপুরের খাওয়ার পরে মিতাহারী বিস্ত সাহেব চলে গেলেন তাঁর ব্যবহারে ও সৌজন্যে আমাদের মুগ্ধ করে।

আমরা এখন দোতলার বারান্দাতে বসে আছি। বাংলোর পাশেই একটি নুনী বা Salt Lick—। কুদরতি নয়, বানাওটি। আর তার ঠিক পেছনেই ভুটানের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথার কাছের কিছুটা জায়গা সাদা দেখায়, সেখান থেকে পাথর বা কোনও ধাতব পাথর বের করাতে। মনে হয়, যেন বরফ পড়েছে। বারান্দায় বসে সেই দিকে চাইলে "নুনী"টা দৃষ্টিপথেই পড়ে। চারটি চিতল হরিণী আর একটি শিঙাল নুন চাটতে এসেছে। জোর হাওয়া আসছে নদী থেকে। আর ঝরঝরানি আওয়াজ।

রাতে বেশ ঠাণ্ডা হবে। ভাবলাম।

ঋজুদা বলল, মনে হচ্ছে, রাতে দুটি কম্বল লাগবে জানালা-দরজা বন্ধ করেও। অথচ মাসটা মার্চ।

বললাম, রায়ডাক নদী ঘুমপাড়ানি গান গাইবে সারারাত।

রাইট।

বলে, অনেকক্ষণ বাদে ঋজুদা পাইপটা ধরাল। পাইপ খাওয়া অনেকই কমিয়ে দিয়েছে আজকাল। দুপুরের খাওয়ার পরে একটু খায়, আবার রাতের খাওয়ার পরে। ব্রেকফাস্টের পরেও খায় কখনও কখনও।

এদিকে মনে হয় একটাও তক্ষক নেই। ট্যাক টু-উ—ট্যাক্-টু-উ ডাক একেবারেই শোনা যাচ্ছে না।

আমি বললাম।

আছে হয়তো। নদীর শব্দের জন্যেই হয়তো শোনা যাচ্ছে না।

খাওয়াটা বড় জোর হয়ে গেল র‍্যা।

ভটকাই বলল।

খেতেই তো এসেছিস তুই।

আমি বললাম।

চল, বিকেলে চা খেয়ে হাঁটতে বেরোব।

ঋজুদা বলল।

নদীতে যাব তো?

যাব। কিন্তু বাংলোর পাশের পাম্পঘরের পাশ দিয়ে নয়। সামনের পথ দিয়ে যাব।

কেন?

ওইখানে নদী খুব চওড়া।

বেশ!

তারপর কাল সকালে তোদের নিয়ে পীপিং-এ যাব। ভুটান আর পশ্চিমবাংলার সীমান্তে। বিস্ত সাহেব বলছিলেন। ভুটানের নদীটির নাম ওয়াঞ্চু। গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে বইছে। পীপিং-এ পৌঁছে, সমতলে পড়েই, ছড়িয়ে গেছে নদী। হাত পা শরীর সব মেলে দিয়েছে। তার নাম হয়ে গেছে সেখানে এই রায়ডাক।

রায়ডাক নাকি নদ? শুনেছি।

হবে। কিন্তু আজকাল তো ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের তফাত করা যায় না। লেখিকা বলেন না কেউই, বলেন লেখক। তাই রায়ডাক পুরুষ না নারী তা নিয়ে বৃথা তর্ক করে কী লাভ?

গল্পে গল্পে দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল। কিছুক্ষণ আগে আকাশে একটু মেঘ মেঘ করেছিল। এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। মনবাহাদুর দোতলার বারান্দাতে চা নিয়ে এল। রেঞ্জার সুবীর বিশ্বাসও লাঞ্চের পরে চলে গেছিলেন তাঁর রেঞ্জ অফিসে। বলে গেছিলেন সন্ধের পর আসবেন। কল্যাণ দাস, অ্যাডিশানাল ডি. এফ. ও.ও আসবেন বলেছিলেন।

বলতে একেবারেই ভুলে গেছিলাম যে, বিস্ত সাহেব আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ সরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কনসার্ভেটর এসেছিলেন। ঋজুদার ভক্ত। উনিও খাওয়া-দাওয়ার পর বিস্ত সাহেবের সঙ্গেই ফিরে গেলেন। ঋজুদার খুবই পছন্দ হয়েছে তাঁকে। বলল, ছেলেটি খুবই ব্রাইট। অনেক খোঁজ-খবর রাখে। দেখিস, জীবনে খুব উন্নতি করবে। তোরা দেখতে পাবি। তখন আমি হয়তো আর বেঁচে থাকব না। কল্যাণ দাসও অবশ্য ভাল। দুজনেই ভাল। তবে দুরকম।

চা খেয়ে আমরা বেরোলাম। তখনও বেলা ছিল। দিনে দিনেই ঘুরে আসব। সঙ্গে টর্চও নিইনি। ধূলি-ধূসরিত পথ ধরে পীপিং যাওয়ার রাস্তাতে আমরা হেঁটে এগোলাম। তারপর এক ফার্লং মতন গিয়ে সেই পথ ছেড়ে ডান দিকে যে পথটি চলে গেছে তাতে ঢুকলাম। সে পথে ট্রাকের চাকার দাগ ছিল।

ঋজুদা বলল, নদীতে ট্রাক যাওয়া-আসা করে কেন ? কীরে ভটকাই ?

ভটকাই বলল, পিকনিক পার্টি ?

তোর মাথা। এই মার্চ মাসে কেউ পিকনিক-এ আসে। তাও আজ তো রবিবারও নয়। ভেবে বল।

মার্চ মাস হলেও ওয়েদার তো প্লেজেন্ট।

পিকনিক-এ আসতে হলে মনেরও কিছু বলার থাকে। জমাটি শীত না পড়লে, রোদে বসে আরাম না হলে, কি পিকনিক করার কথা মনে হয় কারোরই ?

তাহলে ? ভেবে নিয়ে ভটকাই আবার বলল, বালি আনতে গেছিল হয়তো নদীর বুকে।

বালি তো জয়ন্তী, ফাসখাওয়া, চুনিয়াঝোড়া যে-কোনও নদী থেকেই আনা যেত। এত দূরে ঠেঙিয়ে আসার দরকার কী ?

তবে ?

পাথর রে, পাথর। নদীর বিছানা থেকে পাথর আনতে যাওয়া-আসা করে ট্রাক।

এখানে নানা রকমের ধাতু আছে, না ? ঋজুদা ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

নিশ্চয়ই।

ঋজুদা বলল।

কী ? কী ? ঋজুদা ?

ডলোমাইট, লাইমস্টোন, ক্যালকারিয়াস টুফা, কপার ওর, কয়লা, আয়রন ওর আর ক্লে।

"ওর" কী জিনিস ?

ভটকাই বলল।

ধাতু তো আলাদা থাকে না। পাথরের সঙ্গেই মেশানো থাকে। পাথর থেকে তাদের আলাদা করে তারপর তা গলিয়ে মানুষ নানা কাজে লাগায়। সেই ধাতব পাথরকেই বলে "ORE" বাংলায় বলে 'আকর'।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা নদীর কাছে এসে পৌঁছলাম। এদিকে চিলৌনি, সিঁদুরে গাছ, ডেউয়া, ডুমুর এবং আকাতরু গাছ দেখা গেল। বহেড়া এবং আমলকী। যদিও হিমালয়ের পাদদেশকে বলে তেরাই, এই সব কিন্তু "ভাব্বার" অঞ্চল। এ অঞ্চলে জল থাকে ভূস্তরের অনেকই নীচে। গাছেদের অনেক গভীরে শিকড় নামিয়ে দিতে হয় জল পাওয়ার জন্যে। এই শিকড়দের বলে "Tap Roots"। সুন্দরবনের ম্যাংগ্রোভ জঙ্গলের গাছেদের শিকড়দের যেমন বলে, "Aerial Roots"।

একরকমের মাঝারি গাছ দেখিয়ে ঋজুদা বলল, এগুলোর নেপালি নাম কী

জানিস ?

কী ?

ঝিমুনি। দ্যাখ, পাতাগুলো দেবদারু ও লিচুপাতার মতন। আর ওই যে দ্যাখ, মেড়া গাছ। ঘন সবুজ পাতা। বেনটিক লতা, বউভোনিয়া লতা।

এই বউভোনিয়াই কি Bauhinia Valli ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঋজুদা বলল, কার-রে-ক্ট। শেষ শব্দটির ওপর জোর দিয়ে।

তারপর বলল, এদের স্থানীয় নাম ভেড়লা।

ভেড়লা ? কী নাম রে বাবা !

ভটকাই বলল।

রাইফেল-বন্দুক সঙ্গে কিছুই নেই। "কড়াক-পিং" করতে পারছে না। ভটকাই-এর মন ভাল নেই। উদাসী-উদাসী ভাব। নিনিকুমারীর বাঘ মারার অ্যাডভেঞ্চারের পরে তো মণিপুরের ইম্ফল আর নাগাল্যান্ডের "কাঙ্গপোকপি"তে যাওয়া হয়েছিল মৃত্যু-রহস্যর কিনারা করতে। সেখানেও বন্দুক-রাইফেলের দরকার ছিল না। ছিল পিস্তলের।

এবারে বনের বুকের কোরক আর মাথার উপরে পাতার সবুজ চাঁদোয়ার ছায়া পেরিয়ে আমরা নদীর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

আঃ। অপূর্ব !

ভটকাই-ই বলল প্রথমে।

সত্যিই অপূর্ব। আমার মুখ থেকে অনবধানেই বাক্যটা বেরিয়ে এল।

ঋজুদা কিছুই না বলে, সেদিকে চেয়ে পাইপের পোড়া ছাই ঝেড়ে ফেলে পাইপে নতুন তামাক ভরতে লাগল।

তোমার এই তামাকটার গন্ধ ভারী ভাল ঋজুদা। কী তামাক ?

গ্ল্যামার। চেরী র‍্যাভেন্ডিশ। ডাচ টোব্যাকো। হল্যান্ডে তৈরি। গত সপ্তাহে, ডিটার রাইমেনস্নাইডার ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে নিয়ে এসেছিল আমার জন্যে।

তিনি আছেন কেমন ? আমাকে ডাকলে না ?

আমি বললাম।

ভালই। তিন দিনের জন্যে এসেছিলেন। খুব ব্যস্ত, তাই...

বাঃ। দারুণ সুন্দর গন্ধ কিন্তু। যারা কাছে থাকে তাদের দিলখুশ হয়ে যায়।

রোদ আস্তে আস্তে পড়ে আসছে।

নদীর ওপারে ভুটান। প্রায় হাজার ফিট উঁচু খাড়া পাহাড় চলে গেছে বরাবর নদীর সমান্তরালে। আর সেই পাহাড়ের পেছনে ঢেউ-এর পর ঢেউ-এ পাহাড় মাথা তুলেছে। ক্রমশ সবুজ থেকে কালচে হয়েছে তাদের রং, কাছ থেকে যত দূরে গেছে। পাহাড়ের পায়ের কাছেই নদীর দুধলি জলধারা বেগে নীচের

পাথরে হোঁচট খেতে খেতে চলকে-ছলকে বিভিন্ন-রঙা পাথরের উপর দিয়ে, বিভিন্ন সমতার তল বেয়ে বেগে ধেয়ে চলেছে। আসলে, জলের তো কোনও রং নেই, অবয়বও নেই। যার বুকে যখন থাকে জল তখন তারই রঙের হয়ে যায়। যার উপর দিয়ে বয়ে যায় জল, তারই আয়তনকে সে নিজস্ব করে নেয়। তাই তার রং আর চেহারার এত হাজার রকম।

জোর শব্দ উঠছে সেই উচ্ছল জলরাশি থেকে। বিদায়ী সূর্যের নরম কমলা রোদ, সাদা নুড়িময় শুকনো নদীরেখা, দ্রুতধাবমানা জলরাশি আর তার পেছনের স্থির গম্ভীর পাহাড়শ্রেণী মিলে মিশে হু-হু হাওয়ার মধ্যে এক আশ্চর্য অনড় ছবির সৃষ্টি করেছে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। কথা বলতেও ভুলে গেলাম।

হঠাৎ ঋজুদা পাইপ-ধরা ডান হাতটা তুলে কী যেন দেখাল দূরে।

আমরা দেখলাম, একজোড়া সাদা-কালো Wood Duck ভাঁটা থেকে উজানে, পীপিং-এর দিকের ওয়াঞ্চু নদীর দিকে উড়ে যাচ্ছে, রায়ডাক নদীর বুকের উপর দিয়ে। তাদের সাদা-কালো নরম কোমল ডানা-মেলা সম্ভ্রান্ত উড়াল শরীরে দিনশেষের কমলা আলো পড়ে মাখামাখি হয়ে তাদের যেন সোনার পাখি বলেই মনে হচ্ছে।

যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ চেয়ে রইলাম আমরা সকলেই।

আবার ঋজুদা বলল, ওই দ্যাখ।

বলেই, এগিয়ে চলল জলের দিকে।

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম শিমুলের বীজ-ফাটা তুলো আলতো হয়ে ভেসে আসছে হাওয়াতে দ্রুতগতিতে। সেই জোড়া উড-ডাক যেদিকে উড়ে গেল সেই দিক থেকেই। তুলোর আঁশেরা ধীরে ধীরে উচ্চতা হারিয়ে এসে জলে পড়ছে একেক করে। আর ধাবমানা জল তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড বেগে, যেমন করে আমাদের দেশে হাজার হাজার তীর্থক্ষেত্রে প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা করে, নদীর বুকে পুণ্যার্থীদের ভাসিয়ে-দেওয়া ফুল-পাতার দোনাতে-বসানো প্রদীপগুলি ভেসে যায়।

ভাবছিলাম, কে জানে! এই নির্মল কলুষহীন তীব্র হাওয়া কার বা কাদের মঙ্গল কামনা করে কোন অচিনপুরের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই অগণন বীজ-ফোটা শিমুলের তুলোর প্রদীপ?

ঋজুদা বলল, চল, আমরা পথ দিয়ে না গিয়ে নদীর বুক ধরেই ভুটানঘাট বাংলোতে ফিরে যাই। পাম্প হাউসের কাছে গিয়ে, জল পেরিয়ে উঠব গিয়ে বাংলোর পিছন দিয়ে। ওদিকের জলধারায় স্রোতের বেগও কম। পেরুতে অসুবিধে হবে না।

ভটকাই বলল, চলো।

এই আশ্চর্য সৌন্দর্যর মুখোমুখি হয়েই ভটকাই-এর মতন বাচালও সৌন্দর্যহত

হয়ে একেবারেই নীরব হয়ে গেছে।

আমি বললাম, ঋজুদা।

বলেই, বালিতে দেখালাম, ডান হাতের তর্জনী দিয়ে।

একটা লেপার্ড জল খেয়ে জঙ্গলের দিকে ফিরে গেছে। তার টাটকা পায়ের দাগ বালিতে।

ভটকাই দাঁড়িয়ে পড়ে মনোযোগ সহকারে দেখল।

ঋজুদা বলল, ফিমেল।

তারপরই দেখলাম, আর একটু এগিয়েই একটি বড় বাঘ, মানে টাইগারের পায়ের দাগ। সেও জল খেয়ে জঙ্গলে ফিরে গেছে। তবে ছাপটি দিন চার-পাঁচের পুরনো। বালির উপরে রাতের শিশিরে আর দিনের রোদ-হাওয়াতে ছাঁচ ভেঙে গেছে।

বললাম, পুরুষ বাঘ। তাই না ?

ঋজুদা থুতনিটা নিচু করে সায় দিল।

ঋজুদাও কথা বলছে না কোনও। এমন সৌন্দর্য মানুষকে বোবা করে দেয়। হয়তো কাঁদাতেও পারে। আমার তাই মনে হচ্ছিল ভটকাই-এর সৌন্দর্যহত মুখটির দিকে তাকিয়ে।

এবারে দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে। দিন ও রাতের মধ্যের এই ক্ষণটুকুকেই অর্যমা বলে। সিনে-ক্যামেরার মিক্সিং-এর মতনই ঘটছে এই সন্ধে নামা ব্যাপারটা। নিঃশব্দে। ওপারের ভুটানের দিক থেকে হাতির বৃংহণ ভেসে এল মার্সিডিজ ট্রাকের হর্ন-এর তীক্ষ্ণ আওয়াজের মতন। হাওয়াটা ক্রমশই জোর হচ্ছে এবং ঠাণ্ডা।

নদীতে সামনেই একটি প্রপাত মতন আছে। এক কোমর সমান উঁচু হবে। জল কম, অথচ কী আওয়াজ ! কী স্রোত ! জুতোসুদ্ধু পা একবার ডুবিয়েই মনে হয়েছিল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে রায়ডাক আমাকে বিন্দুমাত্রও হাঁকডাক না করে। ডান দিকের প্রায়ান্ধকার জঙ্গলের মাথার উপরে একজোড়া ওয়াটেল্ড ল্যাপউইং ডাকছিল, ডিড উ্য ডু ইট ? ডিড উ্য ? ডিড উ্য ডু ইট ?

চাঁদটা উঠেছে ভুটান পাহাড়ের পিঠের ওপরে কিন্তু কোনও প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের মতন পাহাড়টার অন্ধকার রোমশ পিঠ সেই আলো শুষে নিচ্ছে। টিটি পাখি দুটো নিশ্চয়ই কোনও মাংসাশী জানোয়ার দেখে থাকবে। সাবধান করছে তৃণভোজীদের। অথবা কোনও নড়াচড়া দেখেছে। হয়তো নদীর পাথর আর বালিভরা বুকে চলমান আমাদের তিনমূর্তিকে দেখেই ডাকছে, তাও হতে পারে। এমন সময়ে আমাদের পেছন থেকে একটা অদৃশ্য কোটরা হরিণ খুব জোরে ব্বাক-ব্বাক-ব্বাক-ব্বাক করে ভয় পাওয়া ডাক ডেকে উঠল।

ভটকাই বলল, বাঘ কি চিতা দেখেছে।

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, রুদ্র সেই গানটা গা তো।

কোন গানটা ঋজুদা ?

সেই যে, "ও আমার দেশের মাটি...." তুই বড় ভাল গাস গানটা।

ভটকাইও যেন নীরবে আমাকে অনুরোধ করল গানটি গাইতে।

আমি ধরলাম :

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার
'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে
বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥"

আমার গানের সঙ্গে সঙ্গে যেন নদীর জলের আওয়াজ আরও জোর হতে লাগল এবং গাঢ় হতে লাগল অন্ধকার।

আমরা তিনজন নুড়ির আর বালির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে লাগলাম আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর দেশের এক সুন্দর কোণে, এক সুন্দরতর সন্ধ্যাতে। গর্বে আমার চোখ জলে ভরে এল, আমরা এই দেশে জন্মেছি যে, এই কথা ভেবে।

কারও মুখেই কোনও কথা ছিল না।

আমরা তিনজনে....

ঋজুদার সঙ্গে অচানকমার-এ

বেলা যদিও হয়েছে, কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার পুবে একটি পাহাড় ছিল। সেটি ডিঙিয়ে আসতে সূর্যের সময় লাগল প্রায় ঘণ্টাখানেক। আমরা বাংলো থেকে অনেকক্ষণ হলই বেরিয়েছি। সূর্যটা সবে উঠছে পাহাড়ের ওপাশে। এখনও এই অচানকমারে শীত শীত ভাব আছে এই মার্চ মাসের মাঝামাঝিতেও।

কলকাতার মানুষ মাত্রই শীতকাতুরে। শীত বলতেও সেখানে মাত্র দেড়-দুমাস। তাও তাকে শীত বললে উত্তর ও মধ্যভারতের এমনকী বিহার, ওড়িশা, আসামের মানুষেরাও হাসেন।

কাল সন্ধেবেলাতেই আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি।

আমরা মানে, ঋজুদা, আমি আর ভটকাই। তিনজনে দাঁড়িয়েছিলাম একটা টিলার উপরে, অচানকমার বনবাংলো থেকে মাইল দুয়েক উত্তরে। সামনে দিয়ে দুধলি সাপের মতন এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটা পাহাড়ি নদী। তার বুকের নুড়িময় সাদা বুকে অতি ধীরে ধীরে পাহাড়-টপকানো সূর্যর কমলারঙা আভা লাগছে, যেমন করে স্থলপদ্মর পাপড়িতে সকালে লালের ছোপ লাগে। এমন ধীরে, যে বোঝা পর্যন্ত যায় না।

রোদ আরও জোর হলে সেই কমলাভাবটি কেটে যাবে। দুধলি অস্পষ্টতা মুছে গিয়ে নদীর জল সাদা হবে, বালির রং গেরুয়া, পাথরের কালো। তখনও রাতের শিশিরে বনজঙ্গল, দূরের ঝিকারপানির পাহাড় সব ভিজে আছে। এই বসন্তের ভোরের বন পাহাড় নদীর এক আশ্চর্য গন্ধ ও মোহ আছে। মুগ্ধতাও।

তিতির, বটের ও ছাতারে ডাকছে চারধার থেকে। টিয়া আর চন্দনার ঝাঁক শন শন করে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক সবুজ তীরের মতন। মাথার উপর দিয়ে। এমনই ব্যস্তসমস্ত হয়ে, যেন কোনও খুবই জরুরি খবর তাদের পৌঁছে দিতে হবে এখুনি কারও কাছে।

রাতের সব পাখিরা এখন চুপ। একেবারেই চুপ। ধীরে ধীরে পাহাড়শ্রেণীর পেছনে পুবের আকাশ লাল হচ্ছে। আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কতকিছু ঘটবার

সম্ভাবনাও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। অন্ধকার রাত পোয়ালে, সবকিছু স্পষ্ট, আলোকময় করে, রাতের সব ভয় ও অনিশ্চিতি দূর করে একটি দিন আসছে অনেক আশার বাণী নিয়ে।

আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কতকগুলো কালো পাথরের স্তূপের পাশে। এই রকম স্তূপকেই পুব-আফ্রিকার ঘাসের দিগন্তলীন সমুদ্র, সেরেঙ্গেটিতে বলে "কোপী"। বানান অবশ্য Kopje।

আফ্রিকার সোয়াহিলি ভাষার ব্যাপারই আলাদা। ডাক্তারি শাস্ত্রে যেমন অনেক শব্দেরই আগে একটি করে 'p' যোগ করে দিতে হয়, যেমন নিউমোনিয়া এবং থাইসিসের (টি.বি.) বানান আরম্ভ হয় 'p' দিয়ে, তেমনই সেখানেও অনেক শব্দের আগে 'N' বসে। অদ্ভুতভাবে উচ্চারণ করে তারা শব্দগুলো। যেমন NGORONGORO, NDUTU, অথচ উচ্চারণ গোরোংগোরো, এবং ডুটু।

এসব কথা আমি ঋজুদা আর তিতির জানি। ভটকাই চন্দ্র তো মাত্র সেদিন ঢুকেছে আমাদের দলে। তাও আমারই লাগাতার সুপারিশে। আফ্রিকাতে তো ও যায়নি। "গুগুনোগুম্বারের দেশে"-তে অবশ্য শুধুই আমি আর ঋজুদাই গেছিলাম। তারপর ভুষুণ্ডার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে, পরে আবারও যখন "রুআহাতে" গেছিলাম তখন তিতির গেছিল আমাদের সঙ্গে। তাই ভাবছিলাম, ভটকাইকে আফ্রিকার কথা বলে লাভ নেই। এমনিতেই তো ওর আগবাড়ানো মাতব্বরি আর ডেঁপোমিতে আমি একেবারেই বিরক্ত। ঋজুদা যে ওকে শাসন কেন করে না জানি না। তিতির এখন দিল্লিতে পড়াশোনা করছে তাই কিছুদিন হল আমাদের সঙ্গ দিতে পারবে না।

—এটা কী নদী ? ঋজুদা ?

—মানে ?

—মানে, নদীর নামটা কী ? তুমি তো এর আগে অনেকই বার এসেছ।

ফাটা শুরু হল সাতসকালেই। ভটকাই-এর লাগাতার কথার ধানি-পটকা।

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে আমরা মধ্যপ্রদেশের এই অচানকমার-এর আশ্চর্য সুন্দর এক চৈত্রসকালের শান্তিতে যে বুঁদ হয়ে ছিলাম সেই শান্তি ছিঁড়েখুঁড়ে গেল।

ঋজুদার পাইপের ইংলিশ 'গোল্ডব্লক' তামাকের গন্ধে এই মিশ্রগন্ধী সকাল আরও সুগন্ধী হয়ে উঠেছিল।

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে ঋজুদা বলল, মনিয়ারী কৈরাহা।

বাঃ।

আমি বললাম অজানিতেই। কী সুন্দর নাম। নদীর নাম মনিয়ারী কৈরাহা ?

হ্যাঁ।

আর সামনে ওই যে পাহাড়টা দেখছিস ওটার নাম ঝিকারপানি।

তুমি না বললে বিন্ধ্যপর্বতমালা। ভটকাই ফুট কাটল।

তাই তো। 'পর্বতমালা' মানেইতো অনেক পর্বতের সমষ্টি। পর্বতের মধ্যে কত শত পাহাড় থাকে। তাদের নামও থাকে। এই ঝিকারপানিরই মতো অসংখ্য নামও দেয় স্থানীয় মানুষেরা তাদের। আর শুধু বিন্ধ্যই তো নয়! মাইকাল পর্বতমালাও আছে ডানদিকে।

তারপর পাইপে একটা টান লাগিয়ে বলল, অমরকণ্টকের নাম শুনেছিস?

হ্যাঁ।

ভটকাই বলল।

তারপর বলল, জ্যাঠাইমা পটলাদাদাদের সঙ্গে সেখানে তীর্থ করতে গেছিলেন একবার। আমি যখন ছোট ছিলাম।

তুই এখনও ছোটই আছিস।

ঋজুদা বলল।

যদিও পেকে ঝুনো হয়ে গেছিস।

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, তুই ভুল বললি রুদ্র। বল, এঁচড়ে পেকে গেছে।

ঠিক তাই।

ফুঃ! সব এঁচড়ই আজকাল পাকা। কলকাতার কোনও বাজারে জেনুইন এঁচড় কি আর পাওয়া যায়? কারবাইডে পাকানো কাঁঠালই চলে এঁচড় হিসেবে।

তাও ভাল। আমারতো মাঝেমাঝে ইচ্ছে হয় যে তোকে 'কিলিয়ে কাঁঠাল' পাকাই।

তার মানে?

ভটকাই তার খরগোশের মতন বড় বড় কানদুটি তুলে আমাকে আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করল।

মানে আবার কী? কারবাইডে না পাকিয়ে কিল মেরেমেরেও যে এঁচড়কে কাঁঠাল করা যায়, তা কি জানিস?

ভটকাই আমার দিকে একটি জ্বলন্ত চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ঋজুদা, সকালেই আরম্ভ করেছে কিন্তু তোমার ওরিজিনাল চেলা।

বলেই বলল, আসল ব্যাপারটা কী জানো তো?

কী?

সেই নিনিকুমারীর মানুষখেকো বাঘ মারতে যাওয়ার সময়ে আমার সাহস এবং এলেম দেখার পর থেকেই ও 'জে'।

'জে' মানে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জে' মানে জানো না? 'জে' ফর জেলাসি। ঈর্ষা। পিওর অ্যান্ড সিম্পল

ঈর্ষা। আরে ঈর্ষা করেই তো বাঙালি জাতটা গোল্লায় গেল। আমাকে ঈর্ষা না করে, কী করে আমার মতো ঈর্ষণীয় হতে পারিস তার চেষ্টা কর, ভাল কাজে সময় ব্যয় কর, উন্নতি হবে।

ঋজুদা বলল, চল। এদিকটা মোটামুটি দেখা হল তবে ব্রেকফাস্ট-এর পরেই সারাদিনের মতো বেরোতে হবে চারধার ভাল করে দেখার জন্যে।

ভটকাই বলল, একেই তো বলে scouting। তাই নয়?

ঋজুদা কথা না বলে, মাথা নাড়ল।

আমরা অচানকমার বনবাংলোর দিকে ফিরে চললাম।

এতক্ষণে হয়তো শিকারি দুখু গোঁন্দ এসে বসে আছে।

আমি বললাম।

হুঁ। ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ওসমানসাহেব ব্রেকফাস্ট করবেন আমাদের সঙ্গে। অচানকমারের ম্যান-ইটিং টাইগার সম্বন্ধে পুরো ব্রিফিং করে যাবেন আমাদের। যদিও গত মাসে যখন কলিয়ারির কাজে এখানে এসেছিলাম, কনসার্ভেটর সাহেব মোটামুটি জানিয়েছেন যা জানানোর। মাত্র তিনমাসে পনেরোটি মানুষ খেয়েছে বাঘটা। অনেক মানুষখেকো বাঘ ও লেপার্ড দেখেছি। মেরেওছি কম নয়। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে এত মানুষ আর কোনও মানুষখেকো মেরেছে বলে জানি না। আমার অভিজ্ঞতাতে অন্তত নেই।

বাঘটার কোনো Wound আছে নিশ্চয়ই। যে কারণে মানুষের মতন প্রতিরোধহীন প্রাণী ছাড়া অন্য কোনও প্রাণী শিকার করারই ক্ষমতা তার নেই।

আমি বললাম।

ঋজুদা পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, could be!

আমরা টিলা থেকে নেমে আস্তে আস্তে অচানকমার বাংলোর দিকে ফিরে যেতে লাগলাম। আমরা নিরস্ত্র। শুধু ভটকাই-এর কাঁধে বারো-বোরের দোনলা বন্দুক। ঋজুদার পারমিশানে আমাদের খাওয়ার জন্যে একটা মাত্র মুরগি অথবা খরগোস মারার অলিখিত পারমিট সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে।

বন্দুকটা কিন্তু দারুণ। ইটালিয়ান বন্দুক। ব্যারেটা। ওভার-আন্ডার। মানে বন্দুকের নল দুটি পাশাপাশি নয়। উপরে নীচে। ইটালির ব্যারেটা কোম্পানিতে নিজের হাতের ও কনুইয়ের দৈর্ঘ্য, কব্জি থেকে তর্জনীর দূরত্ব, নিজের মুখের মাপ সব পাঠিয়ে Custom-built করিয়েছিল ঋজুদা এটিকে বহুদিন আগে। পয়সা অবশ্য ঋজুদা দেয়নি। আমরা হাজারীবাগের মুলিমালোঁয়ার 'অ্যালবিনো' রহস্য ভেদ করার পরে বিষেনদেওবাবুই ঋজুদাকে জোর করে প্রেজেন্ট করেছিলেন। তখনকার দিনেই আমাদের দেশের টাকাতে লাখখানেক টাকা দাম পড়েছিল। ওঁদের অভ্র রপ্তানির পয়সা ছিল অঢেল।

বিদেশি মুদ্রাতে দিতেও কোনও অসুবিধেও হয়নি।

সকালে এক কাপ চা না খেয়ে কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে কোথাওই যাওয়া সম্ভব নয়। ঘুম পাচ্ছে এখনও আমার।

ভটকাই বলল, ব্যাজার মুখে।

আমি হাসলাম।

হাসির কী হল এতে ? তুমিও কি সকালে চা খাও না ? নাকি রবীন্দ্রনাথের মতন নিমপাতার রস খাও ?

ভটকাই বলল।

না। সেজন্যে নয়। নিজেকে ভদ্রলোক বললি তো ! তাই। তা ছাড়া, সারাটা জীবনই তো তুই ঘুমোলিই। ঘুম থেকে উঠলি আর কখন ? কুম্ভকর্ণ Incarnated। তোকে মাধব স্যার বলতেন না স্কুলে ? মনে নেই ? এই যে বৎস ভটকাই, ঘুম কি ভাঙল ?

তারপরই মাধব স্যার আমাদের বলতেন, ওরে, তোরা ওকে একটু চটকে দিয়ে দেখত মটকা মেরে আছে, না সত্যিই ঘুমোচ্ছে ? মাধব স্যারের সেই কথা থেকেই 'ওরে ওরে ভটকাই, আয় তোরে চটকাই' এই শ্লোগানের জন্ম।

ঋজুদা বলল, তাই ? শ্লোগানটা শুনেছিলাম কিন্তু প্রেক্ষাপট জানতাম না।

তারপর বলল, চল ফিরে বাংলোতে। গরম গরম পরোটা, ডিম-এর ভুজিয়া, বেগুন ভাজা লাল করে, সঙ্গে শেওতারাই এর কালা জামুন।

ভটকাই বলল, আর বিলাসপুরের বেঙ্গল সুইটস-এর সন্দেশের কথাটাই ভুলে গেলে ! এস. ই. সি. এল-এর সুভাষ চৌধুরী সাহেব আনিয়ে দিলেন না ?

ঋজুদা বলল, ঠিক।

আমি বললাম, ভারী গুণী মানুষ কিন্তু ভদ্রলোক। কী দারুণ ওড়িয়া এবং হিন্দী বলেন।

ঋজুদা বলল, চৌধুরী সাহেব আবার মামুলি হিন্দি নয়, একেবারে দূরদর্শনের আগমার্কা হিন্দি বলেন।

কী রকম ?

গতবারে আমাকে স্টেশানে তুলে দিতে এসে একজন চেকারকে বিলাসপুর স্টেশানে শুধিয়েছিলেন, "বম্বে-হাওড়া মেইলকি স্থিতি ক্যা হ্যায় ?"

মানে ? ভটকাই বলল।

মানে, ট্রেনটার অবস্থিতি আর কি ! কত লেট আছে ? আদৌ লেট আছে কি না এবং দুর্গ থেকে ছেড়ে এসেছে কি না।

দুর্গ। কোথাকার দুর্গ ?

ভটকাই বলল।

সকাল সকাল বাগে পেয়েই একটু কড়কে দিলাম ওকে। যাকে বলে 'Nipped in the bud'। বললাম, ওরে মূর্খ। সাহিত্য বা বিজ্ঞান এসব তো

কিছু পড়িসইনি, ভূগোলটাও কি পড়িসনি ? মধ্যপ্রদেশে যে দুর্গ (দুরগ) বলে একটি বড় জায়গা আছে তাও জানিস না ? জায়গাটার নাম দুর্গ, পালামৌর বেতলার দুর্গ নয়। "মুর্গ-মুসল্লম্"-এর "মুর্গ"-এর মতো উচ্চারণ। বুঝেছিস ভোঁদাই রাম।

ভটকাই চুপ করে গেল।

॥ দুই ॥

আমরা বাংলোটির বাঁপাশ দিয়ে আসছিলাম, অচানকমার বাংলোর কাছাকাছি আসতেই, দেখা গেল একটি জলপাই-সবুজ জিপ দাঁড়িয়ে আছে বাংলোর সামনে।

ঋজুদা বলল, কী হল ! ডি. এফ. ও. ওসমান সাহেবের তো আসার কথা সাড়ে আটটাতে। বিলাসপুর থেকে আসবেন। এত আগে এলেন যে !

ভটকাই বলল, নিশ্চয়ই কোনও গড়বড়-সড়বর, কোনও গুবলেট হয়েছে।

ভটকাই এর বাগবাজারি ভাষাই ওরকম।

যখন আমরা বাংলোতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন কিন্তু দেখা গেল ভটকাই ঠিকই ধরেছিল।

দূর থেকে আমাদের দেখেই ডি. এফ. ও. ওসমান সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, ওয়্যারলেস-এ খবর পেয়ে আসছি। লমনির পেছনে গণিয়া বস্তীর একটি যুবতীকে বাঘে নিয়েছে আজই খুব ভোরে। মেয়েদের চার পাঁচজনের একটি দল মহুয়া কুড়োতে গেছিল। তার মধ্যে থেকে একজনকে নিয়েছে। এখুনি গেলে হয়তো আপনাদের পরিশ্রমের লাঘব হবে। আজই মানুষখেকো নিধন হবে।

ভটকাই এর মুখের দিকে তাকিয়ে ঋজুদা বলল, মানুষখেকো কি অত সহজে মারা যাবে ? সন্দেহ আছে।

ভটকাই এর মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। ফিসফিস করে আমাকে বলল, ব্রেকফাস্ট ?

কিন্তু স্যার চেষ্টা তো করতে হবে। আপনিই তো ভরসা। কনসার্ভেটর সাহেব তো তাই বলেছেন আমাদের। আপনি পারবেনই। অন্যেরা বিফল হলেও।

ওসমান সাহেব বললেন।

তারপরই বললেন, চলুন। তাড়াতাড়ি বেরিয়েই পড়া যাক। আতারিয়া বনবাংলোতে ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ দুইয়েরই বন্দোবস্ত করতে বলেছি ওয়্যারলেস-এ।

আতারিয়া কেন ? লামনিতে থাকা নয় কেন ?

ভটকাই বলল।

সাহস কম নয়! ঋজুদা থাকতে এমন মাতব্বরী! সত্যিই ভাবা যায় না!

ভাবছিলাম আমি।

লামনি বাংলোটা কেঁওচির দিকে যাওয়ার বড় রাস্তার ওপরে। এপথ দিয়েই তো পেন্ড্রা রোড, অমরকণ্টক, সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস এর সুহাগপুরের সব কলিয়ারিতে যাওয়ার পথ। ঋজু বোস-এর মতন সেলিব্রিটিকে ওই বাংলোতে রাখলে জানাজানি হয়ে গেলে মিঃ বোসেরই অসুবিধে হবে। মধ্যপ্রদেশ তো এখন বাঙালি ট্যুওরিস্টদের স্বর্গরাজ্য হয়ে গেছে। শিক্ষিত বাঙালিরা যদি জানতে পারে যে ঋজু বোস লামনি বাংলোতে আছেন তবে ভিড় সামলাতে পুলিশ ডাকতে হবে।

ঋজুদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই সবই রুদ্রর কাণ্ড। যত্ত বাজে কাণ্ডমাণ্ড সব।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, বানিয়ে বানিয়ে আরও গপ্প লেখো। "ঋজুদা কাহিনী"। জীবনে যে কারণে সিনেমাতেই নামলাম না, তুই আমাকে নিয়ে গপ্প লিখে সেই বিপদেই ফেললি শেষে। কোনও মানুষ সেলিব্রিটি হয় মানুষের সাতজন্মের পাপ থাকলে। নিজের Personal life বলে কিছু থাকবার জো আছে! "ল্যাংড়া পাহান" বাঘেরই মতন সকলেই আঙুল তুলে দেখিয়ে বলবে, ওই যায়! ওই যায়!

ইতিমধ্যে অচানকমার বাংলোর চৌকিদার সন্তরাম চা নিয়ে এল ট্রেতে করে। আমরা বারান্দাতে বসে এক কাপ করে চা খেয়েই আপাতত একদিনের মতন জামা-কাপড় রাইফেল-বন্দুক-গুলি-দূরবীন সব নিয়ে তাড়াতাড়ি জিপে উঠলাম।

ঋজুদাই বলল, এখানে সময় নষ্ট করার মানে হয় না।

অন্য সবকিছুই অচানকমারে পড়ে রইল। কনসার্ভেটর সাহেব চৌকিদার সন্তরামকে বললেন, সব ঠিক-ঠাক করে দেখে রেখো সন্তরাম। সাহেবরা কখন ফিরবেন তা ওয়্যারলেস-এ তোমাকে জানিয়ে দেব।

জী সাব।

Attention-এ দাঁড়িয়ে বলল, সন্তরাম। মধ্যপ্রদেশের বনবিভাগেও পুলিশ বিভাগের মতন নিয়মানুবর্তিতা আছে দেখে খুশি হলাম। নিয়মানুবর্তিতা, অথবা নিয়মানুবর্তিতার ভান, যাই হোক।

পৌঁছে দেখলাম, লামনি বনবাংলোটি বেশ বড়। বাইরে থেকেই দেখা গেল একটি মস্ত গামহার গাছ বাংলোর হাতাতে এবং দুটি সুপ্রাচীন বটলব্রাশ-এর গাছ। এত বড় বটল-ব্রাশ গাছ আগে কখনও দেখিনি। আমরা বাংলোর পাশ দিয়ে গিয়ে মাট্টিনালার উপরের কংক্রিটের সাঁকো পেরিয়ে আরও কিছুটা গভীর

গাঢ় জঙ্গলের মধ্যের আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে ডানদিকের কাঁচা রাস্তাতে ঢুকে পড়লাম। লাল মাটির পথ। হাওয়াতে তখনও মহুয়া আর করৌঞ্জ-এর গন্ধ ভাসেনি, নানা-রঙা মরা-পাতার রাশ গালচে পাতেনি প্রতি গাছের নীচে। তবে বাংলোর হাতার মধ্যে যেন আমের বোল আর কাঁঠালের মুচির গন্ধ পেলাম। পেটভরে প্রশ্বাস নিলাম। আঃ।

ভাবছিলাম, আমাদের এই সুন্দর ভারতবর্ষ দেশ হিসেবে এতই বড় ও বিচিত্র যে, একেক জায়গাতে একেক সময়ে পলাশ আর শিমুল ফোটে। মাদার, পারুল, জারুল, মহুয়া, করৌঞ্জ থেকে আম কাঁঠালও। কোথাও ফেব্রুয়ারিতেই আমের বোল আর কাঁঠালের মুচি এসে যায়, কোথাও আবার মার্চের একেবারে শেষে। এত বিচিত্র আবহাওয়া, জমি, গাছ-গাছালি বলেই আমার দেশকে এত ভালবাসি আমি। অবশ্য এই ভালবাসা শিখেছি পুরোপুরি ঋজুদারই কাছ থেকে। জানি না, ঋজুদা যখন থাকবে না তখন কী করব। কী করে এই ভালবাসার দায় বইব। কেউই তো চিরদিন থাকে না। ঋজুদাও থাকবে না। তবে আমি কোনওদিনই চাইনি ঋজুদা বিছানাতে শুয়ে মারা যাক। অমন সাধারণ ছা-পোষা মানুষের মৃত্যু ঋজুদাকে আদৌ মানায় না।

আতারিয়া বাংলোতে পৌঁছেই দেখলাম, পাশ দিয়ে একটি সরু ছোট নদী বয়ে গেছে। গত কয়েকদিন বিন্ধ্য আর মাইকাল পর্বতশ্রেণীতে বেশ ভাল বৃষ্টি হয়েছে। তাই ঘোলা জল চলেছে ঢল নামিয়ে।

ঋজুদা আসবে বলে কয়েকজন মানুষ অপেক্ষা করছিল সেখানে। ওসমানসাহেব একজনকে ডাকলেন। ঋজুদাকে বললেন, এর নাম চৈতুরাম পোর্তে। এই হল লামনির মুখিয়া।

লোকটার চেহারা আমার মোটেই ভাল লাগল না। অত্যন্ত ধূর্ত বলে মনে হল। কয়েকজন মেয়েও ছিল সেখানে। যারা সকালে গেছিল মহুয়া কুড়োতে। ওরা বলল, অঘটনের জায়গাটা নাকি আতারিয়া বাংলো থেকে কাছেই।

ঋজুদা বলল, তোমরা থাকো কোথায় ? কোন গ্রামে ?

গণিয়া।

সেই গ্রামের আশে পাশে মহুয়া গাছ নেই ?

একটা মাত্র আছে। এদিকে মহুয়া গাছ কম।

কথাটা ঠিকই। বিহারের মতন মহুয়াগাছ সম্ভবত অন্য কোনও রাজ্যেই নেই। বড় হতে সময়ও নেয় খুব তারা।

বাবুর্চিখানা থেকে ফার্স্টক্লাস খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা পরোটার গন্ধ ছাড়ছিল। ভটকাই এর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঋজুদা লক্ষ করে একটু বিরক্ত হয়ে বলল, ভটকাই তুই বাংলোতেই থাক। ভাল করে ব্রেকফাস্ট কর। বারান্দাতে বসে নদীর শোভা দেখ।

বলেই, আমাকে বলল, চল রুদ্র।

সাধে কি আর বলে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু !

কিন্তু ঋজু বোস-এর মুখ দিয়ে একবার কথা বেরিয়ে গেলে তা রাইফেলের নল থেকে বেরিয়ে যাওয়া গুলিরই মতন আর ফিরে আসে না।

ভটকাই রীতিমতন কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, আ... আ... আমি !

ঋজুদা বলল, যা বললাম, তাই কর ভটকাই।

তারপর বলল, চলো, চৈতুরাম।

মেয়েদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি বয়সী, তার বয়স, এই উনিশ কুড়ি হবে, তাকে ডেকে নিল ঋজুদা চৈতুরামের সঙ্গে। ওসমান সাহেবকে বলল, আপনি চলে যান বিলাসপুরে।

চলে যাব ? আপনার যদি কোনও দরকার...

কোনও দরকার হবে না। একটি ওয়্যারলেস টেলিফোন লাগানো জিপতো রেখেই যাচ্ছেন আপনি। তবে আর অসুবিধে কী ? তবে আপনি যাওয়ার আগে, প্লিজ, নাস্তা করে যান। মিস্টার ভটকাই আপনাকে কম্পানি দেবে। ও খেতে খুব ভালবাসে। বলতে গেলে, ভাল-মন্দ খেতেই এসেছে ও এখানে। আমারই চেলা তো !

আমি বললাম, চেলা তো আমি ! ও হল, চামুণ্ডা।

ঋজুদা হেসে বলল, ঠিক বলেছিস।

বলেই বলল, তুই ব্যারেটা শটগানটা নে। যা যা গুলি নেবার সব নিয়েছিস তো ?

বললাম, নিয়ে নিচ্ছি।

কাঁদো-কাঁদো মুখে ভটকাই বন্দুক আর গুলির বেল্ট আমাকে দিল। আমি তার থেকে বেছে দুটো লেথাল বল আর চারটে এল. জি. নিয়ে আমার বুশ-শার্ট-এর দু' পকেটে রাখলাম।

ঋজুদা নিয়েছে থার্টি ও সিক্স ম্যানলিকার শুনার রাইফেলটি। আর পাঁচটি গুলি। গুলিগুলি তার বুশ-শার্টের বুকের বাঁদিকের পকেটের খাঁজে গোঁজা। সব গুলিই সফট-নোজড বুলেট।

দূরবীনটাও নিয়ে নে রুদ্র।

ভটকাই-এর গলাতে জার্মানির তৈরি জাইস-এর দূরবীনটা তখনও ঝোলানো ছিল। পরানো—মালার মতন। খুলে নিলাম আমি সেটাকে। ভটকাই-এর মুখের ভাবটা এমনই হল যেন আমি "শুভদৃষ্টির" সময়েই ওর গলার মালাটা খুলে নিলাম।

যাক। বহু বহু বছর পর ভটকাইকে বেশ মনোকষ্ট দিয়ে হেভি আনন্দ পেলাম আমি। কে জানে ! মানুষকে সুখী করে যেরকম আনন্দ পাওয়া যায়, দুখী করে হয়তো তার চেয়েও অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। পাজি

মানুষেরা তাই পায় অন্তত।

তারপরই ভাবলাম, আমি কি পাজি ?

ঋজুদা বলল, মড়ি নিয়ে আসা হয়েছে দাহ করার জন্যে ? মেয়েটির বাড়ির লোকেরা কেউ আসেনি ?

যে মেয়েটি আমাদের সঙ্গে চলল, সে বলল, তার কেউই ছিল না সাহাব। বাবা মারা গেছিল সাপের কামড়ে, তার যখন তিনবছর বয়স তখন। আর মা মারা গেছিল চীচক রোগে। ওর যখন সাত বছর বয়স তখন। তখন থেকেই সে একা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, চীচকটা কী রোগ ?

ঋজুদা বলল, চীচক মানে বসন্তরোগ। আসল বসন্ত।

একা থাকে যদি তো থাকে কাদের সঙ্গে তা হলে ? একাই থাকত বস্তিতে ?

ঠিক তা নয়।

তবে ?

ঋজুদা আবার প্রশ্ন করল।

মেয়েটি একবার মুখিয়া চৈতুরামের মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, থাকত মুখিয়ার বাড়িতেই। নানা কাজ-কর্ম করত আর তার বদলে খেতে-পরতে পেত।

ও।

ঋজুদা বলল।

আমরা আতারিয়া বাংলোর পেছন দিয়ে একটু এসে একটি পায়ে চলা পথে ঢুকে পড়লাম। যাকে বলে Game track অর্থাৎ জানোয়ারদের চলাচল করার পথ। সে পথে মানুষেরাও যাতায়াত করে। সাবধানে জানোয়ারদের খুরের বা থাবার দাগ দেখতে দেখতে এগোলাম আমরা। শুয়োর, শম্বর, কোটরা, চিতল হরিণ, শজারু, একটি মাদী চিতা এবং বাইসনের দলের দাগও দেখলাম। সম্ভবত এই পথটির একটি মুখ নদীতে আর অন্য মুখ কোনও নুনীতে আছে। নুনী অর্থাৎ Silt Lick, প্রাকৃতিক। বনের মধ্যে কোনও কোনও জায়গাতে লবণাক্ত পাথর অথবা মাটি থাকে। তৃণভোজী জানোয়ারেরা সেই নুন চাটতে আসে। আর তাদের পেছনে পেছনে আসে মাংসাশী জানোয়ারেরা।

কিছুদিন পরেই খরা পড়বে। নদী আর এমন কলরোলে বইবে না। কি আতারিয়া নদী, কি মনিয়ারী কৈরাহা আর কি মাট্টিনালা। তখন জানোয়ারেরা নদীর দিকেই আসবে বেশি করে। খরার সময়ে জঙ্গলে জল থাকবে না। জানোয়ারেরা এখন যায় শোভাযাত্রা করে নুনীতে। আসলে শোভাযাত্রা করে কি আর যায় ! একেক প্রাণী যায় তার সময় সুবিধে মতো, রাতের নানা প্রহরে। শেষ বিকেলের থেকে শেষ রাত অবধি।

আরও কিছুটা যাওয়ার পরে প্রায় কুড়ি মিনিট মতন, একটি টিলা দেখা

গেল। তার চারদিকে, পায়ের কাছে, আঁচলে, নানা হরজাই গাছ, শিশু, বিজা, সাহাজ, কুচি, গামহার, আরও নানা গাছ অথচ টিলাটাতে কেবলই মহুয়া। খুবই প্রাচীন সব মহুয়া।

নাম কী ? এই টিলার ?

মহুয়া টিলা।

মুখিয়া বলল।

এই টিলার উপরেই ধরেছিল বাঘে মেয়েটিকে ?

তা ওই মেয়েটিই বলতে পারবে।

নাম কী তোমার ?

ঋজুদা শুধোল।

রূপকুমারী।

তোমার বন্ধুকে বাঘে কোথায় ধরল ?

তা দেখিনি।

মানে ?

মানে, আমরা সকলেই মহুয়া কুড়োচ্ছিলাম। আলোতো ফুটেছিলই, সূর্যও উঠে গেছিল।

যে অঞ্চলে মানুষখেকো বাঘ এত মানুষ ধরেছে সেখানে তোমরা অন্ধকার থাকতে গ্রাম থেকে বেরোলে কোন সাহসে ?

এই বাঘটাতো দিনের বেলাতেই মানুষ ধরে। রাতে তো একজনকেও ধরেনি। চিতা যদি মানুষখেকো হয়, তবে রাতে ধরে। একবার গামহারগাঁও-এ এক চিতা...

আঃ। বড় বেশি কথা বলিস তুই রূপকুমারী। সাহাব কত বড় মানুষ জানিস ? দেখলি না ডি. এফ. ও. সাহাব পর্যন্ত কীরকম খাতির করলেন সাহাবকে। তোর সঙ্গে এত বেশি কথা কীসের ? যা প্রশ্ন করবেন তারই ঠিকঠাক জবাব দিবি। তোর গেঁহু-বাজরার গাই-বলদের কিসসা শোনার সময় সাহাবের নেই।

ঋজুদা মুখিয়াকে থামিয়ে দিয়ে বলল, না বললে, সব জানব কী করে ! ওকে থামাবার দরকার নেই।

মুখিয়া একটু দমে গিয়ে বলল, ঠিক আছে সাহাব।

বল রূপকুমারী।

আমরা যখন সকলে মহুয়া কুড়োচ্ছি ও...

ওর নাম কী ছিল ?

প্রাণকুমারী।

তারপর ?

ও ওর ঝুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, আমি একটু আসছি। বলে

মহুয়াটিলার ওই পাশে একটু নেমে গেল। একটু নামতেই আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল সে। উৎরাই ছিল তো!

কী করতে গেছিল?

তা বলতে পারব না। জানি না।

বলেই, চোখ নামিয়ে নিল রূপকুমারী নীচে। লজ্জাতে।

আমি বুঝলাম, বাথরুম-টাথরুম করতে গেছিল নিশ্চয়ই।

তারপর?

তারপর আমাদের যখন ফেরার সময় হল তখনও ও এল না দেখে আমরা সকলে একসঙ্গে এগিয়ে নেমে গিয়েও যখন ওকে দেখতে পেলাম না তখন হঠাৎ ঝুমকি বলল, ওকে নিশ্চয়ই বাঘে ধরেছে। সে কথা শোনা মাত্রই আমরা "পড়ি কি মরি" করে দৌড়ে সোজা গ্রামে। তারপর মুখিয়াকে খবর দিতে সে অচানকমার-এর রেঞ্জার সাহেবকে লামনি থেকে একটি ট্রাক ধরে গিয়ে খবর দিল।

তারপর ঋজুদা বলল, টিলাটা চড়তে চড়তে, বাঘকে কেউ কি দেখেছিলে তোমাদের মধ্যে? একজনও?

না হুজৌর।

কোনওরকম আওয়াজ শুনেছিলে কেউ? ধস্তাধস্তির শব্দ-টব্দ?

না হুজৌর।

চৈতুরাম পোর্তে একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলল ঋজুদাকে, লোকমুখে শুনলাম, আপনি নাকি পৃথিবীর সব জঙ্গলেই শিকার করেছেন কিন্তু মানুষখেকো বাঘে বা চিতাতে যখন মানুষ ধরে তা তার পাশের মানুষও যে টের পায় না তাও কি সাহাব জানেন না? বেড়ালে পায়রা ধরলে, পায়রা তবু ডানা ঝটপট করে কিন্তু মানুষখেকো বাঘ কি চিতা যম-এর চেয়েও তো বেশি নিঃশব্দ।

ঋজুদা পূর্ণ দৃষ্টিতে চৈতুরামের মুখে একবার তাকাল।

তারপর বলল, তাই বুঝি? তা, তোমরা বনজঙ্গলেই তো চিরটাকাল থাকো, তোমরা আমার মতন শহুরে মানুষের চেয়ে বেশি জানবে বইকী। আমার জ্ঞান তোমাদের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়।

আমি ভাবছিলাম, চৈতুরামের কথাটা তো ঠিকই। একটি ছাগলের শিং আছে, পায়ে খুর আছে। সেও আক্রান্ত হলে শিং নাড়ে, পা ছোঁড়ে। সেই তুলনাতে মানুষেরই কিছু করার নেই, মানুষই সবচেয়ে অবল।

ঋজুদা বলল, মেয়েটির মড়ি কে দেখেছে? মানে, লাশ?

সদ্য-সদ্য মানুষখেকো বাঘে-নেওয়া মানুষের লাশ দেখতে গিয়ে কে শখ করে নিজেই লাশ বনতে যাবে বলুন সাহাব? তাও যদি, যাকে নিল তার আপনজন কেউ থাকত তো অন্য কথা। মানে মা, বাবা, দাদা, বোন। ওর তো কেউই ছিল না।

কেন ? তুমি তো ছিলে মুখিয়া। তোমার আশ্রয়েই তো থাকত প্রাণকুমারী।

হ্যাঁ।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল মুখিয়া চৈতুরাম পোর্তে।

তারপর বলল, ওই ছোট জাতের মেয়ের জন্যে নিজের জীবন বরবাদ করবে এমন পাগল তো আমি নই। আমার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম এই ঢের। আমি না থাকলে তো ও এই এতবড়টি হয়েই উঠতে পারত না। ওর হাতে আমরা খেতামও না কখনও। ভুলুয়া কুকুর আর ওর জন্যে দুটি আলাদা থালা ছিল। জাম গাছের গোড়াতে ওদের দুজনকে একই সঙ্গে খাবার দিত আমার বউ। তার জন্যে অত দরদ তো আমার ছিল না। থাকার কথাও ছিল না। তাছাড়া বড় হতেই মেয়েটা ভারি পাজিও হয়ে গেছিল।

পাজি ?

বলেই, ঋজুদা চুপ করে গেল।

ততক্ষণে আমরা মহুয়া টিলার ওই প্রান্তে পৌঁছে গেছি।

ঋজুদা বলল, তোমরা কেউ প্রাণকুমারীকে বাঘে নিতে দেখনি, তার লাশের খোঁজও করনি। বাঘের খাবার দাগ কি ছিল ? মানে, কেউ কি দেখেছিল ? তোমাদের গাঁয়ের আর সব মানুষই বা গেল কোথায় ?

তাদের সকলকেই খেটে খেতে হয় সাহাব। তাদের কি আপনাদের মতন ভাল অবস্থা যে বসে থাকলেও পেট চলবে। যে যার কাজে গেছে। আমিই বলেছি যেতে।

সে কী ? মেয়েটার একটা হদিস না করেই ? তাকে বাঘের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে চলে গেল তারা !

মুখিয়া বলল, বাঘের পায়ের দাগ ওই ঘাসের মধ্যে কী করে দেখা যাবে ?

পায়ের দাগ না হলেও ঘাসের মধ্যে চিহ্ন তো থাকবে কিছু। অতবড় ভারী বিরাট একটা জানোয়ার চলা-ফেরা করলে পায়ের দাগ নাও পড়তে পারে পুরু নরম ঘাসের উপরে, শব্দও না হতে পারে কিন্তু কোনওরকম চিহ্নই পাওয়া যাবে না ? এতো আশ্চর্য কথা।

আমি বললাম।

আপনারা অনেক পড়ে-লিখে বড় শিকারি সাহাব। আপনারা পেলেও পেতে পারেন। আমরা পাইনি।

হুঁ। ঋজুদা বলল, চিন্তান্বিত মুখে।

তারপর বলল, পাব কি না জানি না। চেষ্টা তো করতে হবে। মধ্যপ্রদেশ সরকার এত খরচপত্তর করে আমাদের নিয়ে এসেছেন, মেয়েটাকে বাঘে নিয়ে গেল, আর আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব তাতো হয় না।

তারপরই কী ভেবে, রূপকুমারীর দিকে ফিরে তার দু চোখে নিজের দু চোখ

ঋজুদা বলল, তোমার কী মনে হয় ? রূপকুমারী ?

রূপকুমারী যেন ভয় পেয়ে গেল

বলল, কীসের কী মনে হব হুজৌর ?

না... মানে...

ঋজুদা, ত্রিভুবন পোর্তের দিকে ফিরে বলল, ঠিক আছে। তোমরা সকলেই এবার যেতে পারো। তোমাদের গ্রামে তো একজনও নিষ্কর্মা লোক নেই দেখেছি। এমন কাজ-পাগল গ্রাম ভারতের কোণে কোণে হোক। তা হলে দেশের সব দুর্গতিই মোচন হবে।

মুখিয়ার সঙ্গে যে আরও দুজন লোক ছিল, তারা বলল, আপনারা এ অঞ্চলে নতুন। জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে যেতে পারেন, তা ছাড়া মানুষখেকো বাঘ রয়েছে এ জঙ্গলে। আপনাদের ছেড়ে যাই কী করে ?

ঋজুদা বলল, মানুষখেকো বাঘ মারবার জন্যেই তো এসেছি আমরা। মানে, আমাদের আনানো হয়েছে। বাঘকে ভয় করলে কি আসতাম ! প্রাণকুমারীকে বাঘেই খেল না ঘোগে খেল তা আবিষ্কার করে তারপরেই ফিরব। আমাদের জন্যে তোমাদের কোনওই চিন্তা নেই। তোমরা যাও।

তারপর শক্ত গলায়, হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, যাও।

ওরা বেজার মুখে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরল।

ঋজুদা মুখিয়াকে জিজ্ঞেস করল, প্রাণকুমারী যে ছোট জাতের বললে, কী জাত ছিল ওর ?

পানকা।

মুখিয়া বলল।

ঋজুদা বলল, ও, তাই ?

তারপর ওরা যতক্ষণ না দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ততক্ষণ ওই একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে রইল ঋজুদা।

ওরা চলে গেলে বলল, জানিস রুদ্র, এই পানকাদের ছোট জাত বলল মুখিয়া অথচ এই জাতের কোনও পুরুষের সঙ্গে যদি পথে কোনও অনাত্মীয়া নারীর দেখা হয়, সে বিরাশি বছরেরই হোক কি তিন বছরের, তারা প্রত্যেককেই, হাঁটু গেড়ে বসে, দুহাত পায়ে ঠেকিয়ে প্রণাম করে। এই ওদের সংস্কৃতি। এই পানকাদের যারা ছোট জাত বলে, তারা নিজেরাই অমানুষ।

আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, মধ্যপ্রদেশের এই সব অঞ্চলে কোন কোন আদিবাসী থাকে ?

থাকে তো অনেকই রকম কিন্তু তাদের আর তাদের মতন থাকতে দিলাম কোথায় আমরা, এই শহুরেরা ? আমাদের ভাল যে ওদের ভাল নয়, ওদের নিজেদের ভালত্ব নিয়েই যে ওরা এত হাজার বছর বেঁচে এল হেসে খেলে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, সুখে, সে কথা আমরা মানলাম কই ? মনের সুখের সঙ্গে যে

বড়লোকির কোনও সম্পর্কই নেই এই কথাটা আমরা নিজেরা তো বুঝলামই না ওদেরও কলুষিত করলাম, আমাদের "চাই চাই-খাই খাই" সংস্কৃতি দিয়ে আমাদের সংস্পর্শে এসেই এই সরল, ভাল, আদিবাসীরা এই চৈতুরাম পোর্তেরেই মতন ধূর্ত-ধাউর হয়ে গেছে। লোকটার চোখ দুটো দেখলি ? শেয়ালের মতো।

দেখেছি। আমি বললাম। প্রথম দর্শনেই তাই মনে হয়েছে আমারও।

এবারে চল। কাজে নামা যাক।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, বাঘতো অনেকই শিকার করেছি আমরা কিন্তু প্রাণকুমারীকে অচানকমারের বাঘে মেরেছে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

অবাক হয়ে আমি বললাম, তবে কীসে মেরেছে ?

মেরেছে যে আদৌ সে কথাও এখুনি বলতে পারছি না। তবে তুই তোর বন্দুকের দুই ব্যারেলেই গুলি পুরে রাখ। একটা বাঘ, সে মানুষখেকো হলেও তার মোকাবিলা করা সহজ। আমাদের হয়তো একই সঙ্গে একাধিক বাঘের মোকাবিলা করতে হবে। ভটকাইটাকে শাস্তি দেবার জন্যে বাংলোতে রেখে এলাম। এখন দেখছি, ও থাকলে ভালই হত। তৃতীয় Gun থাকত। কোনও Lead-ই তো নেই !

পেটুক হওয়া এত বড় অপরাধ নয় যে, ঋজুদা, তুমি বেচারিকে কলকাতা থেকে এতদূরে নিয়ে আসার পরেও সে মেক-আপ টেক-আপ নেওয়ার পরও তাকে স্টেজে নামতে দিলে না। তা ছাড়া পেটুক বদনাম হয় ওর একারই, খাই তো আমিও কম নয়।

সেটা ঠিক। অন্যায় হয়েছে আমার। তবে নাটকের এই দৃশ্যে নামেনি তো কী হয়েছে ? এই মঞ্চ Revolving। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই নতুন নতুন দৃশ্য, নতুন নতুন অঙ্ক আসবে। ওর দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। আর ভটকাই তো রীতিমত ওস্তাদ হয়ে উঠেছে আজকাল। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রেই তো দেখানো ভাল। তাই না ? দেখবি, মানুষখেকোটাকে শেষ পর্যন্ত ওই হয়তো মারবে।

মহুয়া-টিলার যেদিকে আঙুল দিয়ে রূপকুমারী দেখিয়েছিল, প্রাণকুমারী নেমে গেছে বলে, ঋজুদা সেদিকে না গিয়ে তার ডানদিকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেল। আর আমাকে বলল, তুই বাঁ দিকে নেমে যা। খুব ভাল করে খুঁজতে হবে। বাঘের কোনও চিহ্ন, মড়ির কোনও চিহ্ন, একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ের কোনও চিহ্ন, কোনওরকম চিহ্ন, কানের দুল, জামা বা শাড়ির টুকরো, মাথার চুল কিছু পাওয়া যায় কি না। আর সেই সঙ্গে সবসময়ে সজাগ থাকবি। কান খাড়া রাখবি। যে-কোনও মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে।

মানুষখেকোর কাছ থেকে ?

না। মানুষখেকো এ জঙ্গলে নেই।

মানে ?

মানে, অচানকমারে অবশ্যই আছে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে বড় রাস্তার, মানে শেওতারাই থেকে অচানকমার এবং লামনি হয়ে যে পথটি কেঁওচি চলে গেছে তার ডানদিকে ওই বাঘ কখনও আসে না। কনসার্ভেটরের ঘরে বসে আমি ম্যাপ দেখে এসেছি। যতগুলো kill এই মানুষখেকো করেছে তার একটিও এই বড় রাস্তার ডানদিকের কোনও গ্রামেই হয়নি আজ অবধি।

কেন ?

কেন তা বলা মুশকিল। তবে কারণ অবশ্যই আছে। আমার মনে হয়, বাঘটা এই পথের ডানদিকের কোনও জঙ্গলে গুলি খেয়ে থাকবে। যারা বাঘটাকে দেখেছে তারা সকলেই বলেছে বাঘটা কেমন ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে চলে। চোট না পেলে, তার শরীরে আঘাত ও অস্বস্তি না থাকলে সে ক্রমান্বয়ে এবং এত ঘনঘন মানুষই বা মেরে চলবে কেন ? বাঘটা বুড়োও নয়।

কী করে বুঝলে ?

বুড়ো হলে তার এত রাক্ষসের মতন খিদে থাকত না। বাঘটা জোয়ান বাঘ। পায়ের দাগ যারাই দেখেছে তারা সকলেই বলেছে নাকি।

এরকম কি হয় কখনও ? মানুষ মারছে ধড়াধ্বড় আর রাস্তার ডানদিকে তার ‘No Entry’। ডানদিকটা ‘Out of Bounds’। আশ্চর্য তো !

কিমাশ্চর্যমতঃপরম। বৎস, পারব্বালাম্। পারব্বালাম্। টিক্কে থই ধরো, সব্ব বুঝি পারিবে।

একইসঙ্গে ঋজুদার সংস্কৃত, তামিল এবং ওড়িয়া বাণী শুনে তো আমার অবস্থা কাহিল। অতএব ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায়ও নেই।

ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার আগে ঋজুদা মহুয়াটিলার পাশে, মানে আতারিয়া বনবাংলোর দিকে একটা প্রকাণ্ড বড় কুসুম গাছ দেখিয়ে বলল, আমি বারোটার সময়ে ওই গাছটার নীচে তোর জন্যে অপেক্ষা করব। আগেই আসতে পারি। তুইও আগে আসতে পারিস তোর তদন্ত সেরে।

আশা করি কুসুম গাছটা চিনতে তোর অসুবিধে হবে না কোনও।

আমি বললাম, বসন্তবনের কুসুম গাছ চেনা আবার কঠিন কী ? নতুন ফিনফিনে ফিকে-মেরুন রঙা পাতাতে তো ভরে রয়েছে গাছ। যারা জানে না, তারা মনে করে ফুলই ফুটেছে বুঝি। চলে আসব আমি ঠিক। নো প্রবলেম।

তারপরে ঋজুদা বলল, তবে একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, প্রাণকুমারীকে বাঘে নেয়নি। ওই চৈতুরাম পোর্তের খারাপ ব্যবহারের হাত থেকে বাঁচতেই হয়তো সে পালিয়ে গেছে। নয়তো তার অন্য কিছু হয়েছে।

মানুষখেকো বাঘ মারতেই তো আমাদের এনেছেন ওঁরা। নিরুদ্দিষ্টর তদন্ত করতে তো আনেননি। আমি বললাম।

নিমকহারামি করিস না তো ! যাদের ঘাড়ে চড়ে মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ে

এলি তাদের প্রতি কিছু তো কর্তব্যবোধ থাকবে ! It's all in the *game!* তা ছাড়া, অচানকমারের মানুষখেকো যে 'আমরা মারতে পারবই' এমন গ্যারান্টিই বা দেব কী করে ? ওড়িশার 'নিনিকুমারীর বাঘ'-এর কথা তোর মনে নেই ? আমরা তো হতাশ হয়ে ফিরেই যাচ্ছিলাম না মারতে পেরে। হাজারীবাগের 'অ্যালবিনো'র কথাও ? সাদা বাঘ মারতে গিয়ে কী গোয়েন্দাগিরিই না করতে হয়েছিল। বাব্বাঃ।

তা অবশ্য ঠিক।

আমি নেমে গেলাম। খুব সাবধানে মাটির দিকে চোখ রেখে এগোতে লাগলাম।

ঋজুদা যখন বলেছে যে, বাঘ এদিকে আসে না তখন বেদবাক্য বলেই মেনে নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু বনজঙ্গলের নিয়মকানুন আলাদা। সে কথা ঋজুদাও জানে। বেদবাক্যই হোক কি পিতৃবাক্যই হোক বনে-জঙ্গলে এবং বিশেষ করে মানুষখেকো বাঘের বা চিতার ব্যাপারে আমি কারও কথাতেই চলতে রাজি নই। ঋজু বোস, ঋজু বোসই। কিন্তু আমার শিক্ষানবিশিও তো কম দিন হল না। এই শিক্ষা ঋজুদারই দেওয়া। ঋজুদা বলে, আমি ভগবান নই। ভুল সকলের হতে পারে। আমার কথা, বাধ্য ছেলের মতন সবসময়েই মেনে নিস না। নিজের বিচার-বুদ্ধিতে চলবি, এখন তো তুইও পাকা শিকারি।

ঋজুদার শাগির্দ হওয়া আরম্ভ হয়েছিল যখন আমার বয়স ছিল মাত্র দশ-এগারো। তারপর আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি ও রুআহা, বিহারে হাজারীবাগ, ওড়িশার লবঙ্গী, মধ্যপ্রদেশের সুফ্‌কর (অবশ্য সুফ্‌কর-এ শিকার করিনি, ঋজুদার মুখে সেখানের সেই মারাত্মক বাঘের গা-শিউরানো গল্প শুনেছিলাম) আরও কত জায়গাতে কত অভিজ্ঞতা হল। কথাতেই বলে, "গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা মিলে এক"। যদি ঋজুদার মতন গুরু পেয়েও যোগ্য চেলা এতদিনে না হয়ে উঠতে পারি তবে সে তো গুরুরই অসম্মান !

এই চৈত্রদিনের বনের সৌন্দর্য যে কী রকম তা বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তেমন ভাষা বা বিদ্যা আমার নেই। এখন চৈত্রর মাঝামাঝি। শোভা এখনও পুরো খোলেনি। যত দিন যাবে ততই খুলবে। রঙবাহারি হবে বনভূমি। কাঁচপোকা উড়বে। নানারঙা প্রজাপতির ঝাঁক ঘুরবে। মনে হবে, "বনময়, ওরা কার কথা কয় রে !"

মুখ নিচু করে কোনওরকম চিহ্ন, বাঘের অথবা মেয়েটির পাওয়া যায় কি না, তা দেখতে দেখতে চলেছি। অথচ মুখ নিচু করে জঙ্গলে চলা আদৌ উচিত নয়। বিপদ উপরেও থাকে। উপরে তাকিয়ে চলার অভ্যাস নেই বলেই বাঘের মতন মহাবলী প্রাণী এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিকারি, মানুষের মতন চামচিকের হাতে বেঘোরে মারা পড়ে, যেসব শিকারি মানুষ, গাছের উপরে মাচা বেঁধে বসে থাকে, সেই সব মানুষের হাতে। তাই, মাঝে মাঝে উপরেও তাকাচ্ছি।

বন্দুকের বাটটা ডান বগলের নীচে ধরে আর ডান হাতের আঙুলগুলি দিয়ে "স্মল অফ দ্যা বাট"কে ধরে খুব আস্তে আস্তে এক পা এক পা করে এগিয়েও এখন পর্যন্ত কিছুই চোখে পড়েনি সন্দেহজনক।

প্রায় আধ-ঘন্টাটাক হেঁটেছি। পাহাড় ছেড়ে সমতলে নেমে এসেছি। রোদ এখন পুরো জঙ্গলের আনাচ-কানাচেও পৌঁছে গেছে। অনেক পর্ণমোচী গাছের পাতা ঝরে গেছে। সেসব গাছে নতুন পাতা আসেনি এখনও। অনেক গাছে আবার এসেওছে। আবার কিছু গাছ আছে আমাদের বন-পাহাড়ে, যে-সব গাছের পাতা কখনওই ঝরে না। তারা চিরসবুজ।

জঙ্গলে একা একা এমন করে হাঁটতে হাঁটতে নেশা লেগে যায় আমার এমন যে, মনেই থাকে না বন কেবল সৌন্দর্যরই নয়, সেখানে নানারকম বিপদও আছে। কিন্তু সব বিপদকেই তুচ্ছ করতে ইচ্ছে যায়। সামনেই একদল ছাতারে পাখি ছ্যা ছ্যা করছে। কতগুলো পুটুস ঝোপের নীচে। পুটুস-এ ফুল এসেছে। গাঢ় কমলা-রঙা। নানারঙা পুটুসের ফুল, ফলে যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে। এমন কী একই অঞ্চলেও। এর ইংরেজি নাম Lantana। ভারতের প্রায় সর্বত্রই এবং সমুদ্রর সমতা থেকে হাজার দেড় হাজার ফিট অবধি এই ঝাড় দেখা যায়। এই পুটুস বা Lantana-র ঝাড় চিতা বাঘ আর তিতির-বটেরের এবং খরগোশেরও খাসা আস্তানা।

ছাতারেদের ডানদিকে একটি ছোট টিলা মতো ছিল সামনে, সেটাতে উঠে ভাল করে নজর করব চারদিকে যেই ভাবলাম, ঠিক তখনই আমার চোখ পড়ল একটি পথের উপরে। পায়ে চলা পথ নয়। তার চেয়ে চওড়া। জিপের চাকার দাগও আছে। তবে সম্ভবত ট্রাক যায় না। অনেকদিন আগে যখন এই শালের জঙ্গলে Coppice Felling হয়েছিল সম্ভবত, তখন ঠিকাদারদের ট্রাক যাওয়া-আসা করত। এখন অনেক বর্ষাতে নানা আগাছার চারা জন্মে গেছে। জঙ্গল পুনর্দখল নিয়েছে তার জমিদারির। তবে চারাগাছগুলো কোথাওই হাঁটুর চেয়ে বেশি উঁচু নয়। তা ঠেলে সহজেই জিপ যেতে পারে এবং হয়তো যায়ও। হয়তো চোরা শিকারিদের জিপ। রাতের বেলা আসে তারা চেকনাকা এড়িয়ে, ঘোরা পথে।

সেই পথে নেমে এলাম আমি আস্তে আস্তে এবং নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠলাম। একটা মস্ত দাঁতাল শুয়োর, ওজনে প্রায় দেড় থেকে দুই কুইন্টাল হবে, সেই পথের উপরে শুয়ে আছে পাশ ফিরে। যেন অপেক্ষাতে আছে, কেউ তাকে জম্পেশ করে ঘুমুবার জন্যে একটি কোলবালিশ এনে দেবে বলে।

পথের সেই জায়গাটি গভীর ছায়াচ্ছন্ন। একটু স্যাঁতস্যাতেও। তার মানে, জল আছে কাছে পিঠে। ভাবছিলাম, খুব বড় দাঁতাল বলেই কি একা ছিল? শুয়োর তো দলেরই জীব, মানুষের মধ্যেও যারা শুয়োর তারাও যেমন

সবসময়েই দল বেঁধে থাকে।

বন্দুকটা দুহাতে ধরে এগিয়ে যেতেই এক বীভৎস দৃশ্য দেখলাম। কারও রাইফেলের গুলি লেগেছিল তার পেটে। সে কতখানি পথ যে দৌড়ে এসে শেষে এখানে পড়েছে আর চলতে না পেরে, তা জানা নেই, তবে তার নাড়িভুঁড়ির অনেকটা পথেই পড়ে গেছে। আর কিছু জড়িয়ে-মড়িয়ে আছে এই বনপথের আগাছাতে। জায়গাটার মাথার উপরে চাঁদোয়া আছে বলেই শকুনদের নজরে পড়েনি এখনও। তারা দেখতে পেলে এতক্ষণে এখানে কামড়া-কামড়ি খেয়োখেয়ি শুরু হয়ে যেত। মানুষদের মধ্যে যেমন শুয়োর আছে তেমন শকুনও আছে। সবাই যূথবদ্ধ। যারা একলা থাকে তাদের অসাধারণত্বকে ছিন্নভিন্ন করবার জন্যে তারা সদাই উদগ্রীব। একলা মাথা উঁচু করে চলা মানুষ বা একলা জানোয়ারকে তারা সহ্য করতে পারে না। হীনম্মন্যতাতে ভোগে সবসময়ই।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। যে-কোনও মৃত্যুই আমার মন খারাপ করে দেয়। তা সে কাঁচপোকার মৃত্যুই হোক, কি শুয়োরের!

জানি না, এই সব শিকারিরা কী ধরনের শিকারি! অত বড় দাঁতাল শুয়োরটাকে মাটিতে পায়ে দাঁড়িয়ে মারার সাহস তাদের নেই। আহত জানোয়ারের যন্ত্রণা যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব তা লাঘব করা যে প্রত্যেক শিকারীরই কর্তব্য তা এরা নিশ্চয়ই মানে না। এই সব শিকারিরা জানোয়ারদের চেয়েও অধম।

শুয়োরটার ওপরে, এখুনি জঙ্গলের বড় বড় নীল মাছি পড়বে। শয়ে শয়ে। ক্ষতস্থানে বসবে আর উড়বে। তাদের সকলের ডানার শব্দ দূর থেকে শুনলে মনে হবে যেন কোনও মোনো-এঞ্জিন প্লেন, টাইগার-মথ বা বনাঞ্জা উড়ছে, যে-সব প্লেন চালিয়ে ফ্লাইং ক্লাব থেকে ঋজুদা পাইলটের লাইসেন্স পেয়েছিল বহুদিন আগে।

শুয়োরটা পেরিয়ে, সেই রাস্তা ধরে, ঋজুদা যেদিকে নেমেছে সেদিকেই আর কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখলাম একটি ছোট নালা সেই বনপথটিকে আড়াআড়ি পেরিয়ে গেছে। নালাটি সম্ভবত আতারিয়া নদী থেকেই বেরিয়েছে। কালো ও খয়েরি নুড়ি, পাথর, খয়েরি-রঙা কতকগুলো ফুলের ঝোপ নালাটার বুকের মাঝে মাঝে। নামেই নালা। পায়ের পাতা ভেজে না এমন জল তিরতির করে বইছে। আর মাসখানেকের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে।

কী মনে হওয়াতে ভাবলাম, নালাটার পাশে পাশে কিছুটা এগোই। চল্লিশ পঞ্চাশ মিটার যেতেই দেখি নালাটা ডান দিকে ঘুরেছে। Right Angle turn, মানে, ঋজুদার যেদিকে বাঘ বা প্রাণকুমারীর চিহ্ন খোঁজার কথা, সেদিকে। ভাবলাম, ভালই হল, ঘড়িতেও ততক্ষণে সোয়া এগারোটা বাজে। জঙ্গলে কোনও কিছু Tracking করতে বাঘেরও যেমন সময় লাগে, শিকারিরও

লাগে। এক পা থেকে আরেক পা যেতে দু তিন মিনিট কেটে যায়। একেবারে নিঃশব্দে আড়াল থেকে আড়ালে চলতে হয়। ভাবছিলাম, মহুয়াটিলা পেরিয়ে নবীন-পাতাতে ভরে-যাওয়া সেই প্রাচীন কুসুম গাছটির দিকে যাওয়ার আগেই হয়তো ঋজুদার সঙ্গে এই সমতল বনভূমিতেই দেখা হয়ে যাবে।

নালার বালিতে নানা জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখলাম। একটি প্রকাণ্ড ময়াল সাপ খুব ধীরে ধীরে নদী পেরোল আমারই সামনে। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমি। প্রায় চার থেকে ছ মিনিট নিল সে ওই অল্প চওড়া নালাটি পেরোতে। আবার সামনেই একটা বাঁক নিয়েছে নালাটা। সেই বাঁকের মুখে গিয়ে যখন পৌঁছেছি, ঠিক সেই সময়ে আমাকে ভীষণই চমকে দিয়ে হঠাৎ একজোড়া Red Turtle Dove সেই বাঁকের মুখ থেকে প্রচণ্ড ভয়ার্তস্বরে ডেকে উঠে, নিচু দিয়ে, প্রায় জমির সমান্তরালে উড়ে এল আমারই দিকে। পরক্ষণেই আমাকে দেখে আরও ভয় পেয়ে, ডাকতে ডাকতে অদৃশ্য হয়ে গেল পেছনে। ওই জাতের ঘুঘুদের অমন ব্যবহার করতে দেখিনি কখনও আগে আমাদের দেশের কোনও জঙ্গলেই। হতবাক হয়ে গেলাম। বাঁপাশে একটি বাদামি-কালোতে মেশা লম্বা লেজওয়ালা Crow-Pheasant একা একাই এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে আসছিল। সেও কিছু দেখে, হঠাৎই ভয় পেয়ে বাঁদিকের গভীর নলি-বাঁশের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

কেন ?

কে জানে। আমার গা-ছমছম করে উঠল। হতবাক হবার আরও বাকি ছিল আমার। দেখলাম যে, বাঁকের ওপাশ থেকে নালাতে যে জল বয়ে আসছে তিরতির করে, তাতে রক্ত মিশে আসছে। ফিকে গোলাপি রঙা। তার মানে, রক্তর উৎসটা যেখানে, সে জায়গাটা দূরে। খুব কাছে হলে, জলের রং গাঢ় লাল বা লাল দেখাত।

আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিজ করে গেলাম। শুধু নিঃশব্দে বন্দুকটাকে দুহাতে তুলে ধরে বুড়ো আঙুলটা সেফটি-ক্যাচ এর উপরে রেখে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠিক সেই সময়েই খপ করে একটা শব্দ হল অথবা চপ করে।

কিছু কি খাচ্ছে কেউ ?

কে খাচ্ছে ?

বাঘ ?

বাঘই কি ?

কিন্তু কী খাচ্ছে ?

বুঝলাম, যদি বাঘই হয়, তবে সে এখন গভীর মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। খাদক, বাঘ নাও হতে পারে। হয়তো চিতা। কিন্তু স্বাভাবিক বাঘ বা চিতা কেউই বেলা পৌনে বারোটার সময়ে সচরাচর মড়িতে যাবে না। তবে এটাও

ঠিক যে কোনও বাঁধাধরা নিয়মই খাটে না বনে-জঙ্গলে। সবসময়েই ব্যতিক্রমের জন্যে তৈরি থাকতে হয়। বিশেষ করে মানুষখেকোর বেলাতে।

ভেবে দেখলাম যে, আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিক দিয়ে নালার বাঁকে পৌঁছতে গেলে যে মুহূর্তে আমি বাঁকে পৌঁছব, সেই মুহূর্তেই বাঘ বা অন্য জানোয়ার আমাকে দেখে ফেলবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষাৎ যমদূত হয়ে উড়ে আসবে আমার উপরে। উল্কারই মতন। যাদের তেমন পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে, তারাই জানেন যে, সেই অভিজ্ঞতা মোটেই মধুর নয়।

কিছুক্ষণ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, বন্দুক রেডি-পজিশানে ধরে আমি খুবই আস্তে আস্তে পিছু হটতে লাগলাম। কিছুটা পিছু হটে এসে তারপর ডানদিকের ঘন পুটুসের ও নলি বাঁশের ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে নিশ্বাস বন্ধ করে খুব সাবধানে এগিয়ে গেলাম এমন একটি জায়গাতে, যেখান থেকে শব্দ হয়েছিল সেই জায়গাটার দেখা পাওয়া উচিত। পিছু হটে তারপর এতটুকু পথ এক পা এক পা করে এগোতেই আমার প্রায় পনেরো মিনিট সময় লেগে গেল।

আমার আন্দাজমতন জায়গামত পৌঁছে আরও মিনিট দু-তিন দম নিলাম। তারপর একটি মস্ত শালগাছের আড়াল নিয়ে আবার শামুকের গতিতে এগোতে থাকলাম। তার আগে দেখে নিয়েছিলাম যে, রোদটা আমার উল্টোদিক থেকে আসছে। আমার ছায়া যেন বাঘ দেখতে না পায়, তাই। এদিক দিয়ে এগোলে আমার ছায়া বাঘ দেখতে পাবে না। তারপর সেখানে পৌঁছে শালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পুরো শরীরটা লুকিয়ে রেখে শুধু চোখদুটি বের করে যা দেখলাম, তাতে আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল।

একটি মেয়ে, সেই নালার ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। পুরোপুরি উদোম। পিঠময় তার চুল ছড়ানো। কিছু চুল ছিঁড়ে গেছে। ডান পা'টি হাঁটু থেকে কেটে নিয়ে বাঘ তা চিবোচ্ছে। কটাং করে শব্দ হল একবার। দেখলাম মেয়েটির পেছনের বাঁদিকটাও পুরো খেয়ে ফেলেছে। সেখানে কোনওই মাংস নেই আর। দগদগে লাল ক্ষত।

কিন্তু পরক্ষণেই আরও ভয় পেয়ে গেলাম দেখে যে, বাঘ হঠাৎই খাওয়া থামিয়ে আমার ডানদিকে মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখতে লাগল। দেখলাম যে, খুব বড় না হলেও, বেশ বড় বাঘ। তার মুখে, গোঁফে মেয়েটির শরীরের লাল রক্ত লেগে রয়েছে। মনে হচ্ছে, এই মাত্র হোলি খেলে উঠেছে সে বাঘ। ওই দৃশ্য দেখে আমার গা বমি-বমি করতে লাগল। তবে বাঁচোয়া এই যে, বাঘ আমার দিকে না তাকিয়ে, অন্যদিকে, অন্যকিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে অথবা কোনও ভয়ে ভীত হয়েছে। তাই তার সব মনোযোগ সেইদিকেই।

আমার দিকে পুরো ব্রডসাইডে দাঁড়িয়ে আছে এখন বাঘ। আলো এসে পড়েছে ঝরো-ঝরো শালপাতাদের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে। বুক, গলা, মাথা সবই দেখা যাচ্ছে এবং বড়জোর বারো থেকে পনেরো মিটারের মধ্যে। বুঝলাম, এই

মোক্ষম মুহূর্ত। তখন আমি বাঘের এতই কাছে চলে গেছি এবং পায়ে ঠেকে যে, হয় আমি বাঘকে মারব নয় বাঘ আমাকে মারবে। ইসপার নয় উসপার।

আর কালক্ষেপ না করে আস্তে আস্তে আমি বন্দুকটাকে তুললাম, তারপর ট্রিগারে তর্জনী ছুঁইয়ে যেই ট্রিগার টানতে যাব অমনি দাঁড়ানো বাঘ বসে পড়ল। ইংরেজিতে যাকে বলে Crouching Position-এ। বাঘ এবারে লাফাবে। মানে, আক্রমণ করবে ওই জায়গা থেকে অদৃশ্য কোনও লক্ষ্যর উপরে। এই মুহূর্তেই লাফাবে, আগুনের হল্কার মতন। তার লেজটা পিছনে লম্বা সোজা শক্ত হয়ে গেছে। লাফালেই সে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। তাই আর এক সেকেন্ডও দেরি না করে ঋজুদার ওভার-আন্ডারটার যে ব্যারেলে লেথাল বল পুরেছিলাম, সেটির ট্রিগার আগে টানলাম বাঘের ঘাড়ের সঙ্গে শরীরের সংযোগ যেখানে হয়েছে সেখানে লক্ষ্য করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই অন্য ব্যারেলের এল. জি. ও ফায়ার করে দিলাম ব্যারেলটাকে সামান্য ডাইনে ঘুরিয়ে বাঘের কান লক্ষ্য করে, বিহারে যাকে বলে, "কানপাট্টিয়ামে"।

বাঘের লাফানো আর হল না। মনে হল, সেও যেন ফ্রিজ করে গেল। বাঘের মাথাটি তার সামনের দু-পায়ের মধ্যে নেমে এল। ধীরে ধীরে চোখ দুটি বন্ধ হয়ে এল।

গলা দিয়ে কুলকুচি করার মতন আওয়াজ উঠল মনে হল একটা। অতি সংক্ষিপ্ত। তারপর স্থির হয়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে সেই Red Turtle ঘুঘু জোড়া যেমন করে উড়ে এসেছিল আমার দিকে, তেমন করে খুব নীচ দিয়ে উড়ে ডানার সাট-সাট শব্দ তুলে যে দিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে গেল।

পরপর, প্রায় একই সঙ্গে হওয়া আমার বন্দুকের দুটি গুলির শব্দে বন গমগম করে উঠল। হনুমানেরা হুপ-হুপ-হুপ করে বড় বড় গাছের পাতাতে ঝুপ-ঝুপ শব্দ করে ঝাঁপাতে লাগল। বাদামি-রঙা বড় বড় হিমালয়ান স্কুইরেল উঁচু এগাছ থেকে সেগাছে পাতায় পাতায় ঝরঝরানি তুলে চিক-চিক আওয়াজ করতে লাগল।

মিনিট দুয়েক পরে বাঘটা যেদিকে লাফাতে যাচ্ছিল সেদিক থেকে আমাকে প্রচণ্ড চমকে দিয়ে ঋজুদা বলল, তুই আমার প্রাণ বাঁচালি আজ রুদ্র। ওই ব্যারেটা ওভার-আন্ডারটা তোকেই দিয়ে দেব। বাঘটা তো আমাকে শেষই করে দিত আজ। আমি বোধহয় বুড়ো হয়ে গেছি।

তুমি এতক্ষণ আওয়াজ দাওনি কেন?

হতবাক হয়ে একটা পাথরে বসে পড়ে বললাম আমি।

বাঘ প্রাণকুমারীকে কোথায় ধরেছিল, তা চোখে পড়ার পরে সেই Trail-এর পিছু পিছু আসাতে ভেবেছিলাম যে বাঘকে আমিই দেখতে পাব ও আমাকে দেখার আগে। বাঘকে অথবা মড়িকে। তাই তোর বিপদের কোনওই আশঙ্কা

করিনি। তোর তো এদিকে আসার কথাও ছিল না। আশ্চর্য! এত কাছে এসেও আমি বাঘটাকে দেখতে পেলাম না!

—কটাং করে হাড় ভাঙার আওয়াজ পাওনি?

না তো!

ঋজুদা হতভম্ব গলাতে বলল।

আশ্চর্য! তোমার কানটা একবার কোনও ভাল E.N.T.-কে দেখাও।

—ওটা কানের জন্যে হয়নি। যখন মৃত্যুর সময় আসে, মানুষ তখন অন্ধ এবং বধির হয়ে যায়। আমার মৃত্যু ট্যাঙ্গো নাচছিল আজ আমার সঙ্গে। তুইই বাঁচালি। সত্যিরে! আমি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছি!

—বুড়ো না ছাই। আমি বললাম। এখনও বুড়ো-হাড়ে ভেলকি দেখাও যখন তখন!

তারপরই বললাম, আচ্ছা মেয়েটিকে বাঘ ধরেছিল কোথায়?

ঋজুদা বলল, মহুয়া-ঘেরা টিলাটার অনেকই নীচে। বেচারির হয়তো পেটের গোলমাল হয়েছিল। নইলে, নালার দিকে আসতে যাবে কেন এতখানি নেমে। এই নালাটা আর মহুয়াটিলার মাঝামাঝি জায়গাতে আমি ওর ব্লাউজের রক্তমাখা একটা ফালি পাই। আরও একটা ভুল করেছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, বাঘ নিশ্চয়ই মড়িতে নেই এই অবেলায়। দূরে কোথাও আছে। যেমন সব মানুষখেকো বা গোরুখেকো থাকে সচরাচর।

তা হলে কনসার্ভেটর সাহেবের থিওরিটা ভুল বলে প্রমাণিত হল। বল?

না। আমারই ভুল। কনসার্ভেটর তো বই-পড়া শিকারি। আজকালকার আর্ম-চেয়ার কনসার্ভেশানিস্টদের মতন। তাঁরা অভয়ারণ্যর প্রায়-পোষা বাঘ দেখেই ভাবেন সব জেনে গেছেন বাঘ সম্বন্ধে। যেহেতু একটিও kill পথের এ পাশে হয়নি সেইহেতু যে কখনওই হবে না, এমন ভাবাটাই পরম মূর্খামি হয়েছিল আমার পক্ষে। ওঁর মানুষখেকো বাঘের অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে, আমার তো ছিল!

আমরা দুজনে মহুয়াটিলার দিকে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলাম। প্রথমদিনেই যে কার্যসিদ্ধি হবে এ অভাবনীয় ছিল। নামবার সময়ে এক পা এক পা করে নেমেছিলাম। ওঠবার সময়ে কোনওরকম সাবধানতারই প্রয়োজন ছিল না তাই তাড়াতাড়িই উঠছিলাম। তা ছাড়া, সত্যি বলতে কী আমার নাকেও সকালের খাঁটি ঘি-এ ভাজা পরোটার গন্ধটা যেন উড়ে এল। খিদেও পেয়েছিল জব্বর।

ঋজুদা বলল, দুটো চার নম্বর ছররা আকাশের দিকে মুখ করে ছুঁড়ে আওয়াজ কর। ভটকাই আর ওরা পাহাড়ের ওপর থেকে ছোঁড়া এ গুলির শব্দ শুনতে পাবে। ওরা না এলে, বাঘটা কোথায় আছে তা তাদের জানাব কী করে! পাঁচ-দশ গ্রামের মানুষ দেখতে আসবে তাদের যমকে।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হয় সেদিন যেমন হালকা লাগে, বিশেষ করে, ভাল

পরীক্ষা দেবার পর আমার তেমনই লাগছিল।

গুলি করলাম মানে, ঋজুদা যেমন বলল। তারপর একটি মোটা শাল গাছে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। ঋজুদা পাইপে নতুন টোব্যাকো ভরে পাইপ ধরাল।

কতক্ষণ আমরা সেখানে বসেছিলাম জানি না। সংবিৎ ফিরল হঠাৎ বন্দুক-হাতে ভটকাই আর তার পেছনে পেছনে চৈতুরাম পোর্তে এবং আরও জনা দশেক মানুষকে দেখে। তারা দৌড়তে দৌড়তে লাফাতে লাফাতে আসছিল। এমনকী রূপকুমারীও।

ঋজুদার কাছে সংক্ষেপে প্রাণকুমারীর কী হয়েছে তা শুনে মুখিয়া চৈতুরাম পোর্তে ডুকরে কেঁদে উঠল্।

ঋজুদা রূপকুমারীকে বলল, তোমরা মেয়েরাই যাও ওখানে আগে, একটি শাড়ি নিয়ে। প্রাণকুমারীকে ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসো অথবা ওখানেই দাহ করার বন্দোবস্ত করো। ওর আপনজন তো তোমরাই। ছেলেরা পরে বাঘটা বয়ে আনবে।

রূপকুমারী বলল, না না জঙ্গলে দাহ করব না। তা ছাড়া ওকে তো দাহ করা যাবেও না। অপঘাতে মৃত্যু। ওকে আমরা আমাদের কবরস্থানে কবর দেব।

ভটকাই তক্ষুনি বাঘটা দেখতে পাচ্ছিল না বলে হাত কামড়াচ্ছিল।

ঋজুদা বলল, আগে মেয়েরা যাক। মরে গেলেও কি লজ্জা যায় মানুষের! মেয়েটা ভারী লজ্জা পাবে। এখন যাস না! আমাদের নেহাৎ না গিয়ে উপায় ছিল না, তাই।

চৈতুরাম তখনও হাউ হাউ করে কাঁদছিল।

আমি ভাবছিলাম, মানুষের বাইরের চেহারা দেখে কখনও কারোকে বিচার করাটা উচিত নয়। ও হয়তো মেয়েরই মতন ভালবাসত প্রাণকুমারীকে। কিন্তু কী করবে? সমাজ। জাতপাত। ও যে আবার মুখিয়া!

এইজন্যেই আমি শুয়োরই হোক কি মানুষই হোক, কারোকেই পছন্দ তো করিই না, রীতিমত ঘেন্না করি, যারা দলে থাকে তাদের। সমাজও একটি মস্ত দল। সমাজে যারা থাকে তারাও আস্তে আস্তে তাদের অজানিতে যূথবদ্ধ জানোয়ারের মতনই হয়ে যায়।

বোধহয়।

ঋজুদা বলল, ওরে ভটকাই। আতারিয়া বাংলোয় গিয়ে বল, সব খাবার দাবার এখানেই নিয়ে আসতে। গরম করা তো প্রবলেম নয় কোনও। আজ এই মহুয়াটিলাতেই খাব। কাল তো অচানকমার থেকে চলেই যাব।

কালই চলে যাব? তা হলে জঙ্গল তো দেখাই হবে না। আমার কী হবে? অচানকমারের বাঘও তুমি মেরে দিলে। আমার কি কোনওই কনট্রিবিউশান থাকবে না?

থাকবে।

দাও তোমার পাটা একটু টিপে দিই ঋজুদা।

ঋজুদা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, আমার নয়, আমার নয়। পা টেপ তোর "জানি-দুশমন" রুদ্র রায়ের।

কেন ?

বাঘটা যে ওই মেরেছে। শুধু মারেইনি, আমাকে প্রাণেও বাঁচিয়েছে ও আজ নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে।

নিনিকুমারীর বাঘের হাত থেকে যেমন বাঁচিয়েছিল ?

ইয়েস ! কিন্তু এখন তুই কী করবি ?

যাই করি, বাজে লোকের পা আমি টিপব না। আমার ইনিংসও আসবে। এক মাঘে শীত যায় না !

ভটকাই বলল, ভটকাইসুলভ গলাতে।

নানা পাখি ডাকছিল চৈত্রর আগুয়ান সকালে, চারধার থেকে। নববর্ষের সময়ে এইসব বন-পাহাড়, কচি-কলাপাতা-রঙা জমির শাড়িতে সেজে উঠবে। নানা-রঙা পোলকা-ডট থাকবে সে শাড়িতে।

যখন আমার খুবই আনন্দ হওয়ার কথা ছিল, গর্বিত হওয়ার কথা ছিল, ঠিক তখনই প্রাণকুমারীর জন্যে মনটা দুঃখে ভরে গেল।

ভাবছিলাম, ঋজুদা, আমি আর ভটকাই ক'টা মানুষখেকোই বা মেরেছি বা মারতে পারব ? এই জাত-পাত-এর মানুষখেকোদের যতদিন না নির্মূল করা যাচ্ছে, ততদিন হাজার হাজার প্রাণকুমারীরা আমাদের অজানিতেই নিরুপায় হয়ে নিয়তই মারা যাবে।

আর সেই সব মৃত্যুর কতই বা রকম !

কাঙ্গপোকপি

ঋজুদা নেই?

গদাধরদা দরজা খুলতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তা তিনি নেই তো কী, আমি তো আচি। ভিতরে এইস্যে বইস্যো দিকি। তা এতদিন কোতায় পাইলে গেচিলে তুমি, রুদ্দ বাবু?

পাইলে কেন যাব? ময়না মাসি তো এখন মাইসোরে থাকে। তিতিমিতির জঙ্গলে ঘুরে এলাম এবারের ছুটিতে। কেন? ঋজুদা তোমাকে বলেনি?

হ্যাঁ, আমি তো তেনার ইয়ার কিনা! দিনের মধ্যে কতাতো কন সাড়ে তিন খানা। মানে, বাক্যি। আমিও কি মনিষ্যি? এই তোমরা এলেই দেকি তেনার মুকে খই ফোটে! বিশেষ করে, ভটকাই বাবু। ইসস্, কী সাহস! কী সাহস!

ওর কথা ছাড়ো।

ঋজুদাকে জন্মদিনে প্রণাম করতে এসেও সেই মীরজাফরের প্রশংসা শোনার একটুও ইচ্ছে আমার ছিল না।

কী খাবে বলো?

গদাধরদা বলল!

ঋজুদা গেছে কোথায়?

তা তো বলতে পারবনি। তবে একজন মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ ফোন কইরেছিলেন, তাই তিনি গেচেন তার সইঙ্গে দেকা কইরতে।

মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ তা তুমি জানলে কী করে?

আচ্ছা, আমি কি আর মাদ্রাজি জানি? দাদাবাবুই ফোন নামিয়ে রেখে বললেন যে, কাল রাতে একজন মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ বাড়িতে খাবেন। পুজো-আচ্চা করে চান-টান সেরে যেন ভাল কইরে রান্না করি।

শোন, মাদ্রাজি বলে কোনও ভাষা নেই। ম্যাড্রাসের মানুষেরা যে ভাষাতে কথা বলে তার নাম, 'তামিল।'

তা এখন বলো দেকি, তাকে খাওয়াবেটা কী?

তা, কীসের মাংস ভালবাসেন তা তো জানি না। কালই সকালে দাদাবাবুকে

জিজ্ঞেস করে নে, তাপ্পরই ঠিক হবে।

মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ মাংস খান না কোনওরকমই। তুমি বরং ধোঁকার ডালনা, ছানার ডালনা, পটল-পোস্ত, কাঁচা কলাইয়ের ডাল, বেগুন-বাসন্তী, কুমড়োর ফুলভাজা, কচি ঝিঙের টক এই সবই কোরো। খেয়ে তার মাথা ঘুরে যাবে। তুমিই তো ঋজুদার মা এবং বউ। দেখো, ঋজুদার ইজ্জৎ রেখো। আজকাল তোমার রান্না থার্ডক্লাস হয়ে যাচ্ছে।

গদাধরদা চটে উঠে বলল, কী করে জাইনলে?

আবার কী করে। বহুদিন তো খাওয়াও না। আসলে কেমন যে রাঁধতে তাই তো ভুলে গেছি!

অ! তাইলে তুমিও কাল রেতে চইলে এসো।

ঋজুদা নেমন্তন্ন না করলেও আসাটা কি ঠিক হবে?

গদাধরদা হেসে ফেলল।

বলল, ঢং তো দেকি শিকেচো অনেকই। দাদাবাবুর অপেক্কাতেইতো রইয়েচো। যেদিন আস সেদিনই তো ফ্রিজে যা কিছু থাকে সবই সাবড়ে দিয়ে যাও। পাইরলে আমাকে সুদ্দু খেইয়ে ফেল, তার...

আমি হেসে ফেললাম। বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি জেনে খুশি হলাম।

বললাম, তা হলে উঠি। ওহো, দেখেছ, তোমাকেই প্রণাম করতে ভুলে গেছি। বলেই, গদাধরদাকে নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেলাম।

আহা করো কী! কর কী! দাঁড়াও, ব্যাপারটা কী? দাঁড়াও, পাটা ধুয়ে আসি।

আহা। তুমি হলে গিয়ে গুরুর গুরু। তা ছাড়া তুমি পা-ই যদি ধোবে তবে আর পদধূলি পাব কী করে?

বলেই, প্রণাম করলাম।

দেকো তো! দেকো তো! ছেলেটা কতা শোনেনা মোট্টে। বলেই বলল, চুপটি কইরে বস। আমি ক্ষীরের তক্তি, চন্দ্রপুলি আর কুচো নিমকি নে আসতেচি।

কালোজিরে আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছ তো নিমকিতে ভাল করে? ময়ান দিয়েছ?

হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ। তিনকাল গে এককালে ঠেইকল আর উনি এইচেন আমাকে রান্না শেকাতে!

গদাধর ভিতরে যেতে না যেতেই ঋজুদার ড্রয়িংরুমের ডানদিকের জানালার দিকের কোণে যে গোলাকৃতি একটি ঝকঝকে বার্নিশ করা টেবিল আছে; সাদা ইটালিয়ান মার্বল টপ্-এর; সেই টেবিলের উপরে উজ্জ্বল লালরঙের গোলাকৃতি একটি জিনিস চোখে পড়ল। অমন সুন্দর উজ্জ্বল লালরং আমি কখনওই দেখিনি। জিনিসটার উপরে সূক্ষ্ম রুপোর জালের ওড়িশি কাজ করা একটি ঢাকনি। সেটিও গোলাকৃতি। উঠে গিয়ে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করব জিনিসটি, ঠিক এমনই সময়ে কলিংবেলটা বাজল। গদাধরদা ভেতরে থাকায় আমিই গিয়ে দরজাটা খুললাম।

আর খুলেই দেখি, ভটকাই। এবং তার পিছনে ঋজুদা।

কী রে? কতক্ষণ? তা আদর আপ্যায়ন করেছে গদাধর ঠিকমতো?

হচ্ছে, হচ্ছে। আমি বললাম।

বিরক্তি গোপন করে।

ভটকাই তা হলে ঋজুদার এত কাছের মানুষ হয়ে গেছে যে, আমি জানি না আর ঋজুদা ভটকাইকে নিয়ে...। ওই মাদ্রাজি ব্রাহ্মণের সঙ্গে নতুন কোনও রহস্য বা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ যে মাখামাখি হয়ে আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই রইল না আমার। এবং ওই রহস্যময় সুন্দর লাল গোলাকৃতি জিনিসটির সঙ্গে ওই মাদ্রাজি ব্রাহ্মণের নিশ্চয়ই কোনও যোগাযোগও আছে।

মুখ গম্ভীর দেখেই ঋজুদা মন পড়ে নিয়ে বলল, তুই তো কলকাতায় ছিলি না। এলি কবে?

আজই সকালে।

তাই বল। তুই নেই জানি, তাই ভটকাইকে আর তিতিরকে আসতে বলেছিলাম। আমি অন্য জায়গাতে গেছিলাম। ভটকাই-এর সঙ্গে আমার একসঙ্গে ঢোকাটা নেহাতই কাকতালীয়।

আমি আশ্বস্ত হয়ে বললাম, তাই বলো! ঘরে ঢুকেই বুঝেছি যে, ওই নবাগন্তুক মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ আর ওই লাল বলের সঙ্গে নতুন কোনও রহস্য বা অ্যাডভেঞ্চার দানা বাঁধছে। আর তিতিরদের ফোন খারাপ।

লাল বল?

ঋজুদা অবাক হয়ে শুধোল।

হ্যাঁ।

আমি এমফ্যাটিক্যালি বললাম, লাল বল।

আমিতো জানি না। কোথায়?

ওই দ্যাখো।

ঋজুদা নিজের টিল্টিং-চেয়ারটাতে বসতে যাচ্ছিল কিন্তু বলটা দেখেই, না-বসে সেদিকে এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে গদাধরদাও আমার জন্যে ট্রেতে সাজিয়ে খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

তাকে দেখতে পেয়েই ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, এটা কী জিনিস, গদাধর? কে দিল এটা? তোমাকে আর কতদিন বলব যে, কখনও অচেনা মানুষদের কাছ থেকে কোনও জিনিস নেবে না, রাখবেও না বাড়িতে। এটা যে একটা টাইম-বম্ব নয়, তাই বা এখুনি জানা যাবে কী করে?

আমি চণ্ডীগড়ে ছিলুম তো গতবছর পুজোর মধ্যে। ঠিক এমনি একটি টাইমবম্ব দিয়েই টেররিস্টরা একটি পুরো বাড়ি উড়িয়ে দিয়েছিল। আমারই চোখের সামনে। হাউ ডেঞ্জারাস! ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করতে হচ্ছে।

ভটকাই অত্যন্ত উত্তেজিত গলাতে বলল।

গদাধরদা কথার মধ্যে কথা বলে উঠল, যা কখনওই করে না সে। বলল, এটা তো এই ভটকাই বাবুই কিছুক্ষণ আগে দে গেল। বইলে গেল, রেখে দাও গদাধরদা, আমি এই একুনি আসতিচি...

ঋজুদা চাপা বিরক্তির সঙ্গে বলল, ভটকাই? কী ওটা?

ভটকাই একটুও না-ঘাবড়ে বলল, পৃথিবীর চৌত্রিশতম বিস্ময়।

ব্যাপারটা কী?

ঋজুদা আবারও শুধোল। অসীম কৌতূহলের এবং বিরক্তির সঙ্গে।

এর পেছনে ভটকাই-এর কোনও ষড়যন্ত্র আছে এবং সেটা আমারই বিরুদ্ধে যে, এমন একটা সন্দেহও আমার মনে হঠাৎই উঁকি দিয়ে গেল। কিন্তু কোনও কথা না বলে আমি মাথা নিচু করে মনোযোগ দিয়ে ক্ষীরের পুলি খেতে লাগলাম।

ঋজুদা উঠে গেল জিনিসটার কাছে। রূপোর জালের ঢাকনাটা খুলল। খুলেই, হো হো করে হেসে উঠল। হাসতেই থাকল। এমন হাসি ঋজুদাকে বহুদিন হাসতে দেখিনি। ঋজুদার হাসি শুনে আমি খাওয়া থামিয়ে উঠে দৌড়ে গেলাম সেই জিনিসটার কাছে। দেখি, ওই বস্তুটির ওপরে ছোট্ট একটি লাল কাগজের টুকরো আঠা দিয়ে সাঁটা আছে। তার ওপুর লাল কালিতে লেখা, মিস্টার রুদ্র রায়। লাল কাগজ এবং লাল কালি বলেই দূর থেকে ঠাহর হয়নি।

ঋজুদা তখনও হাসছিল। কিন্তু আমি কিছুই বুঝলাম না।

হাসি থামতে ঋজুদা বলল, ভটকাই, তুই বড় কৃতঘ্ন। এই রুদ্রই তোর জন্য অনেক ওকালতি করেছিল আমার কাছে। রুদ্রর জন্যই তুই 'নিনিকুমারীর বাঘ' মারার অ্যাডভেঞ্চারে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলি, আর 'সুফকর'-এও গেছিলি আমাদের সঙ্গে। সেই রুদ্রর সঙ্গে তোর এমন ব্যবহার করাটা মোটেই ভাল হচ্ছে না। তোর মতো কৃতঘ্ন বাঙালিদের জন্যেই বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মতো মানুষকেও সাঁওতালদের সঙ্গে কাটাতে হয়েছিল, শেষ-জীবনটা।

ভটকাই তার উত্তরে হঠাৎ একটি গানের কলি আমারই দিকে চেয়ে, ডানহাতের তিন আঙুল নেড়ে নেড়ে গেয়ে উঠল, "আদর যতন করিতে যেমন সে বাঁধনে যেন ছিঁড়োনা। আমি জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি, তুমি যেন ঘৃণা কোরো না"।

এটা আবার কী গান?

ঋজুদা হেসে ফেলে বলল।

আঙুরবালা দাসীর গান। আমার ঠাকুমার মাথাতে যন্ত্রণা হলেই পুরনো ঘি মালিশ করতেন মাথায়, ব্যাব্যাগো! কী দুগ্গন্দ! আর তখন কলের গানে ওই গানটি শুনতেন।

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ওই বস্তুটি কী?

ভটকাই বলল, ওটি হচ্ছেন গিয়ে তুমিই! বুয়েচ। ওটা একটি ফল। ওর নাম মাকাল ফল। অত সুন্দর কিছু দেখেছ কি আগে? আশ্চর্য সুন্দর, কিন্তু কোনও

কাজেই লাগে না কারও। না খাওয়া যায়, না ফুটবল খেলা যায়, না তরকারি হয়, না টক হয়। কথায়ই বলে না, "জামাই একটি মাকাল ফল!" এই ফলেরই আরেক নাম, রুদ্র রায়।

ঋজুদা বলল, রাগ করছিস কেন, রুদ্র? আমরা সকলেই জানি, তুই নিজেও জানিস তুই কী? কিন্তু তুই ভটকাই-এর সেন্স অব হিউমারটা অ্যাপ্রিসিয়েট কর।

আমি বললাম, বাট হোয়াই অলওয়েজ অ্যাট মাই কস্ট?

ভটকাই বলল, বিকজ মাকাল ফল ইজ কস্টলি, অলমোস্ট অ্যাজ কস্টলি অ্যাজ য়্যু আর।

পেলি কোথায় এটাকে?

এবারে ঋজুদা শুধোল।

কোথায় আবার? আমার "রুটস" যেখানে, সেখান থেকেই। সেই কেষ্টলগর সিটিতে। চুর্ণী নদীর পারের এক বড়লোকের ভেঙে-পড়া বাগানবাড়ির লাগোয়া অবহেলিত নির্জনে একলাই বাগান আলো করে শোভা পাচ্ছিল। সংগ্রহ করেছি অনেকই দিন। মনিমাসিমার ডিপ-ফ্রিজে রাখা ছিল। যাতে চেকনাই না নষ্ট হয়।

আশ্চর্য! মাকাল ফল, কিন্তু আমিও আগে দেখিনি কখনও। এত বনে-জঙ্গলে ঘুরেছি। ঋজুদা বলল।

তুমি চিনবে কী করে? মাকালেই মাকাল চেনে!

ভটকাই ফুট কাটল।

আমার খাওয়া শেষ হলে বললাম, এই মাদ্রাজি ব্রাহ্মণটি কে? একটি রহস্য-রহস্য গন্ধ পাচ্ছি যেন।

ঋজুদা বলল, অনুমান মিথ্যে নয়, তবে এবারে যদি যেতে রাজি হই তবে মিশনটি এতই বিপজ্জনক যে, তোমাদের কাউকেই নেব কি না আদৌ, তা ভেবে দেখতে হবে।

ভটকাই বলল, রামকৃষ্ণ মিশন না চ্যারিটি মিশন তা আমি জানি না, কিন্তু আমাদের না নিলে আমরা তোমার দরজার সামনে অনশন করব বলে দিচ্ছি। প্রথমে দাঁড়ানো-অনশন, তারপর বসা-অনশন। না হলে শোওয়া-অনশন। মিশনটা কী? আর ওই মাদ্রাজি ব্রাহ্মণটিই বা কে?

ঋজুদা বলল, আমার আজকে এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে। তোরা কাল সন্ধে সাতটার মধ্যে চলে আয়। কেদাণ্ডারামাইয়া মশাই আসবেন সাড়ে সাতটাতে। আলিপুরে ওঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছেন।

উনি কে?

উনি কর্ণাটকের ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ।

তোমার সঙ্গে কী?

কিছু নয়, কিছু হতে পারে। ওরই বড় সম্বন্ধী হচ্ছেন ভেঙ্কটারামাইয়া মশায়। নাম শুনিসনি? ভারত বিখ্যাত ভীনাবাদক। উনি আমার বহু দিনের বন্ধু। গতমাসে

রবীন্দ্র সরোবরের কাছের থিয়াগারাজা হলে রসিকরঞ্জনী সভার একটি অনুষ্ঠানে উনি বাজাচ্ছেন। সেখানে গেছিলাম ওঁর বাজনা শুনতে। ওঁরই নিমন্ত্রণে। বাজনা শেষ হলে, যখন ব্যাকস্টেজে ওঁকে কনগ্র্যাচুলেট করতে গেছি, তখনই উনি বললেন ভীরাপ্পান-এর দৌরাত্ম্যের কথা এবং ওঁর ভগ্নীপতি ভেঙ্কটরামাইয়া মশায়কে উনি ওঁর সমস্যার কথা শুনে আমার কথা বলেছেন। এখন আমি যদি রাজি থাকি, তো আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে তিনি ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতা আসবেন।

ভেঙ্কটারামাইয়া মশায় বড় গুণী মানুষ, তা ছাড়া কেসটা খুবই বিপজ্জনক হলেও খুবই ইনটারেস্টিংও। যাই হোক, এখন আমার তাড়া আছে। তোরা ইচ্ছে করলে বসতে পারিস। বাঘ সংক্রান্ত ভিডিও ফিল্মগুলো এতদিনে ফেরত পেলাম, সনৎদার কাছ থেকে। দেখবি তো, বসে দেখতে পারিস। গদাধরতো আছেই। আর বাড়িটা তো তোদেরই! বুড়ো বয়সে কবে যে তোরা আমাকেই বের করে দিবি বাড়ি থেকে, তোরাই জানিস।

আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছ, দাঁড়াও! প্রণাম করতেই তো আসা, প্রণামটা অন্তত করতে দাও। আজ না তোমার জন্মদিন।

ভটকাইও বলল, ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম। মাকাল ফল নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলুম।

বাস বাস। আর নয়। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

ঋজুদা আমাদের মাথায় হাত রেখে বেরিয়ে পড়ল।

বলল, গদাধর, ওদের দেখো!

আমি বললাম, আশ্চর্য! ঋজুদার জন্মদিনে তিতির...

তিনি তো বাবা মায়ের সঙ্গে এবার গোয়াতে গেছেন। সেখান থেকে বম্বে ফিরে মনে হয়, মহাবালেশ্বর যাবেন। সেখান থেকে বেস ক্যাম্প করে ছত্রপতি শিবাজির দুর্গগুলো দেখবেন। এক এক করে। মায় সামুদ্রিক দুর্গ জিঞ্জিরা পর্যন্ত।

ঋজুদা বেরিয়ে যাবার পরে ভটকাই বলল, ঈশ্বর কিছু লোককে কপাল দিয়ে পাঠান। সত্যি! ভীষণ একচোখো ভদ্রলোক। যাই বলিস, আর তাই বলিস, রুদ্র। নইলে আমরা ঋজুদার ঘাড়ে চেপে ছাড়া কোথাওই যেতে পারি না আর তিতির কেমন...বলেই চোখ, ঠোঁট ও জিভ এই তিন প্রত্যঙ্গের সাহায্যে "টাক" করে একটা শব্দ করল, যা শুধু ভটকাইই করতে পারে। মেয়েরা তেঁতুল বা চালতা খেয়ে এমন শব্দ করে বটে; কিন্তু, কোনও ছেলেকে, ভটকাই ছাড়া এমন শব্দ করতে শুনিনি।

সকালে ঋজুদা প্রত্যেককেই ফোন করেছিল। বিকেল চারটেতে ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে ডেকেছে। কোল্লেগাল-এ যাবে, এমন মর্মে তামিলনাড়ু আর

কর্ণাটক সরকারের যৌথ আবেদন মঞ্জুর করে ঋজুদা তার বন্ধু অনীকদার অফিস থেকে ফ্যাক্স পাঠিয়ে দিয়েছে। এই দুই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সেক্রেটারিরা নাকি ঋজুদার "অ্যাকসেপটেন্স" পেয়ে ফোন করেছিলেন ঋজুদাকে।

বিশপ লেফ্রয় রোডে যখন গিয়ে পৌঁছলাম চারটে বাজতে দুমিনিটে, দেখি তিতির ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে এবং বসে আছে ঋজুদার সঙ্গে। বসবার ঘরে। গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটাতে যখন গাং গাং করে চারটে বাজল, ঠিক তখনই ভটকাই ঢুকল। হাতে একটা প্রায় তিন কেজি ইলিশ মাছ নিয়ে। ঘড়ির দিকে বাঁহাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, দ্যাখ, দেখে শেখ। একেই বলে, অন টাইম।

ঋজুদা পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, ব্যাপারটা কী। মোহনবাগানের সাপোর্টারের হাতে ইলিশ। অবাক করলি তুই।

বড়মামা দিলেন। জুট মিলের ম্যানেজার তো। বাড়ির জন্যও এনেছেন। আর তোমার নাম করেও একটা। "ঋজুদার সঙ্গে সুফকর"-এ পড়ে খুব ভাল লেগেছে কি না। ঋজু বোসের ফ্যান হয়ে গেছে একেবারে। তাই তোমার জন্য এই নৈবেদ্য। কোথায় গেলে গদাধরদা? এই নাও গো। দেকো, কী এইনিচি তোমার জইন্যে।

বলেই, গলা তুলে চেঁচাল।

এই এনু বলে, ভটকে দাদা।

ভেতর থেকে গদাধরদা সাড়া দিল।

শুধু ঋজুদাকেই নয়, গদাধরদাকেও ভটকাই কাবু করেছে ভালমতো। কিছু আছে ছেলেটার মধ্যে। তুক-তাকও জানতে পারে!

গদাধরদা আসতেই ভটকাই বলল, তোমার রুইন্দবাবু বলার আগে আমিই বলতিচি, রাতে আমরা খেইয়ে যাব কিন্তুক। আকাশে মেঘ কইরেচে দেকেচো তো। ভাজা মুগডালের ভুনি খিচুরি, মধ্যে চিনাবাদাম, কিসমিস দিয়ে; আর ইলিশমাছ ভাজা। কড়কড়ে করে। শুকনো লঙ্কা আর পিয়াজি ভাইজতি ভুলে যেওনি যেন আবার।

তুমি যে এক্কেবারে রুইন্দবাবু হইয়েচো গো ভটকেদাদা।

তা না হয়ে কি পারি, গদাধরদা? আমি যে তেনারই চ্যালা। আর ঋজুদা হলেন গে আমাদের সক্কলের মহাগুরু। বুইজলে কিনা!

ঋজুদা হেসে উঠল ভটকাই-এর কথার ভঙ্গিতে।

সত্যি। নর্থ ক্যালকাটার এই ছেলেটা ঋজুদার চরিত্রটাই পাল্টে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। ভটকাই-এর প্রতি কথাতেই এত হাসির কী আছে ঋজুদার, তা কে জানে!

তোরা কে কোন কাগজ পড়িস রে? বাংলা?

বর্তমান। আমি বললাম।

তিতির বলল, আমি বাংলা কাগজ পড়িই না। শুধুই, "দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া" পড়ি।

অন্যায় করিস। ঋজুদা বলল।

একাধিক না রাখলেও অন্তত একটা বাংলা কাগজ রাখা উচিত প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালির বাড়িতেই। স্থানীয় একটা ইংরিজি কাগজও।

ভটকাই বলল, আমাদের বাড়িতে "দ্য স্টেটসম্যান" আর "আনন্দবাজার" রাখা হয়। আমার মেজদাদুর তো বাথরুমই হত না প্রথম থেকে শেষ অবধি আনন্দবাজার না পড়লে।

ভটকাই বলল।

তিতির হেসে উঠল, ওর কথা শুনে। বলল, 'মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া'র কমপিটিটর না কি? আনন্দবাজার?

"দেশে-বিদেশে"তে পড়েছি যে, সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের বাবা 'দ্য স্টেটসম্যান' থেকে "প্রিন্টেড অ্যান্ড পাবলিশড বাই" অবধি না পড়লে তাঁর দিনটাই নষ্ট হয়ে যেত। বিশেষ বিশেষ কাগজ সম্বন্ধে অনেকের এমন দুর্বলতা থাকেই। কথাটা ঠাট্টা নয়।

ঋজুদা বলল।

যে কারণে তুমি কাগজের খোঁজ করছিলে ঋজুদা, গতকাল, মানে 'বনধ'-এর দিনের আনন্দবাজারের কপি নিয়ে এসেছি। এই কারণেই তো জিজ্ঞেস করছিলে?

হ্যাঁ, ভেরি স্মার্ট অফ য়্যু। কিন্তু কেটে আনতে গেলি কেন? আমিও তো আনন্দবাজারই রাখি।

তবুও নিয়ে এলুম। সাবধানের মার নেই। ভটকাই বলল।

তা এনেছিস যখন, তুই-ই ওদের পড়ে শুনিয়ে দে খবরটি। এটিই হচ্ছে লেটেস্ট খবর ভীরাপ্পানের ওপরে। গতকাল 'বনধ' না হলে পেয়ে যেতাম ডিটেইলড খবর, "ফ্যাক্স"-এ। মাইসোর ও কোয়েম্বাটোর থেকে।

বলেই বলল, ও ভাল কথা, মিস্টার এন. কৃষ্ণমূর্তি ফোন করেছিলেন আজ সকালেই। মানে পশ্চিমবঙ্গের চিফ-সেক্রেটারি। চমৎকার বাংলা বলেন ভদ্রলোক। খুব ভাল লাগল। বললেন, ওঁকেও নাকি কর্ণাটক আর তামিলনাড়ুর চিফ সেক্রেটারিরা ইনফর্ম করে রেখেছেন।

তারপর গম্ভীর মুখে ঋজুদা বলল, আমার কিন্তু বেশ চিন্তা হচ্ছে। ভাবছি এবার তোদের কারোকেই নিয়ে যাব না সঙ্গে। ইট উইল বি ভেরি ভেরি রিস্কি। এতখানি ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। পুলিশ, বি. এস. এফ. কম্যান্ডোদের ব্যাটেলিয়ানের পর ব্যাটেলিয়ান, দুটি রাজ্যের সব শক্তিকেই যে বিফল করে দিচ্ছে, তার মুখে তোদের এগিয়ে দেওয়া যায় না। দুপক্ষেরই কত লোক মারা গেছে, তা জানিস?

একথা শুনেই ভটকাই সটান ঋজুদার পায়ের সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল দুহাত জড়ো করে, "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ" স্টাইলে।

ঋজুদা বিরক্ত হল। হঠাৎই ভীষণ চটে উঠে বলল, সবসময় সবকিছু ভাল লাগে না ভটকাই। খুব সীরিয়াস একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। তা ছাড়া এবারে যদি কারোকে নিতেও হয় সঙ্গে, তোকে নেওয়া আউট অফ দ্য

কোয়েশ্চেন। তুই এ পর্যন্ত শুধু 'নিনিকুমারীর বাঘ' মারতেই গেছিস আমাদের সঙ্গে। ওইটিই তোর "মেইডেন ভেঞ্চার"। ভীরাপ্পানের সামনে যেতে হলে যেমন অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তা হয়তো রুদ্র আর তিতিরের কিছুটা আছে, কারণ ওরা আফ্রিকাতে আমার সঙ্গে গেছিল। রুদ্র তো দুবার গেছিল, এবং প্রথমবার তো বলতে গেলে ওই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী চোরা-শিকারিদের ওরা মোকাবিলা করেছে আফ্রিকাতে। আজকের এই মিটিংটা শিক্ষার মধ্যে পড়ে তাই আজকে ডেকেছি তোকে। তবে, তোকে তো নয়ই, তোদের কাউকেই এবার সঙ্গে নাও নিতে পারি। এ ভীষণই বিপজ্জনক ব্যাপার। এবার আমি নিজেই বেঁচে ফিরে আসব কিনা তারই কোনও স্থিরতা নেই। অথচ, স্বদেশের ব্যাপার। বিদেশের ডাকে তাদের সমস্যার সমাধান করে এসে নিজের দেশের আকুল আহ্বান পাবার পরও যদি না যাই, তাহলে সবাই আমাকে ভীতু ভাববে। বলবে, ঋজু বোস একটা "হোক্স"। "স্পেন্টফায়ার"। কিন্তু একা যে ঝুঁকি নেওয়া যায়, তোমাদের সঙ্গে করে সে ঝুঁকি নেওয়া যায় না। তোমরা তিনজনেই ছেলেমানুষ। কত সুন্দর জীবন পড়ে আছে তোমাদের সামনে। প্রত্যেকেরই সামনে। তা ছাড়া একটাই জীবন! যে জীবন নিয়ে তোমাদের প্রত্যেকেরই অনেক কিছু করার আছে। বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে তোমরা ভীরাপ্পানের এ. কে. ফর্টিসেভেন রাইফেলের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হবে, তা আমি হতে দিতে পারি না। তা ছাড়া, তোমাদের মা বাবার কাছেই বা আমি মুখ দেখাব কেমন করে? যদি নিজে বেঁচেও ফিরি? না, না। তা হয় না।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধতা নেমে এল। ঋজুদার এই "স্নাবিং"টার খুবই দরকার ছিল ভটকাই-এর। কিছুদিন ও এখন ঠাণ্ডা থাকবে। বড্ডই বেড়ে গেছিল। তবে, আমারও মন খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গেই যখন নিয়ে যাবে না, তখন এই মিটিং-কনফারেন্সের কী দরকার ছিল? তিতিরের মুখও ব্যাজার হয়েছে দেখলাম।

ঋজুদাই নীরবতা ভেঙে একটু পরে বলল, কী রে! পড় ভটকাই। যে কাটিংটা এনেছিস, আনন্দবাজারের।

প্রচণ্ড ঝড়ে ডানা-ভাঙা পাখির মতো অবস্থাটা সামলে উঠতে সময় নিল একটু ভটকাই। কিন্তু, উঠল সামলে। উঠে, মানুষ যেমন করে শোকসভাতে শোকপ্রস্তাব পাঠ করে, তেমন করে, আনন্দবাজারের কাটিংটা সামনে ধরে গম্ভীর গলাতে আস্তে আস্তে পড়তে লাগল:

আনন্দবাজার পত্রিকা

৭ই জুন, ১৯৯৩

ভীরাপ্পানের আরও ছয় সাগরেদ ধৃত

"ব্যাঙ্গালোর, ৬ জুন—চন্দনকাঠের কুখ্যাত চোরাচালানকারী ভীরাপ্পানের আরও ৬ সাগরেদকে গতকাল গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ছ'জনের মধ্যে

ভীরাপ্পানের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী রয়েছে। এই লোকটি ভীরাপ্পানের দলকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করত। মালে মহাদেশ্বর পাহাড় অঞ্চলের একটি মন্দিরের এক পুরোহিতকেও আটক করেছে পুলিশ। পুলিশের সন্দেহ, এই পুরোহিতের সঙ্গে ভীরাপ্পানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এবং মাঝে মধ্যেই তাদের দেখা হত। কাল এই ছ'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ বড় রকম সাফল্য পেয়েছে।

মহীশূর জেলার কোল্লেগাল তালুক থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করার ফলে এ পর্যন্ত ভীরাপ্পানের মোট ১৭ সাগরেদ ধরা পড়ল। গত সপ্তাহেই আটক করা হয়েছে ১১ জনকে। মূল্যবান চন্দনকাঠ চুরি কিংবা হাতির দাঁতের জন্য চোরাগোপ্তা হাতি শিকারের কাজে এরা নানাভাবে সাহায্য করত। যে পুরোহিতকে আজ পুলিশ গ্রেফতার করেছে সে মালে মহাদেশ্বর পাহাড়ের কাছে টালাবেট্টার নবগ্রহ মন্দিরের। ওই মন্দিরের কাছেই ২৪ মে ভীরাপ্পানের দল পুলিশের টহলদার দলকে আক্রমণ করে ৬ জন পুলিশকর্মীকে খুন করে। ভীরাপ্পানের আটক সাগরেদদের থানা হাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

ইতিমধ্যে ৫০০ আধাফৌজ কালকেই মালে মহাদেশ্বর পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছেন। পথে তাঁদের বিপুল সংবর্ধনা জানান স্থানীয় মানুষ। সেখানে পৌঁছে সীমান্তরক্ষীবাহিনীর (বি. এস. এফ) কম্যান্ড টাস্ক ফোর্স অফিসারের সঙ্গে বসে 'অপারেশনের' কৌশল মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছেন। তাঁদের লক্ষ্য, ভয়ঙ্কর চন্দন-দস্যু জঙ্গলের পোকা ভীরাপ্পানকে যেন তেন প্রকারেণ ধরা।

'অপারেশনে'র সময় আধাফৌজ এবং টাস্কফোর্সের চলাচল অবাধ করতে সংলগ্ন গ্রামগুলোতে ২০ জুন পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করে গ্রামবাসীদের গতিবিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। মালে মহাদেশ্বর পাহাড় এবং তামিলনাড়ু সীমান্তের দিকে যাওয়ার সমস্ত বেসরকারি বাসও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

ভটকাই-এর পড়া শেষ হলে, তিতির বলল, এখন ভীরাপ্পান কোণঠাসা হয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে। এর কিছুদিন আগেও তো ওর চ্যালা-চামুণ্ডা কিছু মারা পড়েছিল পুলিশের হাতে। হি ইজ লুজিং গ্রাউন্ড গ্র্যাজুয়ালি।

আমার সন্দেহ আছে।

ঋজুদা বলল।

যারা মারা গেছে, তারা যে ভীরাপ্পানেরই লোক, এর প্রমাণ কী? এমন এমন সিচ্যুয়েশনে দুপক্ষই ভুল করে, অনেক সময় ইচ্ছে করে প্রেসকে ভুল খবর দেয়। ভুল জেনেও, তা ঠিক বলে দাবি করে। হাওয়াটা কোনদিকে বইছে, তা এখানে বসে খবরের কাগজ পড়ে বোঝা সম্ভব নয়। স্পট-এ যাওয়া দরকার। আর্মচেয়ার কনসার্ভেসানের মতোই, আর্মচেয়ার—জার্নালিজমের মতোই, তা হবে

থিওরিটিক্যালি এক্সারসাইজ। দুপক্ষরই প্রত্যেক দাবি ও পাল্টা দাবির সত্য খুব ভাল করে যাচাই করে দেখতে হবে, নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে।

তিতির বলল, মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে পড়ি বটে, কিন্তু আসলে এই মানুষটা কে? কোথায় থাকে? কী করে? তামিলনাড়ু আর কর্ণাটক সরকারের যৌথ প্রচেষ্টাতেই তাকে ধরা বা মারা কেন যে সম্ভব হল না এতদিনেও, তা তো আমার বোধগম্য হয় না।

হয়তো তোর বুদ্ধির অকুলান বলেই।

ঋজুদা বলল।

আমাদের একটু বলো না ভীরাপ্পান সম্বন্ধে, ঋজুকাকা। তুমি যেমন আমাদের গার্জেন, আমরাও তোমার গার্জেন। সব শুনে-টুনেই ঠিক করব তোমাকে একা একা সেখানে যেতে দেওয়া আদৌ ঠিক হবে কি না!

ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, আচ্ছা "কল" করবার মতলবে আছিস তো তোরা। দ্য টেবিল ইজ টার্নড, ইট অ্যাপিয়ার্স।

সে তুমি যাই বলো। আগে তো শুনি। তারপরই আমরা ডিসাইড করব। লোকটার পুরোনাম কী? বয়স কত?

বয়স? কত হবে? এখন হবে, এই চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মতো। পাঁচশো বুনো হাতি মেরেছে ওর দল, দাঁতের জন্য। "রুআহা"-র ভুষুণ্ডারাও লজ্জা পাবে ভীরাপ্পানের কাছে। আর কত কোটি টাকার চন্দনকাঠও যে পাচার করেছে তার সঠিক হিসেব কেউই জানে না। তবে মানুষটাকে ধরার ও মারার জন্য দুই রাজ্যের কম্যান্ডো ট্রেনিং-নেওয়া পুলিশ অফিসারেরা, বি. এস. এফ-এর জওয়ানরা, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডস, এমনকী ইন্দো-টিবেটান বর্ডার ফোর্সের বাঘা বাঘা জওয়ানরা আর অফিসাররাও শুধু ঘোলই খাননি, অনেকেই প্রাণ দিয়েছেন তার হাতে। কিন্তু এত করেও ভীরাপ্পানকে ধরা যাচ্ছে না। কিছুদিন হল ভীরাপ্পানের যেখানে বিচরণভূমি, সেই অঞ্চলে, একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে, যাতায়াতের সব পথ রুদ্ধ করে, সমস্তরকম সরবরাহ বন্ধ করে, ওকে প্রাণে মারার উপক্রম করা হচ্ছে। তবুও ভীরাপ্পান ধরা পড়ছে তো নাই, মাঝে মধ্যেই নানাভাবে দুঃসাহসিক ফন্দি-ফিকির করে, হাজারের ওপর নানা ফৌজকে বুদ্ধু বানাচ্ছে, তাদের অফিসারদের সুদ্ধু মেরে দিচ্ছে।

এত সব ফৌজ মিলেও কেন ধরতে বা মারতে পারছে না ওকে, ঋজুদা?

কারণটা কী বা কী কী হতে পারে, তোরাই বল।

গদাধরকে ঢুকতে দেখেই থেমে গিয়ে তাকে বলল ঋজুদা, এতক্ষণে মনে পড়ল তোমার গদাধর? শুধু কি কথাতে পেট ভরে? এরা যে খিদেতে মরছে। ভটকাই-এর মুখের দিকেই একবারটি চেয়ে দেখো তুমি।

এট্টু দেরি হয়ে গেল দাদাবাবু। পেটিসগুলান ঠাণ্ডা মেরে গেচিল কি না! তাই এট্টু গরম কইরে নে এলাম।

পেটিস না, প্যাটিস গদাধরদা।

ওই হল। আর সঙ্গে পেটিটিরিও আচে। নাও। দাদা-দিদিরা সব ভাল কইরে খাও দিকিনি। আমি চা আইনতেচি বড় টি-পটে করি।

পেটিটিরিটা কী ব্যাপার?

তিতির অবাক হয়ে ঋজুদাকে শুধোল।

ঋজুদা হেসে বলল, পেস্ট্রি। 'ফ্লুরি' থেকে প্যাটিস আর পেস্ট্রি আনছে গদাধর গত কুড়ি বছর হল, কিন্তু "পেটিস" আর "পেটিটিরি' যেই কে সেই রয়ে গেল বদলাল না একটুও। গদাধর মানুষটা একেবারে ওরিজিনাল।

সামান্য একটু উন্নতি হয়েছে। আমি বললাম। আগে বলত, "কেকুরি-পেটুরি"—মানে, কেক ও প্যাস্ট্রি।

তিতির আর ভটকাই হেসে উঠল।

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে বলল, নে নে। তোরা তুলে নে, কোয়ার্টার প্লেটে করে। ফর্ক নে, ন্যাপকিন নে। তারপর পাইপে একটা টান দিয়ে বলল, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিলি না।

ভটকাই একটা চকোলেট-কেকের পুরোটা একেবারেই মুখে পুরে দিয়েছিল। তাই সাঁতার না-জানা মানুষ যেমন জলে পড়ে খাবি খায়, তেমন করে খাবি খেতে খেতে কেকটাকে কব্জা করার চেষ্টা করতে করতেই বলল, আমি বলব?

বল।

আমার মনে হয়, এত পুলিশ-টুলিশের মধ্যে একজনও আসলে নিজে মরতে রাজি নয় বলেই মারতে বা ধরতে পারেনি ওরা ভীরাপ্পনকে, আজ অবধিও। আমায় নিয়ে চলো ঋজুদা, আমি ঠিক মেরে দেব। নিজে মরতে রাজি না থাকলে কি অমন দুর্ধর্ষ কাউকে মারা যায়? এত হাজার ফোর্স গেলে হবে কী? আমি বাজি ফেলতে পারি, এদের মধ্যে একজনও নিজে মরতে রাজি নয়। একজনও নয়। ডেডিকেশন চাই, জেদ চাই, "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" অ্যাটিচুড চাই।

আমি বা তুই মরতে রাজি থাকলে অথবা না-থাকলেও ভীরাপ্পান যে আমাদের ঠিকই মেরে দেবে, সে বিষয়ে ভীরাপ্পানের অথবা আমারও কোনওই সন্দেহ নেই। এমন কথা হচ্ছে, ভীরাপ্পন নিজে মরে কি না? তার মরার বিশেষ ইচ্ছে আছে বলে মনে হচ্ছে না। আর ওকে জীবিতাবস্থায় ধরার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ধরা পড়বে পড়বে হলেও হয়তো সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করবে।

তারপরই বলল, আরও কী কী কারণ হতে পারে, রুদ্র? তিতির? ভটকাই অ্যাটলিস্ট মেড আ পয়েন্ট। ভটকাই-এর উত্তরটা অন্তত একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়।

আমি বললাম, আমার মনে হয়, ভীরাপ্পান জঙ্গলের পোকা। তোমারই মতো ও বনজঙ্গলকে খুব ভাল করেই চেনে। বিশেষ করে, ওর নিজের এলাকার বনজঙ্গলকে। তাই গেরিলাযুদ্ধে ওকে কোনও ফোর্স, পুলিশের ব্যাটেলিয়ান,

এমনকী কম্যান্ডোরাও কিছু করতে পারছে না। যে-মানুষ জঙ্গলকে জানে, ক্যামোফ্লেজিং জানে, যে তার নিজের এলাকার পাহাড়, নদী, নালা, পথ, সুঁড়িপথ, উপত্যকা, অববাহিকা এবং মালভূমিকে নিজের হাতের রেখার মতোই, মায়ের মুখের মতোই চেনে; তার সঙ্গে টক্কর তারই মতো জবরদস্ত, দুঃসাহসী অন্য কোনও মানুষই একমাত্র দিতে পারে। এবং সহজেই অনুমেয় যে, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীরা সব ট্রাডিশন ভেঙে তোমাকে নিমন্ত্রণ করাতে পুলিশ, বি. এস. এফ এবং অন্যান্য নানা ক্র্যাক-ফোর্সের অফিসার ও জওয়ানরা বনবিভাগের হোমরা-চোমরারা অত্যন্তই অপমানিত হবেন। কিন্তু এসব ভাল করে জেনে ওঁরা তোমার শরণাপন্ন হয়েছেন। ব্যাপার অত্যন্তই গুরুতর। এই যুদ্ধটা, মনে হয়, কোনও আর্মির সঙ্গে আর্মির যুদ্ধ নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিরই যুদ্ধ। আফ্রিকার চোরা-শিকারি ভুষুণ্ডার কথা, "অ্যালবিনো"র রহস্যভেদের কথা, "নিনিকুমারীর বাঘ" এবং তোমার অন্যান্য সমস্ত অভিযানের কথা ভারতের এবং বিদেশের সমস্ত বড় কাগজে এবং টি. ভিতেও যেভাবে প্রচারিত হয়েছে তাতে আমাদের দেশের এবং হয়তো বিদেশেরও যে কোনও শিক্ষিত মানুষের কাছেই তুমি আর অপরিচিত নও। তাই "বিপদে মধুসূদন" তোমাকে ডেকে শেষ চেষ্টা করে দেখতে চান ওঁরা।

পরিচিতি-টিতির কথা জানি না। ওসব ফালতু ব্যাপার। নাম-যশ। আমি যে অতিমানবও নই তা আমার মতো ভাল আর কেউই জানে না। তবে তুই হয়তো ঠিকই বলেছিস। নীলগিরি হিলস্-এ মানে মাইসোর থেকে উটি, (যাকে এখন উধাগামঙ্গলম বলা হয়) আর উটি থেকে কোয়েম্বাটোরের মধ্যবর্তী জঙ্গলে ছেলেবেলাতে জ্যেঠুমণির সঙ্গে অনেকই শিকার করেছি। একটা বনপথ গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কোয়েম্বাটোর থেকে মাইসোর চলে গেছে, 'উটি'কে পাশ কাটিয়ে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, বুঝলি, সেই জঙ্গলের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ এখনও আমার চোখে আর নাকে লেগে আছে, সব জঙ্গলই সুগন্ধি, কিন্তু নীলগিরির নীলপাহাড়ের মাইলের পর মাইল চন্দনবনের যে কী স্নিগ্ধ সুগন্ধ; বিশেষ করে বৃষ্টি হলে, তার তুলনাই নেই।

বান্দিপুরটা ঠিক কোথায়? বান্দিপুর ন্যাশনাল পার্ক?

তিতির শুধোল।

মাইসোর থেকে উটিতে যাবার পথেই পড়ে। নীলগিরি পাহাড় শ্রেণী শুরু হবার আগে। বান্দিপুর; মুদুমালাই সব।

আর, পেরিয়ার ন্যাশনাল পার্ক?

ভটকাই শুধোল।

বান্দিপুর পড়ে কর্ণাটকে আর পেরিয়ার তামিলনাড়ুতে। অগণ্য হাতির আবাসস্থল এইসব অঞ্চল। আসলে ভীরাপ্পানের এলাকা হচ্ছে এইরকম। প্যাডটা দে তো তিতির, টেবিল থেকে। আর একটা কলম দে, তোদের একটা রাফ-স্কেচ

করে দেখাচ্ছি।

তিতির প্যাডটা এগিয়ে দিল আর ড্রয়ার খুলে একটা মঁ-ব্লাঁ কলম এগিয়ে দিল। ঋজুদা নিঃশব্দে একটা ম্যাপ এঁকে দিল। নিঃশব্দে এজন্য বলছি, এইসব দুর্মূল্য জার্মান কলমে কোনওই শব্দ হয় না, লেখার সময়ে। আর কলমই হচ্ছে ঋজুদার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস, একথা তার দেশ-বিদেশের অগণ্য বন্ধু-বান্ধব-অনুরাগীরা জানেন বলেই, সকলেই ঋজুদাকে কলমই উপহার দেন। আর ঋজুদার সবচেয়ে প্রিয় কলম হচ্ছে মঁ-ব্লাঁ। উচ্চারণটা ওইরকম। লিখলে MONT BLANC, জার্মান ভাষায়।

মঁ-ব্লাঁ, না?

তিতির শুধোল।

হ্যাঁ।

মানে কী শব্দটার ঋজুদার? কোন দিশি কলম ওটা?

ভটকাই শুধোল।

সুইটজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতমালার সর্বোচ্চ চূড়ার নাম MONT BLANC, তবে উচ্চারণটা মঁ-ব্লাঁ।

একদিন ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত জাতীয়তাবাদী জাত জার্মানরা, অন্য দেশ সুইটজারল্যান্ডের চূড়োর নামে তাদের নিজেদের তৈরি ঝর্না-কলমের নাম রাখতে গেল কেন?

ঋজুদা হেসে বলেছিল, ওরে বোকাইচন্দর। সুইট্জারল্যান্ড একটা আলাদা দেশ হতে পারে বটে, কিন্তু 'সুইস'দের আলাদা কোনও ভাষা নেই। ভাষা হিসেবে সুইট্জারল্যান্ডের আধখানিতে জার্মান চলে, অন্য আধখানিতে চলে ফরাসি। যদিও ওয়াটারটাইট-কম্পার্টমেন্ট নেই কোনও। যে কোনও স্যুইসের সঙ্গে আলাপ হলে তুই জিজ্ঞেস করতে পারিস, আপনি কি স্যুইস-জার্মান? না স্যুইস-ফ্রেঞ্চ? সুইট্জারল্যান্ডে একটি গিরিবর্ত আছে, তার নাম "পিও"। শীতকালে সেখানে স্কিইং-এ উৎসাহীদের মেলা বসে যায়। সেই "পিও পাস"-এর একদিকে জার্মান ভাষাভাষীরা বাস করে আর অন্যদিকে ফরাসি। যদিও ধরাবাঁধা কোনও নিয়ম নেই।

আমার মন মঁ-ব্লাঁ কলমটা থেকে অনেক দূরে চলে গেছিল মুহূর্তের মধ্যে। ঋজুদার গলার স্বরে চমক ভাঙল। ঋজুদা বলল, এই দ্যাখ।

আমরা তিনজনে খেতে খেতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম প্যাডটার ওপরে। ঋজুদা সেই ফাঁকে একটা চিকেন-প্যাটিস তুলে নিল। মিষ্টি তেমন পছন্দ করে না ঋজুদা, নোনতাই বেশি পছন্দ করে।

আমরা দেখলাম ম্যাপটাকে।

দেখছিস তো। এই হচ্ছে কর্ণাটক রাজ্য, আর এই হচ্ছে তার রাজধানী মাইসোর। এই দ্যাখ যেখানে কর্ণাটকের সীমানা এসে তামিলনাড়ুর সঙ্গে মিশেছে,

তার কাছেই এই "কোল্লেগাল"। উটি বা উধাগামঙ্গলম, তামিলনাড়ুতে। কিন্তু ওখানে পৌঁছতে হলে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর হয়েও যাওয়া যায়, সেখান থেকেই কাছে হয়, আবার মাইসোর হয়েও আসা যায়, বান্দিপুর ন্যাশনাল পার্ক হয়ে। বান্দিপুরের পরেই পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। পাহাড়ের পর পাহাড়। নীল তাদের গায়ের রং, তাই তাদের নাম নীলগিরি। এই নীলগিরিতেই যত দৌরাত্ম্য ভীরাপ্পানের।

লোকটা এরকম হল কী করে? পাঁচশো হাতি মারা কি চাট্টিখানি কথা! আর মারলই বা কী করে? একা একা?

তিতির বলল।

একা মারেনিরে। আসলে ভীরাপ্পানের যখন ন' বছর বয়স ছিল তখনই সে ওই অঞ্চলের কুখ্যাত চোরাশিকারির দল জেভিয়ার গুণ্ডাদের দলে নাম লেখায়।

মানুষটা তা হলে তো খুনি টাইপের বলতে হবে। ওই শিশুবয়স থেকেই ওইরকম ছিল!

নারে। যখন শিশু ছিল তখন ওও অন্য দশটা শিশুর মতোই ছিল। অতি গরিব মা-বাবার ঘরের বড় ছেলে। তার তিনটি বোন এবং দুটি ভাই। বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলে। ঘরে খাবার নেই যে খাবে, অবস্থা নেই যে পড়াশোনা করবে, কী করবে, আর? দলে জুটে গেছিল।

পাইপটা নিভে গেছিল ঋজুদার। দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে নিয়ে গম্ভীর মুখে পাইপটাতে একটা টান লাগিয়ে বলল, ভীরাপ্পানেরা যখন মস্ত বড় দানবীয় চেহারা নিয়ে আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তাকে মারবার জন্য পুলিশ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, কম্যান্ডো সবকিছুকে নিয়োগ করি আমরা। অথচ, আমাদের একটু সহানুভূতি, একটু মায়া-মমতা, একটু ঔদার্য, সময়মতো খরচ করে ওই শিশু ভীরাপ্পানকেই সমাজের কতবড় উপকারী করে তুলতে পারতাম। দোষটা আসলে ভীরাপ্পানের একার নয়; দোষটা এই সমাজ-ব্যবস্থার, এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের, এই পঙ্গপালের মতো, গিনিপিগের মতো, তেলাপোকার মতো, প্রতিমুহূর্তে জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেশনে বাড়তে-থাকা জনসংখ্যার। ভীরাপ্পান আমাদেরই তৈরি করা চরিত্র, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। সে আকাশ থেকে পড়েনি।

আমরা সকলেই চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ ঋজুদার কথা শুনে।

ঋজুদার মধ্যের এই গুণটা আমাকে প্রথম দিন থেকেই মুগ্ধ করে। সাধে কি ঋজুদার চামচাগিরি করি? কোনও মানুষকেই সহজে বাতিল করতে চায় না ঋজুদা। করে না। ফলটা দেখেই উত্তেজিত হয় না—বীজটা খুঁজতে চায়। সবসময়ই।

ভটকাই অগুনতি প্যাটিস ও পেস্ট্রি সাঁটিয়ে, "ভুড়ি যব ঠাণ্ডা, মুড়ি তব ঠাণ্ডা" নীতির জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ হয়ে, খুশি খুশি গলায় বলল, আমাদের আরও বলো ঋজুদা ভীরাপ্পান সম্বন্ধে। দারুণ একটা ক্যারেকটার। যাই বলো, আর তাই বলো!

জন্মেছিল ও উনিশশো সাতচল্লিশে। কর্ণাটকের মহীশূর জেলার গোপীনাথম নামের একটি গ্রামে তামিলনাড়ুর সীমান্ত থেকে দেড়শো মাইল মতো দূরে ওর এক ভাইয়ের নাম অর্জুনান। সে এখন তামিলনাড়ুর জেলে রয়েছে। চিদাম্বরম নামক একজন ফরেস্ট রেঞ্জারকে খুন করার অভিযোগে সে অভিযুক্ত। কিন্তু, অনেকেই আবার বলেন যে, চিদাম্বরমকে খুন করেছে আসলে ভীরাপ্পানই। তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে না পেরেই তার ভাইকে ভরে দেওয়া হয়েছে জেলে। অবশ্য এমনতো আকছারই ঘটছে দেশের সব আনাচে-কানাচেই!

তুমি যে বললে, ভীরাপ্পান চন্দনকাঠের চোরাকারবারি। আমরাও তো বিভিন্ন কাগজে তেমনই পড়েছি।

তিতির শুধোল।

হ্যাঁ, এখন তাই। আগে ও জেভিয়ার গুণ্ডাদের হাতি মারা দলে ছিল। শ পাঁচেক হাতি জেভিয়ার গুণ্ডাদের দল নাকি সাবাড় করে দিয়েছে, গত তিনযুগে। ভেবে দেখ একবার।

এ তো "গুগুনোগুম্বারের দেশ"-এর আর "রুআহা"-এর টর্নাডো-ভুষুণ্ডাদেরও হার মানালো দেখছি।

তিতির বলল।

তবে দেখতে দেখতে হাতি মারার ব্যবসা বন্ধই হতে বসল এখানে, যখন থেকে ভারতবর্ষ থেকে হাতির দাঁত রপ্তানির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হল। আসলে মেরেছিল ওই দল শ পাঁচেকেরও বেশি হাতি। প্রকৃত সংখ্যা জানার কোনও উপায় ছিল না। কেন ছিল না, তারও একটা লজ্জাকর কারণ ছিল। নিয়ম ছিল, যদি কোনও রেঞ্জে একটিও হাতি, চোরা-শিকারিদের হাতে মারা যায় তবে সেই রেঞ্জ-এর রেঞ্জারের সঙ্গে সঙ্গে চাকরি যাবে। ফলে, বুঝতেই পারছিস, রেঞ্জারেরা নিজের নিজের ঘাড় বাঁচাবার জন্যই হাতি শিকারের খবর যাতে উপরওয়ালাদের কাছে না পৌঁছয়, তা দেখত। তাই পাঁচশো সংখ্যাটা যদি অফিসিয়াল সংখ্যা হয়, তবে প্রকৃত সংখ্যাটা স্বভাবতই তার চেয়ে অনেকই বেশি ছিল।

আসলে ঠিক কোন অঞ্চলে ভীরাপ্পানের দৌরাত্ম্য চলছে, এখন?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ঋজুদাকে।

এখন তো সে কাল্লাটির গভীর জঙ্গলে ডেরা করেছে। সেখানে কারও পক্ষেই আর পৌঁছবার কোনও উপায় নেই। চারদিকেই জমি-মাইন পেতে রেখেছে সে। যদি সেখানেও তাকে ধরবার জন্য মাইনের ও সম্ভবত সমস্ত প্রতিরোধের বাধা পেরিয়ে কেউ পৌঁছতেও পারে তবে সে জঙ্গলের আরও গভীরে পালিয়ে যাবে সত্যমঙ্গলম-এর দিকে। ভীরাপ্পান যাকে বলে, জঙ্গলের পোকা। একমাত্র অন্য কোনও জঙ্গলের পোকাই তার সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। সাধারণ পুলিশ বা বি.এস.এফ দিয়ে হবে না।

কেউই কি যেতে পারেনি আজ পর্যন্ত, সত্যমঙ্গলম-এ?

পুলিশের এস. গোপালকৃষ্ণনই একমাত্র মানুষ, যিনি ভীরাপ্পানের খোঁজে ওই জঙ্গলে একবার গেছিলেন, এবং মাইনে 'আহত হয়ে' হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এপ্রিল মাসের ন তারিখে এক বাসভর্তি তামিলনাড়ুর রাজ্যের টাস্ক ফোর্স-এর পুলিশকে নেতৃত্ব দিয়ে যখন উনি নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের ভীরাপ্পানের সত্যমঙ্গলম-এর ডেরার দিকে, তখনই ভীরাপ্পানের মাইনে, তাঁদের পুরো বাসটিই উড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই বাইশজন দক্ষ ও সাহসী পুলিশের মৃত্যু ঘটে। গোপালকৃষ্ণন নিজে যদিও কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন কিন্তু সাংঘাতিক রকম আহত হন। নইলে, এপ্রিল মাসের ন তারিখে আহত হবার পর জুন মাসের আজ অবধিও তাঁকে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হত না।

এ পর্যন্ত কত জন পুলিশ ভীরাপ্পানের হাতে মারা গেছে?

ভটকাই শুধোল।

তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক রাজ্য পুলিশের এবং অন্যান্য ফোর্সেরও কত মানুষ যে ভীরাপ্পানের হাতে প্রাণ দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। অথচ ভীরাপ্পান কিন্তু আজও বন-জঙ্গলের মানুষদের কাছে দারুণ জনপ্রিয়। গরিবদের সবরকম সাহায্য করে ভীরাপ্পান। তার বয়স্কা মা-বাবাকে দেখে সবদিক দিয়ে—তার তিন বোন আর দুভাইকেও দেখে। তার দুঃসাহস প্রায় কিংবদন্তির রূপ নিয়েছে ওই অঞ্চলে—ইংল্যান্ডের রবিন হুডেরই মতো।

ভীরাপ্পানের ফ্যামিলি নেই?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, মাত্রই বছর দুয়েক আগে বিয়ে করেছে ভীরাপ্পান। তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল। শিশুও ভূমিষ্ঠ হল। যে ভীরাপ্পানকে ধরবার জন্য হাজার সশস্ত্র পুলিশের দিনে রাতের চব্বিশ ঘণ্টা চোখে ঘুম নেই, সে-ই শহরের হাসপাতালে গিয়ে সকলকে বুদ্ধু বানিয়ে তার স্ত্রী ও শিশুকে দেখে এল। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভীরাপ্পান নিজে যে শুধু দুঃসাহসী তাই নয়, সমাজের সব স্তরেই তার হিতার্থী বন্ধু এবং সহযোগী আছে। নইলে, এমন অঘটন সম্ভব হত না। আসলে আমার মনে হয়, ভীরাপ্পানও হয়তো আফ্রিকার ভুষুণ্ডারই মতো কোনও নেপথ্যচারী টর্নাডোর ক্রীড়নক। সেই লোকটা হয়তো সমাজের ওপরতলার অত্যন্ত সচ্ছল লোক। দিব্যি আরামে আছে। খাচ্ছে দাচ্ছে, মৌজ ওড়াচ্ছে, ব্যাঙ্গালোর, কি মাইসোর কি কোয়েম্বাটোর কি মাদ্রাজে বসে।

সত্যি! ফ্যান্টাসটিক।

ভটকাই উত্তেজিত গলায় বলে উঠল।

বলেই, তাৎক্ষণিক স্বরচিত একটা ছড়া আওড়ে দিল:

"শোনো, শোনো, মিস্টার ভীরাপ্পান
আমিও যে মিস্টার ভটকাই,
ভেবোনা আমাকে তুমি পোলাপান

দুই হাতে, হাতে-নাতে পিপিণ্ডি চটকাই।
দেখা হলে কী করে যে ঘাড়খানি মটকাই।
আমি ভটকাই। চটকাই। হাই-ফাই।"

ঋজুদা হেসে ফেলল। তিতিরও। আমি একটুও হাসলাম না। হাসা যেত, যদি ছড়াটা, ছড়া পদবাচ্য হত। এমন কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর চেষ্টা যারা করে, তারা অন্যদের তো আনন্দ দিতেই পারে না, উলটে নিজেদেরই ছোট করে। হচ্ছিল কী রকম সিরিয়াস কথা, তার মধ্যে বাগবাজারি চ্যাংড়ামি! কোনও মানে হয়!

ঋজুদা বলল, রুদ্রর আদৌ পছন্দ হয়নি তোর ছড়া, ভটকাই। আমারও যে খুব একটা পছন্দ হয়েছে তা নয়। তবে, আমি বোধহয় তোদের "বোর" করতে শুরু করেছিলাম—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই বিরতিটা, খুবই টাইমলি এনেছে ভটকাই।

এমন সময়ে ফোনটা বাজল। রিসিভারটা তুলে নিয়েই ঋজুদা বলল, ইয়েস।

ইয়েস। গুড ইভনিং। নমস্কারম্।

ও আই সি! দ্যাট আর্লি। অন সানডে? গুড হেভেনস্! হুইচ ডে ইজ টুডে? টুইসডে!...ইয়া!...ইয়া? আই কোয়াইট সি ইওর পয়েন্ট...নো নো, প্লিজ ডোন্ট ওয়্যারি বাউট দ্যাট। বাট ইট মাস্ট বি কেপ্ট আ সিক্রেট। দ্য হোল থিং। নো গর্ভর্নমেন্ট ভেহিকেল্স। নো রিসেপশান। নো বডি শুড নো। নো-বডি। প্লিজ, মেক ইট ডাবলি শিওর।...নো। নো। নান অফ ইওর অ্যারেঞ্জমেন্ট প্লিজ। এভরিথিং শুড বি ডিসক্রিট—আটারলি ডিসক্রিট। আই রিপিট। ডু য়্যু আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস, প্লিজ থ্যাঙ্ক বোথ দ্য চিফ মিনিসটারস অন মাই বিহাফ।...ইয়া। আই উইল গিভ ইউ দ্য ফ্লাইট নাম্বার—ইয়েস। অন দ্য ডায়রেকট লাইন। ইয়েস। অন দি আনলিস্টেড ওয়ান।—অ্যাট ইওর রেসিডেন্স।...ইয়া।

গুড নাইট। নমস্কারম্।

ফোনটা নামিয়েই ঋজুদা বলল, রুদ্র, গিয়ে দেখতো গদাধর খিচুড়িটা চাপিয়ে দিল কি না। না, আজকে খিচুড়ি-ইলিশমাছ ভাজাটা বাদ দিতে হবে।

বাদ? খিচুড়ি?

গভীর আশাভঙ্গের সঙ্গে ভটকাই বলল।

হ্যাঁ। তবে ক্যানসেল হচ্ছে না। আগামী কাল তোমরা সকলে পৌনে-সাতটায় আসবে। তারপর খিচুড়ি ইলিশমাছ খেয়ে, রাত দশটার মধ্যে বাড়ি যাবে।

আমি উঠতে যাব, এমন সময়ে গদাধরদা নিজেই কাশ্মীরি কাঠের ট্রেতে, সুন্দর হালকা মেহেন্দি-রঙা ম্যাটের ওপরে চাপিয়ে, প্রবাল-রঙা টি-কোজিতে মোড়া বড় চায়ের পটটি আর বোন-চায়নার কাপ ডিস সাজিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল। তিতিরের জন্য আলাদা একটি ফিকে হলুদ-রঙা গ্লাসে দুধ, ড্রিঙ্কিং-চকোলেট মেশানো।

ঋজুদা বলল, গদাধর, সৈন্যদলকে এখন বিদায় করো দুধ আর চা খাইয়ে। কাল রাতে খাওয়া-দাওয়া হবে। ভাজা-ভুজির পদ দু একটি বেশি কোরো। ভাজা ছাড়া

স্ফূর্তি জমে না।

কাঁঠালের বিচি ভাজা খাব, ঋজুকাকা।

আদুরে গলাতে, তিতির আবদার করল।

দাঁড়াও না। কাঁঠাল তো এখন গোরুর খাইদ্য। দেকি, পাই কি না।

গদাধরদা বলল।

ভটকাই বলল, তোমার বয়সই হল চার-কুড়ি, কিন্তু বুদ্ধি বলে কিচুই হলনি গো গদাধরদা। এতদিনে এও জানলিনে গো! কাঁঠালের বিচি আলাদা কিনতে পাওয়া যায়। আমিই নে আসবখন।

এই দাদাটা বড্ডই ভ্যাজ-ভ্যাজর করে। কই? রুদ্দর বাবুকে তো এতদিন ধরে দেইকতিচি, তিনি তো আমার সঙ্গে কইক্কনো...।

আমি বললাম, গদাধরদা, তুমিও তেমনই। তোমার রুদ্দরবাবু এই একটাই হয়েছিল। তুমি তার জোড়া পাবে কোত্থেকে!

একটা লাখ কথার এক কথা বলে ফেলেছিস রুদ্র। তুই যে এই পৃথিবীতে একটা মাত্রই—এই জ্ঞানটা তোর হয়েছে জেনে ভাল লাগল। একটা মাত্র যে কী? কোন চিজ, সেটা আর বললাম না।

তিতির বলল, তুমি রবিবারে যাচ্ছ, ঋজুকাকা?

ঋজুদা অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। তিতিরের হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে নিতে বলল, উঁ? হুঁ! তাই তো যেতে হবে দেখতে পাচ্ছি।

একাই যাবে? ভটকাই শুধোল।

চায়ে একবার চুমুক দিয়ে বলল ঋজুদা, এখনও তো সেইরকমই ঠিক আছে।

ভটকাই এর আশায় ছাই পড়ল। কে কে যাবে, সে বিষয়ে ঋজুদা মুখ খুলল না।

আমরা কেউই আর কোনও কথা বললাম না।

মিনিট পাঁচেক পর সকলে একসঙ্গেই বেরোলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভটকাই বলল, তিতির তোর গাড়িতে একটা ছোট্ট লিফট দিবি?

ছোট্ট লিফট মানে? তুই তো থাকিস বাগবাজারে আর রুদ্র...

আরে না না। অতদূরে যেতে হবে না। আমি আর রুদ্র একটু ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের পাশে ডাকাতে-কালীর কাছে নেমে যাব।

কেন?

পুজো দেব, পাঁচসিকে, পাঁচসিকের।

কীসের পুজো?

ঋজুদার মন গলানোর পুজো! ভীরাপ্পানের কাছে ঋজুদাকে একলা ছেড়ে দেওয়াটা কি তোদের উচিত? আমি না-হয় রংরুট, অনভিজ্ঞ; আফ্রিকার অ্যাডভেঞ্চারে কোয়ালিফাই করিনি। কিন্তু তোরা? তোরা কি মানুষ? ঋজুদা যদি

আর না ফেরে? ভাবিস না যে, সেন্টু দিচ্ছি। আমার সত্যিই চিন্তা হচ্ছে। ঋজুদার মন গললে, তবে না...

তিতির বলল, আমি পুজো-ফুজো জীবনে দিইনি। মূর্তি-পুজোতে আমার বিশ্বাস নেই। তবে, আমি গাড়িতে বসে থাকব, তোরা আমার নামেও পাঁচ সিকের পুজো চড়িয়ে দিস। সত্যি! ব্যাপারটা বেশ চিন্তারই হয়ে দাঁড়াল।

আমরা, মানে আমি আর তিতির, সাড়ে ছ'টার পরই পৌঁছে গেছিলাম বিশপ লেফ্রয় রোডে। ঋজুদা নেই। গধাধরদা বলল, কোতা গেচে কী করে জাইনব। গতরাতেও তো ঘুমটুম নেই। অনেক বইপত্তর মেলে বসচেলো আর টেলিফোনের পর টেলিফোন কইরতেচেল। রাত জেগে কারা টেলিফোনে কতা কয়, কে জানেরে বাবা। তাপ্পর সেই ভোরবেলা বেইরে গেচে চান করে শুধু এক কাপ চা খেইয়ে, আর দ্যাকো দিকি, একনও ফেরার নাম নেই।

তিতির বলল, পৌনে সাতটার মধ্যে ঠিক ফিরে আসবে। দেখো তুমি।

আমি বললাম, ঋজুদা বলে, “কথা দিলে, আমার ডেড-বডি আমার কথা রাখবে।” আমি যদি নিজে নাও রাখতে পারি। কোনওদিনও তিরিশ সেকেন্ডও দেরি করতে দেখিনি ঋজুদাকে—জাপানের ট্রেনগুলোর মতো।

সাতটা বেজে সাঁয়ত্রিশ। এমন সময়ে দরজার বেলটা বাজল। গদাধরদা বসবার ঘরেই ছিল। তাই, গদাধরদাই দরজা খুলতে গেল। দরজা খুললও। মনে হল, কার সঙ্গে কী কথা বলল। পরক্ষণেই প্রায় দৌড়ে ফিরে এসে বলল, একটা তিলক-পরা মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ কী সব দুর্বোদ্দ ভাষায় কতা কইচে গো। তোমরা যেয়ে দ্যাকো দিকি। আমি চন্নু কিচিনে।

তিতির আর আমি, দুজনেই গেলাম। দেখি সারা কপালে পাথালি করে মোটা সাদা আর লাল চন্দনের তিলক-কাটা, সাদা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা, পায়ে একসাইজ বড় একটি চটি পরে, হাতের বোতাম খোলা সাদা টুইলের শার্ট পরে, কাঁধে পাট করে সাদা-খোলের নীল-পাড়ের চাদর ফেলে, এক দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক, দুহাত জড়ো করে নমস্কার করে বললেন, “নমস্কারম্”।

তিতির বলল, মিস্টার বোস ইজ নট ইন। প্লিজ কাম ইন। হি উইল বি হিয়ার এনি মোমেন্ট।

সেই ভদ্রলোক বললেন, ইয়ানি ওরু পেরেয়া মেরুগাম।

আমি বললাম, সরি। উই ডোনট স্পিক তামিল।

এই কথা বলতে বলতেই আমি চিনে ফেললাম অ-ভদ্রলোককে। এবং তাঁর গলার স্বরকে। তিতির তখনও চিনতে পারেনি। ইতিমধ্যে ঋজুদাও এসে পৌঁছে গেল। এবং কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক ঋজুদাকে বললেন, ভান্নাক্কমে নানপারাএ নেনাইভু এরুক্কেরাথা?

ঋজুদা আমাদের অবাক করে দিয়ে বললে, আপ্পে হেথু ভাম্বেরকাল?

তারপর আমরা সকলে ভিতরে ঢুকলাম একই সঙ্গে। ভিতরে ঢুকেই অ-ভদ্রলোক আবার বললেন, "ইয়ানি ওরু পেরেয়া মেরুগাম।"

বলেই, যেন পরিত্রাণ পেয়ে পরিষ্কার বাংলাতে বললেন, রাত জেগে শিখেছিলাম অনেকই। কিন্তু এই একটা সেনটেনসই যে কেন ঘুরে ফিরে আসছে। অন্যগুলো যে কোথায় হাপিস হয়ে গেল।

ঋজুদা হেসে উঠে বলল, মানেটা বলে দে ওদের, ভটকাই।

ভটকাই বলল, মানে হচ্ছে, হাতি খুব বড় জানোয়ার।

তিতির শুনেই হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল। বলল, শুধু "হাতি খুব বড় জানোয়ার" এই বাক্যটাই মনে থাকল কেন তোমার?

তা কী করব! হাতি-শিকারি নিয়ে কারবার এবারে, হাতিকে প্রিডমিন্যান্স না দিলে কি চলে?

পরক্ষণেই ঋজুদার দিকে ঘুরে বলল, দেখো ঋজুদা! তোমার জন্যে ন্যাড়া হলাম ম্যাড্রাসি সাজলাম, এর পরেও নেবে না আমাকে?

ঋজুদা হো হো করে হেসে ফেলল, অনেকক্ষণ ধরে হাসতেই থাকল, এমন করে হাসতে দেখিনি বহুদিন ঋজুদাকে।

হাসল বটে, কিন্তু উত্তর দিল না ভটকাই-এর কাকুতি-মাখা প্রশ্নর। সেও বড় শক্ত ঠাঁই।

ভটকাই চুপসে গিয়ে, ন্যাড়া মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

ভেকটা কিন্তু ভালই ধরেছে। প্রথমে তো আমরাই চিনতে পারিনি। ঋজুদাও হয়তো পারেনি প্রথমে।

ঋজুদা বলল, তোর ঘড়ি-পরার রকমটা শুধু ঠিক হয়নি। হয় একটা ট্যাঁক ঘড়ি জোগাড় কর, নয়, ঘড়িটার ডায়ালটা ভিতর দিকে করে পর। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী যেমন করে ঘড়ি পরতেন। অধিকাংশ টামিলিয়ানরাই, কেন জানি না, ওরকম করে ঘড়ি পরতেই পছন্দ করেন।

বলেই বলল, তা তুই "হাতি খুব বড় জানোয়ার"-এ এসে আটকে গেলি কেন?

কী করব! আমার স্মৃতিশক্তি হচ্ছে বেগ-বেগা।

সেটা আবার কী?

তিতিরই শুধোল।

তাও জানিস না? কতরকমের মেমারি হয় জানিস?

স্মৃতিশক্তির আবার রকম কী?

তিতির বলল, অবাক হওয়া গলায়।

আছে আছে। শোন তবে। চাররকমের মেমারি হয়। (১) চির-চিরা (২) চির-বেগা (৩) বেগ-চিরা (৪) বেগ-বেগা। আমার মস্তিষ্কে সবকিছুই বেগে প্রবেশ করে এবং তা মুহূর্তের মধ্যে আবার সমান বেগে বেরিয়ে যায়। মুখস্থ করতেও

সময় লাগে না, ভুলে যেতেও নয়। তাই আমার স্মৃতি শক্তি, বেগ-বেগা।

চির-চিরা মানে কী? সেটার কী বিশেষত্ব?

চিরচিরা মানে হল, মাথায় ঢুকতে বহুতই সময় নেয়, কিন্তু মগজে একবার যদি ঢুকে গেল, তো সেখানেই পাথর হয়ে রয়ে গেল। হোল লাইফ। নট নড়ন-নট চড়ন, নট কিচ্ছু।

আর চির-বেগা?

সেটিই হল, সবচেয়ে খারাপ। মগজে ঢোকাতে ঢোকাতে জীবন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু, যদি বা অবশেষে ঢুকল; তাও ঢোকামাত্রই সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল।

তিতির মুখস্থ করে নিল। "চির-চিরা", "বেগ-বেগা", "বেগ-চিরা", "চির-বেগা"।

আজ বৃষ্টি নেমেছে। বছরের প্রথম বৃষ্টি। খিচুড়িটা জমবে ভাল। কিন্তু এক কাপ করে চা তো খাবি?

ঋজুদা বলল।

মন্দ হয় না। আমি বললাম।

তিতির বলল, আমি কিন্তু কিচ্ছু না।

ভটকাই বলল, আমি গিয়ে গদাধরদাকে আরও একটু ভড়কে দিয়ে কড়কে আসি। আমাকে দেখেই তো পালিয়েছে, রান্নাঘরে। তাই না?

তিতির হেসে বলল, হার্ট-ফেল করে মারাই যাচ্ছিল প্রায়। কী যে করোনা তুমি!

ভটকাই ভিতরে চলে গেল এবং পরমুহূর্তেই ভয়ঙ্কর ভীত গদাধরদা দৌড়ে বসবার ঘরে ঢুকে বলল, ওই মাদ্রাজিটাকে কিচিনে কে পাইটে দেল? সেখানে গে আমাকে আন্ড্রে-পান্ড্রে কী সব বলতিচে, আবার ধমকও মারতিচে—

ঋজুদা হেসে বলল, তোমার এতখানি বয়স হল, গাঁয়ের মানুষ তুমি। সং চিনতে পারলে না গো গদাধর? কেমন ধারা লোক? ভাল করে চেয়ে দ্যাখো দেখি। একে কি তুমি চেনো না?

পূর্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর সান্দাকফুতে সূর্যোদয়ের মতো আস্তে আস্তে, গদাধরদার মুখে আলো ফুটতে লাগল। তারপর, স্বস্তির হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্বগতোক্তির মতো বেরিয়ে এল মুখ থেকে একটি মাত্র শব্দ। বিচ্ছু! হায়! হায়! কী বিচ্ছু ছেলে গো! বলার সঙ্গে সঙ্গেই, হাতে-ধরা পেতলের হাতাখানি দিয়ে মারল ভটকাই-এর ন্যাড়া মাথাতে, আলতো এক ঠোক্কর।

মেরেই, ঋজুদাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আজ এই বইলে দিনু। তোমার ভবিষ্যৎ বহুতই খারাপ দাদাবাবু।

কেন? হঠাৎ এমন অলুক্ষণে কথা কেন?

কেন আবার! "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে"।

বলেই, গদাধরদা অন্তর্হিত হল।

গদাধরদার বলার ভঙ্গি শুনে, হেসে ফেলল, ঋজুদা।

উরি বাবারে। কী গরম রে। চাঁদি ফেটে গেল গো। বলে, চেঁচিয়ে উঠল ভটকাই, হাতার বাড়ি খেয়ে। পেতলের হাতাটা ভারীও কম নয়।

ঋজুদা বলল, তিতির তুই গিয়ে চায়ের কথাটা বলে আয়।

সত্যি! ভটকাইটা সবকিছু গুবলেট করে দিল। যা-তা একটা।

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, যাই বলিস, ভটকাই-এর কিন্তু খুব রেডি-উইট আছে। জীবনে মানুষের এই গুণটি খুবই কাজে লাগে।

ঋজুদার "মুড" "গুড" দেখে বললাম, আমরা সকলেই কি যাচ্ছি আগামী রবিবারে? ঋজুদা? আজ তো বুধবার হয়ে গেল।...গোছগাছ...

ঋজুদা বলল, এখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি। আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না, এই ডেঞ্জারাস মিশনে তোদের নিয়ে যাবার। তবে এটাও ঠিক যে, এবারে আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে থাকব না কিন্তু, রণকৌশলটা আমাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যদি পারি, তবে বাতলে দেব ওঁদের। আমাদের ভূমিকা এবার গোয়েন্দা এবং স্ট্রাটেজিস্ট-এর। তবে, একেবারে ফ্রন্টে তোমাদের যেতে দেব না—প্রয়োজন যদি পড়ে, আমি একাই যাব। এ নিয়ে যদি কোনওরকম গাঁই-গুঁই করো, তা হলে, তোমাদের ওখানেই ছেড়ে রেখে আমি ফিরে আসব।

ঠি আচে।

ভটকাই বলল।

খুব উত্তেজিত হয়ে যখন তাড়াতাড়ি কথা বলে ভটকাই, তখন এমনি করেই শেষের অক্ষরটা ফেলে দৌড়য়। ঠিককে বলে, 'ঠি।'

তা হলে। আমরা যাচ্ছি?

তিতির বলল।

ভটকাই থাম্বস-আপ করল।

রুদ্র, তুমি!

তিতিরই এসে দরজা খুলল। কোনওদিনই খোলে না। সম্ভবত বাড়িতে এখন কেউই নেই।

কী ব্যাপার? হঠাৎ না বলে-কয়ে?

তুমি যে এমন ভি. আই. পি. যে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট না-করে তোমার কাছে আসা যাবে না?

তোমার মতো সকলেই যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া যখন তখন আসে, তবে সুদূর ভবিষ্যতে কোনওদিনও ভি. আই. পি. হবার সামান্য সম্ভাবনা থাকলেও তা আর হওয়া হবে না। তাই আর কী। বুঝলে রুদ্র। প্রত্যেকেরই জীবনে

"পার্সোনাল-টাইম ম্যানেজমেন্টটাই" হচ্ছে আসল জিনিস। ওটি যিনি করতে না পারেন, তাঁর পক্ষে কিছুই 'হয়ে-ওঠা' আদৌ সম্ভব নয়। সময় নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমি রাজি নই।

তিতিরের 'জ্ঞান'-এর কোনও জবাব না দিয়ে বললাম, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। ঋজুদাকে দেখতে যাব। উডল্যান্ডস-এ।

উডল্যান্ডস-এ! কেন? ঋজুদার কী হয়েছে? আমি তো কিছু জানি না। হার্ট অ্যাটাক?

মধ্যপ্রদেশে অতগুলো দিন ভটকাই-এর সঙ্গদোষে কাটাবার সময়েও যদি হার্ট-অ্যাটাক না হয়ে থাকে, তবে ঋজুদার তা হবার সম্ভাবনা আছে বলে তো মনে হয় না। ক্যালকাটা-ফিভার। খুব মাথার যন্ত্রণা, একশো পাঁচ জ্বর। কষ্ট পাচ্ছে খুবই।

তা বলে নার্সিংহোমে! আমাকে ফোন করল না কেন? আমরা এতজনে আছি কী করতে তা হলে? বাড়িতেই তো রাখা যেত।

আরে আমিও কি আর আগে জানতাম। গদাধরদা নাকি আমাদের খবর দেওয়ার কথা বলেও ছিল। ঋজুদাই নাকি বারণ করেছিল। বলেছিল, আমার পরীক্ষা, পড়াশোনার ক্ষতি হবে। দুস্‌স্‌। পড়াশোনা করে যেন উল্টে দিচ্ছি একেবারে।

'উডল্যান্ডস'-এ নিয়ে গেল কে, বিশপ লেফ্রয় রোড থেকে?

প্রতিবেশীরাই! আবার কে? অরামাসি নিজেও নাকি গেছিলেন। মণ্টু কাকাদের ফ্ল্যাটও তো পাশের ব্লকেই।

ও হ্যাঁ! তাই তো। কিন্তু এখন আছে কেমন? ঋজুদা?

তাই দেখতেই তো যাওয়া! নাও, এখন আর কথা বাড়িও না। আমি বসছি। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। তোমার এখান থেকে ভটকাইকে কি একটা ফোন করতে পারি? আসার আগেও করেছিলাম। বাড়ি ছিল না। টিকিট কাটতে গেছে নাকি রবীন্দ্রসদনে। ওর মা বললেন।

সেখানে কী? কীসের টিকিট?

'দক্ষিণী'র প্রাক্তনী থেকে রবীন্দ্রনাথের 'অরূপরতন' করছে। এর আগে নাকি বিদ্যাভবনেও দেখেছে ও একবার, কবিপক্ষে। কী দেখেছে, তা ওই জানে! একেবারে উচ্ছ্বসিত! বিশেষ করে অর্পিতা বলে একটি মেয়ের অভিনয়ের—। সে সুদক্ষিণার চরিত্রে নাকি দারুণ অভিনয় করেছে।

আমাদের দেখাবে না? সত্যি, অরূপরতন-এর মতো নাটক আজকাল দেখাই যায় না।

না দেখিয়ে কি সে ছাড়বে? কান ঝালপালা করে দিল। ওর অর্পিতাদির মতো অভিনয় নাকি স্মিতা পাটিলও করতে পারত না। সম্ভবত আমাদের জন্যেই কাটতে গেছে টিকিট। দেবাশিস রায়চৌধুরীর পরিচালনা।

তুমি বোসো রুদ্র। আমি এক মিনিটে আসছি। দাঁড়াও, মাকে একটা ফোন করে

দিই। মা অবশ্য, অরামাসিদের বাড়িতেই গেছেন। এখন বাড়িতে কেউই নেই।

তিতির ফোনটা করেই, ভিতরে চলে যেতেই, ফোনটা বেজে উঠল। তিনবার বাজবার পরও যখন তিতির ধরতে এল না, তখন আমি তুললাম, ফোনটা।

হ্যালো।

কী রে! আমি ঠিক জানতাম, তুই এখন তিতিরের সঙ্গে ঝিং-চ্যাক সাদা মারুতিতে করে নগর-পরিক্রমাতে বেরোবি। তাই আন্দাজিফাই করেই তোকে ধরলাম।

দ্যাখ ভটকাই, সবসময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না। ঋজুদার ক্যালকাটা-ফিভার হয়েছে। উডল্যান্ডস-এ আছে। তোকে বাড়িতে ফোন করেছিলাম। তোরও কি আমাদের সঙ্গে যাওয়াটা কর্তব্য নয়? কর্তব্যজ্ঞান বলে তো কোনও কিছুই...

আমিও এগজ্যাক্টলি সেই কথাটাই ভাবছিলাম, মানে তোর কোনও কর্তব্যজ্ঞান নেই, সেই কথা। ভিজিটিং-আওয়ার্স প্রায় শেষ হতে চলল, আর ঋজু বোসের ওরিজিনাল এবং ফেভারিট চামচেদের কারও দেখা পর্যন্ত নেই! তোরা কি মানুষ? অকৃতজ্ঞের দল সব! ছিঃ ছিঃ!

মানে?

হতভম্ব হয়ে বললাম।

মানে, আমি উডল্যান্ডস থেকেই বলছি। তাড়াতাড়ি আয়। আমার পক্ষে দুজন রোগীকে একা সামলানো অসম্ভব। একজন অনর্গল অক্সোনিয়ান অ্যাকসেন্টে ইংরেজিতে আবৃত্তি করে চলেছেন, ধুম জ্বরের মধ্যে ঘোরে, হয় ওয়াল্ট হুইটম্যান নইলে রবার্ট ফ্রস্ট। মধ্যে মধ্যে সুকুমার রায়ও অবশ্য আওড়াচ্ছেন: “হলদে সবুজ ওরাং-ওটাং/ ইট পাটকেল চিৎ- পটাং।” আর আরেকজন বিশুদ্ধ দোকনো বাংলায় কুঁই পেড়ে, কন্টিনিউয়াসলি কেঁদে চলেছেন, “কী হবে গো আমার? ও ভটকেদাদা। তিনি চইলে যেতিচেন গো! হায়! হায়! আমার কী হবে গো! দাদাবাবু গোওওও!”

কে?

আবার কে! তোমাকে খিচুড়ি খাইয়ে যিনি গোবর বাইনেচেন।

গদাধরদা?

আঁজ্ঞে। তেনার জন্যেও একগাচি নার্স ঠিক কইরতে হবেক। সঙ্গে মালকড়ি নে এস। চঞ্চল করি। আমি বাবা গরিবের ঘরের ছেইলে! শরীর দে যেটুকু করার নিশ্চয় কইর্যে দেবোকন। কিন্তু পয়সা কুয়াড়ে মিলিব?

গদাধরদা আবার সেখানে গিয়ে নাটক করছে কেন?

সেটা তোমার পেয়ারের গদাধরদাকেই নিজে এসে জিজ্ঞেস করো। নার্সরা দুজনকে নিয়েই একেবারে নাজেহাল। নেহাত বিশ্ববিখ্যাত ঋজু বোস। অন্য কেউ হলে, দুজনকেই বের করে দিত, নার্সিংহোম থেকে। ঋজুদা অত্যন্ত খারাপ পেশেন্ট। মা বাবার একমাত্র সন্তান তো। ছেলেবেলাতে বোধহয় স্পয়েল্ট-চাইল্ড

ছিল।

তুই থাম। আমি আর তিতির আসছি এখনই। কোনও ভয় নেই তো রে ভটকাই?

না। তবে অসুখ মানেই তো সুখের অভাব। জ্বর ভাল ঠিকই হবে, তবে ভোগান্তি আছে। ভয় নেই কিন্তু ভয় আছেও। আজকাল কোনও রোগীই রোগে মরে না, ওষুধে মরে। আরও একটা ভয় আছে। সেটা শুধু ঋজুদারই নয়, আমাদেরও। ভীরাপ্পানের ভয়।

কোন ভীরাপ্পান?

যার কথা তুমি ভাবছ চাঁদু। দাক্ষিণাত্যের কোল্লেগাল-এর জঙ্গলের, হাতির দাঁতের, চন্দনকাঠের চোরা-চালানকারী। চন্দনকাঠেই এবার চিতা সাজছে আমাদের সকলের। একেবারে রাজা-রাজড়ার মতো মারা যাবে। খাসা! এবার দেখব তোমার আর নেকু-পুষু-মুনু তিতিরের বাহাদুরি। "গুগুনোগুম্বারের দেশে" আর "রুআহা"র ভুষুণ্ডা, কোল্লেগালের ভীরাপ্পানের কাছে, যাকে তোদের ভাষায় "পোলাপান" বলে; তাই। কিন্তু সেখানে হয়তো যাওয়াই হবে না। অলরেডি অন্য এক নেমন্তন্ন পৌঁছে গেছে ঋজুদার কাছে। এবং...

এবং কী?

অধীর আগ্রহের সঙ্গে আমি, রুদ্ধশ্বাসে শুধোলাম।

পিচিক করে, পুব-আফ্রিকার মাসাই উপজাতিদের থুতু ফেলার মতো একটা শব্দ করে একটু হাসল ভটকাই। তারপর বলল, শনৈঃ শনৈঃ। বৎস। শনৈঃ শনৈঃ। ক্রমশ প্রকাশ্য। অত তাড়াহুড়ো কীসের?

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভাবছিলাম যে, "খাল কেটে কুমির" তো আমিই এনেছি। এখন ভটকাই-ই হচ্ছে আমার আর তিতিরের সবচেয়ে বড় প্রবলেম। "নিনিকুমারীর বাঘ" মারতে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াতে ওড়িয়াটাও শিখে গেছে একটু একটু। গদাধরদার কাছ থেকে দক্ষিণ বাংলার ভাষার টান-টোনও রপ্ত করেছে। তার সঙ্গে আবার সংস্কৃত মিশিয়ে দিচ্ছে মাঝেমাঝে। ঋজুদার হাতে-পায়ে ধরে, কত চেষ্টা চরিত্তির করে ওকে আমাদের দলে ঢুকিয়েছিলাম, আর এখন ওই আমাদের ওপর হরওয়াক্ত ছড়ি ঘোরাচ্ছে। ঋজুদার প্রশ্রয়েই এটা ঘটেছে। খুবই অভিমান হয় মাঝে মাঝে, ঋজুদার ওপরে, এই জন্যে। এইরকম আলটপ্‌কা সিনিয়রদের "সুপারসিড" করার দৃষ্টান্ত সরকারি চাকরিতেও বেশি দেখা যায় না।

সাধে কি ছোটঠাকুমা বলেন, "রুদদুররে, ভুলেও কক্কনও বাঙালির উপগার করিসনি দাদু। তোর ছোটদাদুকেও তো চোকের উপরে দেকলি! কি পায়শ্চেত্তটা করলে!

কী যে বাদলা চলেছে কলকাতায় প্রায় একমাস হল যে, মনই ভাল লাগে না। মা শান্তিনিকেতনে গেছিলেন। বলছিলেন, এমন খরা সেখানে বহুদিন হয়নি। বাগানের গাছগাছালি বাঁচিয়ে রাখাই দায়। ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা গাছটা, নতুন মালীর গাফিলতিতে মরে গেছে। তবে এই খরারই কারণে আবার জ্যাকারাণ্ডা আর বোগেনভেলিয়াদের ডালে ডালে রঙের মারদাঙ্গা লেগে গেছে।

ভটকাই বলে, এমনটিই তো হবার কতা। একটা ডেবিট হলেই একটা ক্রেডিট হতেই হবে। একেই বলে ডাবল-এন্ট্রি।

শান্তিনিকেতন এবারে নাকি বৃষ্টির ব্যাপারে একেবারে একটা দ্বীপের মতো হয়ে রয়েছে। ঊষর দ্বীপ। বীরভূমে শেষের দিকে বন্যা হয়ে গেল, কিন্তু শান্তিনিকেতন খটখট করছে।

মা গত সাতদিন কলকাতাতে না-থাকাতে বাড়ি আগলাতে হয়েছে, ফোন ধরতে হয়েছে। বাবা দিল্লিতে গেছেন মাসের গোড়াতে। সেখান থেকে বম্বে হয়ে ফিরবেন। সে কারণেই ঋজুদার কাছে একদিনও যেতে পারিনি। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পরও উডল্যান্ডস থেকে ছাড়া পেয়ে ঋজুদা নয়নামাসির বাড়িতে গিয়ে ছিল আরও সাতদিন। সেখানে নয়নামাসি অফিস থেকে সাতদিন ছুটি নিয়ে ঋজুদাকে খাইয়ে-দাইয়ে, ক্লাসিকাল, রবীন্দ্র সংগীত আর পুরাতনী গানের রেকর্ড আর ক্যাসেট শুনিয়ে, শরীরে মনে একেবারে ফিট করে, বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে।

ফোনে, ঋজুদা বলছিল, এখন জগিং-ফিট হয়েছে, ফাইটিং-ফিট হতে এখনও আর দিন সাতেক লাগবে।

কোল্লেগাল বা মালে মহাদেশ্বর বা সত্যমঙ্গলম-এর পাহাড় জঙ্গলে আমাদের যাওয়া যে হবে না, সে খবরটা ঋজুদা অসুস্থ হবার আগেই পেয়ে গেছিল। ভটকাই তো জানতই। আমি আর তিতিরই জানতাম না। তবে মনমরা হবারও কিছু নেই। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

তামিলনাডু আর কর্ণাটকের পুলিশের বড়কর্তারা আর বি. এস. এফ.-এর বড়কর্তারাও প্রথমে ঋজুদাকে আকুল আহ্বান জানিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ঘটনাপরম্পরা তাঁদের আয়ত্তে এসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরাই প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রবিভাগে, ঋজুদার যাওয়া নিয়ে। তাঁদের বক্তব্য এতজনের প্রাণহানির পরে, এত কাণ্ডের পরে, মিডিয়ার হাতে এত অপমান নিন্দামন্দ সহ্য করার পর যখন তাঁরা ভীরাপ্পান এবং তার দলবলকে প্রায় নিজেদের কব্জার মধ্যে এনেই ফেলেছেন, তখন কলকাতার ঋজু বোস এসে তাঁদের ওপর ছড়ি ঘোরাবেন এটা ওঁদের পক্ষে লজ্জাকর তো বটেই, একেবারেই দৃষ্টিকটু। আগে ডাকলেও না-হয় হতো। ইটস ট্যু লেট ইন দ্য ডে।

ওদের যুক্তিটা অবশ্যই গ্রাহ্য। অন্যায় কিছু বলেননি ওঁরা। তা ছাড়া, সাফল্য যখন প্রায় হাতের মুঠোতে এসেছে তখন ওঁদের চটানো বা ওঁদের মনে আঘাত দেওয়ার মতো কিছু করা, উপরওয়ালারা ন্যায্য কারণেই ভাল বলে মনে করেননি।

ঋজুদার সঙ্গে নাকি দুই রাজ্যের চিফ-সেক্রেটারিরাই কথা বলেছেন, ব্যাপারটা বুঝিয়ে। ঋজুদা যাতে কিছু মনে না করে। সে সম্বন্ধেও চেষ্টার ত্রুটি করেননি ওঁরা। অবশ্য ঋজুদা তো আর সেখানে যাওয়ার জন্য লালায়িত ছিল না। তাঁদের অনুরোধেই যাচ্ছিল। তাই মনে করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

নীলগিরির পাঁচ কে. জি সবচেয়ে ভাল চা এসেছে। মহীশূরের চন্দনকাঠের একটি চমৎকার কার্ড-টেবিলও পাঠিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু, ঋজুদা যে শুধু তাস খেলে না তাই নয়, তাস খেলা আদৌ পছন্দও করে না; তা না জেনেই। চমৎকার টেবিলটা নয়নামাসির বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে ঋজুদা। ওঁরা সবাই তাস-পাগল। চাও পাঠিয়েছে সকলকেই। আমাদের বাড়িতেও এসেছে এক প্যাকেট। তা ছাড়া, ঋজুদার কাছে তো খাওয়াই যায় যখন তখন। তবে, ঋজুদা নিজে নীলগিরি বা আসামের চা পছন্দ করে না। মকাইবাড়ির চা খায়। নয়তো লপচু—দার্জিলিং-এর। পাঙ্খাবাড়ির খাড়াপথের পাশের মকাইবাড়ির চা-বাগানের মালিক, রসিক, শিকারি এবং ঋজুদার বন্ধু ব্যানার্জি-জেঠুরা প্রতি দুমাস অন্তর ঋজুদার জন্য চা পাঠান।

যেদিন দক্ষিণ ভারত থেকে "যেতে হবে না" খবরটি আসে, ঠিক সেদিনই অন্য একটি খবরও এসে যায়, মণিপুর থেকে। আসলে, মণিপুর রাজ্যের 'মোরে' থেকে। যেখান থেকে ডাক এসেছে সেই জায়গাটার নামই "মোরে"। ইংরেজি বানান MOREH। মোরে আর মরে উচ্চারণটা এক বলে প্রথমটায় আমরা খুব হাসাহাসি করেছিলাম, মরে যেতে হবে বলে। 'মোরে' মণিপুর আর বার্মার সীমান্তবর্তী গ্রাম। গ্রামই নাকি ছিল আগে। এখন মস্ত জায়গা। মোরের পরেই একফালি নো-ম্যানস ল্যান্ড। তারপরই বার্মার একটি নদীর একটি সরু শাখা নদী। তার ওপরে একটি ব্রিজ। লোহার। তারও পরে আবার কিছুটা নো-ম্যানস ল্যান্ড। তারপরেই বার্মা, এখন মায়নমার সীমান্তর গ্রাম, নাম "তামু"।

এই মোরেতেই খুন হয়েছেন দিন পনেরো আগে মণিপুর রাজ পরিবারের একজন রাজপুরুষ, অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে। এবং সেই খুনের তিনদিন আগেই তাঁর "মোরের" বাড়ি থেকেই খোয়া গেছে একটি পারিবারিক, "সেরিমনিয়াল" তরোয়াল, যা সেই ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষেরা বংশ-পরম্পরায় ব্যবহার করতেন, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে। সেই তরোয়ালটি আবার দুদিন পরে পাওয়া গেছে সে বাড়িরই বাগানের একটি নীলফুলফোটা বড় কেসিয়া গাছের তলাতে। কেউ মাটি খুঁড়ে পুঁতে রেখেছিল সেটাকে। কিন্তু রহস্যের সেখানেই শেষ নয়। সেই তরোয়ালের হাতলের ঠিক নীচেই বসান ছিল, একটা প্রকাণ্ড চুনী। মানে, রুবি। যার দাম, আজকের দিনে, কম করে কোটি টাকারও বেশি।

এই মৃত্যুরই কিনারা করার অনুরোধ জানিয়ে মণিপুরের রাজ পরিবারের এক দূর সম্পর্কের শরিক, পাঠিয়েছেন, মিস্টার তম্বি সিংকে। মিস্টার তম্বি সিং কলকাতাতে ঋজুদার সাহায্য চাইতেই ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছেন এবং হোটেলে

ঋজুদার ভাবের অভাবেই কাল থেকে বসে আছে। মণিপুরে বসে ঋজুদার বই জানা সম্ভব ছিল না, কিন্তু অন্য সূত্রে তম্বি সিং শুনেছিলেন ঋজুদার বই। আসলে তিনিও ঋজুদাকে চেনেন না। কলকাতা থেকে ঋজুদার পরিচিত এক মণিপুরী ভদ্রলোক মিস্টার শিলক সিং বছর অল্পদিন আগেই এই ঘটনার সময় মণিপুরে পৌঁছেছিলেন। তখন তিনিই শিকারি, অ্যাডভেঞ্চারার এবং প্রাইভেট ডিটেকটিভ ঋজুদার কথা জানান ওঁদের এবং তাঁর কথা শুনেই তম্বি সিং ফোন [illegible] ছুটি ধরে ইম্ফল থেকে কলকাতা চলে আসেন।

টেলিফোনে মি. তম্বি সিং-এর সঙ্গে ঋজুদার কথাবার্তা আগেই হয়ে গেছে। কিন্তু ঋজুদা অসুস্থ হয়ে পড়াতে সব গুবলেট হয়ে গেল। নিজের বাড়িতে না-হলে অবশ্য দেখা করা সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছিল ঋজুদা। তাই ফিরে গিয়ে আবার এসেছেন উনি গতকাল। আজকে রাতেই মিস্টার সিং আসবেন ঋজুদার ফ্ল্যাটে। ঋজুদা মণিপুরে যেতে রাজি হয়েছে এবং আমাদের সকলকেই যে ঋজুদা নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে এই আনন্দে আমরা সকলেই [illegible]। বিশেষ করে, ভটকাই। তবে ঋজুদা বলেছে, মণিপুর চমৎকার জায়গা। তোদের দেখা হবে বলেই নিয়ে যাচ্ছি। গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে নয়।

ঋজুদার কথামতো আমরা সকলেই সোমবারে বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বিশপ লেফ্রয় রোডে পৌঁছে গেছি। মিস্টার তম্বি সিং আসবেন ছটার সময়ে। উনি ডিনার খাবেন না। ঋজুদা যদিও বলেছিলেন খেতে। ওঁর নাকি ইন্দোনেশিয়ার কনসাল বি. ডি. কে. নাগের সঙ্গে কী কাজ আছে। ডিনারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কি নেই তা অবশ্য বলেননি, ঋজুদার সঙ্গে ডিনার খেতে পারবেন না তাই শুধু জানিয়েছেন।

আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। আজকে সন্তার ওপর দিয়ে সেরেছে গদাধরদা। পেঁয়াজি, পাতলা পাতলা করে কাটা বেগুনের বেগুনি—বেসন দিয়ে কড়া করে ভাজা। কুমড়োর ফুল ভাজা। আর চা।

ঘড়িতে যখন ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট তখন ভটকাই একবার দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে দেখে এল। "নিনিকুমারীর বাঘ" মারতে গেছিল আমার আর ঋজুদার সঙ্গে সেটা অন্য ব্যাপার ছিল, তা বলে খুনের কিনারা করতে যাওয়া! ন্যাচারলি অত্যন্ত উত্তেজিত এবং উন্মুখ হয়ে আছে সে।

ঋজুদা বলল, তুই দেখি আমাদের ম্যাডার মতন।

কে ম্যাডা? যার নামে ম্যাডাক্স স্কোয়ার? যেখানে জমজমাট পুজো হয়?

তিতির বলল, নামটা ম্যাডাক্স স্কোয়ার নয়, ম্যাডক্স স্কোয়ার।

নারে, না। আমাদের একটি আইরিশ ফক্স-টেরিআর কুকুর ছিল। সাদাতে-কালোতে মেশানো রং। কী বুদ্ধি যে ছিল তার, আর কী চঞ্চল, তা কী বলব। জেঠুমণি যখনই অফিস থেকে আসতেন তখনই ম্যাডা পথের সব গাড়ির হর্ন-এর মধ্যে জ্যেঠুমণির গাড়ির হর্ন ঠিক চিনে নিতে পারত আর উত্তেজিত হয়ে

লেজ নাড়াতে নাড়াতে ঘর-বারান্দা করত বার বার—এবং তারপরই এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গারাজে চলে যেত। বাড়ির ভেতর দিক থেকে গারাজে ঢোকার একটি দরজা ছিল।—সেই দরজা দিয়েই জেঠুমণি গাড়ি গারাজ করে, দোতলাতে উঠে আসতেন। গারাজ খোলা মাত্রই ম্যাডা গারাজে ঢুকে গাড়ির সামনে লাফাতে থাকত। এমনি করেই তো একদিন গাড়ির তলাতে পরে ডান পাটা ভেঙেই গেল।

তিতির বলল, আচ্ছা ঋজুদা, তুমি বুঝি কুকুর ভালবাস না?

আমি বললাম, তোমরা আর কতদিন চেন ঋজুদাকে? বহুদিন আগে ঋজুদা যখন ওড়িশার জঙ্গলে ক্যাম্প করে থাকত, কাঠের ঠিকাদারি করত, তখন ঋজুদার সাত সাতটি কুকুর ছিল। আর তাদের নাম কী ছিল, জানো?

ভটকাই শুধোল, কী?

সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি।

তিতির হেসে উঠল। বলল, শুদ্ধ না কোমল?

আমি বললাম, সাত স্বরেই তো কোমল পর্দা লাগে না। শুদ্ধ স্বরগুলি ছিল পুরুষ আর কোমল স্বরগুলি মেয়ে।

ঋজুদাও হেসে উঠল, পুরনো কথা হঠাৎ মনে পড়িয়ে দেওয়াতে।

আমি অনেকদিন পরে একহাত নিলাম ভটকাইকে, তিতিরকেই বা নয় কেন! দুজনকেই।

তারপরই জ্যাঠার মতো বললাম, সে কি আজকের কথারে? 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে'তে লিখেছি সেসব কথা। ঋজুদাকে নিয়ে সেই তো আমার প্রথম বই। তখন আমার কতই বা বয়স!

তিতির হেসে বলল, হ্যাঁ, তুমি তো এখন বুড়োই হয়ে গেছ রুদ্র। তোমার বয়সের কি আর গাছ-পাথর আছে?

বুড়ো নই, বুড়ো নই; অভিজ্ঞ! এক্সপিরিয়েন্সড।

রাইট।

বলল, ঋজুদা! পাইপে দেশলাই ঠুকে।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, রুদ্রকে তোরা মাঝেমাঝে যে হেনস্থা করিস এবং ও সবসময় হাসিমুখে তোদের সহ্যও করে, সেটা ওর মহত্ত্বই বলতে হবে। সত্যিই, আমার আর রুদ্রর পার্টনারশিপ তো কমদিনের হল না! আর ঋজুদা কাহিনী লিখে, বলতে গেলে রুদ্রই তো আমাকে ফেমাস করল। যদিও ফেমাস হতে চাইনি আমি। এ এক বিড়ম্বনা!

ঘড়ির দিকে একবার চেয়েই ভটকাই আবার এক দৌড়ে বারান্দাতে গেল, ঋজুদার জ্যেঠুমণির ম্যাডার মতন। গিয়েই রানিং কমেন্টারি দিতে লাগল—কন্টেসা ক্লাসিক সাদা রং। এক্ষুনি পৌঁছল। মিস্টার তন্বি সিং নামলেন। ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

বাবা! এ যে দেখি পুরো সাহেব।

বলেই, ঘরে এল। বলল, ওঁর বড় ভাইকে সঙ্গে আনলেন না?

বড় ভাই?

ঋজুদা একটু তাকাল অবাক হয়ে, ভটকাই-এর দিকে।

হ্যাঁ। হম্বির তো তম্বির বড় ভাইই হওয়ার কথা। হম্বি-তম্বি বলেই তো জানি কথাটা আমরা।

আমরা সকলেই হো হো করে হেসে উঠলাম। এবং গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটাতে ছ'টা বাজার শব্দ আরম্ভ হতে না হতেই কলিং বেলটা বাজল।

আমিই খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ঋজুদা হাত দিয়ে ইশারাতে মানা করে, নিজেই গিয়ে দরজাটা খুলল, বলল, গুড ইভনিং মিস্টার তম্বি। কাম অন ইন।

ভারতীয়দের সঙ্গে সচরাচর ইংরেজি বলে না ঋজুদা। কারণ, সে, মানে দূরদর্শনের খবরের হিন্দি নয়; হিন্দুস্তানি, মারাঠি, ওড়িয়া, হো, সাঁওতালি, মুণ্ডারি, নেপালি, ইত্যাদি অনেক ভাষাই ভাল বলতে পারে। কিন্তু যে-সব ভারতীয়, বাঙালিদের মধ্যেও তাদের সংখ্যা বড় কম নয়, দেশ স্বাধীন হবার চল্লিশ বছর পরও ইংরিজি বলে শ্লাঘা বোধ করেন, তাদের সঙ্গে ইংরেজিই বলে। সেই-সব মানুষেরা ইংরেজি না-জানা মানুষের কাছে, নীচ প্রবৃত্তিতে, আপার-হ্যান্ড নিতে চান ইংরেজি বলে। কিন্তু অপাত্রকে আপার-হ্যান্ড দেবে, এমন পাত্রই ঋজুদা নয়।

মিস্টার তম্বি বললেন, অ্যাম আই অন টাইম, মিস্টার বোস?

রাইট অন টাইম। ইওর হাইনেস।

হেসে বলল, ঋজুদা। রাজা রাজড়াদের দিন শেষ হয়ে গেছে তা ভাল করে জেনেও। এবং এই মানুষটি শুধুমাত্র দূতই! তাও সত্যি সত্যিই কোনও রাজার দূত কিনা, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হয়েও। ঋজুদার মতো খুশি করতে, কম মানুষই পারে। আবার দুখী করার বেলাতেও এই কথাটাই সমান ভাবে খাটে।

তারপর আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে মিস্টার সিং-এর আলাপ করিয়ে দিল। সিনিয়ারিটি অনুযায়ী। আগে আমার সঙ্গে, তারপর তিতিরের সঙ্গে এবং সবশেষে ভটকাই-এর সঙ্গে।

চোখ দিয়ে ইশারা করে ভটকাইকে বললাম, একেই বলে প্রোটোকল। তোর মতো অভব্যদের ঋজুদাকে দেখে শেখা উচিত।

ও! আগের কাজ আগে।

বলেই, তম্বি সিং ওঁর জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক গোছা প্লেনের টিকিট বার করে ঋজুদাকে দিলেন। বললেন, আগামী রোববারের। সকালের ফ্লাইট। রিটার্ন ওপেন আছে। তারপর একটা মোটা খাম।

ঋজুদা অবাক হয়ে বলল, এতে কী আছে?

পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। অন অ্যাকাউন্ট। পাঁচশো টাকার নোট।

তা ক্যাশ কেন? আপনি জানেন তো যে, দশহাজারের চেয়ে বেশি টাকা ক্যাশ-এ পেমেন্ট করলে, ইনকাম ট্যাক্সে বাদ পাওয়া যায় না খরচ হিসাবে?

সেসব আমার, বলেই, একটু বিব্রত হয়ে বললেন, রসিদ দিতে হবে না।

রসিদ আমি দেবই, তা আপনি রাখুন আর ছিঁড়েই ফেলুন।

বলে, ঋজুদা ড্রয়ার খুলে প্যাড বের করে রসিদ লিখে দিল। রেভেন্যু স্ট্যাম্প লাগানোই ছিল।

মিস্টার তম্বি সিং আমাদের দিকে একে একে চেয়ে বললেন, এঁরাই তা হলে ফেমাস ঋজু বোসের ফেমাস অ্যাসিস্ট্যান্টস—ঋজু বোস অ্যান্ড কোম্পানি।

ঋজুদা হাসল। বলল, রাইট য়্যু আর। আমাকে ইনফেমাস এমনকী নটোরিয়াসও বলতে পারেন, কিন্তু এঁদের প্রত্যেককেই ফেমাস বলেই জানবেন। ইন দেয়ার ওওন রাইটস।

এবারে বলুন, কী খাবেন? হোয়াট ক্যান আই অফার য়্যু? বাট আই অ্যাম সরি আই ডু নট হ্যাভ এনি হার্ড ড্রিঙ্কস।

না, না। কিছু না। কাজের কথা সেরে নিই তাড়াতাড়ি।

ঠিক আছে।

ওঁকে মধ্যের সিঙ্গল সোফাটাতে আরাম করে বসতে দিল, ঋজুদা। আসলে, এই সোফাটার মুখোমুখি ঋজুদার রিক্লাইনিং চেয়ারটার বাঁ পাশের সাইড টেবিলের ওপরেই রাখা থাকে টেবিল লাইটটা। আলোটা এই চেয়ারে যে-ই বসবেন, তাঁরই মুখের ওপরে পড়বে। তা ছাড়া, রাতের বেলা ঘরের অন্য অনেক আলো তো থাকেই। ওই আলোটা দিনের বেলাতেও পড়াশোনার জন্য ব্যবহার করে ঋজুদা। মাথার পেছনে, বাঁ পাশে থাকে। কোনও নবাগন্তুক এলে এই উপরি আলো কাজে লাগে। মনস্তত্ত্ববিদেরা, পুলিশ অফিসারদের মধ্যে যাঁরা জেরা করেন, তাঁরা সকলেই এমন আলোর ব্যবহার জানেন।

মাথার টুপিটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন মিস্টার সিং। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটা খুলে নিয়ে, হ্যাট-স্ট্যান্ডে রেখে এলাম।

উনি বললেন, থ্যাঙ্ক য়্যু। তারপর একটি “পলমল” সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমাদের অফার করে, নিজে ধরালেন একটি। নিজের লাইটার দিয়েই। বললেন, এইই আমার দোষ। এই অ্যাডিকশনটাকে ছাড়তে পারলাম না। অবশ্য অ্যাডিকশান বলতে এই একটিই।

ঋজুদা হেসে বলল, ছোটখাটো অ্যাডিকশন দু একটি থাকা ভাল।—নইলে তা এড়াতে গিয়ে অনেকগুলি বড়র খপ্পরে পড়তে হয়।

তা ঠিক।

বলেই, মি. সিং হাসলেন।

হাসিটা আমাদের মতন না। অনভ্যস্ত কানে, হঃ, হঃ হঃ শোনায়। নেপালি বা দার্জিলিং বা গ্যাঙটকের মানুষেরা কিন্তু এরকম হাসেন না। মেঘালয়ের খাসিরাও এমন করে হাসেন না। হয়তো মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশের মানুষদের হাসির ধরনটা একটু অন্য ধরনের। হতেই পারে। এত বড় দেশ আমাদের। কত

বৈচিত্র্য!

বলুন এবার, আপনার যা বলার।

ঋজুদা বলল, "ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট" গলাতে।

হ্যাঁ।

শুরু করলেন তম্বি সিং।

ইংরিজি মোটামুটি বলেন। উচ্চারণটাও মোটামুটি। তবে মাঝেমাঝেই কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণে বোঝা যায় যে, ইনি কোন অঞ্চলের মানুষ। যেমন, পশ্চিমবাংলার, হরিয়ানার, পাঞ্জাবের, বিহারের, ওড়িশার এবং তামিলনাড়ুর মানুষদের ইংরেজি শুনলেই বোঝা যায়।

মণিপুরের রাজপরিবারের একজন রাজা, লাইহারোবা সিং ছিলেন নিঃসন্তান। ইবোহাল সিং তাঁরই ভাইপো। তিনি প্রায় আমারই সমবয়সী। আমরা অত্যন্ত বন্ধু ছিলাম। তাঁকেই কে বা কারা খুন করে, তাঁর 'মোরে'র বাংলোতে, আগস্টের...।

ঋজুদা বলল, তারিখটা তো আমাকে জানিয়েছেনই!

কী ভাবে খুনটা হয়?

গলায় ফাঁস দিয়ে।

দিনে না রাতে?

রাতে। গভীর রাতে।

সন্ধে-রাতে যে নয়, সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হলেন কী করে?

না, না, আমি নিশ্চিত নই। পুলিশের তাই ধারণা।

আই সি!

কোথায় হয় খুনটা?

ওঁর স্টাডিতে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকতেন, ওঁর স্টাডিতেই থাকতেন বেশির ভাগ সময়।

স্টাডিতে কী করতেন?

পড়াশুনা করতেন। ভিডিও ক্যাসেট দেখতেন। মিউজিক সিস্টেমে গান বাজনা শুনতেন, বই পড়তেন, পুরনো অ্যালবাম দেখতেন। ওঁর সখের শেষ ছিল না। ভাল হুইস্কি খেতেন। রাতে হুইস্কি, দিনে জিন।

কতখানি খেতেন?

আধ বোতল করে।

দুপুরে এবং রাতে?

ইয়েস। কেন? বেশি মনে হচ্ছে?

না, না। রাজারাজড়াদের ব্যাপার-স্যাপার তো একটু আলাদা হবেই। আমার ইনকুইজিটিভনেস ক্ষমা করবেন।

ওঁর পরিবারে কে কে ছিলেন?

কেউই নয়। উনিও ব্যাচেলরই ছিলেন। ওঁর কাকারই মতো।

আই সি। তা উনি কোনও উইল করে গেছিলেন? ওঁর সম্পত্তি ওঁর অবর্তমানে কে পাবে?

উইল করে গেছিলেন বলে তো জানা নেই! তবে আচ্চাও হয়তো কিছু জানে এ বিষয়ে।

আচ্চাও কে?

ওই আচ্চাওই দেখাশোনা করত, ইবোহালের। প্রাইভেট সেক্রেটারির মতো ছিল। সবসময়ের সঙ্গী ছিল। আমাদের সঙ্গে শিকারেও যেত। আচ্চাও গান-বেয়ারারকে গান-বেয়ারার, ড্রাইভারকে ড্রাইভার, শেফকে শেফ ছিল। হ্যাঁ, মি. বোস, আচ্চাও দারুণ ভাল রান্নাও করে। সে সবই ছিল ইবোহালের—নয়নের মণি।

তার মানে, মিস্টার ইবোহাল সিং ডায়েড ইন্টেস্টেড।

ইয়েস মি. বোস। আমরা যতটুকু জানি, তাতে ইবোহাল কোনও উইল রেখে যাননি। আর উইল করলে তো এক্সিকিউটার করত আমাকেই।

সে-সম্বন্ধে আপনি নিঃসন্দেহ হলেন কী করে?

তার কোনও প্রমাণ দিতে হয়তো পারব না, তবে আমিই তো ছিলাম ওঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ। ওঁর বাড়িতেই থাকতাম মাসের মধ্যে প্রায় পনেরো দিন। কিন্তু, যেদিন খুনটা হয় সেদিন আমি ইম্ফলে ছিলাম।

ঋজুদা চুপ করে একটুক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, এক কাপ চা কি আপনি...।

না, না। মেনি থ্যাঙ্কস।

তারপর ঋজুদা বলল, মি. ইবোহাল সিং-এর পরিবার কি মণিপুরের রাজ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত, না কি যোগসুত্রটা তেমন নিকট নয়?

না না, ঠিক তেমন নিকট নয়। বলছি।

ভদ্রলোক একটু থেমে থেমে প্রম্পটারের প্রম্পট শুনে, পার্ট-ভুলে যাওয়া অভিনেতা যেমন করে কথা বলেন, তেমনি করে কথা বলছিলেন।

ইবোহালের ঠাকুর্দার অবস্থা খুব ভাল ছিল। রাজ পরিবারের লোকেদের সঙ্গে দহরম-মহরম ছিল। ওঁদের পুরুষদের সঙ্গে পোলো খেলতেন। একটু থেমে বললেন, আপনি কি জানেন মিস্টার বোস, যে, 'পোলো' খেলাটা মণিপুর রাজ্যেই প্রথম হত? আজকালকার সাইকেল পোলো-ফোলোর মতো ইন্নোভেটিভ ব্যাপার নয়—আসল পোলো। ঘোড়ায় চড়ে।

সে কী? ইটস আ নিউজ। আমার তো ধারণা ছিল যে, জয়পুর, যোধপুর, গোয়ালিয়র ইত্যাদি উত্তর ভারতের সব রাজা-রাজড়াই ভারতে পোলো খেলার পত্তনকারী।

তিতির বলল, অবাক হওয়া গলাতে।

ঋজুদা বলল, আমিও তাই জানতাম।

না, তা নয়। দেশ স্বাধীন হবার পর উত্তর ভারতীয়রাই বলতে গেলে এদেশের রাজা—এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণ ভারতীয়রাও, এমনকী ফর আ চেঞ্জ কখনও কখনও পশ্চিম ভারতীয়রাও; কিন্তু আমরা পূর্বাঞ্চলের হতভাগা মানুষেরা তো আজও প্রজাই রয়ে গেলাম। আমরা আর স্বাধীন হলাম না। পোলোর মতো আরও অনেক কিছুই আছে যা অন্য প্রদেশীয়রা আমাদের কাছ থেকেই শিখেছিল, সে-কথা অনেকেই জানেন না। জানলেও স্বীকার করেন না। দেখলেন তো, আপনার মতো পৃথিবী-ঘোরা উচ্চশিক্ষিত মানুষও জানতেন না, এই পোলোর ব্যাপারটা।

ঋজুদা ইতিবাচক ঘাড় নাড়ল।

তারপরই বলল, পুলিশ কী বলছে?

কী সম্বন্ধে?

যেন চমকে উঠে বললেন, মিস্টার তম্বি সিং।

ও না। পুলিশ আবার কী বলবে? আমাদের সব জায়গার পুলিশ যা বলে, তাই বলেছে। যে বা যারা খুন করেছে, তারা নিশ্চয়ই আগে থাকতেই ম্যানেজ করেছে পুলিশকে। এ কি আর ইংল্যান্ডের পুলিশ?

না। তা নয়। ভারতেও অনেক সৎ ও দক্ষ পুলিশ অফিসার আছেন। সব বিভাগেই আছেন। তবে এটা ঠিক যে, সততার সঙ্গে ভারতের মাটির যোগ ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। কিন্তু তবু বলব, আপনার কি ধারণা, ইংল্যান্ডের সব পুলিশেরাই সৎ? সাদা চামড়াদের মধ্যে কালো চামড়াদের দোষ সংক্রামিত হয় না? আমি তো বলব, সব দোষই হয়তো আমরা পেয়েছি ওদেরই কাছ থেকে।

জানি না। বাট আই বেগ টু ডিফার।

তম্বি সিং বললেন।

আপনি কি ইংল্যান্ডেই পড়াশুনো করেছেন?

হ্যাঁ।

কোথায়?

অক্সফোর্ডে।

কোন কলেজে?

বললাম তো, অক্সফোর্ডে।

আই সি।

বলেই, ঋজুদা প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

তারপর বলুন, পুলিশ কী বলছে? আপনার কি মনে হয়? আর মোটিভ? এই খুনের উদ্দেশ্য কী হতে পারে? ওঁকে খুন করে কে বা কারা লাভবান হতে পারেন? ওঁর শত্রু কি ছিল কেউ? অন্যান্যদের মধ্যে ওঁর কাছের লোকজন কারা ছিলেন? ইম্ফলে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও উনি মোরেতে কেন থাকতেন? 'মোরে' ইম্ফল থেকে একশো কিমির চেয়েও দূর হবে। বিশেষ করে, এখন মণিপুরের মধ্যে যা

সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ চলছে এবং তার বেশিটাই তো জানি মোরেরই দিকে—মানে, প্যালেল আর মোরের মাঝামাঝি—তবুও উনি এই সময়ে মোরেতেই পড়ে রইলেন কেন? ইম্ফলেও যদি থাকার জায়গা থেকে থাকে।

আমরা তো বটেই, মনে হল মিস্টার তম্বি সিং-ও যেন একটু অবাক হলেন, ঋজুদার কথা শুনে।

তম্বি সিং বললেন, আপনি কি গেছেন কখনও, মণিপুরে?

ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, বহুবার। প্রথমবার যাই, উনিশশো ছাপ্পান্নতে। তখন আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি। তারপরেও, বহুবার গেছি। মণিপুরের ইম্ফল, নাগাল্যান্ডের কোহিমা, ডিমাপুর, মোককচুঙ, মাও, বার্মার তামু, ত্রিপুরার আগরতলা, গারো পাহাড়ের তুরা, মেঘালয়ের শিলং, জয়ন্তী এবং...।

বাস। বাস। ওরে বাস।

বললেন মিস্টার তম্বি সিং।

বলেই বললেন, তবে তো একেবারে ঠিক লোকের কাছেই এসেছি। আমার বরাত খুব ভাল বলতে হবে। অন্ধের মতো কিছুই হাতড়ে বেড়াতে হবে না আপনাকে, মণিপুরে গিয়ে। আই মাস্ট থ্যাঙ্ক পিশাক সিং। আপনার কথা আমাদের বলেছেন বলে।

বলেই, আরেকটি সিগারেট ধরালেন। পুরনোটি অনেকক্ষণ আগেই অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়েছিলেন।

তারপর বললেন, আপনি আমাকে যেসব প্রশ্ন করলেন, ইনফ্যাক্ট, সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্যই তো আপনাকে যাওয়ার নেমন্তন্ন নিয়ে এসেছি। আসলে...আমরা একেবারেই পারপ্লেক্সড। আমার মেয়ে সানাহানবি তো কেঁদে কেঁদে রোগা হয়ে গেল। ইবোহাল ওজ ভেরি ফন্ড অব হার।

হ্যাঁ, সেটাও আমি জানতে চাই। ওঁর সম্বন্ধে যা কিছু জানেন, সবই জানতে চাই।

ইবোহাল ওজ আ হি-ম্যান। আ লেডিজ ম্যান। সব বয়সী মহিলারাই ইবোহালকে এক বিশেষ চোখে দেখত। পাঁচ বছর থেকে পঁচাশি বছর অবধি।

মি. সিং, একটা প্রশ্ন করব? আপনার নিজের কী ইন্টারেস্ট, এই রহস্যভেদ করে? ইবোহাল সিং-এর মৃত্যুতে তাঁর প্রিয় বন্ধু হিসেবে আপনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন এবং সেইজন্যই কি আপনি চান যে, প্রকৃত খুনি বা খুনিরা ধরা পড়ুক? না, অন্য কোনও কারণও আছে?

তম্বি সিং অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একবার মুখ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে আমার, তিতিরের ও ভটকাই-এর মুখের দিকে দেখলেন।

ঋজুদা পাইপের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে বলল, এরা প্রত্যেকেই আমার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন। এবং এরাই আমার সহকারী। আপনি নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে বলুন, যা বলতে চান।

ব্যাপারটা কি জানেন?

বলেই সিগারেট একটি বড় টান লাগালেন তম্বি সিং।

ব্যাপারটা হচ্ছে, অ্যাজ ব্যাড লাক উড হ্যাভ ইট, পুলিশে কিনারা করতে না-পারাতে, জানাশোনা এবং স্থানীয় মানুষের সন্দেহটা আমার ওপরেই এসে পড়েছে। শুধু বন্ধুত্বের টানেতেই নয়, নিজেকে মিথ্যে দুর্নাম থেকে বাঁচাতেও আপনার কাছে ছুটে আসতে হয়েছে। এ ছাড়া, সত্যি কথা বলতে কী আমার আর কোনও...।

হঠাৎ মনে হল যে, তিনি ভেঙে পড়বেন—উনি বললেন, আমি গরিব মানুষ...।

ঋজুদা বলল, ভেরি স্ট্রেঞ্জ। অথচ আপনিই...

হ্যাঁ। অফ অল পার্সনস, আমিই। কারণ, আমার মতো ভাল আর কেউই জানে না যে, আমি আমার প্রিয়তম বন্ধু ইবোহালকে খুন করিনি। আমরা কত শিকার করেছি ছেলেবেলা থেকে দুজনে, একসঙ্গে, লকটাক লেকে—পাখি, নাচুনে-হরিণ। থেংনোপালের, কাঙ্গপোকপির, তাদুবীর জঙ্গলে বাঘ, হরিণ, চিতা। কত পোলো খেলেছি প্রথম যৌবন থেকে। ইবোহাল, আমার স্ত্রীর আর একমাত্র মেয়ে সানাহানবির এমনই প্রিয় ছিল যে, নিন্দুকেরা বলত, যে আমার স্ত্রীর দুই স্বামী।

কিন্তু আমিও যদি খুনের কিনারা না করতে পারি? তাহলে তো আপনার ওপর যারা সন্দেহ করছে, সেই সন্দেহ থেকেই যাবে। এমনকী তা হয়তো বেড়েও যাবে। তখন তো বিপদ আপনারই বাড়বে।

না না, আমি জানি যে, আপনি ঠিকই পারবেন কিনারা করতে। আপনিই পারেন, আমার মান বাঁচাতে। আপনি ছাড়া আর কেউই পারবেন না।

আপনার কি খুনি বলে কাউকে সন্দেহ হয়?

ঋজুদা বলল।

কী করে বলি, নিশ্চিত না হয়ে। তবে আমার ফেইন্ট সন্দেহ হয় যে, ইবোহালের সম্পত্তি ও অন্য কাউকে দেবে বলে ভাবছিল এবং কথাটা হয়তো আচ্চাও জেনে যায়। আচ্চাও হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে, ইবোহাল যেহেতু নিঃসন্তান এবং আচ্চাওকে পুত্রসম ভালবাসে, তাই ওর যা কিছু আছে, সবই সে আচ্চাওকে দিয়ে যাবে। কিছুদিন হল হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিল খুব। শরীর ভাল যাচ্ছিল না। একদিন ইবোহাল আচ্চাওর সামনেই আমার মেয়ে সানাহানবিকে বলে যে, শিগগিরই সে উইল করবে। সেটা শোনার পর থেকেই আচ্চাও-এর খুব রাগ জন্মেছিল ইবোহালের ওপরে। তাই মনে হয়, সেই রাগেই...

যখন এই কথা ইবোহাল সিং বলেন তখন কি আপনি সামনে ছিলেন?

না। আমি সামনে ছিলাম না।

তবে আপনি একথা জানলেন কী করে? আপনার মেয়ে সানাহানবি কি আপনাকে বলেছিল?

না, সানাহানবি কিছুই বলেনি। সে অন্য ধরনের মেয়ে। তাকে দেখলেই

আপনিই বুঝতে পারবেন সে কী। আমাকে দেখে মেয়ে সম্বন্ধে ধারণা করবেন না কোনও।

তবে কে বলল আপনাকে? আচ্চাও সিং?

না। সেও বলেনি। সেও খুব চাপা ছেলে। আত্মসম্মানজ্ঞানী।

তবে আপনি জানলেন কী করে?

ইবোহালের খাস-বেয়ারা বার্মিজ উ-মঙ্গ বলেছিল।

সে কি তখন সামনে ছিল?

সামনে ছিল কি না জানি না। তবে না থাকলে...

ওর সামনে এমন একটা ডেলিকেট ও গোপনীয় কথা মিস্টার ইবোহাল সিং বলবেন বলে আপনার বিশ্বাস হয়?

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী এসে যায়? আসলে, আমাকে আপনি জেরা করবেন না। করলে, এ কেস-এর সমাধান আপনি করতে পারবেন না। আমি দূত হয়ে এসেছি আপনার যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে। ইম্ফলে গিয়ে, মোরেতে গিয়ে, কাঙ্গপোকপিতে গিয়ে, আপনি যত খুশি প্রশ্ন করবেন, যত লোককে ইচ্ছে। আমি এখনও ইবোহালের মৃত্যুর শকটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমাকে মাপ করবেন।

ঠিক আছে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করব না। আপনার নিজের যা খুশি, তাই বলুন।

ও হ্যাঁ। কিছুদিন হল, শুনেছি, একজন খুব বড়লোক ব্যবসায়ী আচ্চাওকে তাঁর ব্যবসার কাজে লাগাবেন বলে খুব ভাল মাইনে-পাতির লোভ দেখাচ্ছিলেন। হয়তো, আচ্চাওকে, ওঁকে ছেড়ে যেতে নিরস্ত করার জন্যই ইবোহাল ওইরকম বলেছিল। সম্পত্তি দেবে না, এই ভয় দেখিয়েছিল। অবশ্য দেবে যে, একথাও কখনও কাউকে বলেনি। আচ্চাওকেও বলেছিল বলে মনে হয় না আমার। হয়তো ইবোহাল আচ্চাওকে প্রেসারইজ করছিল যাতে ব্যবসা করতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল না মারে। এখন মরা মানুষের কাছ থেকে তো আর নতুন করে কথা বের করা যাবে না।

না। তা যাবে না। এই ব্যবসায়ীটি কোথায় থাকেন?

ইম্ফলেই। মস্ত বড়লোক। নাম, থাঙ্গজম সিং লংজু।

ঋজুদা বলল, আচ্চাও ওরিজিনালি কোন চাকরিতে ঢুকেছিল? ড্রাইভার হিসেবে? গান-বেয়ারার হিসেবে? না, ইবোহাল সিং-এর ভ্যালে হিসেবে?

না, না। আচ্চাও তো শিক্ষিত। পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডও ভাল। ছেলেবেলায় ওর মা বাবা একই সঙ্গে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলে কাকারা সম্পত্তি ঠকিয়ে নেয়। এক মাসি দেখাশোনা করতেন ওকে। তবে তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেছিল ও। ইবোহাল ওকে প্রথমে এস্টেট ম্যানেজার হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করেছিল। ধীরে ধীরে ও হয়ে উঠল ইবোহালের, যাকে বলে, হিন্দিতে দোস্ত!—ইয়ার!—একেবারে মাথায় চড়িয়েছিল ইবোহাল

তাকে।

এখন আচ্চাও সিং কোথায়?

সে পালিয়ে গেছে। তাকে পাওয়া গেলে তো অনেক কিছুই জানা যেত।

সে পালিয়ে গেলে তো পুলিশ তাকেই সন্দেহ করবে প্রথমে এবং সে সন্দেহ তো অমূলক নয়!

শুধু সন্দেহ করলে তো হবে না। প্রমাণ সাবুদ তো চাই। আর অন্য প্রমাণের মধ্যে রুবিটাও পড়বে। সেটা যার কাছে পাওয়া যাবে, যদি যায়, নব্বইভাগ সন্দেহ তার উপরই পড়বে খুনি বলে।

তাই?

ঋজুদা বলল। কিছু মনে করবেন না মিস্টার সিং। আপনার মেয়ে, আচ্চাওকে কী চোখে দেখত?

মেয়েদের দেখার কথা কে বলতে পারে মিস্টার বোস?

ঋজুদা বলল, আমি তো পারিই না। আমি তো ব্যাচেলার।

হেসে ফেললেন, মিস্টার সিং।

আচ্চাও, ওর ঘনিষ্ঠদের নাকি বলেছে, পালাবার আগে, যে তার এত ভালমানুষ মালিককে কে বা কারা খুন করল তা সে খুঁজে বের করবেই। নইলে ওর শান্তি নেই।

আমি বলে উঠলাম, সম্পত্তিই যদি না পায়, তবে তা করে আচ্চাও সিং-এর লাভ?

লাভ?

বলেই, তম্বি সিং থেমে গেলেন।

বললেন, ফিনান্সিয়াল লাভ তো কিছু দেখছি না। টাকাটা সকলের কাছে বড় নাও হতে পারে। হয়তো অন্য কোনও মোটিভ থাকতে পারে এর পেছনে। আপনি গোয়েন্দা, আপনিই ভাল বুঝবেন, আমার চেয়ে।

হাতঘড়ির দিকে চাইলেন একবার তম্বি সিং। ঘড়িটা—সোনার। ইতিমধ্যে গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকে সাড়ে ছ'টা বাজল।

বাঃ। আপনার ঘড়িটা কিন্তু দারুণ।

ঋজুদা বলল।

হ্যাঁ। ইবোহালই আমাকে কিনে দিয়েছিল। দুজনে একসঙ্গে যখন সুইজারল্যান্ডে গেছিলাম। ইবোহালের এক স্যুইস বন্ধু প্রায় জোর করেই ওকে কিনতে বলল। ওতো একটা কিনলই, আমাকেও একটা আইডেনটিকাল পিস কিনে দিল।

ভটকাই হঠাৎ বলল, কী বললেন? মিস্টার ইবোহাল সিং-এর স্যুইস বন্ধু?

ইয়েস। দ্যাটস রাইট।

ভটকাই তার দুটি চোখ তম্বি সিং-এর দুচোখে ফোকাস করে রেখে শুধোল,

সেই বন্ধু স্যুইস-ফ্রেঞ্চ না স্যুইস-জার্মান? না স্যুইস-ইটালিয়ান?

আই বেগ ইওর পার্ডন?

ঘাবড়ে গিয়ে শুধোলেন তম্বি সিং।

তারপরই বললেন, স্যুইস ফ্রেন্ড। মানে, সুইজারল্যান্ডের লোক।

বুঝেছি, সরি স্যার, ফর দ্য ইনটারাপশন।

ভটকাই বলল।

আমি এবার উঠতে পারি? আমি কাল চলে যাচ্ছি। রবিবার সকালে আমি এয়ারপোর্টে থাকব, আপনাদের রিসিভ করতে।

থাকার বন্দোবস্ত কোথায় করেছেন?

সার্কিট-হাউসেই। আমার বাড়িতেও থাকতে পারতেন। কিন্তু আপনাদের দেখাশোনা করবে কে? আমার বাড়িতে তো অন্য কেউই থাকেন না। আমার স্ত্রী তো গত হয়েছেন, চারবছর হল। আর সানাহানবিও রয়েছে এখন কাঙ্গপোকপিতে, তার এগ্রিকালচারাল ফার্মে। ফার্মিং করে, ঘোড়ায় চড়ে, শিকার করে। সানাহানবি ভাল পোলোও খেলে। আসল ব্যবসা হয়েছে এখন কুকুর-ব্রিড করানো। ছেলেবেলা থেকেই কুকুর ভালবাসত খুব। এখন কুকুরেরই ব্যবসা হয়েছে।

কাঙ্গপোকপি!

কী দারুণ নামটা! তাই না?

তিতির বলল।

ভটকাই বলল, জায়গার নাম? কাঙ্গপোকপি?

তম্বি সিং কিছু বলার আগেই ঋজুদা বলল, হ্যাঁ। মণিপুর থেকে যে পথটা পাহাড় আর গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে নাগাল্যান্ডের দিকে, সেই পথেই কাঙ্গপোকপি পড়ে। তাদূবী, মাও, জুকুমা, খুজামা এই সব নামের জায়গা আছে না আশেপাশে? মাওতেই বোধহয় বর্ডার, নাগাল্যান্ডের? আর কী চমৎকার সে নৈসর্গিক সৌন্দর্য! অনেকেই বলেন, ওই পথের দৃশ্য, জম্মু থেকে শ্রীনগরে যাওয়ার দৃশ্যের মতোই সুন্দর। এখন তো কাশ্মীর যাবার উপায় নেই, ওখানে গিয়েই দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে নিতে পারবি।

তম্বি সিং আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আসুন। আসুন। আপনাদের সব দেখাব! কিন্তু আপনারা এমন সময়েই যাচ্ছেন। এখন তো মণিপুরে গোলমাল, সাংঘাতিক।

ঋজুদা বলল, তা ঠিক। গোলমাল তো মোরের দিকেই বেশি। চূড়াচান্দপুর বা কাঙ্গপোকপির দিকেও কি তেমন গোলমাল আছে? তা ছাড়া আপনার বন্ধুর হত্যা-রহস্যের সমাধান তো গোলমালের জন্যে বসে থাকবে না।

না। তা নয়। ওদিকে এখনও গোলমাল নেই, কিন্তু না থাকলেও লাগতে কতক্ষণ?

তম্বি সিং, ঋজুদা মণিপুর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে দেখেই যেন মনমরা হয়ে

বললেন।

আপনার মেয়ের বিয়ে দেননি, মিস্টার সিং?

আমি কি দেব? আজকালকার মেয়েরা কি আর বাবা মায়ের ইচ্ছেতে বিয়ে করে? তা ছাড়া, আমাদের সমাজও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। মেয়েরাই মালিক সেখানকার। কাজেকর্মেও তারা এগিয়ে! মেয়েরাই তো সর্বেসর্বা মণিপুরে। মণিপুরে কেন, সব পূর্বী-পাহাড়েই।

তিতির বলল, চলুন। আগে তো গিয়ে পৌঁছই। তারপর যদি আপনার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাই, তবে সেখানেই থেকে যেতে পারি।

বলেই, ভটকাই আর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই মেল-ডমিনেটেড পৃথিবী আর ভাল লাগে না।

কাঙ্গপোকপির ফার্ম-হাউসে সানাহানবি একা থাকেন?

তিতির শুধোল। উৎসুক হয়ে।

হ্যাঁ। সানাহানবি একাই একশো পুরুষের সমান। তা ছাড়া, ওর কুকুরেরাও থাকে। ফার্মের দেখাশোনা, কুকুর ও ঘোড়ার দেখাশোনা করার লোকেরাও থাকে। কুকুরের খুব শখ ওর। পৃথিবীর সব ভাল কুকুর আছে ওর কাছে। কুকুরের বাচ্চা বিক্রি করে। ঘোড়াও আছে। তবে, বেড়াল ওর ভারী অপছন্দের।

কী কী কুকুর আছে?

ঋজুদা শুধোল।

কুকুর সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন? জানলে নাম বলুন না। কোন কুকুর নেই? আমি তো অত জানি না।

কথাটা খুব কনফিডেন্টলি বললেন তম্বি সিং। ভেবেছিলেন, এবার জব্দ করতে পারবেন ঋজুদাকে।

ঋজুদা পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে হাতে ধরে বলল, সালুকি আছে?

সালুকি?

তম্বি সিং অবাক হয়ে বললেন।

সালুকি আবার কী কুকুর, আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম। মানে, আমরা সকলেই।

তম্বি সিং বললেন, হ্যাঁ। সালুকিও আছে।

ঋজুদা উত্তেজিত হয়ে বলল, বলেন কী সিং সাহেব। যিনি সালুকি ব্রিড করান তিনি যে সে ডগ লাভার নন। কলকাতাতেই আমার জানাশোনার মধ্যে একজোড়া সালুকি ছিল একমাত্র সনৎদার—সনৎ দত্ত, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের—। আর কারও কাছেই সালুকি দেখিনি। সে তো কোটিপতিদের কুকুর। যাই হোক, কাঙ্গপোকপিতে যেতেই হবে, আপনার মেয়ের ফার্মে। শুধু এদের সালুকি দেখাতেই।

সে তো আমার সৌভাগ্য। সানাহানবিরও সৌভাগ্য। তা হলে আজকে আমি

উঠি। রবিবার সকালে দেখা হবে এয়ারপোর্টে। তখন দিনের পর দিন আপনাদের প্রশ্নেরই জবাব দেব, সকলে মিলে।

ওক্কে।

বলল, ঋজুদা।

আমরা সকলে মিস্টার তম্বি সিংকে পৌঁছে দিলাম, সিঁড়ির মুখ অবধি। তারপর আমি আর ভটকাই ওঁকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিলাম। ভটকাই-এর অতি উৎসাহ দেখে মনে হল, সানাহানবির কথা শুনেই ও নানা কল্পনার জাল বুনতে শুরু করেছে। যাকে বলে, ইমাজিনিং থিংগস।

বললাম, কী রে?

ভটকাই বলল, মাকাল ফল যাবে এবার, ইম ফল।

বসার ঘরে ঢুকে ভটকাই বলল, কেস খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে।

এখন থেকেই ভাব ভাল করে। প্রতিদিন রাতে ইম্ফলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে, কার কী মনে হচ্ছে তা নিয়ে। অনেক মাথা একসঙ্গে হলে সুবিধে হবে।

আমি বললাম, নাও হতে পারে। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

তারপর বললাম, ইন্দোনেশিয়ার কনসাল মিস্টার ডি. কে. নাগকে আমি চিনি। ইম্ফলে যেন কীসের ব্যবসা ছিল। সেগুন কাঠ না, কীসের যেন। সম্ভবত, ওই মোরেতেই। দ্বিজেন মেসোমশাই খুব ভাল বার্মিজ বলতে পারেন। ইন্দোনেশিয়ান তো পারেনই। আসলে ওঁরা রেঙ্গুনেই মানুষ—চলে এসেছিলেন নাকি পঞ্চাশের দশকে।

তাই? ফোন নাম্বার মনে আছে?

মনে নেই। তবে, মায়ের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছি এখুনি।

জান তবে।

পুশ-বাটন ফোনের ডায়াল টিপে আমি মায়ের কাছ থেকে দ্বিজেন মেসোর নাম্বার নিয়ে সেই নাম্বার ডায়াল করলাম। একজন মহিলা ধরলেন। বললেন, উনি বাড়ি নেই। ঋজুদার বাড়ির ফোন নাম্বারটা দিয়ে আমি রিং-ব্যাক করতে বললাম।

তোর মেসো কীরকম লোক?

আপন মেসো নয়। মায়ের বন্ধুর স্বামী। তবে বিজলি মাসি মারা গেছেন বেশ কয়েকবছর আগে।

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ঋজুদা বলল, আগামীকাল সকালে উঠেই তিতির আর রুদ্র কোনচৌকির খামারে যাবি, ভটকাইকে নিয়ে। পিস্তলে ওর হাতটা ঠিক করাবি। প্রয়োজন হোক আর না হোক। তোমার লাইসেন্সেই গুলি তুলবে ইস্ট-ইন্ডিয়া আর্মস থেকে, তিতির। আমার আর রুদ্রর ওভারড্রন অ্যাকাউন্ট। অন্তত একশো-দেড়শো গুলি ছোঁড়াবে। আর যা যা প্যাক করার তা নিয়ে নেবে। তোমরা তো সবাই ভেটারান। তবে মানুষখেকো বাঘ শিকারের আয়োজন একরকম, আর

খুনের গোয়েন্দাগিরি আরেকরকম।

বলেই বলল, রুদ্র, আমাদের বাক্সটা নিতে ভুলবি না।

সেই "অ্যালবিনো"র সময়ের বাক্সটা তো?

হ্যাঁ। তবে, মাইনাস ট্রানজিস্টার।

ইতিমধ্যেই ফোনটা বাজল।

ঋজুদা খপ করে রিসিভার তুলে বলল, এক সেকেন্ড ধরুন। বলেই বলল, রুদ্র, তোর ফোন।

হ্যাঁ। দ্বিজেন মেসোমশাই? আপনার সঙ্গে ঋজুদা একটু কথা বলবেন।

কে?

ঋজুদা। ঋজু বোস।

কী ব্যাপার রে? তিনি তো বিখ্যাত লোক।

নমস্কার।

ঋজুদা ফোনটা ধরে বলল।

মানে, একটা প্রশ্ন করার জন্য একটু বিরক্ত করছি। আপনি কি ইম্ফলের মিস্টার তম্বি সিংকে চেনেন? হ্যাঁ...হ্যাঁ...তাই তো বললেন। ...না, আমার সঙ্গে একটু আগেই আলাপ হল। আপনার কাছে যাচ্ছেন বললেন, আর রুদ্র বলল, আপনি ওর মেসোমশাই।

তারপর হাসল, ঋজুদা। কী কারণে, কে জানে!

আমি পরশু, তরশু একবার রুদ্রকে পাঠাব আপনার কাছে। যা বলার ওই গিয়ে বলবে। একটা অনুরোধ। আমি যে আপনাকে ফোন করেছিলাম বা রুদ্র বা আমি যে আপনাকে চিনি, সেকথাও ওঁকে বলবার দরকার নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার বন্ধু যখন নন...। ফাইন।... খুব ভাল লাগল, আপনার সঙ্গে কথা বলে। নমস্কার।

ঋজুদা ফোনটা নামিয়ে রাখল।

তারপর বলল, তাহলে আজকের মতো এই থাক। আবার দেখা হবে শুক্রবার রাতে। ছ'টার সময়। সেদিন এখানেই খেয়ে যেও। বাঙালি পাঁঠার কালিয়া আর গদাধরদার হলুদ-রঙা কিসমিস বাদাম দেওয়া মিষ্টি পোলাও।

ভটকাই বলল, খুনের তদন্ত করতে যাব শুক্রবারের একরাত পরেই, নেপালচন্দ্রর রাবড়ি হবে না? মাথা খুলবে কী করে? ওরা দুজন তো পড়াশোনাতে ভাল—আমারই শুধু মাথা-মোটা। অন্তত আমার জন্য গদাধরদাকে বন্দোবস্ত করে রাখতে বোলো।

কোথাকার রাবড়ি বললি? শর্মার?

ছিঃ। ছিঃ। ও রাবড়ি হিন্দুস্থানিদের খাদ্য। নেপালচন্দ্রর। মেফেয়ার রোডের নেপালচন্দ্রর। ছোট্ট দোকান হলে কী হয়। নেপালে গোপাল করে।

শুক্রবার ছ'টার মধ্যেই জমায়েত হয়েছিলাম আমরা, বিশপ লেফ্রয় রোডে। কিন্তু, তখন ঋজুদাই ছিল না। গদাধরদাকে পটিয়ে-পাটিয়ে চায়ের বন্দোবস্ত করেছিল ভটকাই, এমন সময় ঋজুদা ঢুকল। পাক্কা বারো মিনিট লেট। এমনটি হয় না কখনওই।

বলল, সরি। তোরা ক্ষমা করে দিস।

চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল ঋজুদাকে।

ভটকাই বলল, দিলাম। কিন্তু তোমার হম্বিতম্বি সিং, জালি লোক হচ্ছে।

হম্বি কোথায় পেলি? তম্বি বল।

হ্যাঁ। জালি-তম্বি।

শোন। এখন আমার অনেক কাজ আছে। এখন মিটিং ডিসমিসড। রবিবারে তিতির আর রুদ্র চাইলে এখানে আসতে পারিস। কিন্তু, সময়মতো। এলে আমার সঙ্গেই যেতে পারিস। ভটকাই, তুই কী করে যাবি? এয়ারপোর্টে?

শ্যামবাজারের মাথা মুড়িয়ে যশোর রোড ধরে নেব। আমার যাওয়ার জন্য তুমি চিন্তা করো না। আমি তো অন্য গ্রহের বাসিন্দা।

তা তো ধরবি। কিন্তু যাবি কীসে?

কেন? বাসে। আমার সঙ্গে মাল বলতে আর কী?

আমি বললাম, তুমি নিজেই তো যথেষ্ট।

তা ঠিক। তুইও মাল। তবে 'মা' আর 'ল' এর মধ্যে কিছু একটা মিসিং। এই যা।

কী? মিসিং মানে?

কেন? 'কা'। 'কা' মিসিং 'ইন-বিটুইন'। তোদের ইংরেজি কায়দাতে বললে।

এখন ইয়ার্কি করার সময় নেই ভটকাই। শোন, একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসবি এয়ারপোর্টে। প্লেন ছাড়ার সময়ের অন্তত পঞ্চাশ মিনিট আগে দমদমে পৌঁছবি।

পিস্তল ইত্যাদি কী করে নেবে, ঋজুদা?

সে সব তোদের চিন্তা করতে হবে না। এয়ারপোর্টের ম্যানেজারকে বলা আছে। আমার সাইলেন্সারওয়ালাটা আর রুদ্ররটা নিলেই চলবে। পাইলটের কাছে জমা দিতে হবে। তোদের আর নিতে লাগবে না। রহস্যের জট ছড়াতে বুদ্ধি যতটা লাগে, গুলিগোলা ততটা লাগে না। বলেই বলল, আচ্ছা রুদ্র, তোর কনসাল মেসো মিঃ নাগ কী বললেন, তা তো বললি না।

আমি খুব লজ্জিত হয়ে বললাম, ইসস্। ঋজুদা। তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি। বিচ্ছিরি ব্যাপার। দ্বিজেন মেসোমশাই মারা গেছেন।

মারা গেছেন।

বলিস কী রে।

ঋজুদা বলল, দুঃখিত গলাতে।

মার্ডার?

লাফিয়ে উঠল রংরুট গোয়েন্দা, ভটকাই। গুলি করেছিল? নাকি ইবোহাল সিং-এরই মতো গলায় ফাঁস?

হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেছেন। ভটকাই-এর গোয়েন্দাগিরির উদ্দীপনাতে জল ঢেলে দিয়ে আমি বললাম।

তম্বি সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়নি ওঁর? সেদিন রাতে?

ঋজুদা শুধোল।

তা তো বলতে পারলেন না ওঁর ভাইঝি। দ্বিজেন মেসোমশাইয়ের তো ছেলেমেয়ে ছিল না। শুনলাম ওঁর ভাইঝিই সব দেখাশোনা করেন। উনি ঠিক বলতে পারলেন না।

আই সি। খবরটা জানতে পারিস না। কোনওক্রমেই?

আমি ঋজুদার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, পারি না তা নয়, পারি। তবে বোঝ তো। কাজের বাড়ি—।

একটা কাজ করতে পারবি যাবার আগে?

ঋজুদা বলল।

কী কাজ? বলো?

মি. নাগের কীসের ব্যবসা ছিল মণিপুরে আর ওঁর ব্যবসার অ্যাসোসিয়েটস কেউ আছেন কি না ওখানে? এবং থাকলে, তার নাম, ঠিকানা ফোন নাম্বার যদি জোগাড় করে আনতে পারিস তো খুব কাজে লাগবে। পারবি? প্লেনে দিলেও হবে। আমাদের ব্যাড লাক বলতে হবে। কবে ঘটল এই অঘটন?

তম্বি সিং যেদিন এসেছিলেন তোমার কাছে, তার পরের পরের দিন। ভুল আমারই। পরদিনই যাওয়া উচিত ছিল ওঁর কাছে, আমার।

প্লেনটা যখন উচ্চতা কমিয়ে দিয়েছে, যদিও ল্যান্ডিং-এর এখনও দেরি আছে একটু, হঠাৎ দুটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সেটা যখন হঠাৎ মণিপুর উপত্যকার উপর থেকে নীচে উঁকি মারে, তখন একেবারে চমকে উঠতে হয়। মনে হয়, এই বুঝি, ছোটবেলা থেকে কল্পনা করা সাংগ্রিলা! কী সুন্দর পাহাড়-ঘেরা একটি উপত্যকা।

ঋজুদা জানলা দিয়ে নীচে চেয়ে বলল, শরতের শেষে হেমন্তে এলে দেখতে হয় মণিপুরের সৌন্দর্য। মাইলের পর মাইল নিয়ে সোনালি ধানের শিষ দুলছে হৈমন্তী হাওয়ায়। কী যেন সেই গানটা রে, তিতির? সেই লক্ষ্মী বন্দনার গানটা?

কিছু মনে থাকে না আমার, আজকাল।

ও? তিতির বলল। সেটা তো রুদ্র তোমাকে শুনিয়েছিল।

রাইট। গা'ত রুদ্র, গানটা।

এ কী। প্লেনের মধ্যে।

বিব্রত হয়ে আমি বললাম।

না গাইবি তো, কথাগুলো মনে করিয়ে দে অন্তত।

হ্যাঁ। তা পারি।

"এসো সোনার বরণ রানী গো, এসো শঙ্খকমল করে,
এসো মা লক্ষ্মী, বোস মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।"

তারপর আরও অনেক আছে।

হ্যাঁ জানি। অন্যমনস্ক গলাতে ঋজুদা বলল।

আমি বুঝলাম যে, ভাবনাতে পেয়েছে।

প্লেনটা নামছে, নামছে, নামছে, নামছে, ওই নেমে গেল। ছোট এয়ারপোর্ট। তারপর যখন ট্যাক্সিং করে গিয়ে পার্কিংস্লটে দাঁড়াল, তখন তিতিরই প্রথম দেখতে পেয়ে বলল, ওই যে মিস্টার তম্বি সিং।

পাশে কে দাঁড়িয়ে রে? প্যারাগন অফ বিউটি যে! হুবহু লেডি ডায়না।

তিতিরই বলল।

আরে সাব্বাস! জীবন সার্থক। আহা! কি হেরিনু জীবননাথ! এযে মাধুরী দীক্ষিত, পূজা ভাট আর পল্লব যোশীকে এক শিলনোড়াতে মিহি করে বেটে চৈত্রমাসের রোদে বড়ি বানিয়ে শুকোতে দিলে যা হতো, তাই। হে প্রভু, গোবিন্দজী, তোমার এ কী লীলা!

ঋজুদা বলল, কী যাত্রা শুরু করলি ভটকাই, নামতে না নামতেই?

বেঁটে জালি-তম্বির এমন কিউট মেয়ে। ভাবা যায় না। চিন্তা করো একবার। "সলিলকি" করে চলল ভটকাই।

আঃ। কী হচ্ছে ভটকাই। থার্ড ক্লাস হিন্দি ছবি দেখা বন্ধ কর এবারে একটু। তোর রুচি আর ভোক্যাবুলিরি দিনে দিনে যা হচ্ছে।

আমি বললাম।

নাও। এবার বক্তৃতা থামিয়ে নামো প্লেন থেকে। নইলে তম্বি সিং আমাদের না দেখে সত্যি সত্যিই হম্বি করবেন। অতগুলো টাকা দিয়ে টিকিট কেনা!

তিতির বলল।

প্লেন থেকে বেরোতেই মেয়েটির দিকে চোখ পড়তেই চোখ জুড়িয়ে গেল। সৌন্দর্যের নিজেরও আলাদা একটা দাম আছে। এমনকী কোনও গুণরহিত সৌন্দর্যেরও। "পহিলে দর্শনধারী, পিছলে গুণবিচারী", কথাতেই বলে। সত্যি! এই মেয়েটি কে, এখনও তা জানা নেই, কিন্তু সত্যিই অবিশ্বাস্যরকম সুন্দরী। আর এমন এলিগেন্ট।—এলিগেন্টের বাংলা প্রতিশব্দ জানি না। ভটকাই জানলেও জানতে পারে। পরনে সবুজ আর নীলে মেশানো একটা স্কার্ট। ভারী সুন্দর দুটি পা।

সমারসেট মম-এর "কেকস অ্যান্ড এল" উপন্যাসে পড়েছিলাম, "য়্যু অলওয়েজ ওয়্যার আ পেয়ার অফ বিউটিফুল লেগস।" মনে পড়ে গেল।

বাক্যিটা মনে গেঁথে ছিল। আজ এই সকালবেলাতেই মন ভাল-করা আলোর

মধ্যে, সেই অবচেতনে গেঁথে-থাকা বাক্যিটা, হঠাৎই ফুলের মতো ফুটে উঠল।

একটি ফিকে-হলুদ ব্লাউজের টপ। মাথায় একটি হলুদ-সবুজ-ফুল-ফুল প্রিন্টেড কটনের টুপি। হাওয়ায় কাঁপছে। চোখে সানগ্লাস—ক্যাটক্যাটে কালো না—ওই যে নতুন বেরিয়েছে যেগুলো—কী যেন নাম? আলোর তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে রং বদলায়—সেই কাচের। কাচ তো নয়, প্লাস্টিকের। তিতির বলতে পারবে। আজকাল আমিও সব ভুলে যাচ্ছি।

ঋজুদা আগে নামল। তার পেছনেই মিস্টার ভটকাই। যেন ওই সেকেন্ড ইন কম্যান্ড—সেল্‌ফ-অ্যাপয়েন্টেড। তার পেছনে শাড়ি পরা, ডেইনটি, তিতির সেন। এবং সবচেয়ে পেছনে, বদখত্ রুদ্র রায়। ঋজুদার ওরিজিনাল সাকরেদ, অথচ ভটকাই-এর ভাষাতে: একসময়ের "ঝাঁ-চকচক", "দিল-ধড়কান", নতুন মডেলের অবসলিট হয়ে যাওয়া নিষ্প্রভ, রং-চটা আজকের ছ্যাকরা গাড়ি। ছিঃ।

পরিচয়পর্ব শেষ হবার পরে আমরা টারমিনাস-এর বাইরে এলাম। ইয়েস। ভটকাইয়ের কথাই ঠিক। ইনিই জালি-তম্বির কন্যা, সানাহানবি দেবী।

ছোট্ট বাড়িটা। মানে টারমিনাস বিল্ডিং। ইন্দোর, বাগডোগরা বা শিলচরের চেয়েও ছোট। তম্বি সিং সাহেব একটি টাটা-সিয়েরা গাড়ি নিয়ে এসেছেন আর তার মেয়ে নিজে চালিয়ে এসেছেন একটি নীল-রঙা পুরনো মডেলের অ্যামবাসাডর।

তম্বি সিং বললেন, সার্কিট হাউসেই আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করেছিলেন উনি। কিন্তু, কন্যা বলেছেন মান্যগণ্য অতিথিদের ওখানে ওঠানো যাবে না। মাতৃতান্ত্রিক মণিপুরে যে মেয়েদের কথাই শেষ কথা।

সানাহানবি বললেন, কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-টন্ত্রী এলে যেমন সার্কিট হাউস রাতারাতি ভোল পাল্টে দিয়ে ঢেলে সাজান হয়, চক্ষুলজ্জাহীন ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে; তেমন হলেও কথা ছিল। তার চেয়ে, মৈরাঙ্গের পথে ওঁদের, আংকল ইবোহাল সিং-এরই একটি নিভৃত বাগানবাড়ি আছে। অনেকবছর আগে ওঁদের পূর্বপুরুষেরা "শুটিং লজ" হিসাবে ব্যবহার করতেন, যখন এইসব জায়গাতে জঙ্গল ছিল। সেখানেই আপনাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। একটি বাবুর্চি আছে। বদরপুরী মুসলমান। তার হাতের রান্না যা...

উনি বললেন যা, তাতে মনে হল, তার হাতের রান্না একবার খেলেই হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। গুলি বা ডাণ্ডা কিছুই খেতে হবে না।

ওই বাংলার ঘরগুলিও সুন্দরভাবে ফার্নিশড। ওয়েল-স্টকড বার...কোনওরকম কষ্টই হবে না আপনাদের।

ঋজুদা বলল, আমি কালেভদ্রে খাই ওসব। অকেশান, টকেশানে! আর এরা তো সব ছেলেমানুষ। ওসব না থাকলেও কোনওই ক্ষতি ছিল না।

ভটকাই নিচু গলাতে বলল, যাতে ঋজুদা শুনতে না পায়, পোলাপান! পোলাপান! তিনখান!

সানাহানবি বললেন, চলুনই তো। গিয়ে দেখবেন। তারপর পছন্দ না হলে কাঙ্গপোকপিতে আমার ফার্মেই না হয় থাকবেন। গরিবখানাতে। ছটি বেডরুম আছে। কষ্ট হবে না।

আমরা তো এখানে আরাম করতে আসিনি।

আমি বললাম।

আহা। তা তো জানিই। তবে, দেয়ারস নাথিং রং ইন মিক্সিং ওয়ার্ক উইথ প্লেজার। আরাম করেই যদি কাজের কাজটা করা যায়, তা হলে ক্ষতিটা কী?

ভটকাই ওয়ালট-ডিজনির মিকি-মাউসের মতো উত্তেজিত হয়ে, লাফালাফি শুরু করেছে।

ঋজুদা সানাহানবির গাড়িতে গিয়ে উঠল। বাঁদিকের দরজা খুলে। এমন কিছু গরম নেই এখন। তবে আকাশে মেঘ করলে বাইরে গুমোট হবে। এখন চমৎকার হাওয়া আছে বাইরে। এখনও সেপ্টেম্বরে পৌঁছয়নি বছর, কিন্তু আকাশ আর রোদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, পুজো এসে গেছে। পথপাশের কৃষ্ণচূড়া আর অমলতাসের গাছে গাছে কানাকানি করছে সে হাওয়া।

মিস্টার তম্বি সিং-এর টাটা-সিয়েরাতে আমরা তিনজন। শোফার-ড্রিভন এয়ারকন্ডিশনড্ গাড়ি। তিতির সামনে বসে প্রায় হারিয়েই গেছে অতবড় সিটটাতে। আর মনমরা ভটকাই, চোর-চোর মুখ করে বসে আছে আমার আর তম্বি সিং-এর মধ্যে। আহা, ছোঁড়ার খুব ইচ্ছে ছিল লেডি ডাইয়ের গাড়িতে যায়।

রাজকুমারীর গা দিয়ে কী দারুণ একটা গন্ধ বেরুচ্ছিল র‍্যা? তিতির? কী সেন্ট মেখে ছিল র‍্যা?

ফিসফিসে গলায় বলল ভটকাই, বাগবাজারি বাংলাতে।

তিতির হাসল। প্রায় নিঃশব্দে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, আদিখ্যেতা কোরো না, ভটকাই। আমরা একটা সিরিয়াস কাজে এসেছি। ওই পারফ্যুমের নাম হল, "রেড ডোর"।

আমি বললাম, ইংরিজিতি কথা বলো, তিতির। অভদ্রতা হচ্ছে। উনি ভাবছেন আমরা হয়তো কোনও চক্রান্ত করছি।

ভটকাই বলল, আমরা তিনজন যেখানে, সেখানেই তো একটি চক্কর। চক্কান্ত হতে কতক্ষণ?

আচ্ছা, আর কতদূর?

তিতির শুধোল, যেন, হাঁপিয়ে গিয়ে, ইংরেজিতে।

অতবড় টাটা সিয়েরা, তাও বেশ জোরে চলছিল, আর রাজকুমারী সানাহানবি এত জোরে গাড়ি চালিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেলেন, যে ওঁর গাড়িকে এখন আর দেখাই যাচ্ছে না।

তম্বি সিং বললেন, আরও মিনিট পনেরো।

বাবা। তবে তো বেশ দূর আছে। অনেক পথ। ভটকাই বলল।

"মোরে'টা কোনদিকে? যেখানে মিস্টার ইবোহাল সিং খুন হয়েছেন?"

তিতির শুধোল।

ওঃ। সে তো এই পথেরই অন্য দিকে। আমরা যেদিকে যাচ্ছি, তার উল্টোপথ। এবং বেশ দূরেও। ইম্ফল থেকে একশো দশ কিলোমিটার। তাও পথে গভীর জঙ্গল আর থেংনোপালের ঘাট পেরোতে হবে, ছ' হাজার ফিট উঁচু, ইম্ফল থেকে উনসত্তর কিমি—ওই পথেই টেররিস্টদের দারুণ ঝামেলা। থেংনোপাল খুব উঁচু। মেঘেদের চেয়েও উঁচু। যখন যাবেন দেখবেন মেঘেরা আপনাদের পায়ে চুমু খাচ্ছে।

•টেররিস্টরা কারা এখানে? কীসের কারণে টেররিজম? কী চান ওঁরা?

সে অনেক কথা। বলব এখন পরে। আগে পৌঁছন তো জায়গামতো। রিল্যাক্স করুন।

যখন পৌঁছল ওরা, দেখল ছোট্ট হলেও অত্যন্ত সাজানো গোছানো চমৎকার একটি বাংলো। কটি বেডরুম আছে তা বোঝা গেল না, তবে পাঁচ ছ'টি তো হবেই কম করে।

ঋজুদা আগেই পৌঁছে বারান্দার সাদা রং-করা বেতের চেয়ারে বসে ততক্ষণে পায়ের ওপর পা তুলে পাইপ খাচ্ছে। আর সানাহানবি দেবী সামনে বসে ঋজুদাকে চা ঢেলে দিচ্ছে টি-পট থেকে। জাপানিজ টি-সেট, সবুজের ওপর কমলা-রঙা ড্রাগন আঁকা। টি পটের ওপরে কাশ্মীরী কিন্তু খুব দামি টি-কোজি।

নাঃ। দেখেই মনে হল, রাজা ইবোহাল সিং-এর শুধু পয়সাই ছিল না, রুচিও ছিল। একটা "ক্লাস"-এর ব্যাপার ছিল ভদ্রলোকের মধ্যে, শুধুমাত্র বড়লোক হলেই যা থাকে না। ব্যাচেলার হলে কী হয়, বাড়ির বারান্দাতে পা দিয়েই টবে টবে নানা ফুল, পাতা, ঝাড়, ক্রোটন, অর্কিড, সাকুলেন্টস, ক্যাকটাই, বাগানের গাছপালা, দারুণ ট্রিম-করা লন, তারপর ফার্নিচারের রং, অ্যারেঞ্জমেন্ট, ঘরে না ঢুকেই ঘরের ফার্নিশিং-এর রুচি, বিভিন্ন প্যাস্টেল রঙা কুশন-কভারের রং দেখেই চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয়, কোনও আর্টিস্টের বাড়ি—এবং অত্যন্ত বিত্তবান আর্টিস্ট-এর।

তিতির ফিসফিস করে এই কথাই বলছিল, আমাকে।

আমাদের চা খাওয়ার আগে ভিতরে ঢুকে ড্রয়িং রুম, ডাইনিং রুম, আমাদের তিনটি বেডরুম, সব দেখিয়ে দিলেন সানাহানবি দেবী। বদরপুরী মুসলমান, সাদা দাড়িওয়ালা, একেবারে সাদা উর্দি পরা রজ্জাক মিঞা, (তিতিরের ভাষায়, ইন "ইম্যাকুলেট লিভারেজ"-এ), বাবুর্চির সঙ্গে এবং দুজন মণিপুরি অভিজ্ঞ, বয়স্ক বেয়ারা, একজন নাগা দারোয়ান এবং দুজন কুকি মালীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলেন সানাহানবি দেবী। সবাইকে বললেন, দেখো, যেন মেহমানদের কোনওরকম অসুবিধেই না হয়। বলেই বললেন, আমি কিন্তু এবার যাব মিস্টার বোস। আপনি তো জানেনই কাঙ্গপোকপি কতদূর এখান থেকে। বাবার কাছে এবং

এদের কাছেও আমার ফোন-নাম্বার আছে। আপনাদের সঙ্গে টাটা-সিয়েরাটা থাকবে। শোফার ড্রিভন। যখন যেখানে খুশি যাবেন আপনারা। আর আজ যদি এক্ষুনি "মোরে" যেতে চান, প্লেস অ্যান্ড সাইট অফ মার্ডার দেখতে, তা হলে তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে পড়ুন। ওই পথে কিন্তু আজকাল ভীষণ বিপদ। নানারকম বিপদ। রাত হয়ে গেলে প্রাণ বাঁচিয়ে ফেরাই মুশকিল হবে। এখন মণিপুরে যে-রকম টারময়েল চলছে, এই সময়ে বাবা আপনাদের যে কেন এখানে আসতে বললেন তা আমার মাথাতেই আসছে না।

ঋজুদা বলল, আজকে গেলে আমি একাই যাব। ওরা এখানে থাকুক—সাইট-সিয়িং করে বেড়াক—ঘুরে টুরে দেখুক। এর মধ্যে ওদের একদিন মৈরাঙ্গ, থৈবী-খাম্বার জায়গা, তারপর লেক লকটাক ইত্যাদি সব দেখিয়ে আনব। আর কাঙ্গপোকপিতে যেতেই হবে একবার, অন্য কুকুর না হোক, আপনার সালুকিদের দেখতে অবশ্যই যেতে হবে।

কিন্তু আমার মন ভারী খারাপ হয়ে আছে। আমার বড় প্রিয় কুকুর 'টাইগার' মরে গেল।

কবে?

তা দিনকুড়ি হল। আঙ্কল ইবোহাল-এর মৃত্যুর কদিন পরই।

কী কুকুর?

গ্রেট-ডেন।

ইসস্।

বলল, ঋজুদা।

তারপর বলল, কুকুর ভালেবাসলেও এই কারণেই কুকুর পুষি না। ঈশ্বরের উচিত ছিল কুকুরদের মানুষের চেয়ে বেশি আয়ু দেওয়া।

বাঃ। খুব ভাল বলেছেন। সত্যিই তাই।

যাই হোক। আসুন আপনারা কাঙ্গপোকপিতে। আই উইল বি ডিলাইটেড। বলেই, আমাদের সবাইকে নরম করে 'বাই' বলে, ডানহাতের তিনখানা আঙুল নাড়লেন। আর মিস্টার তম্বি সিংকে বললেন, বাই ড্যাড। লুক আফটার ইওর গেস্টস ওয়েল। অ্যান্ড ইউ শুড টক টু মি এভরি নাইট।

তম্বি সিং মাথা নাড়লেন।

আমি ভাবলাম, বাবা অক্সফোর্ড আর মেয়ে কি হারভার্ড এর? এই ইংরেজ সাহেব ও আমেরিকান মিসিবাবার পাশে তো দিশি লোকজনের প্রাণান্তকর অবস্থা!

একটু পরে মিস্টার তম্বি সিংও চলে গেলেন, বিদায় নিয়ে, তাঁর বাড়িতে। বললেন, বিকেলে ফোন করবেন চারটে নাগাদ। তবে "মোরে" আজ না যাওয়াই ভাল। গিয়েই গাড়িটা পাঠিয়ে দেবেন বলেই, চলে গেলেন।

ওরা চলে গেলে, আমরা সবাই বারান্দায় বসলাম। ভটকাই-এর ভাষায়, 'জমিয়ে' চা খেতে।

ঋজুদা বলল, ভটকাই, আমাকে আর এক কাপ চা। এও তো দার্জিলিং-এর। কিন্তু কোন বাগানের বলতো? বড় দুঃখ হচ্ছে রে, বুঝলি, এই দুর্দিনে এমন কাপ্তান রাজার সঙ্গে তার জীবদ্দশাতে আলাপ হল না!

ভটকাই বলল, আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, টাটা-সিয়েরা গাড়িটার ড্রাইভার বাঙালি। নাম যোগেন। ঢাকার বাঙাল। ওর বাবা পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল হয়ে আগরতলাতে এসে আশ্রয় নেয়। পড়াশোনা বেশিদূর করেনি। তবে স্কুল-ফাইনালটা চার-গড়ানে পেরিয়েছিল। তারপর ফিলিম ডিরেকটর হবার খুব শখ হয়। ধবধবে পায়জামা আর ডোরাকাটা আলখাল্লার মতো পাঞ্জাবি পরে। সুযোগ পেলেই একটা সিগারেট ধরায়। লোকমুখে খবর পায় যে, ইম্ফলে বোম্বের কোনও ফিল্ম কোম্পানি এসেছে শুটিং করতে। রেখা আর রাখী দুজনেই এসেছে আর অমিতাভ বচ্চনও। বাবার ছিটকাপড়ের দোকানের ক্যাশ ভেঙে যা পায় তাই হাতিয়ে নিয়েই ইম্ফলে চলে আসে। ইম্ফলে ট্রেন নেই—অনেকই ঘুর পথে বাসে, ট্রেনে এসে যখন আধমরা হয়ে ইম্ফলে পৌঁছয়, তখন ফিলিম পার্টি শুটিং শেষ করে চলে গেছে। তারপর আর ফেরা হয় না। ফিলিম-ডিরেকটর না হতে পেরে গাড়ির ড্রাইভার হয়।

ঋজুদা বলল, লাঞ্চের জন্য তাড়া দেবার দরকার নেই। আজকের দিনটা আমরা রিল্যাক্স করব। বাড়িটা তোরা ঘুরে টুরে দ্যাখ। আমি ততক্ষণে দারোয়ান, মালী, বেয়ারা, এদের সঙ্গে আলাপ করে দেখি। ইবোহাল সিং-এর মৃত্যুতে এরা যে কেউই বিশেষ খুশি হয়নি তা এদের চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। নতুন মনিবকে যে খুব একটা পছন্দ, তাও মনে হচ্ছে না। কিন্তু কী করবে? বড় বড় আমলারাই, আই. এ. এস সেক্রেটারিরাই মন্ত্রী বদলালে, সরকার বদলালে, নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বদলে ফেলতে বাধ্য হয়, আর এরা তো কোন ছার। সেই ম্যাক্সিম আছে না একটা "দ্য কিং ইজ ডেড, লং লিভ দ্য কিং"—পৃথিবীর সব চাকরেরই এটাই কোড অফ কনডাক্ট। বড়, ছোট সকলেরই। পঁচিশ হাজারি থেকে পাঁচশো পানেওয়ালার। তা তারা স্বীকার করুক আর নাই করুক। তবে এদের মধ্যেও যদিবা সততা কৃতজ্ঞতা আশা করলেও করতে পারিস, যতই ওপরে উঠবি, ততই তা কমে যাবে, মেরুদণ্ডর হাড় ততই পাবদা মাছের কাঁটার মতো পাতলা ফিনফিনে হচ্ছে; দেখতে পাবি। তা ছাড়াও মিস্টার ইবোহাল সিং সাধারণ ভাবে মারা যাননি। ভটকাই-এর ভাষাতে, এই "হম্বিতম্বিরা" রাতারাতি মালিক বনে গেছেন। এদের প্রত্যেকের মুখেই বিরক্তি এবং ঘেন্না চাপা দিয়ে রাখা একরকমের প্রসন্নতা দেখলি না? হম্বিতম্বিদের খুবই মান্য করছে এমন দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু এ হচ্ছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। এদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই খুনের কিনারা হোক এটাই চায় এবং ঠিক মতো হ্যান্ডেল করতে পারলে এদের প্রত্যেকেই আমাদের এজেন্টের কাজ করবে। তবে আমার দৃঢ় ধারণা এদের মধ্যে দু-একজন ডাবল এজেন্টও থাকবে। হম্বিতম্বিরা আগে থেকে সে সম্বন্ধে সাবধান হয়ে ওই

বন্দোবস্ত অবশ্য পাকা করে রেখেছে। এবং তা যদি হয়, তবে যোগোনের পক্ষেই তা হবার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা।

কেন?

তিতির বলল।

প্রথমত, ও বাঙালি। ওর পক্ষে আমাদের প্রত্যেকটি কথাই বোঝা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, আমরা মীরজাফরের দেশের লোক। না-খেটে বসে বসে খাবার মতো সুখ কল্পনা, আমাদের মতো আর কারও নেই। নইলে কি আর পুরো কলকাতা শহরটা, পশ্চিমবঙ্গটাকেই বেচে দিই! অবাঙালিদের যত টাকাই থাকুক না কেন, তাদের রক্তে "বসে বসে কুঁজোর থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে বাঁচব" এমন লজ্জাকর অ্যামবিশান কারওই নেই।

আমি বললাম।

ভটকাই বলল, ফর এ চেঞ্জ, তুই এক্কেরে ঠিক কইছস।

তিতির বলল, ইংরেজি অক্ষরমালার আদ্যক্ষর 'A' অক্ষরটির উচ্চারণ "এ" নয়, "আ"। যদিও কোনও ইংরেজকে বলো বা যে কোনও শিক্ষিত পশ্চিমীকেও যে, "আই অ্যাম এ গুড বয়" তিনি হাঁ করে তাকিয়ে থাকবেন।

ভটকাইকে অপ্রতিভ করতে পারে, এমন শক্তি তিনলোকের কোনও লোকেই কেউ জন্মায়নি এখনও।

ভটকাই বলল, আমাদের বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুলে A-কে 'আ' বলে না, 'এ'ই বলে। তোমাদের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে কি কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই? খামতি নেই? আমরা বলি চানঘর, আমরা বলি পায়খানা আর ইংরেজিতে তোমাদের শেখায়, 'জেন্টস রুম', 'লেডিজ রুম' 'টয়লেট', 'শাওয়ার', 'লু', 'ওয়াশরুম', 'থ্রোন' ইত্যাদি। খেয়ে দেয়ে কাজ না থাকলে ওরকম বাহুল্য করা শোভা পায়। আমরা ভাই গরিব। আমাদের কথাবার্তাও সাদাসিধে। তা ছাড়া যে দেশে রাজা রানিরা এখনও আছেন, আর যুবরানি? যে দেশে লেডি ডায়নার মতো সুন্দরী যুবরানি, সে দেশে 'কমোড'কে কি 'থ্রোন' বলা উচিত? ব্যাড টেস্ট। আমাদের ওসব বালাই নেই। কমোড বিদেশি জিনিস। কমোড ব্যবহার করলে আর্থরাইটিস হয়; গেঁটে বাত। আমাদের পায়খানা, "ওড়িশা টাইপ"। এই ভাল।

এইসব কি খুব গুড টেস্টের কথা হল, ভটকাই? তোর ভাঁড়ামো এবার বন্ধ কর। আমরা এখানে ভাঁড়ামো করতে আসিনি। সব ব্যাপারের একটা লিমিট আছে।

ভটকাই, সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে দুকান ধরে বসে পড়ল বারান্দাতেই। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মালী ও বেয়ারারা এমনকী দারোয়ানও দেখতে পেল।

এই জন্যেই বলে, "লজ্জা, মান, ভয় তিন থাকতে নয়।" বাক্যিটার মানে বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন। ভটকাই-এর উন্নতি ঠেকিয়ে রাখে এমন কোনও শক্তিই নেই। বিশেষ করে, আমাদের দেশে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, চাকরি, রাজনীতি, ব্যবসা,

যে পথই ও বেছে নিক না কেন, ওকে রুখনেওয়ালা কেউই নেই। চক্ষুলজ্জা, আত্মসম্মান, মেরুদণ্ডহীনতা উন্নতির পথের এই প্রতিবন্ধকতার সবকটিই ও জয় করেছে। মালিকের, সে যেই মালিক হোক না কেন, পা-চাটার কম্পিটিশনে, "গিনেস বুক অফ রেকর্ডস"-এ নাম উঠতে পারে ওর।

ঋজুদা গম্ভীর হয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল।

আমার খুব আনন্দ হল। ঋজুদাই আমাদের গার্জেন, লিডার। ঋজুদা অনেকক্ষণ পর, এই প্রথম ভটকাইকে "স্নাবিং" করল।

ভটকাই বকুনি খাওয়াতে আমি আর তিতির খুশি হয়েছিলাম।

আমরা বারান্দাতেই বসে রইলাম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যোগেন ড্রাইভার টাটা-সিয়েরা নিয়ে চলে এল। বলল, চলেন স্যার। "মোরে" পৌঁছতে পৌঁছতেই রাত হইয়া যাইব গিয়া। সাতটার পরে যাইতেই দিব না পুলিশে। আর মিলিটারি। উদিকে যে বড়ই গণ্ডগোল।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, খাওয়া দাওয়া করে আজকে রাজবাড়ি দেখব। কাল যাব এখন ভোর ভোর। তোমরা তাড়িয়ে দিতে চাও তো দেবে। আমাদের কাজ কী? কাজে তো এসেছেন বড় সাহেব।

তা তুমি ভাষাটা এখনও বদলাওনি দেখছি যোগেন বাবু।

আর বাবু ক্যান? ক্যান বদলামু? দ্যাশ বদলাইছি নেহরু সাহেবের গদিতে বসনের লোভে, বাধ্য হইয়া, ডেরেস (ড্রেস) পাল্টাইছি ফিলিমস্টার বা ডিরেক্টর হম্যু বইল্যা। আর ভাষাটাও যদি বদলাইয়া ফ্যালাই তো যোগেন কুণ্ডুর রইলডা কী?

ঠিক আছে ভাই। তুমিও একটু বিশ্রাম করো। আমরা খেয়েই বেরোব।

হঠাৎ ভটকাই বলল, আমার খুব পান্তুয়া খেতে ইচ্ছে করছে। এখানে পাওয়া যাবে?

ক্যান যাব না? আমারই মতো কত রিফিউজি বাঙালি আইস্যা ইখানে সেটল করছে। ঘোষেগো দোকান আছে। তাগো বাড়ি আছিল বরিশালে—ঝালকাটি। ফার্স্ট ক্লাস মিষ্টি বানায়। আমাগো দ্যাশও তো ছিল বরিশালে।

তা এই নাও। বলেই, ভটকাই একটি একশো টাকার নোট বার করল হিপ পকেট থেকে, আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়ে। তারপর বলল, পান্তুয়া খেতে তুমি ভালবাস তো ভাই? যোগেন?

আমারও ফার্স্ট ফেভারিট। তা হলে আপনি পঞ্চাশ টাকার পান্তুয়াই নিয়ে আসুন। আর আমার পেটটা ব্যথা করছে—এই একটা ওষুধ। লিখে দিচ্ছি। বলেই, বুক পকেট থেকে একটা স্লিপ প্যাড বের করে, বুক পকেট থেকেই বলপয়েন্ট পেন বের করে, কী একটা ওষুধের নাম লিখল।

তিতির পাশ থেকে উঁকি মারল।

ভটকাই বলল, এই নিন ভাই, এখুনি নিয়ে আসুন! দোকান কি দূরে?

আবার আপনে—আজ্ঞা ক্যান, তুমি কইরাই বইলেন। কমফর্টেবল লাগে। দুকান দূর, মানে, এই মাইল পাঁচেক হইব। বাজারে।

তা চলুন, আমিও যাই। বাজারটা দেখে আসব। পেটুক মানুষ তো। বাগবাজারের রসগোল্লার নাম শুনেছেন? আমি সেই বাগবাজারের ছেলে তো। মিষ্টির যম।

বলেই, গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ড্রাইভার যোগেন কুণ্ডু বললেন, আপনে চমচম খাইছেন, কখনও স্যার? বরিশালের 'ব্যারনের' ম্যাঙ্গো সিরাপ দেওয়া শরবৎ?

না তো।

লাইফে কিছু মিস করছেন। আমার ওয়াইফ তো...

ওরা গাড়ির দিকে চলে গেল।

তিতির বলল, বরিশালের লোকেরা স্ত্রীকে সবসময় ওয়াইফ কেন বলে জানো রুদ্র?

আমি বললাম, বরিশাল জায়গাটাই তো দ্বীপের মতো। আগে সবকিছুই ইমপোর্ট করতে হত। এক ডাব নারকেল, ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ এবং অন্য নানা মাছ ও কুমির ছাড়া। প্রথম বউ হয়তো, ইংল্যান্ড থেকে ইমপোর্ট করেছিল। তপনমামাকে জিজ্ঞেস করব।

তপনমামাটা কে?

আরে সোনাকাকুর শালা তো, তপন রায়চৌধুরী, অক্সফোর্ডের।

সোনাকাকুটা কে?

হিস্টরিয়ান ডঃ সুরেন সেনের বড় ছেলে, শৈলেন সেন। ইনক্যাম ট্যাক্সের চিফ কমিশনার ছিলেন। বরিশালের মানুষদের ওরিজিনালিটি সম্বন্ধে তপনমামার নানা লেখা আছে। পড়লে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে।

এমন সময় ঋজুদা ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

বলল, ভটকাই কোথায়?

গাড়ি নিয়ে পাস্তুয়া আর কী ওষুধ কিনতে গেল।

পাস্তুয়া? ওষুধ? বলেই ঋজুদা বলল, হুম্‌ম্।

কাছে এসে চেয়ারে বসল একবার, তারপর বলল, চল বাগানে ওই চেরি গাছটার নীচের বেঞ্চে গিয়ে বসি।

ভটকাই কোথায় যেতে পারে বলো তো?

তিতির শুধোল।

কোনও মতলবে গেছে। এমনি এমনি যায়নি। যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে, ও তোদের মধ্যে সবচেয়ে আগে অ্যাকটিভ হয়েছে।

অ্যাকটিভ? কী ব্যাপারে?

যে ব্যাপারে এসেছি এখানে, সেই ব্যাপারে। ও ফিরলেই বোঝা যাবে।

বাগানে পৌঁছে চেরি গাছটার তলার বেঞ্চে বসে, ঋজুদা বলল, এবারে বল, তোরা কে কী ভেবেছিস।

আমি বললাম, আসলে তো মোরেতে যেতে হবে। তাছাড়া খুনের এতদিন পরে গিয়ে "ক্লু" বিশেষ কি আর পাওয়া যাবে? কিন্তু আমার মনে হয়, আচ্চাও সিং-এর সঙ্গে দেখা করাটা সবচেয়ে জরুরি।

ঠিক।

আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। মিস্টার তম্বি সিং খুনের কিনারা করতে তোমাকে নিয়ে এসে, তোমাকে কেন ফ্রি-হ্যান্ড দিচ্ছেন না?

তিতির বলল, মনে হচ্ছে আমারও যে দিচ্ছেন না। নইলে, তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা জিজ্ঞেস না করে, আমাদের শহর থেকে দূরে এখানে এনে তোলার মানে কী হল?

আমার মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই আমাদের এই শুটিং-লজে এনে ওঠানো হয়েছে, যাতে আমাদের ইচ্ছে মতো ঘোরাফেরা করতে না পারি—বাজার, দোকান, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, পাঁচ মাইল দূরে।

ওই সব সম্বন্ধে খোঁজ করতেই গেছে ভটকাই। পান্তুয়াটা উপলক্ষ মাত্র। তবে, ওষুধের মধ্যে অন্য রহস্য আছে। কী হয়েছে ওর? কিছু কি সত্যিই হয়েছে?

না তো। আমরা তো জানি না। ড্রাইভার যোগেন কুণ্ডুকে দেখেই ওর পান্তুয়া খাবার শখ যেমন উথলে উঠল, তেমনি ওষুধ খাওয়ারও।

যাকগে, আসুক ও। তারপরই জানা যাবে। এখন বল, তোরা দুজনে আর কী ভাবলি।

তম্বি সিং লোকটা হয়তো সত্যিই মিথ্যেবাদী। ভটকাই-এর ভাষাতে, জালি।

কেন?

সুইজারল্যান্ডের বন্ধুর কথা বলছিল না? যাঁরাই সুইজারল্যান্ডে বা ইউরোপের কোথাওই গেছেন, তাঁরাই জানেন যে, SWITZERLAND-এর উচ্চারণটা সুইটজারল্যান্ড—যদিও 'ট'-এর উচ্চারণ খুব সংক্ষিপ্ত। কেউই বলে না, সুইজারল্যান্ড। কিন্তু উনি বারবার বলছিলেন।

তিতির বলল।

তা ছাড়া ভটকাই যখন জিজ্ঞেস করল তম্বি সিংকে যে, আপনার বন্ধু সুইস-ফ্রেঞ্চ না সুইস-জার্মান তখন তম্বি সিং ভ্যাবলারামের মতো ভটকাই-এর প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে বলল, "সুইস-ফ্রেন্ড"।

আমি বললাম।

ঋজুদা মনোযোগ সহকারে পাইপ ধরাচ্ছিল। তামাক ভরা সেরে বলল, এসব ছাড়াও অনেক মিথ্যে আছে। প্রথমত, তম্বি অক্সফোর্ডে পড়েনইনি। কারণ, যাঁরাই অক্সফোর্ডে পড়েছেন বা না পড়লেও অক্সফোর্ডে বেড়াতে গেছেন, তাঁরাই জানেন যে, অক্সফোর্ড, যাদবপুর বা কলকাতা কিংবা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোনও

একটি ব্যাপার নয় যে, নিজস্ব বাড়ি, নিজস্ব ক্যাম্পাস, নিজস্ব হস্টেল নিয়েই তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। অগণ্য কলেজ আছে, অক্সফোর্ডে। আলাদা আলাদা। সব মিলিয়েই, অক্সফোর্ড। মি. সিং অক্সফোর্ডে পড়েছেন অথচ কলেজের নাম না বলে শুধুই বারে বারে বলছেন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। তা ছাড়া ওঁর ইংরেজি উচ্চারণের সঙ্গে অক্সোনিয়ান অ্যাকসেন্টের বিন্দুবিসর্গও মিল নেই। যদিও এখন অক্সফোর্ডেও অ্যামেরিকান অ্যাকসেন্ট ঢুকে গেছে।

তিতির বলল, সানাহানবি কোথায় পড়েছে? স্টেটস-এর হার্ভার্ড-এ? তুমি তো ওর সঙ্গে এলে।

মুণ্ডু। অ্যামেরিকান কায়দা-কানুন তো স্টার টিভির বিজ্ঞাপন আর "বোলড এন্ড দ্য বিউটিফুল" সিরিয়াল দেখলেই যে কেউ শিখে নিতে পারে। আমার মনে হয়, ও পড়েছে শিলং-এর ভাল কোনও কনভেন্টে। তারপরে, শিলং-এরই কোনও কলেজে। ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করিনি, কারণ জলজ্যান্ত মিথ্যে শুনলে মাথায় রক্ত চড়ে যায়! বয়স তো হচ্ছে অথচ গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে মাথায় রক্ত চড়ানো আর আত্মহত্যা করা, একই কথা।

ঋজুদা বলল।

তোমার কী মনে হয় ওদের সম্বন্ধে? ঋজুদা?

মনে তো অনেক কিছুই হয়। তবে আচ্চাও সিংকে দেখা দরকার, কথা বলা দরকার, এক্ষুনি "মোরে" যাওয়া দরকার। কাঙ্গপোকপিতে গিয়েও সানাহানবির কুকুর ব্রিডিং-এর ধরন-ধারণ এবং তার মধ্যে মিথ্যে আছে কি না তাও জানা দরকার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গেও কথা বলা খুব জরুরি। এই খুন নিয়ে পুরো অঞ্চলেই শোরগোল পড়ে গেছে। আচ্চাও সিং-এর ওপরেও তো তম্বির সন্দেহ। সেই তো আমাদের প্রথম কুয়ারি। তবে, একটা জিনিস আমাকে খুব ধাক্কা দিচ্ছে, তা এদের স্বচ্ছলতা, অ্যাফ্লুয়েন্স। মণিপুরের মতো ছোট্ট একটি রাজ্যের এবং তাও রাজত্ব চলে যাবার পরও ইবোহাল সিং-এর এত স্বচ্ছলতা আসে কোথা থেকে? এমন স্বচ্ছলতা!

ঠিক। আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

মিস্টার তম্বি হঠাৎ বড়লোক হয়েছে যে, তা তাঁর দিকে একনজরে তাকালেই বোঝা যায়। উনি আদতে হয়তো বড়লোক ননও। আপস্টার্ট। সব দিক দিয়েই।

কেন? আমি আর তিতির একসঙ্গে বললাম।

সেই রাতে যে পোশাকে আমার কাছে এসেছিলেন, সেই পোশাকে তিনটি খুঁত ছিল।

কী কী?

প্রথমত, তার জুতোটা কলকাতার চিনে দোকানের। এবং সদ্য কেনা। হয়তো সেদিনই সকালে। তার টুপিটা মাথা থেকে খোলার সময়ই আমি লক্ষ করেছিলাম লন্ডনের বিখ্যাত শপিং-সেন্টার অক্সফোর্ড স্ট্রিটের একটি টুপির দোকান থেকে

কেনা এবং টুপিটাও ওর নিজের নয়। কমপক্ষে দু সাইজ বড়। এবং বহু-ব্যবহৃত। সম্ভবত মৃত ইবোহাল সিং-এর। তাঁর ট্রাউজার পর্যন্ত মৃত্যুর পরে বেহাত করেছেন কি না কে জানে। এ ছাড়াও, অনেক সাধারণ, গরিব পাহাড়ি মানুষদের মতো তম্বি সিং পাইপ খান। ডানহিল বা মিরশ্যাম বা পিটারসন বা অন্য কোনও ব্রান্ডের পাইপ নয়। স্থানীয় কাঠ থেকে বানানো, তামা বা পেতলের তাপ্পি মারা পাইপ, যা নানা জাতের দিশি তামাক এবং অনেক সময়ে তার মধ্যে আফিং বা অন্য কোনও মাদকের চূর্ণ মিশিয়ে এঁরা খান। ওঁর লাইটারটা উনি যেভাবে ধরে "পলমল" সিগারেটে আগুন ধরাচ্ছিলেন, তা অনেক বছর পাইপ খাওয়া যাঁদের অভ্যেস, তাঁদের পক্ষেই মানানসই। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার, উনি যদি সিগারেট স্মোকারই হতেন এবং যত ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছিলেন তাতে ওর তর্জনী ও মধ্যমাতে একটু হলদেটে ছোপ লাগতই। তা ছিল না, ওঁর এই দুটি আঙ্গুলে। আরও একটা কথা, যারা ওঁর মতো চেইন-স্মোকার তাঁরা পলমল এর মতো দামি এবং বিদেশি "রোস্টেড" সিগারেট অমন ক্যাজুয়ালি আধখানা খেয়েই অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতেন না। এসবই ওঁর বড়লোকির শো। এগজিবিশনিজম্। আসলে উনি বড়লোক নন। আসল বড়লোক ছিলেন ইবোহাল সিং। অথচ, তাঁর বড়লোকিরও কোনও ব্যাখ্যা এখনও আমরা পাইনি। এই নির্জন বাংলো থেকে চলে যেতে না পারলে কাজ কিছুই এগোবে না। ইম্ফল আমার চেনা জায়গা। চেনাজানা মানুষও আছেন একাধিক। আমার যাতে অসুবিধে হয় কাজের, সেই জন্যই হয়তো সার্কিট-হাউসে না রেখে এইখানে উঠিয়েছে আমাদের। যাকগে, টেলিফোনটা কোথায় আছে? তোরা কি দেখেছিস?

হ্যাঁ। ড্রয়িংরুমের বড় সোফার ডান পাশে আছে।

চল তবে। টেলিফোন ডিরেক্টরি কি আছে? দেখেছিস?

না, সেটা তা দেখলাম না।

বাংলোর দিকে যেতে যেতেই ঋজুদা বলল, ইচ্ছে করেই হয়তো সরিয়ে রেখেছে।

বারান্দাতে উঠতেই একজন বেয়ারা এসে সেলাম জানাল। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, টেলিফোন ডিরেক্টরি নেই।

কোথায় গেল?

তিতির শুধোল।

গতকালই মিসিবাবা নিয়ে গেছেন বদলে নতুন ডিরেক্টরি আনবেন বলে।

ও। তা তোমার সাহেবের ফোন নাম্বার কত?

কোন সাহেবের?

তম্বি সিং-এর।

ও। তম্বি সিং-এর? লেখা আছে। কথা বলবেন স্যার? ফোন লাগিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে তোমার পুরনো মনিব ইবোহাল সিং সাহেবের মোরের বাড়িতে

কথা বলা যাবে?

পুরনো মনিব কেন স্যার? উনিই তো আসল মনিব, আমাদের। মিসিবাবাও আমাদের মনিব নন। উনি বলেছেন, নতুন মনিব যিনি হবেন, তাঁকে অনুরোধ করবেন আমাদের রাখতে। কিন্তু টাকা আসবে কোত্থেকে? সাহেবই তো চলে গেলেন। আমাদের মাইনে দেবার সামর্থ্য, নতুন মনিব যেই হোন না কেন, তাঁর থাকবে কি? সাহেবের মতো মনিবই বা পাব কোত্থেকে? নতুন মনিব কে হবেন, তা তো কেউই জানে না এখনও।

আমাদের সকলের মনেই উৎকণ্ঠা এখন। সাহেব কাকে যে তাঁর সম্পত্তি দিয়ে গেছেন তা যতদিন না জানা যাচ্ছে...

তাই?

হ্যাঁ স্যার।

এই যোগেন ড্রাইভারকে কি নতুন রাখা হয়েছে?

তা তো জানি না স্যার।

টাটা-সিয়েরা গাড়িটা কতদিনের?

ওটা তো আমাদের সাহেবের গাড়ি নয়?

তবে কার গাড়ি?

জানি না। ওই গাড়ি ও ড্রাইভারকে আজই প্রথম দেখলাম।

তাই না কি? ঋজুদা অবাক গলাতে বলল।

এখন তোমার সাহেবের মোরের বাংলোতে কে থাকে?

আমরা ঠিক জানি না। শুনেছি, সাহেবের বহু পুরনো খাস বেয়ারা আছে উ মঙ্গ। বার্মিজ। আর কারা থাকে, জানি না।

ঋজুদা সোফাটাতে বসে ডায়াল ঘুরিয়ে একটা নাম্বার চাইল। এখনও এখানে বোধহয় ম্যানুয়ালই আছে টেলিফোনে। অন্তত এনকোয়ারিতে, তাই আছে। ভাবলাম আমি।

ঋজুদার চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

বলল, চিনতে পারছেন গলা?

তারপর বলল, ঋজু বোস।

তারপর খুব জোরে হেসে উঠল ঋজুদা। বলল, একটা কাজে এসেছি। উঠেছি নাগাল্যান্ডের রাস্তাতে "দ্য রিট্রিট"-এ।

ওদিক থেকে যিনি কথা বলছিলেন তিনি একসঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক কথা বললেন।

ঋজুদা হেসে বলল, বিকেলে আপনার গাড়ি নিয়ে আসবেন, ঠিক চারটেতে। তারপর আপনার সঙ্গে বেরিয়ে কথা হবে। আপনার নিজের কোনও গাড়ি নিয়ে আসবেন না। আচ্ছা, একটা কাজ করবেন বরং। একটা ভাড়া-করা গাড়ি পাঠাবেন। ড্রাইভার যেন আপনার বাড়ির পাড়াটা চেনে। বাড়ি চেনার দরকার নেই। হ্যাঁ। না।

আপনার ওখানে গিয়েই বলল সব। ওকে। ওকে। সি য়্যু। ও আর একটা কথা। ভাড়া গাড়ির ড্রাইভার যেন আপনার নামও না জানে। দেখবেন। আপনার কোনও লোককে দিয়ে ভাড়া করাবেন। ডিসক্রিট রাখবেন ব্যাপারটা।

কথাবার্তা সব ইংরেজিতেই হচ্ছিল এবং বেয়ারারা ধারে কাছে ছিল না।

ফোন শেষ হতে না হতেই শ্রীমান ভটকাই এসে হাজির, মস্ত এক হাঁড়ি নিয়ে।

ঘরে ঢুকেই বলল, ইংরেজিতে, দিস হাঁড়ি শ্যাল নট বি হ্যান্ডেড ওভার টু এনি ওয়ান। ইট নিডস সাম ডক্টরিং।

ঋজুদার চোখে হাসি খেলে গেল। আমাদের দিকে চেয়ে যেন নীরবে বলল, কী রে? কী বলেছিলাম তোদের?

ভটকাইকে বলল, কী যেন নাম ড্রাইভারের?

যোগেন কুণ্ডু।

হ্যাঁ, ওকে গিয়ে বলে দে যে, তোরা ঠিক সাড়ে তিনটের সময়ে বেরোবি। রাজবাড়ি দেখবি। ইম্ফলের সব বাজার দেখবি।

তারপর বলল, এখন কেনার দরকার নেই। তবে, ফিরে যাবার আগের দিন, তোদের একটা করে লাইঝাম্পি কিনে দেব। কলকাতার শীতের পক্ষে আইডিয়াল। নরমও। কিন্তু, তোরা থংগল বাজারের দিকে যাবি না আজকে।

ড্রাইভারকে সাড়ে তিনটের সময় বেরোব, একথা বলব কেন?

ভটকাই বলল।

আরও আগে যেতে চাস তোরা?

হ্যাঁ। এখানে বসে থেকে কী করব?

তবে তাই যা। তবে খেয়ে দেয়ে বেরোবার সময় সকলকেই বলে যাবি যে, আমার শরীরটা খারাপ। আমি বিশ্রাম নেব।

কী হয়েছে যদি জিজ্ঞেস করে?

ভটকাই শুধোল।

ঋজুদা জবাব দিল না।

পৈটিক গোলমাল বলব তো!

নিজেই বলল, ভটকাই।

ঋজুদা হাসল।

তিতির বলল, আবার পোয়েটিক গোলমাল বোলো না।

খাবার লাগাতে বলো। কী রাঁধল কে জানে! কিছু তো জিজ্ঞেসও করল না। এ আচ্ছা রাজা-রাজকুমারীর পাল্লায় পড়লাম যা হোক!

বলেই বলল, তোরা যে যাবি গাড়ি নিয়ে, তা তম্বি সিং আসবেন কখন?

যাবার আগে ফোন করে দিবি, যে তোরা ডিনারের আগে ফিরবি। উনি যদি আসেন তো ওই সময়েই যেন আসেন। তার আগে আসার দরকার নেই। আমি যে আলাদা বেরোব, তাও বলার দরকার নেই।

কথা শেষ না হবার আগেই, ওঁরই ফোন এল।

ঋজুদা বলল, এই তো লাঞ্চ লাগাতে বলেছি। লাঞ্চের পরই ওদের নিয়ে শহরে বেরোব। কাল কখন 'মোরে' রওয়ানা হওয়া যেতে পারে? কী বলছেন? ব্রেকফাস্টের পরে? দেরি হয়ে যাবে না? কারণ, ওখানে গিয়ে তো...। ও হবে না বলেছেন? তা হলে তাই হবে। আপনি কি রাতে আসছেন? চেষ্টা করবেন? ঠিক আছে। না, না। ফার্স্ট-ক্লাস বন্দোবস্ত। কোনওই অসুবিধে নেই।

এখানে মাছের একটু অসুবিধে। পুকুরের মাছ। তা ছাড়া এমনিতে বৈষ্ণব জায়গা। তবে নাগা, কুকি আরও বাইশটি উপজাতিরও বাস মণিপুরে। চারিদিকেই তো পাহাড়। মিজোরাম, নাগা হিলস, বার্মার পাহাড়, চীন, আগরতলা; মেঘালয় পাহাড়ই পাহাড়। মণিপুরও তো সবই প্রায় পাহাড়, মধ্যের এই উপত্যকা ছাড়া। অধিকাংশই খ্রিস্টান। তাঁরা তো সবই খান। সাপ, ব্যাঙ, কুকুর, বাঘও খান বলে শুনেছিলাম, কোহিমাতে যখন যাই। সত্যি মিথ্যে বলতে পারব না। তবে মিথ্যে বলার কোনও কারণ ছিল না, যিনি বলেছিলেন তাঁর।

মুরগি, সর্ষে দিয়ে রান্না; মাটন-বিরিয়ানি, কোর্মা, দারুণ অড়হরের ডাল, বেগুন ভাজা, কুড়মুড়ে করে আলু ভাজা, খাঁটি গাওয়া ঘি, মিহি চাল, বলল, এখানকার স্পেশ্যালিটি; পাহাড়ি নদীতে ধরা কুচো মাছের টক। সঙ্গে আনা কালাকাঁদ ছিল। তারপর ভটকাই-এর আনা পান্তুয়া তো অবশ্যই। জমিয়ে খাওয়া হলে, ভটকাই একজন বেয়ারাকে বলল, পান্তুয়ার হাঁড়িটা ফ্রিজ থেকে নিয়ে এসো তো বাবা। আমার আবার খাওয়ার আধঘণ্টাটাক পরে গোটা চারেক মিষ্টি না খেলে হয় না। খাওয়ার পরে মিষ্টি খাওয়াটা উত্তর কলকাতার ট্র্যাডিশান। বাঙালরা এসবের খোঁজ রাখে না।

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে বলল, আমি একটু ঘরে গিয়ে ইজি-চেয়ারে গড়িয়ে নেব। বুদ্ধির গোড়াতে ধোঁয়া দেওয়া দরকার। তা হলে, তোরা সময়মতোই বেরোস।

যাওয়ার আগে দেখা করব, তোমার সঙ্গে।

আমি বললাম।

ভটকাই বলল, তুমি রেস্ট করো, তিতির। আমরা আধঘণ্টা পরে বেরোব।

তারপর আমার আর ভটকাই-এর জন্য যে ঘর বরাদ্দ ছিল সেই ঘরের দরজা বন্ধ করে ভটকাই পকেট থেকে ডালকোলাক্সের পাতা বের করল। দু পাতা।

কী করবি?

দ্যাখই না। বহরমপুরের হনুমানের দলকে ঘায়েল করেছিলাম এই দিয়ে, তার টিকটিকি, যোগেন কুণ্ডু। বঙ্গসন্তান। বজরঙ্গবলী কাত হয়ে গেল, আর এ তো ফিনফিনে বঙ্গজ-ফড়িং।

করবিটা কী?

গোটা কুড়ি বড়ি হবে পার্গেটিভ-এর। বেসিন থেকে ভাল করে হাত ধুয়ে এসে

টুথপিক এর উল্টোদিক দিয়ে পান্তুয়াগুলো ফুটো করে তার মধ্যে দুটো করে ডালকোলাক্সের বড়ি ঠেলে ঠেলে ভরে দিতে লাগল। দশটা পান্তুয়া "ডকটরড" হয়ে গেলে সেগুলো প্লেটে রাখল। হাঁড়িটা এনে বলল, নে! তোরও চারটে খেতে হবে। আমি তো চারটে খাবই।

ভরা পেটে! আমি মরে যাব ভটকাই।

তুই এত সহজে মরবি? কাঙ্গপোকপির লেডি ডাই-এর সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত না করে কারোই মরা চলবে না। খা, খা! বলেই, অত বড় বড় পান্তুয়া একটা একটা করে আমার মুখে পুরে দিতে লাগল। যেন, দিদি শাশুড়ি এসেছেন আমার!

যাই হোক, আটটা দুজনে মিলে, ভটকাই-এর ভাষাতে "সাঁটাবার" পর, বাকি দশটা, অনেকখানি রসে ছেড়ে দেওয়া হল, হাঁড়িতে। হাঁড়িটা একটু নাড়িয়ে ভটকাই রসটা চারিয়ে দিল। পান্তুয়াগুলো খুশিতে জড়ামরি করে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

ভটকাই বলল, যোগেন কুণ্ডু মহাপেটুক আছে। মিষ্টির দোকানেই টেস্ট নিয়েছি। বাঙাল মাত্রই গুচ্ছের খায় তোর মতো। এই পান্তুয়া যদি গোটা দুয়েকও খায় তবেই আর কালকে ডিউটিতে আসতে পারবে না। গোটা চারেক খেলে তো দুদিন কাত। মানে, আটটা ট্যাবলেট।

করছিস কী? ওর বাড়িতে যদি বাচ্চা-টাচ্চা থাকে?

নেই রে নেই। ভটকাইচন্দ্র কি শিশুবধ করে মহাপাতক হবে? সব খবর নিয়েছি।

একটু অসোয়াস্তিতে পড়বে এই আর কী।

অসোয়াস্তি কী? বল, অস্বস্তি।

থাম তো তুই। একে বলে সমীকরণ। আমাকে বেশি বাংলা শেখাস না। কৃষ্ণ থেকে কেষ্ট যেমন, বুয়েচিস।

তিতির সময়মতো তৈরি হয়ে এল। শাড়িটা ছেড়ে সালোয়ার কামিজ পরেছে। আমরাও বেরোলাম। কোমরে আমার যন্ত্রটা নিয়ে নিলাম। গুলিভরা একটা ম্যাগাজিন। অন্যটা হিপপকেটে।

ঋজুদাকে বলে গেলাম, যাবার সময়ে।

ঋজুদা বলল, ড্রাইভারের কী যেন নাম? বলিস আমার পেটে ব্যথা।

ঠিক আছে। নাম যোগেন কুণ্ডু।

ভটকাই সেরিমনিয়াসলি পান্তুয়ার হাঁড়িটা যোগেন বাবুকে দিয়ে বলল, যোগেন দাদা। রাতে তুমি ও বৌদি এগুলো শেষ করে দিও। এগুলোও এই ব্যাটা রুদ্র সেঁটে দিচ্ছিল, অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছি। সত্যি বলছি, পুরো ইন্ডিয়া ঘুরেছি আমি। কিন্তু এক মুসৌরি আর বাংলাদেশের বরিশাল ছাড়া এমন মিষ্টি আর খাইনি।

বরিশালে গেছেন না কি, আপনি? কন কী?

উত্তেজিত হয়ে যোগেন বলল।

কথা ঘুরিয়ে ভটকাই বলল, আমার বাবা ট্যুওরিজম-এর অফিসার ছিলেন তো সব জায়গায় ফ্যামিলিয়ারাইজেশান ট্যুর করতে হত।

সেটা কী?

মানে, সড়গড় হবার জন্য। ফ্যামিলিয়ারিটি শব্দটার মানে বোঝেন তো? ইংরেজি শব্দ।

না বোঝনোর কী আছে? ফ্যামিলি আর ম্যালোরি। মধ্যপদলোপী শব্দ। আমিও বুঝি না, এমন জিনিসই নাই মশয়!

তিতির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পান্তুয়ার হাঁড়িটা সযত্নে গ্লাভস বক্স-এ ঢুকিয়ে শ্যাময় লেদার এর হলুদ কাচ মোছা কাপড়-টাপড় দিয়ে টাইট করে বসিয়ে, তিতিরকে দরজা খুলে বসালেন, যোগেনবাবু। তারপর আমাদের উঠতে বলে বললেন, কয়েন এইবার। যামু কই?

যা যা আছে দেখবার শহরে। সব জায়গাতেই যাব। তবে সাড়ে আটটার মধ্যেই ফিরতে হবে।

তবে প্রথমে চলেন, আই. এন. এ. মেমোরিয়ালে। ন্যাতাজি সুভাষ বোসের আই. এন. এ.র লগে ব্রিটিশদের যুদ্ধ হইছিল হেইখানে। গুলির দাগও এহনও আছে টিনের চালে। এই রাস্তায় সোজা একটু যাইয়াই বাঁদিকে ঘুরুম। মৈরাঙ্গেই আছে তা। সিখানেই তো থৈবী—খাম্বারও জায়গা। থৈবী আছিল রাজকুমারী, আমাগো সানাহানবি দেবীর মতো সুন্দরী। আর খাম্বা আছিল অর্ডিনারি। আমাগো মতো বদখত্ আর কী! কিন্তু মহা ফাইটার। অমিতাভ বচ্চনের থিক্যাও বড় ফাইটার। বীর। দুজনের পেরেম হইয়া গেল। তা রাজকুমারীর ইচ্ছা হইলে কি অইব? রাজা দিলে তো বিয়া?

তারপর?

ভটকাই শুধোল।

তারপর আর কী! যা হওনের তাই হইল।

কী?

আরে মশয়, ভাল লাভ স্টোরির এন্ডে কি বিয়া হয়, নাকি? না কোনদিন হইছে, তাই কয়েন? লায়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট, রাধা-কৃষ্ণ? পেরেম যদি সাচ্চা হয়, বুঝলেন মশয়, তবে বিয়া অইতেই পারে না। বিয়া 'যেই অইব'—বিয়ার ফুল ফুটব, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের ফুল ফাইটব।

ফাটবে মানে?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম।

ফাইটব মানে, ফাইট করনের কথা কই নাই; ফাইট্যা যাইব গিয়া। ফট্টাস কইর‍্যা ফাইট্যা যাইব। আমি নিজে বিয়া কইর‍্যা দেখছি না! অ্যারে কয় ভুক্তুভুগী।

এবারে গাড়ি স্টার্ট করলে হয় না?

তিতির বলল।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। সরি, আমি বড় বেশি কথা কই। এই অইল আমার পেধান দোষ। আমার ওয়াইফে হক্কল সময়ই কয় আমারে।

থাঙ্গজম সিং লংজুর সঙ্গে ঋজু বোসের আলাপ, আশির দশকের শেষাশেষি থেকে। থংগল বাজারের কমলা টাঁইওয়ালার শালা শ্যামানন্দ সাঙ্গেনারিয়ার একটা রহস্য সমাধান করে দিয়েছিল। তাঁর স্ত্রীর বহু লক্ষ টাকার গয়না; হিরেই বেশি, চুরি যাওয়াতে ঋজু বোসকে এনেছিল ইম্ফলে। তখন ঋজু বোসের এত নামডাকও ছিল না। তখন এই থাঙ্গজম সিং লংজু এবং মিস্টার পুরকায়স্থ বলে এক ভদ্রলোকের সাহায্যে এবং মোরে এবং তামুর পুলিশদেরও সাহায্যে সেই গয়নার প্রায় ষাট অংশ উদ্ধার হয়েছিল। তখন থাঙ্গজম সিং-এর অবস্থা ছিল অতি সাধারণ। মোরেতে একটি কাঠচেরাই এর কল ছিল। সামান্য ঠিকাদারিও করতেন।

সেই থেকে ইম্ফলের মানুষদের খুব ভক্তি ঋজু বোসের ওপর এই কারণে যে, চুরি যাওয়া সম্পত্তির মূল্য যাই হোক না কেন, ঋজু বোস শুধু তার যা 'ফি' তাই চেয়েছিল। প্লাস খরচাখরচ। তার বেশি এক পয়সাও চায়ওনি, নেয়ওনি। থাঙ্গজম সিং লংজু ছিল ঋজু বোসের এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বন্ধু, অনীক সেনের মক্কেল। সেই সুবাদে কলকাতাতেই আলাপ হয়। তারপর যখন কমলার কাজে ইম্ফলে আসেন, তখন সেই আলাপ আরও গভীর হয়।

ঋজু বোস পৌনে চারটেতে বেরিয়েছিলেন, বাংলো থেকে। গাড়িটা যতই এগোতে লাগল, ততই নানা কথা মনে হতে লাগল ঋজু বোসের। নানা চিন্তা। কারণ, তম্বি সিং-এর কথাবার্তা শুনে, তার মুখে ইবোহাল সিং-এর বৈভবের কথা শুনে, তার মৈরাঙ্গ রোডের "দ্য রিট্রিট" বাংলোতে থেকে এবং সানাহানবিকে দেখেও তাদের জীবনযাত্রার একটা ধারণা করে নিয়ে ঋজু বোস নিশ্চিত যে, মণিপুরের মতো ছোট্ট জায়গাতে এমন কিছু ব্যবসা বা শিল্প এদের থাকতেই পারে না যার দ্বারা এমন ভাবে, টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কাদের মতোই স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে পারেন ওঁরা। রাজা লাইহারোবাও তো মারা গেছেন কবে। প্রিভি পাস পেলেও এবং আদৌ পেলে কতই বা পেতেন। তা থেকে...। কোনওই সন্দেহই নেই যে, ইবোহাল সিংও ব্যক্তি হিসাবে ভাল হলেও, যা শুনেছেন তাঁর কর্মচারীদের কাছ থেকে; তাঁর রোজগারটা হয়তো ছিল মুখ্যত চোরাচালান থেকেই। কোনও কর্মচারীই, কর্মচারী কেন, স্ত্রীসুদ্ধ পরিবারের মানুষেরাও মালিক বা গৃহস্বামীর রোজগারের সূত্র নিয়ে মাথা ঘামান না। যে রোজগার করে আনে, সেই ভগবান। টাকার চেয়ে বড় মান-সম্মান-ভালবাসা-প্রতিপত্তির ধারক বাহক, আজ আর কিছুই নেই।

অমন সুন্দর বাংলো ও প্রাসাদোপম বাড়ি থাকতেও উনি "মোরে"তে গিয়ে পড়ে থাকতেন না, যদি-না মোরে বর্মার সীমান্তে হত। এই অঞ্চলে

পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ-নেপালেরই মতো চোরাচালান এত জলভাত যে, এই সীমান্তের মানুষ ও পুলিশ অবহেলায় এপার ওপার হয়। চোরাচালানকারীদের স্বর্গরাজ্য এ। রাতের অন্ধকারে মালবাহকেরা, যাদের অধিকাংশই মেয়ে; ইলেকট্রনিক গুডস, মাদক দ্রব্য এবং অন্যান্য কম ভারী অথচ দামি জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যায়, চোরা পথে। আর ভারী জিনিস তো দু পক্ষেরই চেকপোস্ট পেরিয়ে দুপক্ষের যোগসাজশেই ট্রাকে করেই পারাপার হয়ে যায়। সরকার সবই জানেন। যখন আর. ডি. এক্স-এর বিস্ফোরণে অগণ্য নিরপরাধ মানুষের প্রাণ যায়, যখন মারাত্মক এ. কে. ফর্টি সেভেনের গুলিতে ঝাঁঝরা হয় মহিলা ও শিশুর শরীর; তখন সব সীমান্তের নেতারাই একটু নড়েচড়ে বসেন মাত্র।

থাঙ্গজম সিং লংজুর বাড়ির বেশ কিছুটা দূরেই গাড়িটা ছেড়ে দিলেন, ঋজু বোস। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, অপেক্ষা করবে কি না? ঋজু তাকে মানা করে, চলে যেতে বলে, জিজ্ঞেস করলেন, ভাড়া কত?

ভাড়া তো দিয়ে দিয়েছে।

কে দিল?

নাম তো জানি না।

ও, তাহলে রণবীর শর্মাই দিয়েছে। ইচ্ছে করেই একটা বানানো নাম, ড্রাইভারকে শুনিয়ে বললেন উনি। ইসস, এত করে মানা করলাম।

তা হবে।

ড্রাইভার বলল।

তম্বি সিং-এর আমন্ত্রণ পাবার পর থেকেই এটা বুঝে ছিলেন ঋজু বোস যে, এই কেসটা সোজা কেস নয়। কেউ বা কারা কলকাতা থেকে বিখ্যাত গোয়েন্দা এনে তাঁদের চক্রান্তটা যে চক্রান্ত নয়, এটাই প্রমাণ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এবং এটা বুঝতে পারার পর থেকেই, চক্রান্তকারীদের মুখোশ খোলার জন্য জেদ চেপে গেছে ঋজু বোসের।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল কি না, তা দেখে নিয়ে ঋজু খুব আস্তে আস্তে হেঁটে থাঙ্গজম সিং-এর খুব উঁচু কম্পাউন্ডওয়ালা, বাগানওয়ালা বাড়ির গেটে গিয়ে দাঁড়াতেই উর্দিপরা দারোয়ান গেট খুলল। থাঙ্গজম সিং-এর অবস্থার উন্নতি এই ক'বছরে এতখানি হয়েছে দেখে অবাক হলেন ঋজু বোস। খুবই আনন্দের কথা।

থাঙ্গজম সিং বাইরে এসে আপ্যায়ন করলেন। পাশে, একজন গুণ্ডামতো লোক। তাঁর পুত্রবধূও এলেন। পুত্র বাড়িতে ছিলেন না। মনে হয়, সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে।

ঋজু বললেন, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। একটু প্রাইভেসির দরকার।

চলুন। চলুন। ভিতরে চলুন। নাকি, ছাদে গিয়ে বসবেন?

তাই চলুন।

কী খাবেন?

কিছু না। এক কাপ চা, দুধ চিনি ছাড়া।

সেই লোকটাও পায়ে পায়ে ওপরে এসেছিল। আলাপ করিয়ে দিলেন থাঙ্গজম সিং। বললেন, এর নাম হাঞ্জো সিং।

হ্যান্ডশেক করে ঋজু বোস বললেন, ওঃ, আচ্ছা।

হ্যাঞ্জোকেই চায়ের কথা বলে, নীচে চলে যেতে বলে, মোটা কুশন লাগানো চেয়ারে বসিয়ে, তারপর নিজে বসে বললেন, বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে? ও, তার আগে বলি, আমার ওয়াঙ্গোইর এগ্রিকালচারাল ফার্ম থেকে আনারস এসেছে আজ। গোটা কয়েক দিয়ে দেব যাবার সময়ে। কলকাতা নিয়ে যাবেন। কালই কি চলে যাচ্ছেন? এই শেষ ক্রপ। এ বছরে আর হবে না।

কবে যাচ্ছি, তা আমি নিজেই জানি না। তবে, সঙ্গে আমার সৈন্যদল আছে যে। আপনার আনারসদের সসম্মানে এখানেই শেষ করবে তারা। কলকাতা অবধি পৌঁছবে বলে মনে হয় না।

বলেই বলল, আপনি ইবোহাল সিংকে চেনেন?

মণিপুরে ইবোহাল সিংকে কে না চেনে! দ্য মোস্ট প্রিন্সলি পার্সন উইদাউট বিয়িং আ রিয়্যাল প্রিন্স। হাসতে হাসতে বললেন, থাঙ্গজম সি।

রিয়্যাল প্রিন্স নন কেন?

রাজপরিবারের কেউই তো ওঁকে আত্মীয় বলে মানেন না। সেলফ-অ্যাক্লেইমড প্রিন্স। প্রিন্স লাইহারোবা নিজেই যে প্রিন্স ছিলেন, তারই কোনও প্রমাণ নেই।

বলেই বললেন, ও বুঝেছি। আপনি ইবোহাল সিং-এর মার্ডারের তদন্তেই এসেছেন। সত্যি! এই সোজা কথাটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। তা হলে তো এবারে খুনির আর নিস্তার নেই।

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে ঋজু বোস বললেন, মানুষ কেমন ছিলেন? উনি?

কে? ইবোহাল সিং? চমৎকার। মানুষ খারাপ, ইবোহাল সম্বন্ধে কেউই বলবেন না এ কথা। কিন্তু যে পরিমাণ টাকা তিনি দুহাতে খরচ করতেন সে টাকাটা যে আসত কোত্থেকে, সেও একটা রহস্য।

আপনি তম্বি সিংকে চেনেন?

হুঃ।

হাসলেন, থাঙ্গজম সিং। ইবোহালেরই মতন, তম্বিকে চেনে না এমন মানুষও ইম্ফলে একজনও নেই।

তিনি কেমন মানুষ?

ওটা একটা মানুষই নয়। ওটা একটা "সাঙ্গাই"। সারাজীবন "ফুমডি"র ওপরে নেচে বেড়াল।

তাই? বলেই হেসে উঠলেন ঋজু বোস।

হ্যাঁ। ওটা একটা থার্ডরেট মোসাহেব, একটা বাফুন, ক্লাউন একটা।

করেন কী? জীবিকাটা কী?

মোসাহেবি, আবার কী? চিরদিন ওই জীবিকাই। একটা আত্মসম্মানজ্ঞানহীন জানোয়ার।

এই বাক্যটি উচ্চারিত হবার পরে থাঙ্গজম সিং এবং ঋজু বোস দুজনেই একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর ঋজু বোস বললেন, মোসাহেবি করে এত টাকা? কাঙ্গপোকপিতে তো শুনেছি তাঁর মেয়ে সানাহানবির ফার্ম আছে। সেখানে কুকুর ব্রিড করান উনি। সালুকি কুকুরও ব্রিড করেন। সালুকি কুকুর সম্বন্ধে কি কিছু জানেন আপনি, মিস্টার সিং।

জানি না বোস সাহেব, আর জানতে চাইও না। আমার একটি নাগা কুকুর আছে, মোককচুং থেকে নিয়ে এসেছিলাম। সে ওইসব সালুকি-ফালুকির গলার নলি ছিঁড়ে দেবে। সারাদিন অন্ধকার ঘর-এ বন্ধ করে রাখি, রাতে গেট বন্ধ করার পর ছেড়ে দিই। যমরাজেরও সাহস হবে না ঢুকতে, সন্ধের পরে। ইনফ্যান্ট, আমার স্ত্রীকে তাই তো দুপুরবেলাতে নিয়ে গেল যমে।

ও। তাই! ভীষণ খারাপ লাগল শুনে। আই অ্যাম সরি। ভারী চমৎকার মহিলা ছিলেন। আমাকে "ইরোম্বা" খাইয়েছিলেন মনে আছে। কী হয়েছিল মিসেস সিং-এর?

এমন স্বামীর সঙ্গে পঁচিশ বছর ঘর করার পরও কিছু হবার দরকার আছে কি? এই এক অসুখই তো যথেষ্ট। মরল, সেই অশান্তিতেই।

সানাহানবিকে দেখেছেন আপনি? মিস্টার বোস?

হ্যাঁ। এয়ারপোর্টে এসেছিল তো।

লেডি ডায়ানার মতো দেখতে না অনেকটা?

হ্যাঁ। তাই তো আলোচনা করছিল ওরা সকলে।

সকলে মানে?

মানে, আমার সাকরেদরা। সৈন্যদল।

ইংরেজের মেয়ে হলে তো ইংরেজের মতো দেখতে হবেই।

সে কি সানাহানবি তম্বি সিং-এর মেয়ে নয়?

বাবার নামটা ধার নেওয়া। জন হাচিনসন বলে এখানে একজন ইংরেজ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। সে ওই মোরের কাছেই মারা যায় জাপানিদের বোমাতে। তার ছেলে কেনেথ। ব্যাচেলার। লম্বা চওড়া হ্যান্ডসাম পুরুষ। নটিংহামশায়ারে দেশ ছিল। যায়নি কখনও। লেখাপড়া করেনি কিছুই। কিন্তু মানুষ ভাল ছিল। খুব ভাল শিকারিও ছিল। প্রথম জীবনে লেক লকটাক-এ মাছের ব্যবসা করত এবং একটা আনারসের ফার্মও নিয়ে ছিল। তবে ফার্মটা বিরাটই করেছিল। এখনও লোকে একনামে চেনে "কেনেথ-ফার্ম" বললেই। তম্বি ছিল ওই কেনেথ হাচিনসনেরই আনারস ফার্মের একজন সুপারভাইজার। তম্বির স্ত্রী ছিল পরমাসুন্দরী নাগা মেয়ে। নাগারা লম্বা হয়। নাগাদের মধ্যে যে কী

অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে পুরুষ হয়, তা সমতলের লোকেরা জানে না।

তম্বি ছিল একটি অপদার্থ, সবদিক দিয়েই। সারাদিন নেশা করে পড়ে থাকত। বলতে গেলে, ওর স্ত্রীই ওর কাজটা সামলে দিত। তারপর...গল্প উপন্যাসে যেমন পড়া যায় আর কী! কেনেথের রূপ পেয়েছে মেয়েটা আর মায়ের রূপ এবং চরিত্র, দুটোই। তম্বির স্ত্রী লেইমাথেইমা ছিল পরমাসুন্দরী, কিন্তু অত্যন্ত বাজে চরিত্রের মেয়ে। তম্বির স্ত্রী মারা যাবার পরে কেনেথ আনারসের ফার্ম বন্ধ করে দিয়ে এসে কাঙ্গপোকপিতে কুকুরের ব্যবসা আরম্ভ করে।

তা তম্বি সিং তো ভাল ইংরিজি বলেন।

ভাল? আপনিও ভাল বলছেন, মিস্টার বোস? আশ্চর্য!

অক্সফোর্ডে নাকি পড়াশোনা করেছেন উনি?

হাঃ! সত্যি! আপনিও দেখি...। ওর মাথার গোলমাল আছে। তা বেড়েছে এখন, বিশেষ করে ইবোহাল সিং-এর মৃত্যুর পরে। সানাহানবির সঙ্গে ইডিয়ট তম্বিই আলাপ করিয়ে দেয় ইবোহাল সিং-এর। এখন সে মেয়ে যদি ইবোহালের সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে পারে তবে বাবাকে লাথি মেরে তাড়াবে। অবশ্য, এমনিতেই তো মারে। তম্বি সিং এখন খাবে কী? এতদিন তো ইবোহালের মোসাহেবি করে দিব্যি চালিয়েছে। এখন? সেই চিন্তাতেই পাগলের মতো হয়ে গেছে। দোষ নেই বেচারির। এতদিন সাহেবের কাজ করেছে। কিছু ইংরেজি শিখবে বইকী। আমাদের চেয়ে অনেকই ভাল শিখেছে। সাহেবি আদব কায়দাও শিখে নিয়েছে অনেক। দোষ, চাল-চালিয়াতি। কিন্তু শুধু ইংরেজি বলতে পারলেই তো জানোয়ার মানুষ হয়ে যায় না।

ওঁর সম্বন্ধে আর কী জানেন? আপনি?

ঋজু বোস বললেন।

আর কী বলব। তবে বলব মানুষটা বোকা হতে পারে কিন্তু খারাপ নয়। ইবোহালকে ও খুন করেছে বা খুন করিয়েছে তা আমার অন্তত মনে হয় না। অত ষড়যন্ত্র ওর ওই মাথাতে আঁটবার মতো মাথা নিয়ে ও জন্মায়নি। নইলে আজীবন অপদস্থ হয়! তা ছাড়া, ওর মেয়ে সানাহানবির হাতে বেচারি রীতিমত অত্যাচারিত। স্ত্রীর হাতেও কম অত্যাচারিত হয়নি। লোকটা কুঁড়ে ছিল। যে কোনও মাতৃতান্ত্রিক রাজ্যেই দেখতে পাবেন যে গড়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি উদ্যমী। নানা অশান্তির জন্যেই তো ও ওর স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ইবোহালের সঙ্গেই থাকত, চামচেগিরি করত। ওকে অনুকম্পাও করে সকলে, আমিও করি, আবার ওর বিরুদ্ধে তেমন ব্যক্তিগত অভিযোগ খুব কম মানুষেরই আছে।

এবারে বলুন তো আচ্চাও সিংকে চিনতেন?

আ-চ্চা-ও! চিনব না? হিরের টুকরো ছেলে।

ওকেই তো সব সম্পত্তি দিয়ে যেতেন ইবোহাল সিং। বেঁচে থাকলে।

মানে, আচ্চাও সিংকে? তাই না? ঋজু বোস বললেন।

হ্যাঁ, হয়তো বেঁচে থাকলে।

বেঁচে আর থাকলেন কই?

তবে আচ্চাও একেবারেই নির্লোভ ছেলে। ওর বাবা একজন রাজপুরোহিত ছিলেন। যদিও রাজাদের রমরমা তখন বিশেষ ছিল না। এরকম সৎ ও সর্বগুণসম্পন্ন ছেলে সারা মণিপুরে আছে কি না সন্দেহ। কাউকে বলবেন না আপনি। ভেবেছিলাম, আমারই মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব। আলাপ পরিচয়ও আছে। আচ্চাওকে আমার মেয়েরও ভাল লাগে। ভাল লাগার মতোই ছেলে। ও ইবোহালের সম্পত্তি পেল কি পেল না তাতে কী গেল এল? আমার যা আছে, তাতে ওদের চলে যাবে। তা ছাড়া আচ্চাও তো শ্বশুরের পয়সাতে বসে খাবার ছেলে নয়, অত্যন্ত সম্মানজ্ঞান তার। পরিশ্রমীও। তা ছাড়া, শিক্ষিত বলে এতটুকু অহংকার নেই। কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেছিল ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে—আই এ. এস.-এ বসলে সহজেই শিডিউল্ড ট্রাইবের কোটাতে পেয়েও যেত। কিন্তু ও মণিপুরের ছেলেদের শিক্ষিত করে তুলবে বলেই, ওই পরীক্ষাতে বসেনি। তাছাড়া ওই সব চাকরিতে একবার বহাল হলে সারা ভারতেই ঘুরে বেড়াতে হয়। শুধুমাত্র মণিপুরের জন্যই অনেক কিছু করবে বলেই সে বড় শহরের লোভ আর কনস্যুমারিজম্-এ না ভুলে পরীক্ষা পাশ করেই ফিরে এসেছিল। কিন্তু এসেই ইবোহালের খপ্পরে পড়েছিল। ওকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল আমার। ভেবেছিলাম, ওকে আমি একটা ভাল স্কুল করে দেব। আমার মেয়েও ইংরেজিতে বি. এ. করেছে। গৌহাটির কটন কলেজ থেকে। ওদের মতামত, রুচি ইত্যাদিতেও অনেকই মিল।

আপনার মেয়ে কোথায়?

সে কোহিমাতে গেছে এক বন্ধুর বিয়ে অ্যাটেন্ড করতে। আজ তো সোমবার—এ সপ্তাহের শেষেই ফিরে আসবে। আজই সকালে গেছে নিজে গাড়ি চালিয়ে।

আপনার মেয়ের নাম কী?

থৈবী।

বাঃ! সুন্দর নাম তো।

তা সুন্দর! কিন্তু দেবী না হয়ে যদি অসুরী হয়। সেই ভয়।

আচ্চাও কোথায় আছে এখন?

আরে সেই হয়েছে মুশকিল। তাই যদি জানতাম তো গোল ছিল কী?

ওকে একবার ধরতে পারলেই তো জামিন দেবে না। আর সানাহানবির প্ল্যানটা বোধহয় সেরকমই। মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করে পুলিশকে ইনফ্লুয়েন্স করে নিরপরাধকে ফাঁসি দেওয়ানো বা সারাজীবন কারাদণ্ড দেওয়া শুধু এ দেশে কেন, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কঠিন নয়। নন-বেইলেবল অফেন্স তো! বেচারা নিরপরাধ একেবারে। আমার মেয়ে থৈবী তো কেঁদে সারা। আমিই তাই জোর করে পাঠালাম, বিয়ে খেয়ে আসতে। তা ছাড়া ও কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে তা তো

জানি না। কেউই জানে না, সে কোথায়। জানলে তো ওকে কলকাতাতে, নয় দিল্লি, বম্বেতে, কোথাও চালান করে লুকিয়ে রাখতাম।

আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো আমাকে, মিস্টার ইবোহাল সিং যে উইল করে যাননি, প্রমাণ কী? সকলেই কী করে ধরে নিল যে, হি ডায়েড ইন্টেস্টেট। ওঁর কোনও সলিসিটর ছিল না?

সলিসিটর ছিল না। উকিল ছিল, এক বুড়ো। উখরুল-এ বাড়ি। নাম ছাওবি সিং। নামটা ভুলও হতে পারে।

হুমম্।

আই সি। উখরুল-এ কোথায় বাড়ি ছিল?

তা আমি জানি না। তা দিয়ে আপনিই বা কী করবেন?

শেলফ-ড্রিভন কার ভাড়া পাওয়া যায়? কোনও কোম্পানি আছে? এখানে?

ঋজু বোস তারপর শুধোলেন, থাঙ্গজম সিংকে।

কেন? কী করবেন? আমার পাঁচখানা গাড়ি। ছেলে একখানা ব্যবহার করে। মারুতি ওয়ান থাউজ্যান্ড। মেয়ের সাদা মারুতি। আর তিনখানা আমার নিজের ডিসপোজাল-এ। একটা কনটেসা, একটা ফিয়াট এন. ই. ইলেভেন হান্ড্রেড, আর একটা মারুতি-জিপসি। যেটা দরকার, সেটা নিয়ে যান। সেন সাহেবের বন্ধু আপনি। আপনাকে খাতির করা মানে তাঁকেই খাতির করা।

সেন সাহেব কি এখনও আপনার কাজ দেখেন? অডিট, ট্যাক্স-ট্যাক্স?

আসলে, যাতায়াতেই অনেক সময় লেগে যায়। ওঁর ছেলেরাই এসে অডিট করত। তাদেরও যাতায়াত, হোটেল বিল মিলে অনেক হয়ে যেত। আর উনি এত ব্যস্ত লোক! দিল্লি বোম্বেতেই তো থাকেন মাসের পনেরো দিন। তাই গৌহাটিতেই ঢনঢনিয়া বলে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে দিয়েছি, সব কাজ। সেই ঠেকা দেয়। তবে বড় গাড্ডাতে পড়লে সেন সাহেবকে ডাকতে হয় বইকী।

তাই? কতদিন উনি আসেননি ইম্ফলে?

তা, বছর পাঁচেক।

উকিল, ডাক্তার আর গাইয়ে বাজিয়েদের না আসার কী আছে? বেশি ফিস দিলেই আসবেন।

ঋজু বোস বললেন, ইচ্ছে করে।

সব উকিল, ডাক্তার, গাইয়ে বাজিয়েকেই কি এক দলে ফেলা যায়, বোস সাহেব? সব প্রফেশানেই একসেপশন আছে। থাকে। হয়তো আপনাদের প্রফেশানেও আছে। সেন সাহেবকে টাকা বা অন্য কিছু দিয়ে কিনতে পারে না যে কেউ। তিনি ফিয়ার্সলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানুষ। ট্রুলি প্রফেশনাল। মাটির মানুষ। তবে কেউ তার লেজে পা দিলে তখনি শুধু বুঝবেন উনি কী দিয়ে তৈরি। আগে নয়। আমার কাজ এখন উনি নিয়মিত করুন আর নাই করুন, আই স্টিল অ্যাম অ্যান অ্যাডমায়ারার অফ হিম। কলকাতায় যদি ন মাসে ছ'মাসেও যাই তবেও অবশ্যই

ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। আর তেমন গণ্ডগোল পাকালে ধরে পাকড়ে নিয়ে আসি। আসেনও। বেশি ফিসের জন্যে নয়। ফর ওল্ড টাইমস সেক।

থাঙ্গজম সিং-এর বউমা নিজে ট্রেতে করে চা আর পেঁয়াজি ভেজে নিয়ে এলেন।

ঋজু বোস বললেন, থ্যাঙ্ক য়্যু।

সফিস্টিকেটেড মেয়ে ও। গৌহাটিতে পড়াশোনা করেছে কনভেন্টে। তবে বি. এ. পরীক্ষা শেষ করেনি। ব্যস, তারপরই বিয়ে। বি. এ পরীক্ষাটা দেওয়া আর হল না। তাতে কিছু এসে যায় না। যমুনা তো আর চাকরি করতে যাচ্ছে না।

সে তো ঠিকই। তোমার নাম যমুনা? বউমা মাথা হেলাল হেসে। হাসিটা বিপন্ন এবং জোর-করা বলে মনে হল। ভুলও হতে পারে মনে হওয়াটা।

চা খেয়ে পাইপটা ধরিয়ে ঋজু বোস বললেন, এবার উঠব। শুধু একটা কথা। আচ্চাও কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?

আমার ধারণা, ইম্ফলেই।

মোরে ছোট্ট জায়গা। ওখানে লুকিয়ে থাকা সহজ নয়।

পুলিশ কি ওকেই সন্দেহ করে খালাস? আর কাউকে সন্দেহ করেনি?

আর কাকে করবে? সন্দেহভাজন বলে তো আর কাউকে মনে হয় না।

কেন? সানাহানবি? বা তম্বি সিং?

ঋজু বোস বললেন।

ওদের কী ইন্টারেস্ট?

তা, আমি কী করে জানব?

আপনাদের মানে, স্থানীয় মানুষদের আর কাউকে সন্দেহ হয় খুনি বলে?

সন্দেহ তো অনেকেই হয়, কিন্তু সন্দেহ হলেই বা কি? খুন করাটা প্রমাণ তো করতে হবে। আর আসল তো হচ্ছে সেই রুবিটা। যেই খুন করুক, রুবিটা সমেত তাকে তো ধরতে হবে।

কেন?

ঋজু বোস অবাক হয়ে বললেন।

এ তো কমনসেন্স। সে খুন করেছে সে কি অত বোকা? আরে, সে রুবি কবে হয়তো বার্মাতে পাচার হয়ে গেছে। নদী পেরুলেই তামু। তামু মানেই বার্মা। বা, নাগাল্যান্ডে। নাগাল্যান্ড থেকে ডিমাপুর হয়ে ভারতের কোনও প্রান্তে; তার ঠিক আছে। বম্বের জহুরিদের মহল্লাতে বিক্রি হয়ে গিয়ে মিডল ইস্ট-এর কোনও শেখের গলার হারের লকেট হয়ে ঝুলছে এতদিনে সে রুবি, তা কে জানে।

রুবিটার দাম কত হবে?

হঃ। হঃ। দাম? সেইটাই তো কথা। কত মিলিয়ন বা বিলিয়ন ডলার তা কেউই জানে না। সবই তো শোনা কথা। আমরা কি আর দেখেছি? থংগল বাজারের শেঠ মগনলাল জহুরিকে নাকি একবার দেখিয়েছিল, ইবোহাল সিং। শুনেছি, বছর

বিশেক আগে। মগনলালও তখন রেঙ্গুন থেকে রিফিউজি হয়ে এসেছিল। রেঙ্গুনে অনেক দামি দামি বার্মিজ রুবি দেখেছে সে। কিন্তু ও রুবির দামের কোনও অনুমান করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

আচ্ছা, আচ্চাও সিং ছাড়া আর বাইরের কেউ হতে পারে কি খুনি? কাউকেই সন্দেহ বা অ্যারেস্টও করেনি কি পুলিশ? ইবোহাল সিং-এর চাকর বাকরেরাও তো ছিল মোরেতে। তাদের ওপরে সন্দেহ হয়নি পুলিশের?

ইবোহাল সিং-এর খাস বেয়ারা ছাড়া সবাইকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। আচ্চাও গা ঢাকা দেওয়াতে পুলিশের সন্দেহ আচ্চাও এর উপরেই গিয়ে পড়েছে। শিক্ষিত মানুষ হয়েও ও যে এমন কেন গা-ঢাকা দিতে গেল, তা ওই জানে।

ইবোহাল সিং খুন হবার সঙ্গে সঙ্গেই আচ্চাও গা-ঢাকা দিয়েছিল কি?

প্রায় তাইই বলা যায়। যেদিন সকালে ইবোহাল সিং-এর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়, সেদিন থেকেই সে নিখোঁজ।

পুলিশ আসার পর? নাকি সেই রাতেই?

তা জানি না। ওকে কেউই দেখেনি। ঠিক কখন যায়, তা কেউই জানে না।

আপনি এত জানলেন কী করে?

ঋজু বোস জিজ্ঞেস করলেন, সিংকে।

জানাই আমার কাজ, মিস্টার বোস। ব্যবসাদারদের সবকিছু জানতে হয়। তা ছাড়া আমার বিজনেস-কনট্যাক্টস নেই, মোরেতে? তামুতেও আছে।

তা ঠিক।

ঋজু বোস বললেন।

আচ্ছা তরোয়ালটা কে খুঁজে পায়?

তরোয়াল?

হ্যাঁ। যে তরোয়ালে রুবিটা লাগানো ছিল?

কে যে এসব গাঁজাখুরি গল্প বলেছে আপনাকে, কে জানে?

তম্বি সিং। সাধারণের সন্দেহ না কি তাঁরই উপরে পড়েছে?

নিজেকে ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট মনে করে, বিশেষ করে তাঁরা; যাঁরা ইম্পর্ট্যান্ট নন। লোকে সন্দেহ আদৌ করছে না। তবে পুলিশে করতে পারে।

কেন?

ওকে চোর বানানো সোজা, তাই। ও তো মামলা লড়তে পারবে না। আর সেটা একটা স্টান্টও হবে। সাধারণ লোকে যা অভাবিত তা ঘটলে পরেই পুলকিত হয়। যা ভাবিত, তা ঘটলে চমকপ্রদ হয় না ব্যাপারটা। পুলিশেরা এসব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার ভালই বোঝে। ওকে অ্যারেস্ট করে লটকে দেওয়া সবচেয়ে সোজা। ওর মেয়েও ওকে সাহায্য করতে আসবে না।

হুম্‌ম!

ঋজু বোস বললেন।

আপনি ঠিকই বলেছেন। তম্বি সিং-এর বিপদ আচ্চাওরই মতো। এরা যে মুরুব্বিহীন।

আপনি মুরুব্বি হন না, মিস্টার সিং? চোখের সামনে এমন অন্যায় ঘটবে, নিরপরাধ শাস্তি পাবে আর আপনার মতন এত রিসোর্সফুল মানুষ তা চোখ বন্ধ করে দেখবেন?

হঃ। হঃ। হঃ করে অনেকক্ষণ হাসলেন, থাঙ্গজম সিং।

বললেন, বোস সাহেব, আপনার ডায়ালগটা যাত্রার ডায়ালগের মতো শোনাচ্ছে। আপনিও তো মুরুব্বি হতে পারেন। আপনিই বা আমার চেয়ে কম রিসোর্সফুল কীসে? আপনার মনও নরম। আপনি ন্যায়নিষ্ঠও। আপনি নন কেন?

ঋজু বোস বললেন, এই সব মহৎ ব্যাপার শুধুমাত্র ঘরের মধ্যেই আলোচনার এবং চায়ের কাপের তলানিরই মতো আলোচনা শেষে দূরে ছুঁড়ে ফেলার। এ নিয়ে লড়তে গেলে তো ডন কীয়টে (Quixot) হতে হবে। সাড়ে পাঁচ হাজার কোটির স্ক্যামের কিনারা হল না, হবেও না হয়তো, প্রধানমন্ত্রী ঘুষ নিয়েছেন কি নেননি, তাও প্রাঞ্জল হল না আর এক কোটি টাকা দামের একটা রুবি কোথায় গেল বা ক'জন নগণ্য সাধারণ নিরপরাধ লোক জেলে পচে মরল, এসব কথা স্বাধীন ভারতে কোনও দায়িত্বশীল নাগরিকের ভাবনার আদৌ নয়।

থাঙ্গজম সিং বললেন, হঃ। দিলেন সন্ধেটাই মাটি করে। এখন একটু হুইস্কি খাব। সময় হয়েছে অনেকক্ষণ। খাবেন নাকি একটু, আমার সঙ্গে? খুব ভাল ব্রান্ড দিয়েছে একজন। ব্লু-লেবেল।

ব্লু-লেবেল? বাবাঃ! লানডান এর হিথ্রো এয়ারপোর্টেই তো তার দাম শুনে অজ্ঞান হবার জোগাড় হয়েছিল আমার।

এটা ইম্ফল। কী চান আপনি? বাঘের দুধ চান তো তাও খাওয়াব। কেন আপনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এসেছেন জানি না। আপনার ফিস দিচ্ছে কে? তম্বি সিং? সে তো নিজে খেতে পায় না। এ রহস্য সমাধানের নয়। আমি আজ রাতেই সেন সাহেবকে ফোন করছি। যাতে এই ওয়াইল্ড-গুজ-চেজ থেকে আপনাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন, তিনি। আপনার ফিস আসলে কে জোগাচ্ছে সেটাও নতুন রহস্য। এবং কী উদ্দেশ্যে জোগাচ্ছে সেটাও গভীরতর রহস্য।

ঋজু বোস হঠাৎ বললেন, চলি। অনেক উপকার হল আপনার এখানে এসে। কেসটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

এখন কি বুঝলেন কিছু? হঃ। হঃ।

বুঝিনি। আপনি বুঝতে সাহায্য তো করলেন কিছুটা। এই বা কম কী?

আবার আসবেন। ফোন করবেন। এখন মণিপুরের যা অবস্থা কেউই বাড়ি না-ফেরা অবধি নিশ্চিন্তি নেই। কোথায় কখন থাকেন জানিয়ে রাখবেন আপনার হ্যোয়ারাবাউটস। যখনই গাড়ির দরকার হবে, জানাবেন।

কার-রেন্টাল কোম্পানির নামটা?

ঋজু বোস শুধোলেন।

আরে ইম্ফল কি বম্বে কলকাতা নাকি? শোফার-ড্রিভন গাড়িই বা ক'গণ্ডা আছে? পয়সা কি বেশি হয়েছে আপনার? গাড়ির জন্যে আমাকেই ফোন করবেন। আর যদি বিবেকে কামড়ায়, তাহলে না হয় তেলটা নিজেই ভরে নেবেন। গাড়ি আমি পাঠিয়ে দেব, ড্রাইভার সুদ্ধু। সেন সাহেব জানলে কী বলবেন?

ড্রাইভারের দরকার নেই আমার।

আরে স্যার, এত জানেন আর এটুকু জানেন না? আজকাল টেররিস্টদের খুবই ঝামেলা চলছে। কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়বেন। তা ছাড়া, আমার সবকটা গাড়িই এক-হাতে রাখি। মানে, এক-একজন ড্রাইভার একেকটা গাড়ি চালায়— পাঁচ হাত হলে গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। আপনি না জানলে, কে জানবে। আমার কোনওই অসুবিধা হবে না—যতক্ষণ খুশি, যতদিন খুশি রাখবেন গাড়ি। আমার কাছে আপনি হলেন, ভি. ভি. আই. পি। বুঝলেন কিনা স্যার!

থ্যাঙ্ক য়্যু, সিং সাহেব।

বলেই উঠলেন ঋজু বোস।

চলুন, আমি যাই গেট অবধি।

আরে আপনি বসুন। মৌজের সময় আপনার।

কোথায় গেলে যমুনা?

থাঙ্গজম সাহেব বললেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ। যমুনাই পৌঁছে দেবে। আপনি ব্লু-লেবেল খুলুন।

যা বলেন। তাস খেলি না, জুয়া খেলি না, পুজো-আচ্চা করি আর একটু সন্ধেবেলা...। এবারে ইলেকশানে দাঁড়াব। বোঝেন তো, একটু ইমেজের কথাও ভাবতে হয়—সব জায়গায় গিয়ে তো সব কিছু সম্ভব নয়।

ঋজু বোস বললেন, তাতো বটেই! এখন ইমেজই তো সব। "ইমেজ" নিয়ে সকলেই মাথা ঘামায়, কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়াতে চায় না কেউই। এটাই দুঃখের।

যমুনা গেট অবধি পৌঁছে দিল। মেয়েটি অত্যন্ত সপ্রতিভ কিন্তু মুখ দেখে মনে হল যেন ভীষণই অসুখী। কোনও আনন্দই নেই।

তোমার স্বামী কোথায় যমুনা? কী যেন নাম? ভুলে গেছি।

ও কাজে গেছে।

ফেরেনি এখনও?

না। এই তো বেরুল। বোধহয় কালকে ফিরবে। কালও নাও ফিরতে পারে।

সে কী! এ কেমন কাজ? যায় কোথায়? তোমাকেও বলে না?

সে কথার উত্তর না দিয়ে যমুনা বলল, কোথায় যায় বলে তো যায় না। যা দিনকাল।

হুম্‌ম্‌। বললেন ঋজু বোস।

আমি অনেকবার এসেছি ইম্ফলে। তবে তোমার শ্বশুরের সঙ্গে অবশ্য বেশিদিনের আলাপ নয়। ন-দশ বছরের।

তাই? যমুনা বলল।

মনে মনে ভাবলেন, এই কবে ফিরবে তা পর্যন্ত বলে না-যাওয়া আশ্চর্যের বই কী! কী রকম কাজ? আর এই রকম পরিস্থিতিতে।

তোমার শ্বশুরমশাই-এর কাছে যে ভদ্রলোককে দেখলাম, তিনি কোথায় গেলেন—মিস্টার হাঞ্জো না কী যেন নাম?

সেও আমার স্বামীর সঙ্গে গেছে। ও আমার শ্বশুরমশায়ের বডি-গার্ড। আজকে ওর সঙ্গে কেন গেল কে জানে!

চিন্তা কোরো না। চলি যমুনা। ভাল থেকো।

ঋজু বোস বললেন।

কেন জানেন না, ঋজু বোসের মনটা এই মেয়েটির জন্যে ভারী হয়ে উঠল। এত বৈভব, এত বড় বাড়ি, এত গাড়ি, কিন্তু মনে সুখ বা শান্তি কিছুই নেই।

গেট দিয়ে বাইরে বেরুবার পূর্বমুহূর্তে একবার, অভ্যেসবশে পেছনে চাইলেন। দেখলেন, ছাদের আলসের পাশ থেকে একটি ছায়ামূর্তি হঠাৎ সরে গেল।

থাঙ্গজম সিং? ঋজু বোসকে নজর করছিল? কিন্তু কেন? কে জানে?

ঋজু বোস বাইরে বেরিয়ে ভাবলেন, একটু হেঁটে গিয়ে মোড় থেকে সাইকেল রিকশা ধরে থংগল-বাজারে গিয়ে কমলা টাঁইওয়ালার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। দেখা যাক, ও কী বলে। তা ছাড়া, বিপদে-আপদে ওর সাহায্যও নিতে হতে পারে। থাঙ্গজম সিং এর হাবভাব বোলচালে একটা মাতব্বরি আছে। মাতব্বরি, ঋজু বোস একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। সে মাতব্বরি যেই করুক না কেন!

সাইকেল রিকশাতে উঠতে যাবেন, এমন সময়ে দেখলেন টাটা-সিয়েরা গাড়িটা, যে গাড়িতে ওঁরা সকালে এয়ারপোর্ট থেকে "দ্য রিট্রিট" পৌঁছেছিলেন, আসছে থাঙ্গজম সিং-এর বাড়ির দিকেই। সামনের সিটেই ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন তম্বি সিং। আর সেই বাঙালি যোগেন ড্রাইভারই গাড়ি চালাচ্ছে।

তার মানে, রুদ্ররা, বাংলোয় ফিরে গেছে। এবং গাড়িটা থাঙ্গজম সিং-এর।

ওরা দেখতে পাননি ঋজুকে।

গাড়িটা পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই ঋজু রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, হিন্দিতে, ভারী চমৎকার গাড়ি। কার গাড়ি হে?

আবার কার? থাঙ্গজম সিং লংজুর। এ-গলিতে যে সব গাড়ি ঢোকে সবই তো তারই।

যে গরিব সে বড়লোককে গালাগালি করে যে সুখ পায়, তার সেই সুখের কোনও তুলনা নেই। সেই সুখ দিয়ে দুবেলা মাখো-মাখো করে ভাতও খাওয়া যায়। তবে সেই গালাগালি যে সবসময়ই অমূলক, এমনও নয়।

কী করেন ভদ্রলোক? মানে, যার গাড়ি।

কী না করেন তাই বলুন! আর ওকে ভদ্রলোকে বলবেন না বাবু।

কেন? তোমাদের এত রাগ কেন? ওঁর ওপরে?

রাগ হবে না? থাঙ্গজম সিং তো রিকশাই চালাত আমাদেরই মতো ক' বছর আগে। এখন রিকশা দেখলে তার উপরেই গাড়ি চড়িয়ে দেয়। যে মানুষ নিজের অতীত এত সহজে ভুলে যায়, তাকে কি গোবিন্দজি কখনও ক্ষমা করতে পারেন?

গরিব অবস্থা থেকে যদি ভদ্রলোক বড়লোক হয়ে থাকেন নিজের চেষ্টাতে, মেহনতে; এতে তো তোমাদের গর্বই হওয়া উচিত। তুমিও একদিন এমন বড়লোক হতে পার।

আমার দরকার নেই। ফুঃ। খাটনি! মেহনত! তা হলে আর এত কথা বলব কেন। স্মাগলিং-এর পয়সা।

আন্দাজে কি এমন অনুযোগ করা ভাল?

আন্দাজে? আপনি বেড়াতে এসেছেন না কাজে? কী জানেন স্যার আপনি? এতে কী না করতে হয়? এত টাকা এত ক্ষমতা তাও কি শান্তি আছে? শুনছি এবার ভোটে দাঁড়াবে। সারা ভারতেই এমন নেতাই তো এখন বেশি। নইলে দেশের অবস্থা কি এমন হত বাবু?

তা যা বলেছ ভাই। এবার একটু জোরে চলো। থংগল-বাজারে যাব। হাতে সময় কম।

থংগল-বাজারে পৌঁছে রিকশাওয়ালাকে দশটাকার নোট দিল একটা ঋজু।

লম্বা সেলাম দিল রিকশাওয়ালা। বলল, গোবিন্দজি আপনার ভাল করবেন। গরিবের কষ্ট বোঝেন আপনি।

নীচে কিরানার দোকান, উপরে বাড়ি। কমলা টাঁইওয়ালা দোকানে ছিল না। তার বড় ছেলে ছিল, পবন। আদর করে বসাল। বলল, কী খাবেন? ঠাণ্ডা না গরম? এলেন কবে? কাজে না বেড়াতে? একটু খবর তো দেবেন আগে।

বাবা কোথায়?

বাবা তো গেছেন ডিমাপুরে। কোহিমাতেও কাজ আছে একটু। ফিরতে ফিরতে রবিবার।

একটু কাজেই এসেছি পবন। মোরেতে যে ইবোহাল সিং খুন হল, সে সম্বন্ধে বাজারে লোকে কী বলছে?

ও, আপনি ভার নিয়েছেন? কিন্তু আনল কে আপনাকে?

তম্বি সিং!

এও তো এক নতুন রহস্য। আগে এ রহস্যই সমাধান করুন।

করব। তার আগে বলো, বাজারে...

বাজারের লোকের কথা শুনলে তো পাগল হয়ে যাবেন। কতরকম কথাই যে শুনছি। এমন মুখরোচক আলোচনা। যার যা খুশি বলছে। তবে, আমার অনেক

সাপ্লায়ার আছে মোরের। কিছু লটর-পটর কামতো আমাদেরও করতে হয়। তবে আমরা খুন-খারাপির মধ্যে নেই স্যার। আমরা যেখানে দুটো পয়সা কামিয়ে নিতে পারি কামাই। আর সব শালাই যখন কামাচ্ছে তখন না কামানোটাই তো বোকামি। বার্মা থেকে বার্মীদের লাথি খেয়ে প্রায় এক কাপড়ে, এখানে একদিন আস্তানা গেড়েছিল দাদু। এখন যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি—এখান থেকেও লাথি খেয়ে কবে উদ্বাস্তু হতে হবে, কে বলতে পারে? আসাম থেকে চলে যেতে হয় নি কি, আমাদের কত রিস্তেদারের? সেদিক দিয়ে স্যার পশ্চিমবাংগাল, জ্যোতিবাবুর রাজ্য হচ্ছে বেস্ট। ওতো ছোট রাজস্থান। আপনাদের মতো এমন চুপচাপ, সহ্যশক্তি-ওয়ালা, নন-ইন্টারফেয়ারিং জাত আর ইন্ডিয়াতে নেই। খালি কাজ-কর্ম করেন না, এই দোষ আপনাদের। আপনি একসেপশান অবশ্য। বেওসাদারের স্বর্গ হচ্ছে পশ্চিমবাংগাল। পিতাজি তো সাচমুচ শোচতে আছেন কলকাতাই চলিয়ে যাবেন। এখানের সব পাট উঠিয়ে। টাকা পয়সাও সব হুন্ডি করিয়ে ওলরেডি পাঠিয়েই দিয়েছেন—যেটুকু ওয়ার্কিং-ক্যাপিটাল না থাকলেই নয়, সেটুকুই রেখে। অবস্থা দিনকে দিন যা হচ্ছে—যা ওরাজকতা—তাতে এখানে সোব গরবর-সরবর হয়ে যাবে মনে হয়।

পবনের সলিলকি শেষ হলে ঋজু বোস বললেন, ইবোহাল সিং-এর খুন সম্বন্ধে বাজারে কী শুনছ এবারে বলো।

আস্তে স্যার। আস্তে বলুন। দিনকাল খুবই খারাপ। কেউ জানতে পারলে আপনার জানকা খতরা হয়ে যাবে। স্মাগলিং এতো বেড়ে গেছে আজকাল যে বলার নয়। সবরকম আর্মস ও অম্যুনিশানভি আসছে। জান-বাঁচানো মুশকিল।

ঋজু বোস ভাবছিলেন, পবন নিজের গলার স্বর শুনতে খুব ভালবাসে। অবশ্য অধিকাংশ মানুষই তাই বাসেন।

বললেন, তাই?

না তো কী বলতেছি। চুপচাপ থাকবেন। আগের জমানা নেই স্যার।

লোকে কী বলছে বাজারে, তা বলবে না?

শুনতেছি, যে একটা রুবি নিয়েই আসল মামলা। মার্ডার কেন হল সে তা নিয়ে ভি নানা কোথা শুনতেছি—কে করাল তা নিয়ে ভি, কে করল একচুয়ালে সেও ভি, কিন্তু কোনটা সাচ কোনটা ঝুট, তা জানব কী কোরে বোলেন? ওই রুবিটা যদি বর্ডার পেরিয়ে চলে গিয়ে না থাকে তবে ওটা যার কাছে পাওয়া যাবে, সেই ফাঁসবে। সেই আসল কালপ্রিট। লোকটা দারু পিতাথা বহুতই—মগর জিন্দগিমে কভ্‌ভি কিসিসে উঁচু জবান সে বাত নেহি কিয়ে থে—এহি থা বিউটি।

একটু থেমে বলল, যেদিন মার্ডার হল, সেদিনের এক দুদিন আগে থাঙ্গজম সিং-এর লেড়কি আর তম্বি সিং-এর লেড়কি সানাহানবি—হায়! হায়! কেয়া খাবসুরতি হ্যায় ওহি লেড়কি! দোনো মিলকে ইবোহাল সিংকো পাস গয়িথী।

মোরেতে? কেন?

ম্যায় কৈসে জানু স্যার?

সানাহানবি তো যাতিহি থী, মাহিনামে এক দো দফে। উনকি হিষ্টি জিওগ্রাফি আপকি মালুম না হ্যায়? মগর হাঁ, লেড়কি হোতি তো আয়সাই। বি আর চোপড়া কি অফারভি ফেক দি থি উনোনে। আমির খান কি এগেনস্ট মে লিড রোল মিলে থি। তব ভি। আহা, পুরি মণিপুরকি প্রাইড হ্যায় উ লেড়কি! প্রাইড! যাঁহা ভি যাতি হ্যায়, ভিড় জম যাতি হ্যায়।

ঔর থাঙ্গজম সিং কি লেড়কি?

উনকি বাঁতে ছোড়িয়ে। য্যাইসা বাপ গন্ধা, ওইসি লেড়কি ভি গন্ধী। পাইসাকে লিয়ে উতো আপনি বাপকো ভি খা যায়েগা। সিয়ারাম! সিয়ারাম!

মুসলমানেরা তওবা! তওবা! বলে যে ভাবে দুকানে দু হাতের থাবা ঠেকায়, তেমন ভাবে বলল, পবন।

তম্বি সিং লোকটা কেমন?

ইডিয়ট হ্যায় শালা! সিধাসাধা বিলকুল। মগর ইডিয়ট। ইবোহাল সিংকা চামচা থা। পিনেমে জবরদস্ত, কামমে ফসসস্-স্-স্। হামারা তো লাগতা উও বেচারা ভি মার্ডার হো যায়েগা। মার্ডার কি বারেমে উও আদমি কুছ জরুর জানতা হোগা। অ্যায়সা তো হ্যায় আদমি, ভোলেভালা। সাচমুচ। পাগলভি হ্যায়, লাগতা থোরা। মগর, আদমি জাদা লাল্‌চি নেহি হ্যায়। খানা-পিনা ঔর বটল্ মিল জানেসেই খুশ।

তম্বি সিং তো ড্রিঙ্ক করে না।

ঋজু বোস বললেন।

তম্বি সিং? বলেই, জোরে হেসে উঠল, পবন টাঁইওয়ালা।

তারপর বলল, আপ বোস সাহাব অজীব বাঁতে করতে হ্যায়। এখানের মানুষের খবর আমার কাছ থেকেই শুনুন। ও ব্যাটাকে মনে হয় কেউ ফাঁসিয়েছে এই মামলাতে, ওর ঘাড়ে বন্দুক রেখে নিজের ফায়দা উঠিয়েছে। এখন জান দিয়ে দাম না দিতে হয় বেচারাকে।

ওই রুবিটার দাম কত হবে?

উও চিজ কোই দিখা হ্যায় থোরি!

এই বাজারের কোন জুহুরি নাকি দেখেছিল?

জি হাঁ। মগর ও বুডুয়া কব গুজর গ্যায়ে। মগর, শুনা তো থা কুছ কড়োরো রুপিয়া হোগা। আপ মার্ডারার কা পিছা নেহি করকে রুবিকো পিছে যাইয়ে। আপকি কাম শর্টকার্ট হো যায়গা। মগর, বহত সামালকে রহিয়েগা। টেররিজমকি ওজেসে ইতনা আর্মস-অ্যামুনিশান সব আদমিকো হাঁথোমে আ পঁহুছা, চারোতরফ বহল গ্যায়া, আপনা আপনা জান বঁচাকে চলনাহি মুশকিল কা কাম হো গয়া। হামলোগনেত স্যার, দুকান সাত বাজি বন্ধ কর দেকে; খা-পি কে শো যায় গা। ফিন সুবে সাত বাজি খুলেগা। না মর্নিং-ওয়াক—না কুছ। তবিয়তই গড়বড়া গিয়া স্যার। তো আভ্‌ভি বলিয়ে, ঠাহরে হুঁয়ে কাঁহা আপ?

"দ্যা রিট্রিট" নে, কোহিমার পথে। ইবোহালের বাংলোয়। আমার একটা ভাল ট্যাক্সি লাগবে পবন। ডেইলি-বেসিসে। ভাল কন্ডিশনের, ভাল-গাড়ি। ড্রাইভার না হলেও চলবে।

কোনও লাফড়াতে ফেঁসে যাবে না তো স্যার?

আমি তো লফরাবাজিতে নেই পবন। তোমরা তা ভাল করেই জান।

তবে নিয়ে যান, আমার সাড়ুভাই-এর গাড়ি। সে আমেরিকা গেছে, হাওয়াইয়ান আইল্যান্ডে পাইন-অ্যাপল ক্যানিং-এর কোলাবরেশানের ধান্দায়। ওখানে ডোল মান্ডি বলে এক সাহেবের বিরাট ফার্ম আছে। সবকিছু মেশিনে হয়, যদি...সেই ধান্দায়। এখানের আনারসও তো কিছু কম নয়। তার নতুন মারুতি ডেলিভারি পেয়েছি, মাত্র কাল। এখনও গারাজ নাম্বার লাগানো। রেজিস্ট্রি যদিও হয়ে গেছে, নাম্বার প্লেট করা হয়নি। নীল মারুতি-ভ্যান। তেলও ভরা আছে ফুলট্যাঙ্ক। যতদিন খুশি ব্যবহার করুন। ড্রাইভার দিতে পারতাম। কিন্তু ভাল ড্রাইভার নেই। নতুন গাড়ি, খারাপ করে দেবে। আমাদের ভি কুছ কাম আছে কলকাতাতে, সেন সাহেবের কাছে। গৌহাটির ইনকামট্যাক্সের কমিশনার সাহেবের কাছে টু সিক্সটি ফোরের পিটিশান পড়ে আছে একটা। সেন সাহেব ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হোবে না। ফাইলিং করতে ভি লেট হয়ে গেছে অনেকদিন। ডিলে কোনডোনেশানের বেপার ভি আছে।

ইনকামট্যাক্সের আমি কিছু বুঝি না। ওসব তুমি একটি চিঠিতে লিখে দিয়ে দিও। আমি নিজে পৌঁছে দেব। নয়তো, ফোনে কথা বলে নিও। অনীকের সঙ্গে।

ঋজু বোস বলল, এবারে লক্ষ্মী ছেলে, তুমি আমাকে মণিপুরের চিফ সেক্রেটারি আর আই. জি. সাহেবের বাড়ি আর অফিসের ফোন নাম্বারটা লিখে দাও তো। আমার কাছে টেলিফোন ডিরেক্টরি নেই।

আমার কাছে স্পেয়ার আছে এক কপি। আজই তো নতুন ডিরেক্টরি এল। আনতেই গেছিলাম, তো, দুটোই লিয়ে এলম। একটা গদিতে থাকবে। আর একটা বাড়িতে। আপনি নিয়ে যান। কাম হয়ে গেলে, যাওয়ার আগে দিলেই হবে।

তো তোমার গাড়ি কই? তোমার বাবা কিছু বলবেন না তো?

কী যে বলেন স্যার। আমরা বানিয়া হচ্ছি। আপনার জন্যে যাই করি না কেন। সব পরে পুষিয়ে লিব। কামকা আদমিকো খাতিরদারি করনা বাপদাদানে বচপনসে শিখলায়া। আপনার জন্যে না করলে আমার নোকরি খেয়ে লিবে পিতাজি আর বুড়ুয়া ভি।

অব চোলেন স্যার।

মারুতি ভ্যানটা ওদের দোকানের গদির পেছনে যে ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে চাল ডাল চিনি খোল-ভুষি-মশলার বস্তা ডাঁই করা থাকে; ওরা তো হোলসেলার; সেখানেই পার্ক করা ছিল। চাবিটা দিয়ে দিল পবন। বলল , আইয়ে স্যার। মেরা সাড়ুভাইকি খুশনসিবি যো আপহিকি হাঁতোসে গাড়ি বউনি হো রহি

হ্যায়।

গাড়িতে স্টার্ট দিলেন, ঋজু বোস।

পবন বলল, নমস্তে স্যার। ঠাণ্ডা-গরম কুছ ভি নেহি লেকে আপ চলা গেয়ে তো, উসকি লিয়ে ভি হামকো ডাঁটেগা পিতাজি।

ঋজু বোস আস্তে গাড়ি চালিয়ে, বেরিয়ে এলেন ওদের কম্পাউন্ড থেকে। ভাবছিলেন, এই মারোয়াড়ি জাতটাকে যাঁরা খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁর নিজের মতন, তাঁরা ভাল করে জানেন, জাতটার এই রকেটের মতন উত্থানের রহস্য। গুণ, কিছু কম নেই এই জাতের। সেই সব গুণের কিছু অন্তত বাঙালিরা শিখতে পারলে, আমাদের অনেকটাই উন্নতি হত। ব্যবসাতেও ব্যবহার, সময়ানুবর্তিতা, কথার দাম, এবং অবিশ্বাস্যরকম পরিশ্রম করার ক্ষমতার গুণেই ওঁরা এত উন্নতি করেছেন। আমরা বাঙালিরা এঁদের গুণগুলোর কথা একবারও বিবেচনা না করে দোষগুলো নিয়েই চর্চা করে আজকে নিজেদের ভিখিরি বানিয়েছি। এ লজ্জা আমাদের রাখার জায়গা নেই; লজ্জাবোধ বলে যদি আমাদের কিছুমাত্রও এখনও থেকে থাকে।

পেছন থেকে হঠাৎ পবন ডাকল, বোস সাব। বোস সাব।

তাড়াতাড়ি ব্রেকে পা দিয়ে গাড়ি দাঁড় করাতেই পবন পেছন থেকে দৌড়ে এসে বলল, আপনাকে এখানে কমিশান করে কোন পার্টি এনেছে? মানে, আপনার ফিস দেবে, কোন পার্টি?

তম্বি সিং। বললামই তো!

তম্বি সিং! সইত্যানাশ হো গ্যায়া। আভি তো হামকোভি ডিটেকটিভ বলনা হ্যায়। আপকি ফিসতো গ্যায়াই, জানভি যানে শকতা হ্যায়। হামলোঁগোকা নেহিতো দুসরা কিসিকো আপ জারা পুছনে শকতা থা, হিয়া আনেকা পহিলে। যো আদমি আপকো জান-পুছকর লেতে আয়ে হুয়ে হ্যায়, উসকো জরুর কুছ মতলব হ্যায়। বেশ্‌ক। মগর উ্য হ্যায় কওন? পিতাজি আনেসেই আপকো পাস ভেজেগা। হামকো রোজ ফোন কিজিয়েগা একদফে, জরুরত কুছ পড়ে ইয়া নেহি। বহুত চিন্তামে ডাল দিয়া আপ মুঝকো।

রাতে, খেতে বসে, ঋজুদা বলল, একটা ব্লাইন্ড ডিসিশান নিতে হবে। কাল কাকভোরে কাঙ্গপোকপিতে যাব, না মোরেতে? এই দু জায়গাতেই যাওয়াটা সমান দরকার। যাক, গাড়ির সমস্যা যে মিটেছে, এটাই মস্ত বড় কথা।

তুমি এত দেরি করলে! চিন্তা করছিলাম আমরা। ফোন ডিরেক্টরিটা থাকলেও...সেটাও তো সরিয়ে ফেলেছে।

সরায়নি, ফোন ডিরেক্টরি সত্যিই বদলাতে পাঠিয়েছিল। নতুনটা আনবার জন্যে।

কী করে জানলে?

জেনেছি।

খাওয়া দাওয়ার পর তিতির বলল, দু জায়গাতে যাওয়াই সমান দরকার হলে, টস্ কর ভটকাই। হেড হলে মোরে, আর টেল হলে কাঙ্গপোকপি।

ডিনার চমৎকার করেছিল। ওয়েস্টার্ন। মুলিংগাটানি স্যুপ। তিতির দেখেই মুখ ভেটকেছিল। ও দেখতে পারে না। মাছের মেয়োনিজ। কী মাছের বোঝা গেল না। ভেটকিও হতে পারে আবার নাও হতে পারে। চিকেন রোস্ট। পাইন্যাপল—পাই। সঙ্গে ব্রেড-রোলস, ক্রোঁশো এবং টোস্ট। যার যা খুশি।

এত সুন্দর রোল আর ক্রোঁশো কোথায় তৈরি হয়?

...বাবুর্চিকে শুধোলো তিতির।

শিলং-এর পাইনউড হোটেলের বেকারি ডিপার্টমেন্টের একজন চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে ডাংজাথাং সাহেবের সঙ্গে পার্টনারশিপে বেকারি করেছেন। চিজ স্ট্র, নানারকম কেক, ব্ল্যাকফরেস্ট, প্যাটিস, কলকাতার 'কুকিজার' থেকেও একজনকে ভাগিয়ে এনেছে। খুব ভাল বানাচ্ছে সব। ওদিকে আইজল, নাগাল্যান্ডের কোহিমা এবং ডিমাপুর; বার্মার তামু, পাম্থা, মিন্থা, থংডুট এবং পংবীন পর্যন্ত চালান যাচ্ছে। মণিপুরের মধ্যেও কম চাহিদা নেই।

বাঃ। ঋজুদা বলল। তারপর বলল, টস্‌টা কর ভটকাই।

সঙ্গে সঙ্গে বারান্দাতে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে টস করল ভটকাই। টেল হল। অতএব, কাঙ্গপোকপি।

তিতির বলল, ইচ্ছে করে টেল ফেলেছে। ওর প্রথম থেকেই কাঙ্গপোকপিতেই যাবার ইচ্ছে।

ভটকাই রেগে বলল, বেশ তো। তোমরা ফের করো, নতুন করে।

চল, বসার ঘরে গিয়ে বসি।

চলো।

বলো, ঋজুদা, কোথায় গেলে? কাদের সঙ্গে দেখা করলে? কী বুঝছ?

যতই বোঝার চেষ্টা করছি ততই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মিস্টার তন্বির ওয়ার্থ নাকি পাঁচ পয়সাও নয়। ওঁর পেছনে অন্য কেউ আছেন। তিনি পুরো ইস্যুটাকে কনফিউজ করে দেবার জন্যেই আমাকে এখানে ডেকেছেন, যাতে তাঁর সুবিধে হয়। আজ না হয় কাল পুলিশ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেই, কারণ, কৃষ্ণমূর্তি সাহেব এখানের চিফ-সেক্রেটারিকে টেলেক্স পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এত উপর মহলে হল্লা হলে কেস আবার গুবলেট হয়ে যাবে না তো? আসল তো নিচুমহল।

ভটকাই বলল।

সেটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু উপায়ই বা কী ছিল? যাতে আসল অপরাধীকে ধরা পুলিশের পক্ষেও অসুবিধের হয়, অথবা পুলিশদের ভুল বা ইচ্ছে করে ভুল

সিদ্ধান্ত যাতে আমার ভুল সিদ্ধান্তে আরও পাকা-পোক্ত হয়, সে জন্যেই আমাকে ভুক্কা তম্বি সিংকেও মেরে দিতে পারে, যে আসলে তাকে পাঠিয়েছিল আমার কাছে, সে।

তম্বি সিং যে আসল লোক নয়, এটা কিন্তু আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল। মনে আছে, তোমার? কলকাতাতে তুমি যখন রশিদের কথা ওঠালে, তখন তম্বি সিং বললেন, "যে টাকা পাঠিয়েছে তার রশিদের দরকার নেই"। যখন বললে যে, দশহাজারের বেশি কোনও খরচ ইনকামট্যাক্সে মানবে না, তখনও উনি বললেন, "ও যার ব্যাপার সে বুঝবে"।

আমি বললাম।

ঋজুদা হাসল। বলল, মনে আছে।

তিতির বলল, এই কেসে আর ফিস টিস-এর কথা তোমার ভুলে যেতে হবে। এখন মানে মানে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফেরাই যথেষ্ট সকলের। বিশেষ করে, ঋজুদার। বেঁচে থাকলে অনেক গোয়েন্দাগিরি, শিকার ও অ্যাডভেঞ্চার হবে।

ভটকাই বলল, ছিঃ ছিঃ। একি শুনি মন্থরার মুখে? তুই কি ঋজুদারই সাগরেদ? ওপেন রিটার্ন টিকিট তো পকেটেই আছে। একটা কাজ করতে এসে শেষ না দেখে আমি অন্তত যাব না। ইচ্ছে করলে, তোমরা সকলে চলে যেতে পারো আমি একাই রয়ে যাব ঋজুদার সঙ্গে। রুদ্রর পিস্তলটা শুধু চাই। আমাদের বাগবাজারে একটাও দশতলা বাড়ি নেই কিন্তু তোরা কি জানিস যে, কলকাতা থেকে যত মাউন্টেনিয়র পাহাড় চড়তে যায়, তাদের মেজরিটিই আসে বাগবাজার থেকেই, তোদের সাউথ ক্যালকাটা থেকে নয়। অ্যাডভেঞ্চারের! বিপদের গন্ধ যখন পেয়েছি তখন পুলিশের কুকুরের মতো আমি তার পিছু নেব। যা কপালে আছে তা হবে।

ঋজুদা বলল, রাত সাড়ে দশটা। এবারে সকলেই শুয়ে পড়। আমরা ঠিক সাড়ে চারটেতে বেরোব। বাবুর্চিকে বলে রাখ চারটেতে চা চাই। তার ওঠার দরকার নেই। নাইট-ওয়াচম্যান ঘরে পৌঁছে দিলেই হবে।

শুধুই চা? একটু বিস্কুটও না?

ভটকাই বলল।

ঠিক আছে। শুধুই বিস্কিট। গুড নাইট। কাল কথা হবে। সময় লাগবে কাঙ্গপোকপি পৌঁছতে।

সকালে বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখি রীতিমতো, যাকে বলে ক্যালামিটি। ভটকাইচন্দ্রর ডান পাটি তার খাটের নীচে মশারি ভেদ করে ঝুলে রয়েছে, বাঁ পাটি খাটের ভিতরে আর তার মাথাটি, মাথাতো নয়, যেন আন্দামানের একটি দুষ্প্রাপ্য সাদা কচ্ছপ, মশারির সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। সাধু বাংলাতে যাকে বলে, "অঙ্গাঙ্গীভাবে"। আর ভটকাই জালে পড়া চিতাবাঘের মতো ফ্যাঁসস্-ফোঁসস শব্দ করে যাচ্ছে সমানে, দুখানা হাত আর মশারিতেই আটকে-যাওয়া একখানি পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে।

ব্যাপারটা বুঝতে আমার সামান্য সময় লাগল এবং বুঝতে পেরেই হো হো করে হেসে উঠলাম আমি।

ভটকাই একটা সংক্ষিপ্ত বাক্য, উড়ন-তুবড়ির মতো আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। তার অর্থ, আমি ছাড়া, অথবা যিনি "জঙ্গল মহল" না পড়েছেন, আর কারও পক্ষেই বোঝা সম্ভব ছিল না। বাক্যটা হল "খদ্দাকারেকছস্"। অর্থাৎ "খবর্দার কাউরে যদি কইছস"। 'জঙ্গল মহল"-এর "মাইর্য়েন এবং মাইর্য়েননা" গল্পে জামাই বাবুর ডায়ালগ। জামাইবাবু ঘুমের মধ্যেও পান খেতেন—তাই তাঁর সব কথাই অমন জড়িয়ে যেত।

ভটকাই নিজের বাগবাজারত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে, বিপদে পড়ে সেই বাঙালপতিরই শরণাপন্ন হল।

আমি এসে মশারির ফাঁস থেকে উদ্ধার করে বললাম, আরও স্টান্ট দেবার জন্যে, তামিল ব্রাহ্মণ সাজবার জন্যে ন্যাড়া হতে যাও।

ওর ন্যাড়া মাথাতে দু তিন মিলিমিটার মতো চুল গজিয়ে গেছিল—শুয়োরের চুলের মতো খোঁচা খোঁচা; মোটা চুল। যেমন বুদ্ধির বাহার তেমনিই চুলের। ন্যাড়া হওয়ার পর কিছুদিন মশারি থেকে দূরে থাকাই ভাল। তখন মশারি, মশার অরি না হয়ে ন্যাড়ার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

প্রথম প্রাতেই এমন কেলো করলি। ছিঃ।

আমি বললাম।

ভোরবেলা চা দিয়ে বেয়ারা দরজাতে ধাক্কা দিল। তিতির চা খায় না। তাই ভটকাই তিতিরের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিয়ে গাইতে লাগল, "ভোর হল দোর খোলো খুকুমণি ওঠো রে।"

যখন গাড়িতে উঠছি আমরা, তখনও অন্ধকার। সবে আলো ফুটতে আরম্ভ করেছে। পাখি ডাকছে বাগান থেকে। নানারকম। তার মধ্যে ব্যবলার, থ্রাশার, বুলবুলি, টুনটুনি, শালিক এবং দাঁড় কাকেদের গলাই প্রধান। পেছনের ফাঁকা হয়ে যাওয়া জঙ্গল থেকে বনমোরগ। হঠাৎ একটা ময়ূর ডেকে উঠল, বুকের মধ্যে চমক তুলে। এখনই বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব একটা। দিনরাত্রের এই সময়টাতেই পৃথিবী সবচাইতে শান্ত, স্নিগ্ধ, সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশায় ভরা। রোদ উঠে গেলেই কারও আশা পূরবে, কারও আশা ভাঙবে। এই সময়টা আমার তাই সবচেয়ে ভাল লাগে।

ভটকাই আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, জানি কী ভাবছিস। আমি রোজ এই সময় উত্তর কলকাতার পথে পথে হেঁটে বেড়াই। ঘুম-ভাঙার আগে কলকাতার জীবন দেখতে দারুণ লাগে আমার। চোখে কেতুর-লেগে-থাকা কলকাতা।

ঋজুদা বলেছিল, সকলের ব্যাগও সঙ্গে নিয়ে নিতে। কখন কোথায় থাকি ঠিক নেই। কাল রাতেই বাবুর্চি বেয়ারাদের বকশিস টকশিসও দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আমরা ফিরলে তখনই রান্না-বান্নার কথা বলব। কবে কখন ফিরব তার ঠিক নেই। আমরা যাচ্ছি লকটাক-এ। সেখান থেকে কোথায় যাব তাও জানা নেই।

গাড়িতে উঠতে যাব ঠিক এমন সময়ে ফোনটা বাজল। তিতিরই দৌড়ে গেল। ফোন ধরেই চেঁচিয়ে বলল, ঋজুদা তোমার ফোন।

এই সময়ে?

ভুঁরু কোঁচকাল ঋজুদা। তারপর ফোন ধরে এসে, মারুতি ভ্যানে উঠে পড়ে, সামনের, বাঁদিকের সিটে বসল। বলল, রুদ্র তুইই চালা। আর ভটকাই, তোর রসিকতা এখন কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ রাখ।

গাড়ি স্টার্ট করে, কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে পথে পড়তেই ঋজুদা বলল, ব্যাড নিউজ...

কী?

তিতির শুধোল।

তম্বি সিং...

তম্বি সিং মার্ডারড?

ভটকাই প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল।

না। তম্বি সিং ফোন করেছিলেন যে, ইবোবা সিংকে কে বা কারা কাল মধ্যরাতে মোরের পথে থেংনোপালের ঘাটিতে হঠাৎ একটি বাঁকে, রোড ব্লক সেট করে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। গাড়িটাও প্রায় খরচের খাতায়। খুন করেছে।

লোকটা কে? ইবোবা সিং?

থাঙ্গজম সিং-এর ছেলে।

থাঙ্গজম সিং? সে আবার কে?

থৈবী দেবীর বাবা।

থৈবী দেবী? সেই বা কে? থৈবী-খাম্বার কথা তো শুনেছি, সে তো...। তুমিও হেঁয়ালি করছ ঋজুদা।

তিতির বলল।

না হেঁয়ালি নয়। এর নামও সেই লেজেন্ডারি রাজকুমারীর নামেই রাখা হয়েছে।

যাঃ বাবা। কী হেঁয়ালিরে।

হুঁ।

ঋজুদা আপন মনে বলল।

ফোনটা করল কে?

আমি বললাম।

তম্বি সিংই।

তিনি জানলেন কখন? কোত্থেকে। তিনি এখন কোথায়?

জানি না কোত্থেকে ফোন করলেন। কিন্তু তিনি খুব প্যানিকি হয়ে গেছেন। গলা শুনেই মনে হল, প্রকৃতিস্থও নেই। সারারাত হয়তো মদ-টদ খেয়েছেন।

তার মানে, খবরটা আগেই পেয়েছিলেন?

হতে পারে। তবে এখুনি তো জানা যাবে না। হাঞ্জো সিংও মারা গেছে।

এরা কারা? মানে, এই ইবোবা সিং, থৈবী সিং, থাঙ্গজম সিং? হাঞ্জো সিং?

পরে জানবি। এখন একটু ভাবতে দে আমাকে। গাড়িটা একটা মোড়ে এসে পৌঁছতে আমি বললাম, এবারে ডানদিকে না বাঁদিকে? কোনদিকে টার্ন নেব, ঋজুদা।

সোজা, সোজা। সোজা যা। তারপর ভাল করে শুনে নে। সামনে পাঁচ ছ' কিলোমিটার গিয়েই আরেকটা মোড় পাবি। বাঁদিকে যাবি, সেখান থেকে দশ কিমি মতো যাবার পরই কাঙ্গলোটংবি। সেখান থেকে সোজা গেলে কাঙ্গপোকপি, বাইশ তেইশ কিলোমিটার মতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর জঙ্গল আরম্ভ হবে। আগে এই সমস্ত জায়গাই, যেখানে আমরা রয়েছি সেই "দ্য রিট্রিট"-এ, তার পাশেও অত্যন্ত গভীর জঙ্গল ছিল। আশ্চর্য! এমন একটা রাজ্য নেই ভারতবর্ষে, যেখানে বনজঙ্গল শেষ না-করা হয়েছে। ভাবলেও কষ্ট হয়।

ভটকাই বলল, কাঙ্গপোকপি থেকে কোহিমা কত দূর?

কাঙ্গপোকপি থেকে?

হ্যাঁ?

কত আর বড়জোর একশো কি.মি. হবে।

আর মাও? নাগাল্যান্ডের বর্ডার?

মাও হবে পঁচাশি ছিয়াশি কিমি মতো।

আর, কোহিমা থেকে ডিমাপুর কতদূরে?

চুয়াত্তর পঁচাত্তর কিমি হবে। মুখস্থ করে রেখেছি কি? ডিমাপুর তো সমতলে। রেল স্টেশন আছে। কোহিমা থেকে ডিফু নদীকে বাঁ পাশে রেখে, পথটা বাঁক নিতে নিতে কোহিমাতে পৌঁছয়। সেই পথটুকু ভারী সুন্দর।

বলেই চুপ করে গেল।

শোন, তোদের একটা কথা বলে রাখি। এখুনি বলা দরকার। কাঙ্গপোকপিতে সানাহানবির ফার্মে গিয়ে থৈবী দেবী বলে একজন মেয়ের সঙ্গে দেখা হতে পারে তোদের। আমিও তাকে দেখিনি কখনও। মানে, না থৈবীকে না ইবোবাকে। সানাহানবির মতোই হবে হয়তো বয়স মেয়েটির। তবে দেখা যে হবেই, এমনও জোর করে বলতে পারি না। কারণ, তার এখন কোহিমাতে থাকার কথা। তবে মন বলছে, হবে। আমি বা তোরা কেউই তার কথা জানি বা জানিস তা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবি না। বুঝেছিস। আর তিতির, তুই তার সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব করে রাখিস। যে থৈবী দেবীর কথা বলছি, তার দাদাই খুন হয়েছে গত রাতে। সে খবরটা সে হয়তো পেয়েও গেছে। নাও পেতে পারে। কিন্তু খুন হবার সম্ভাবনার কথা তার জানা আছে সম্ভবত! বেচারি যমুনা।

যমুনা আবার কে?

আছে। আছে। তোরা কি সকলকেই চিনিস? থৈবী যদি খবরটা

কাঙ্গপোকপিতে পেয়ে থাকে, তবে রওনা হয়ে হয়তো ইম্ফলে এতক্ষণে চলে গেছে। এখনও কিছু সম্বন্ধেই শিওর নই। দেখি কোনও সাদা মারুতি কি দেখলাম আমরা? আমাদের ক্রস করে যেতে, ইম্ফলের দিকে?

না তো! আমি এমফ্যাটিকালি বললাম।

এমন সুন্দর সকালে একটা মৃত্যুর কথা শুনে আমাদের মন খারাপ হয়ে গেছিল। মৃত্যু, সে যার মৃত্যুই হোক না কেন, মনকে ব্যথিত করেই। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের "ফর হুম দ্য বেল টোলস" উপন্যাসের আগে আছে না? "For Whom the bell tolls, the bell tolls for thee!"—প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর মধ্যেই আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যুই নিহিত আছে।

সালুকি কুকুর সম্বন্ধে তুমি কিন্তু কিছুই বলোনি ঋজুদা, এখনও আমাদের।

আরম্ভ হল এভার-ইনকুইজিটিভ ভুটকাই-এর অন্তহীন প্রশ্নবাণ। এই সুন্দর সকালে মৃত্যু থেকে ও পালাতে চাইছিল আসলে।

সালুকি হচ্ছে, কুকুরদের রাজা। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস আর সালুকির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের আবিষ্কারে দেখা গেছে যে, আদিমতম গুহাগাত্রের আঁকা ছবিতে, কবরের উপরে খোদিত ছবিতে, সালুকিদের ছবিও রয়েছে। তারাই হয়তো কুকুরদের আদিপুরুষ। খ্রিস্টপূর্ব দু-হাজার থেকে সাত-হাজার শতাব্দীতেও যে এরা ছিল তারও প্রমাণ আছে। এমনকী খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের ধর্মপুস্তক বাইবেলেও, যেখানেই কুকুরের কথা আছে, সেখানেই ধরে নেওয়া হয় যে, সালুকির কথাই বলা হচ্ছে। লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির পৃথিবী বিখ্যাত ছবি, "দা লাস্ট সাপার"-এও সালুকিদের ছবি আছে। মুসলমানরা কুকুর আর শুয়োরকে 'হারাম' বলেন—কারণ, তারা নোংরা। এই দুই প্রাণী সম্বন্ধে তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসনে নানা বিধিনিষেধ আছে। এই হারাম থেকেই "হারামজাদা" শব্দের উদ্ভব। কিন্তু সালুকির বেলা ইসলামেও ব্যতিক্রম করা হয়েছে। সালুকিরা শেখদের নিজের তাঁবুতে স্থান পেয়েছিল। এমনকী মিশরের ফারাওদের মতোই এদেরও "মমি" রাখা আছে। নীলনদ-এর উত্তরভাগের অসংখ্য প্রাচীন কবরের মধ্যেও নানা জাতের সালুকির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। ক্যাসপিয়ান সি থেকে সাহারা, মিশর, অ্যারেবিয়া, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, অ্যানাথলিয়া এবং পারসিয়া পর্যন্ত এদের পাওয়া যেত, সেই সুপ্রাচীন কালেও।

তা এই কুকুর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল কী করে?

তিতির শুধোল।

যে করে সমস্ত ভাল বা খারাপ জিনিসই ছড়িয়ে যায়।

তবু বলো না, বিশদ করে।

যতদূর আমি খোঁজ রাখি, অবশ্য বইপড়া বিদ্যায়; তাতে জেনেছি যে, আঠারশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্যার হ্যামিলটন স্মিথ, একটি সালুকি কুকুরী নিয়ে

আসেন ইংল্যান্ডে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে। একটা পুরুষ সালুকির কথাও শোনা যায়, ওই সময়েই লানডান-এর রিজেন্ট পার্ক চিড়িয়াখানাতে ছিল বলে। সমসময়েই, আরও একটি কুকুর ছিল চ্যাটসওয়ার্থ-এর ডিউক অফ ডেভনশায়ারের কাছে। এমনি করে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সেই সময়কার ইংল্যান্ডে বলা হত "পারসিয়ান গ্রে হাউন্ড"। পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অফিসারদের কাছ থেকে এই কুকুর সম্বন্ধে ব্রিটেন ওয়াকিবহাল হয়।

একটা সময়ে, পৃথিবীতে ব্রিটেন আর জার্মানি যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী, মেধাবী এবং প্রতিভাবান জাত বলে স্বীকৃত হয়েছিল এবং দুঃখজনক হলেও যার অমোঘ পরিণতি সংঘাত; সেই সময়ের ইতিহাস নাড়াচাড়া করলেই তোরা দেখতে পাবি যে, যে-কোনও জাত যখন বড় হয়, তখন সেই সব জাতের বড়ত্বর মাপ শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক সাফল্যের পরিমণ্ডলের এবং মাপ দিয়েই চিহ্নিত হয় না।—ফুল, পাখি, প্রজাপতি, কুকুরের প্রতি আগ্রহ থেকে তা পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, দর্শন এই সমস্ত বিষয়েই উপচে গিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়। সভ্যতা ব্যাপারটা জীবনের কোনও এক বিশেষ ক্ষেত্রে কোনওদিন আবদ্ধ থাকেনি। থাকে না। যাঁরা অগ্রগণ্য, তাঁরা জীবনের সমস্ত টুকরো-টাকরাতেও অগ্রগণ্য হন।

আমাদের দেশ শাসন করতে এসে ইংরেজ আই. সি. এস. অফিসাররা আমাদের দেশের গহন গভীরে গিয়ে আমাদের আদিবাসীদের তত্ত্ব-তালাশ করে, ফুল পাখি, প্রজাপতি, জন্তু-জানোয়ার, উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁদের গভীরতা ও তীক্ষ্ণ মেধার স্বাক্ষর যেমন রেখে গেছেন তাঁদের লেখা বিভিন্ন জেলার "গেজেটিয়ারে", তেমন গত চল্লিশ বছরেই কোনও আই. এ. এস. অফিসারের কাছ থেকে তো পেলাম না। যাঁরা পারেন, তাঁরা শাসন যেমন করতে পারেন, ভালওবাসতে পারেন। আর যাঁরা ভালবাসতে শিখেছেন, যত্ন করতে শিখেছেন, তাঁরা নিজের জিনিস আর পরের জিনিসে তফাত করতে ভুলে যান। জার্মান মিশনারিরা যা কাজ করে গেছেন ভারতের নানা আদিবাসীদের সম্বন্ধে, যেমন ফাদার হফ্‌ফম্যান; তেমন মিশনারিদের দেখা কি আজকাল পাওয়া যায়?

তুমি বড় বুড়ো বুড়ো ভাব করছ আজকাল, ঋজুদা।

বুড়োরা যেমন এ যুগের সবকিছুই খারাপ দেখে—সবসময়েই "আমাদের সময়ে এই ছিল", "আমাদের সময়ে ওই ছিল", "এখনকার ছেলে-ছোকরা খারাপ, তাদের পোশাক খারাপ, তাদের বুদ্ধি খারাপ, তাদের বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই, তাদের মাইকেল জ্যাকসন, উষা উত্থুপ, মাধুরী দীক্ষিত, রূপা গাঙ্গুলি সবাই খারাপ" ইত্যাদি ইত্যাদি...তুমি তেমনই কর আজকাল। তুমিও কি বুড়ো হচ্ছ না কি?

আমি বললাম।

বার্দ্ধক্য এমনই জিনিস যে, কারোকেই কোনও গেসসসসওয়ার্ক-এর সুযোগ দেয়

না। সে তো আসবেই একদিন না একদিন। আটকানো তো যাবে না। তবে যখন আসে, তখন তার পদধ্বনি ঘরে বাইরে সকলেই শুনতে পায়। প্রার্থনা করিস, যেন যতদিন সম্ভব তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি। আর যখন আসবেও, যেন তার সঙ্গে লাঠালাঠি না করে গলাগলি করে দিন কাটাতে পারি।

তিতির বলল, ভাগ্যিস তুমি ওর মধ্যে গুরুর নামটাও ধরোনি। তা হলে নিজের বুমেরাংয়ে তো নিজেই কাৎ হয়ে যেতে, ঋজুকাকা। আমাদের সব গুরুরাই খারাপ, এ কথা আর যেই হোক, তুমি বলতে পারো না।

সকলেই হেসে উঠলাম আমরা।

ঋজুদা বলল, আমরা একটু বেশি আগে বেরিয়ে পড়েছি, বুঝলি। একজন মহিলার এবং তরুণীর বাড়িতে আগে না জানিয়ে চারজন আগন্তুকের পক্ষে ব্রেকফাস্ট টাইমের আগে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হওয়া যায় না। একটু আস্তে চালা রুদ্র। আমরা কাঙ্গপোকপিতে পথপাশের কোনও চায়ের দোকানে, গরম গরম জিলিপি বা সিঙ্গারা বা কচুরি দিয়ে গরম চা খেয়ে তারপই সানাহানবির ফার্মে যাব।

জিলিপি-সিঙ্গারা পাওয়া যাবে? এইসব অঞ্চলে?

জিলিপি-সিঙ্গারা না হলেও চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু মিষ্টি ও নোনতা অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেখানেই পথ, সেখানেই সর্দারজি; সেখানেই ধাবা। আর ধাবা থাকলেই কিছু না কিছু খাবার। যে সময়ের যেমন। যাই বলিস, অনেকদিন হয়ে গেল পুরনো-মবিলে ভাজা সিঙ্গারা খাইনি। মাঝে মাঝে অখাদ্য-কুখাদ্য না খেলে ইম্যুনিটি বাড়ে না। গদাধর সূর্যমুখীর তেলের রান্না খাইয়ে খাইয়ে জিবের স্বাদই দিয়েছে খারাপ করে। পুরনো, ব্যবহৃত-মোজাতে ছাঁকা এবং কাঠের গুঁড়ো মেশানো চায়ের গুঁড়োর চা, পুরনো-মবিলে ভাজা কচুরি সিঙ্গারা এবং জিলিপি, এ সব স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে মাঝে মাঝে অবশ্যই খাওয়ার দরকার।

যা বলেছ ঋজুদা! সবসময় এই তিতিরের মতো পুতুপুতু—এখানে খাব না, ওখানে খাব না, এটা খাব না; সেটা খাব না—এদের নিয়ে বেরোনোই যায় না। সাধে কি শাস্ত্রে বলেছে, "পথি নারী বিবর্জিতা!" আমরা বাবা গরিব পাড়ার লোক। সকালে উঠে ম্যানাদার দোকান থেকে সারাদিনের পোড়া কালো বাসি তেলে ভাজা এক টাকার হাতে-গরম তেলে ভাজা খেয়ে নিই। ব্যসস—। সারাদিন আর খাওয়ার খরচাই নেই। গরিব দেশের গরিব পাড়ার এই হচ্ছে প্রধান খাদ্য। তোমরা ইংজিরিতে যাকে বল "স্টেপল ফুড"।

সেকী? তাতেই সারাদিন?

তিতির অবাক হয়ে শুধোল ভটকাইকে।

না। তারপরই জল খেতে হবে দু'গ্লাস। খেলেই পেট একেবারে ভরে যাবে, টইটম্বুর ভরে থাকবে সারাটা দিন। আই-ঢাই করবে পেরান।

সে কী? কীসে?

কেন? অম্বলে। দিশি লাইফ-সেভিং ড্রাগে ভেজাল পাবে, কিন্তু অম্বলে নয়। পিওর বেঙ্গলি অম্বলে। র‍্যানটাক, পলিক্রল, জেলুসিল এম. পি. এস, কোনও অ্যানটাসিডের বাবার সাধ্য নেই যে, সেই বিশুদ্ধ অম্বলের কাছে ট্যাঁ-ফোঁ করে।

হো হো করে হেসে উঠল, ঋজুদা।

তারপরই গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, ওখানে পৌঁছে তো কথাবার্তা বলার সুবিধে হবে না। তা ছাড়া তেমন বুঝলে, সঙ্গে সঙ্গে কাঙ্গপোকপি ছেড়ে আমাদের অ্যাবাউট টার্ন করে "মোরে" তে চলে যেতে হতে পারে। সানাহানবির কাছে বড় জাতের কুকুর কী আছে, একটু ভাল করে খোঁজ করিস তো।

বড় জাতের কুকুর মানে? অ্যালসেশিয়ান?

আমি বললাম।

তার চেয়েও বড় জাতের কুকুর আরও অনেক আছে।

যেমন?

কুকুরদের সাধারণত ছটি ভাগে ভাগ করা হয়। ধর, স্পোর্টিং ডগস, হাউন্ডস...

"দ্য হাউন্ডস অফ দ্য বাস্কারভিল", শার্লক হোমস।

ভটকাই বলে উঠল।

আঃ। শোন না।

তিতির ধমকাল, ভটকাইকে।

হাউন্ড, ওয়ার্কিং-ডগস...

মানে? চাকরি করে, ওয়ার্কিং-গার্লসদের মতো?

আঃ ভটকাই, আমি বললাম।

ওয়ার্কিং ডগস, টেরিয়ারস, টয়েজ...

টয়েজ? খেলনা? খেলনা কুকুর?

হ্যাঁরে বাবা। শোননা। এবং নন-স্পোর্টিং ডগস। এই ছয় ভাগ, ব্রডলি।

তা বড় কুকুর বলতে তুমি কী বলছ?

সবই বলছি। ধর, সেইন্ট বার্নাডস, জার্মান শেফার্ড ডগস, জায়ান্ট শ্নোজার নাম শুনেই বুঝছিস জার্মান, গ্রেট-ডেন, কুলি (রাফ), মাস্টিফ; কত কুকুর আছে! একটু নজর করবি। বুঝলি।

কেন বলছ?

সে পরে বলব।

কাঙ্গপোকপি পৌঁছে পথের উপরেই সত্যিই চমৎকার একটি ধাবা-কাম দোকান পাওয়া গেল। আস্তে গাড়ি চালিয়ে আসাতে এখন সাড়ে সাতটা বেজেছে। অবশ্য ঘাটের রাস্তা, তা ছাড়া পুরোটাই জঙ্গলের মধ্যে মধ্যেও। এমনিতেও ইচ্ছে করলেও খুব একটা জোরে চালানো যেত না। তার ওপরে ইচ্ছে করেই আস্তে চালিয়েছি। বালুসাই আর বড় বড় লুচি আর বেদম ঝাল-আলুর তরকারি খাওয়া হল। ভটকাই-এর ভাষায়, "জমিয়ে"। তিতির খেল একগ্লাস দুধ আর একটি

বালুসাই। অ্যাজ ইউজুয়াল।

আমরা যখন গাড়িতে বসেই চা খাচ্ছি, বেশি দুধে ফোটানো বেশি চিনি দেওয়া চা, হঠাৎ একটি সাদা মারুতি গাড়ি উল্টোদিক থেকে এসে খুব জোরে আমাদের পাশকাটিয়ে বেরিয়ে গেল, ইম্ফলের দিকে। ছেলেদের মতো ছোট করে ছাঁটা চুলের এক মহিলা একাই ছিলেন গাড়িতে। মনে তো হল, মহিলাই।

ভটকাই বলল, কী দিনকাল পড়ল। খিটক্যাল। না পোশাকে চেনার জো আছে, না চুলে। হাবেভাবে তো নয়ই। ভারতবর্ষও ইউনিসেক্সের দেশ হয়ে গেল র‍্যা! আমাদের সময়ের, বলেই, ঋজুদার দিকে তাকিয়ে বলল; মেয়েরা কত বিনয়ী, নম্র-সভ্য, ছিল। মেয়েদের মেয়ে বলে চিনতে পুরুষদেরও কোনও অসুবিধে ছিল না।

ঋজুদা হঠাৎ বলল, যে গাড়িটা গেল, সে গাড়ির নম্বরটা পড়তে পারলি?

না। ভটকাই বলল।

তা পারবি কেন? সবসময় এত কথা বললে কি কনসেন্ট্রেশান থাকে কোনও কিছুতেই? তুই দিনে দিনে অপদার্থ হয়ে উঠছিস। তোকে নিয়ে আর কোথাও আসব না।

ভটকাই উত্তর না দিয়ে মুখ নামিয়ে চুপ করে চা খেতে লাগল।

আমি নেমে গিয়ে পয়সা দিয়ে এলাম দোকানে। ছেলেটাকে বকশিসও দিলাম পাঁচটাকা।

ও অবাক হয়ে চেয়ে বলল, ক্যা করেগা?

তুম লেগা। হাসিতে মুখ ভরে গেল ওর।

মণিপুর আর নাগাল্যান্ডের মাঝের কাঙ্গপোকপির আশ্চর্য সুন্দর সকালের আলোও ম্লান হয়ে গেল; সেই সুন্দর হাসিতে।

মনে মনে নিজেই বললাম, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। নিঃস্বার্থভাবে মানুষের ভাল করলে, ভাল হয়ই। ওর সুন্দর হাসি আর আমার সুন্দর ভাবনাটা অন্য কেউই দেখতে বা জানতে পারল না।

ঋজুদা বলল, চল। আটটা পনেরো। এখন যাওয়া যাক আস্তে আস্তে।

দোকানেই জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলাম সানাহানবি দেবীর ফার্মের কথা। তা দোকানদার এবং আরও দু একজন ট্রাক ড্রাইভার বলল, সানাহানবি হানাহানবি নামকি কোই বাংলা হিঁয়া নেই হ্যায়। ফার্মভি নেই হ্যায়। মগর হাচিনসান সাবকো বাংলো ওর বাগিচ্যা হ্যায়। কুত্তে পালতি হ্যায় মেমসাব, বহুত কিসিমকি। সাব তো গুজর গ্যায়া। মেমসাব হ্যায়।

কত আগে পড়বে বাংলো? এখান থেকে?

জাদা সে জাদা আধা-মিল। ডায়নে পড়েগা। রাস্তা ছোড়কর থোরাসা উতারনা পড়েগা উৎরাইমে। থোরা সা। মগর, রাস্তামে সাবকো নাম লিখা হুয়া বোর্ড মিলেগি আপকো।

বহুত সুক্রিয়া।

পৌঁছে বোঝা গেল, সত্যিই দেখবার মতো বাড়িটা, মানে বাংলোটা—আর তেমনই বাগান। ইবোহাল সিং খুন না হলেও এবং সেই খুনের রহস্যের কিনারা ঋজুদা করতে না পারলেও, শুধু এই বাংলোটি দেখবার জন্যেই কাঙ্গপোকপিতে আসা সার্থক। ছাদের উপরে একটি টেরাস—তাতেও যে কতরকমের লতা ও ঝাড়, পনসাটিয়া, ফার্ন, ক্রোটন, অর্কিড; কতরকমের যে ফুল আছে এখনও অর্কিডে, গরম পেরিয়ে গেলেও! সাকুলেন্টস ও অন্য জায়গা থেকে ক্যাকটাই; টবে রাখা।

সানাহানবি দেবী পথের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। দেবী তো কতজনারই নামে থাকে! তাকে সত্যিই দেবীর মতোই দেখতে। সকালের সূর্যের আলো এসে পড়েছিল তার কোমর-ছাপানো চুলে। সুপুরুষ ইংরেজ সাহেব আর পরমা সুন্দরী নাগা মহিলার কন্যার রূপ যে কতখানি সুন্দর হতে পারে, তা যাঁরা না দেখেছেন সানাহানবিকে তা তাঁরা অনুমানও করতে পারবেন না। শুধু সানাহানবিকেও দেখার জন্যে কাঙ্গপোকপিতে যাওয়া যেতে পারে কলকাতা থেকে। তার বাংলো না দেখতে পেলেও।

সানাহানবি গাড়ি দেখেই উপর থেকে নেমে এসে পর্চ-এ রিসিভ করলেন। বললেন, আপনারা একেবারে ব্রেকফাস্টের সময়েই এসেছেন। তবে আমি খেয়ে নিয়েছি আজ তাড়াতাড়ি। একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেছে।

কী?

ঋজুদা শুধোল।

আমার এক বান্ধবী, বান্ধবী বলব না, বলব ওল্ড অ্যাকোয়েন্টেন্স—ইম্ফল থেকে কাল দুপুরে এসে পৌঁছেছিল এখানে। থাকবে বলে, তিনচার দিন। কিন্তু খুব ভোরে ফোন এল ইম্ফল থেকে—ওর বাবার কাছ থেকে, যে ওর দাদাকে কেউ মার্ডার করেছে, গত রাতে।

মাই গুডনেস! কোথায়? কী ভাবে?

কীভাবে হয়েছে তা তো এখনও ডিটেইলস-এ জানা যায়নি। তবে, হয়েছে মোরেতে নয়, থেংনোপালে। উঁচু পাহাড়ের জংলি রাস্তাতে। বেচারি! পাগলের মতো অবস্থা। জোর করে কিছু খাইয়ে দিলাম। সারা দিনে খাওয়া হয় না হয়। খেয়েই, ঝড়ের মতো গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

ওঁর বাবা কী করেন?

তিতির শুধোল।

ওঁর বাবার নানারকম ব্যবসা আছে। নাম থাঙ্গজম সিং। ভেরি ওয়েল-অফ্‌ফ। ইম্ফলে সকলেই এক ডাকে চেনেন।

ওঁর টাটা-সিয়েরা গাড়িটা নিয়েই কি আপনারা আমাদের রিসিভ করতে ইম্ফল এয়ার-পোর্টে এসেছিলেন?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

অপ্রতিভ হয়ে গেল, অত্যন্ত সপ্রতিভ সানাহানবি। ঢোঁক গিলে বলল, হ্যাঁ।

বলেই বলল, আপনি কী করে জানলেন? খুবই আশ্চর্য তো! তা ছাড়া আপনাদের আসার ব্যাপারে আমার কোনও ভূমিকা নেই। নেহাত আমার সৎবাবার সম্মানার্থে...। গাড়িটা বাবাই চেয়েছিলেন থাঙ্গজম সিং সাহেবের কাছ থেকে। তা ছাড়া বাবাকে কেউ পাঠিয়েছিল আপনাকে আনতে। সে যে কে, তা বাবা আমাকে কিছুতেই বললেন না। আপনাদের একহাজার টাকাও ফিস দিতে পারবেন না উনি, সে সামর্থ্য ওঁর নেই। তাই, আপনাদের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারটা বাবার সম্মানরক্ষার্থেই আমি আমার দায়িত্ব বলে কাঁধে তুলে নিয়েছি।

আমি তো গোয়েন্দা। আমাকে অনেক কিছুই জানতে হয়, যা অন্যে জানে না। এটা আমার এক্সপার্টিস-এর অঙ্গ।

আপনার বন্ধু না অ্যাকোয়েন্টেসের নাম নিশ্চয়ই থৈবী দেবী। তাই না?

ভেরী স্ট্রেঞ্জ! আপনি তাও জানেন?

আরও অপ্রতিভ হয়ে বলল, সানাহানবি।

সাদা মারুতি-ডিলাক্স এখুনি চালিয়ে গেলেন। উনিই তো! কিন্তু আপনার বন্ধু, সরি অ্যাকোয়েন্টেসের সঙ্গে একজন কাউকে দিয়ে দিলেন না কেন? এই রকম মানসিক অবস্থাতে এতখানি পাহাড় জঙ্গলের পথে একা গাড়ি চালিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?

ঠিক বলেছেন আপনি, মিস্টার বোস। আমি অনেক করে বলেওছিলাম। কিছুতেই রাজি হলো না থৈবী। দ্যাট ওজ ভেরি স্ট্রেঞ্জ। কেন যে অত জেদ করল। আমার মাইনে করা ড্রাইভার নেই বটে, কিন্তু আমার লোকজনের মধ্যে দুজন আছে, যাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে এবং আমার বাবার আমল থেকেই গাড়ি চালায়, ভালই চালায়।

থৈবীর দাদার নাম কী?

ইবোবা সিং।

উনি কি থাঙ্গজম সিং-এর ব্যবসার পার্টনার?

হ্যাঁ। একই ছেলে তো।

আর থৈবী দেবী?

হ্যাঁ, থৈবীও পার্টনার। যদিও থৈবী একবছরের ছোট ইবোবা সিং-এর থেকে। তবু থৈবীই আগে পার্টনার হয়েছে। তবে ইবোবা পার্টনার হওয়ার পর থৈবীর অংশ থেকেই অর্ধেক ইবোকাকে দিয়েছেন, ওঁর বাবা। থাঙ্গজম সিং মানুষটি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। মণিপুরের মাতৃতান্ত্রিক পরিবেশে উনি একা হাতেই পিতৃতন্ত্র কায়েম করার চেষ্টাতে আছেন। মানুষটির সঙ্গে আমার অনেক ব্যাপারে অমিল থাকলেও ভদ্রলোক যে সেল্‌ফ-মেড ও ভাবনা চিন্তাতে ওরিজিনাল এ জন্যে আমি ওঁকে এক ধরনের শ্রদ্ধাও করি। জানি না, শব্দটা শ্রদ্ধাই কিনা। আমার

ভোক্যাব্যুলারি খুব পুওর। ভদ্রলোকের বন্ধুবান্ধবও বিশেষ নেই। একাই সময় কাটান। শুধু কাজ নিয়েই থাকেন। টাকা আরও টাকা। এই তাঁর সাধনা।

ভদ্রলোকের মধ্যে একটি মাফিয়া-মাফিয়া ভাব আছে বলে হয় না আপনার?

ঋজুদা বলল।

এগজ্যাক্টলি। আশ্চর্য! আপনি কী করে জানলেন? এই শব্দটা আমার মনে এসেছে বহুবার, কিন্তু প্রকাশ করার সাহস হয়নি। আমার কেন জানি না, একটু শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা ভাব থাকলেও ভয়ও করে ভদ্রলোককে। এড়িয়ে চলি। যতদূর পারা যায়।

ইবোবা সিং-এর বিয়ে তো হয়েছে! ওর স্ত্রী যমুনা, মেয়ে কী রকম?

যমুনা? আপনি তাকেও চেনেন? মাই গুডনেস! ও, শি ইজ আ ভেরি সুইট গার্ল। পুওর গার্ল।

হোয়াই পুওর?

বেচারি ওই পরিবারের পরিবেশে একেবারেই বেমানান। ও তো মিজো। শিক্ষিত মেয়ে। ওর মা মারা যান, ওর খুবই ছেলেবেলাতে। ও মামার বাড়িতেই মানুষ-গৌহাটিতে—। কটন কলেজে পড়ত। কিন্তু বাবা মিজোরামেই থাকতেন। আর্মির কর্নেল ছিলেন। হি টুক টু ড্রিংকস। মদে খেল তাঁকে। এখন প্যারালিসিস হয়ে পড়ে আছেন। যমুনার এক মামা ছিলেন ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে। বলতে গেলে সেই মামাই গার্জেন। এবং, মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত সৎ ছিলেন। যমুনার ওপর তার মামার বাড়ির প্রভাব পড়েছিল। আর, সেজন্যই মনে হয় যমুনা এত ভাল মেয়ে হয়েছিল। যমুনার সেই মামা যখন কিছুদিনের জন্যে ইম্ফলে পোস্টেড হন, তখন থাঙ্গজম সিং প্রায় জবরদস্তি করেই এই বিয়েটা দেন। ইবোবা ছেলে খারাপ নয়। ও ওর মায়ের মতো হয়েছে। উদার মনের। দয়ালু। কর্মচারীদের বেশি মাইনে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। এই সব কারণেই বাবার সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকত বেচারির। যমুনার সবসময়েই মনে অশান্তি ছিল, এই কারণে। এখন তা আরও বাড়ল।

ঋজুদা চওড়া বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে পাইপ ধরাল।

আপনাদের জন্যে ব্রেকফাস্টে কী বানাতে বলব, বলুন।

সানাহানবি বলল।

ভটকাই বলল, ব্রেকফাস্ট আমরা খেয়ে এসেছি।

তা বললে কি হয়! আমার ডিপ ফ্রিজে খুব ভাল সসেজ, সালামি, বেকন এবং হ্যাম আছে। কাঙ্গপোকপির রোড আইল্যান্ড মুরগির ডিমের সঙ্গে খেয়ে দেখুন। সারা দিনে আর লাঞ্চ করতে হবে না।

ঋজুদা বলল, দ্যাটস নট আ ব্যাড আইডিয়া। আমার অন্তত, লাঞ্চ করার সময়ও আজ হবে না হয়তো।

ফাইন। সানাহানবি বলল।

তারপর বলল, ডিম, কার কীরকম হবে বলুন, প্লিজ।

বলেই, কাকে যেন ডাকল, কুলা সিং।

সুন্দর সাদা উর্দিপরা বাবুর্চি এসে দাঁড়াল। সাদা চুল, কিন্তু দাড়ি গোঁফ নেই। বোঝা গেল, হাচিনসন সাহেবের আমলের লোক।

ঋজুদা বলল, আমার ওয়াটার-পোচ।

আমি বললাম, বয়েলড; আন্ডারডান।

ভটকাই বলল, মামলেট, বলেই বলল, সরি, ওমলেট।

তিতির বলল, আমার জন্যে স্ক্র্যাম্বলড্।

একটা বড় ওমলেটও করতে বলি। কুলা সিং দারুণ ওমলেট করে, টোম্যাটো, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, আনারস, বাতাবি লেবু, চিজ আর মাশরুম মিশিয়ে। নাগাল্যান্ডের মাশরুম। আমি মাশরুমের চাষও শুরু করেছি। নিও-রিচদের মধ্যে ভাল কুকুরের চাহিদা নেই। আর এখন অধিকাংশ বড়লোকই তো তাই। সালুকি অথবা হুইপেট বা কুভাজস বা ড্যান্ডি ডিনমন্ট টেরিয়ার বা ভিজ্‌সলা বা বরজোই-এর নামই শোনেনি এরা কেউ। "টয়ের" মধ্যেও খালি পিকিঙ্গিজ, বা শিউয়াহুয়ার বা পমেনারিয়ানের নাম জানে, কিন্তু, মালটিজ, জ্যাপানিজ, চিন, বা আফেনস্পিনসারের নাম শুনলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এখন যদি কাউকে চাওচাও বা লাসা-আপসোর কথা বলি, তো ভাবে, মঙ্গল গ্রহের জীবের নাম বলছি। না; সব ব্যবসারই একটা টার্নিং-পয়েন্ট থাকে। আমি ফুলের, অর্কিডের আর মাশরুমের ব্যবসাতেই চলে যাব। কুকুরের ব্যবসা আর চলবে না। সালুকির দাম এরা কী বুঝবে, বলুন?

ওরে বাবা! নাম শুনেই তো খিদে বেড়ে গেল। বানাতে বলুন ওমলেট। আর আমার বেকনটা একেবারে ক্রিসপ্ হবে। কুড়মুড়ে।

ভটকাই বলল।

হাউ নাইস অফ য়্যু। য়ু আর আ ডার্লিং। প্লিজ ট্রিট মাই হাউজ অ্যাজ ইওর ওন।

সানাহানবি বলল।

তিতির আর আমি ভর্ৎসনার চোখে তাকালাম ভটকাই-এর দিকে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

সানাহানবি বলল, কুকুরের ব্যবসা আর করব না ঠিক করেছি, কারণ, আমার টাইগারই মরে গেল! কিছুতেই বাঁচাতে পারলাম না। ইম্ফল থেকে ভেটকে এনেছিলাম। তার আগে কোহিমাতেও দেখিয়ে ছিলাম। এক্স-রে টা করা গেল না, এইটেই দুঃখ রয়ে গেল।

কেন করা গেল না?

যেদিন নিয়ে যাই, সেদিন ইম্ফলের ভেট্-এর মেশিনটা কাজ করছিল না। ভেবেছিলাম, পরের রবিবার নিয়ে যাব কিন্তু পরের রবিবারের আগেই যে সে মরে যাবে, জানব কী করে?

অসুবিধে কী ছিল?

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছিল। গিলতেই পারছিল না কিছু প্রথম কদিন। তারপর গিলতে পারলেও খেতে চাইছিল না। পনেরো দিনের মধ্যে যে কুকুরটা মারা যাবে, কী করে জানব। ও ছিল আমার সঙ্গী। আমার ভাঙ্গা পুরনো অ্যামবাসাডার গাড়িতে করে যে পাহাড়ে-জঙ্গলে হুট হাট করে ইম্ফল মোরে কোহিমা বা ডিমাপুরে বা মোকক্‌চুং চলে যেতাম, সে তো ওদেরই ভরসাতে। পেছনে ওরা থাকলে কেউ ভয়ে আমার দিকে তাকাতই না। গাড়ির কাছেই আসত না।

কী কুকুর? তিতির শুধোল।

গ্রেট-ডেন।

ছবি দেখবেন? আসুন ড্রইংরুমে।

ওরা ড্রইং রুমে ঢুকে দেখল সত্যিই! টাইগার যেমন নাম, তেমনি বাঘই! তার পাশে সানাহানবি দাঁড়িয়ে। ফেডেড জিনস আর হলুদ ফ্রেড-পেরি গেঞ্জি গায়ে। বয়স আরও অনেক কম ছিল।

আসুন! দেখাই, কোথায় কবর দিয়েছি ওকে।

সবাই মিলে কয়েকটি করে সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের গায়ে গায়ে নামলাম আমরা কিছুটা। অন্যান্য পাহাড়েরই মতো এখানে টেরাসিং-কালটিভেশান বা গার্ডেনিং হয়। দেখলাম, একটা মস্ত বটলব্রাশ গাছের গোড়াতে মাটি তখনও আলগা আছে। তার পাশে একটা ঝাঁকড়া চেরি গাছ, অন্য পাশে একটা মস্ত কদম।

সানাহানবি বললেন, মার্বল-ট্যাব বানাতে দিয়েছি। এলেই, বাঁধিয়ে লাগাব। মাই টাইগার স্লিপস হিয়ার। আসলে ট্যাবটা আজই এসে যাবে কোহিমা থেকে। আনিয়েই বাঁধাব ভেবেছিলাম কবরটা, কিন্তু থৈবী চলে যাবার আগে বারবার মানা করে গেল। বলল, ওও থাকতে চায় ট্যাব বসাবার সময়ে। ও ফিরে আসা অবধি যেন না বাঁধাই গ্রেভটা বা ট্যাবটা না বসাই।

কেন?

ঋজুদা অন্যমনস্ক গলাতে বলল, পাইপ কামড়াতে কামড়াতে।

ঠিক বুঝলাম না। ওও টাইগারকে খুবই ভালবাসত। আঙ্কল ইবোহালের মৃত্যুর দুদিন আগে, আমি ওঁর বাড়িতে গেছিলাম, মোরেতে। থৈবী গেছিল আমার সঙ্গে। টাইগারও গেছিল সঙ্গে। আমি কাউকেই খাওয়াতে দিই না টাইগারকে। নিজে হাতেই খাওয়াই কিন্তু বার্মার তামু থেকে ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গেল সেদিন...

থৈবী যায়নি আপনার সঙ্গে? বার্মার তামুতে?

না। আচ্চাও সিং-এর সঙ্গে গেছিলাম। আপনি আচ্চাও সিং-এর কথা কী জানেন? আঙ্কল ইবোহাল-এর মৃত্যুর পর থেকে সেও নিখোঁজ, কেউ মার্ডার করল নাতো! বড় চিন্তা হয় আমার, ওর জন্যে।

আচ্চাও সিং-এর কথা শুনেছি। আপনার দুর্ভাবনা অমূলক নয়।

থৈবী বলেছিল, টেক-ইওর টাইম। হাঞ্জো আছে, আমি আছি, আমরা টাইগারকে খাওয়াব।

হাঞ্জো কে?

হাঞ্জো সিং। মাসলম্যান। থৈবীর বাবার বডি-গার্ড। অনেকসময় থৈবীর সঙ্গেও থাকে। কোমরে রিভলভার নিয়ে। বড়লোকদের সঙ্গে অনেকসময়েই মোটা টাকা থাকে তো—ব্যবসার জন্যে। ব্যবসার তো নানারকম হয়!

মোরে থেকে আমি ফিরে আসার পরই লক্ষ করলাম যে টাইগার যেন কেমন করছে। নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। কিছু খেতে চাইছে না। ক্রমশ দুর্বল—

কে খাইয়েছিল, টাইগারকে?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

হাঞ্জো কোথাও গেছিল কাজে। থৈবীও আঙ্কল ইবোহালের কাছে আটকে পড়েছিল। তবে খাওয়ানো হয়েছিল, ঠিক সময়েই।

কেউ বিষটিষ খাওয়ায়নি তো!

তিতির বলল।

নানা। সে সব টেস্ট তো করিয়েছি। কোহিমাতে গেছিলাম। কিন্তু ভেট সে দিন ডিমপুরে গেছিলেন। যেদিন রাতে মারা গেল সেদিনই সন্ধেবেলা ইম্ফল থেকে অন্য ভেটকে নিয়ে থৈবী নিজে এল। ভেট, দেখে বললেন, আর কিছু করার সময় নেই। আমিও বুঝতে পারিনি, যে সবকিছু, দিন-পনেরোর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

ভেট কী বললেন? রোগটা কী?

উনি তো বললেন, দুটি রোগে একসঙ্গে আক্রান্ত হয়েছে, টাইগার।

কী? কী?

আপনি কি বললে বুঝবেন?

সানাহানবি বলল, ঋজুদাকে।

ভেট-এর মতো নয়, কিন্তু আপনি যেমন কুকুর ভালবাসেন আমিও একসময়ে—এই রুদ্র জানে সে কথা। তখন কুকুরদের অসুখ-বিসুখ নিয়ে কিছু পড়াশুনো করতে হয়েছিল। কারণ, আমি থাকতাম ওড়িশার গভীর জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে ভেটারানারি ডাক্তার পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। বড় শহরের দূরত্ব ছিল অনেকই।

ও আই সি! তা ভেট বললেন, ইনফেকশাস পাপিলোমাটোসিস-এ আক্রান্ত হয়েছে টাইগার। তা ছাড়া উনি সন্দেহ করেছিলেন, টাইগারের গলাতে একটা টিউমার হয়েছে। সম্ভবত, ম্যালিগনান্ট। এবং মোরেতে খাওয়ার পর থেকেই যে অস্বস্তি, সেটা নেহাতই কো-ইনসিডেন্টাল। রোগটা আগেই হয়েছিল। সেইদিন দুপুর থেকেই অ্যাগ্রাভেটেড হয়েছিল। এরকম হয়, অনেকসময়।

বায়োপ্‌সি কি করা হয়েছিল?

না, সেও আর হল কই!

ডাক্তারের নাম ঠিকানাটা আমাকে দেবেন?

হ্যাঁ। কার্ডটাই দিয়ে দিচ্ছি। তাঁর চেম্বার, ইম্ফলের পাওনা-বাজারে থাকেন মইরাঙ্গখম-এ।

আমি বরাবর কোহিমার ভেটকেই দেখাই। কিন্তু অ্যাজ ব্যাডলাক উড হ্যাভ ইট, ডিমাপুরে গিয়ে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। এখনও উনি ওখানের নার্সিংহোমেই আছেন। ফোনেও কথা বলতে পারেন ইচ্ছে করলে। ইম্ফলের ভেট-এর সঙ্গে।

টাইগারকে তো আর পাওয়া যাবে না। মিছিমিছি এখন ব্রেকফাস্টটা নষ্ট কেন করি! ব্রেকফাস্টের পরে তো আমি চলেই যাব। আজকালের মধ্যে দেখাই করে নেব, ওঁর সঙ্গে। ডিটেইলস-এ আলোচনা করে নেব। টাইগার যখন এতই প্রিয় ছিল আপনার।

এই কথাতে সানাহানবির দুচোখ জলে ভরে এল।

কুকুর পোষা ছেড়ে দিয়েছি এইজন্যেই। ঈশ্বরের উচিত ছিল কুকুরকে হাতি অথবা তিমি মাছের আয়ু দেওয়া, যাতে একাধিক মালিককে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে তবেই নিজেরা যায়, পরপারে।

ঋজুদা বলল।

ফিরে এসে, ডাইনিং রুমের দারুণ ঝকঝকে বাদামি-লালচে রঙা মেহগিনি কাঠের ডাইনিং-টেবিলে বসে মণিপুরি ম্যাটের উপরে বোন-চায়নার প্লেটে স্বাদু ডিম এবং ওমলেট, হ্যাম আর বেকন দিয়ে কড়া টোস্টের সঙ্গে খেতে খেতে, আমরা আরও অনেক কথা বলছিলাম।

ঋজুদা আমাদের বলল, তিতির আর রুদ্র এখানেই থেকে যা বরং, দু একদিন। সানাহানবিকে কম্পানি দে। আমি আর ভটকাই ফিরে আসব, কাল পরশুর মধ্যেই।

আমি বুঝলাম, আমাদের থাকাটা নিছক বেড়াবার বা সানাহানবিকে কম্পানি দেবার জন্যেই নয়, এর পেছনে গূঢ় কারণ আছে।

দুবার করে ব্রেকফাস্টের পরে, আমরা যখন চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছি, তখন সানাহানবি বলল, আপনারা আমার কেনেল দেখলেন না? যা দেখতে আসা।

ঋজুদা বলল, আমার একটু তাড়া আছে। আমি ফিরে এসে দেখব। তিতির আর রুদ্রকে রেখে গেলাম। আপনার স্পেয়ার বেডরুম আছে তো?

স্পেয়ার বেডরুম? আমার বাড়িতে ছ'টি বেডরুম। আগেই তো বলেছি। বাবার বন্ধুরা আসতেন শিকারে, কত কত জায়গা থেকে। আসামের চা বাগানের প্ল্যান্টার্সরা, কলকাতার ও ব্যাঙ্গালোরের রেসিং-ক্রাউড, কোহিমা ও ইম্ফল, আইজল, তুরার; শিলঙের বন্ধুরা। তখন কুড়িটি ল্যাব্রাডর গান-ডগ ছিল আমাদের। দশটি গোল্ডেন-রিট্রিভার—। শিকার কুড়িয়ে আনার জন্যে। এই সেদিনও, কাঙ্গপোকপির বড় রাস্তার উপরে নাগা ও কুকিরা বসে ভেনিসন বিক্রি করত। বাঁশের উপর পেছনের দু পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত। যে যেখান থেকে চাইত,

কেটে দিত। পৃথিবীটাই অন্যরকম ছিল ক'বছর আগেও। চোখের সামনে সব কেমন বদলে গেল। ভাবা যায় না। জঙ্গলই সাফ হয়ে গেল।

আমরা ফিরে আসি, জমিয়ে আড্ডা দেব আর তখনই শুনব হাচিনসন সাহেবের পুরনো দিনের সেইসব কথা।

আমি আর তিতির ঋজুদা আর ভটকাইকে মারুতি ভ্যান অবধি পৌঁছে দিতে এগিয়ে গেলাম। সানাহানবি গেল তার ফার্মের তদারকিতে। বলে গেল যে, টাইগারের গ্রেভ-ইয়ার্ডের পাশ দিয়ে আরও উৎরাইতে নেমে গেলেও ওকে খুঁজে পাব আমরা।

ঋজুদা বলল, সাবধানে থাকিস। আর মেয়েটার উপরে নজর রাখিস।

নজর রাখিস মানে?

মানে, ও কী করে না করে। ওর কাছে কে আসে না আসে। কোনেও ও কারও সঙ্গে কথা বলে কি না বলে। তা ছাড়া...

তা ছাড়া কী ঋজুদা? তিতির শুধোল।

তা ছাড়া মেয়েটাকে পাহারাও দিস। ওরও বিপদ হতে পারে। আরেকটা কথা। সারা রাত টাইগারের কবরের দিকে নজর রাখবি। ওখানে কোনও ঘটনা ঘটতে পারে। ওই কবরের কাছে যেই আসুক তাকে আটকাবি—। কিন্তু সানাহানবি নিজে গেলে না আটকে, ও কী করে তা দেখবি। অন্য কেউ গেলে, সানাহানবিকে জাগিয়ে দিয়ে, সকলে মিলে সেখানে যাবি।

কে আসবে টাইগারের কবরে? কেন আসবে?

আরেঃ। যা বলছি শোন না! কেউ নাও আসতে পারে আদৌ। কেন আসবে, তা আমি নিজেও জানি না। এখন আমাকে দেরি না করিয়ে, যা বলছি; তা করিস।

গাড়িতে উঠে এবারে ঋজুদা ড্রাইভিং-সিটে বসল। বলল, ভটকাই এবারে ফিরে গিয়ে গাড়ি চালানোটা ভাল করে শিখে নিতে হবে কিন্তু। সাইকেল চালাতে ও সাঁতার কাটতে জানিস তো?

জানি না? ডুব সাঁতার, চিৎ সাঁতার, বাটারফ্লাই-স্ট্রোক, ফ্রি-স্টাইল যা বলবে।

তারপরই বলল, ঋজুদা, ভেনিসন কী? ওই সানাহানবি যা বলল?

ওঃ, তুই জানিস না বুঝি? ভেনিসন মানে হচ্ছে, হরিণ জাতীয় প্রাণীর মাংস। আগে ভেনিসন বলতে শিকার করা মাংসকেই বোঝাত। এখনও ভেনিসন, ইংল্যান্ডের ও আমেরিকার সব বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায়।

দশ কিমির মতোও যায়নি ওরা, এমন সময় দেখা গেল, সেই টাটা-সিয়েরাটা আসছে। তবে গাড়ি চালাচ্ছে অন্য একজন ড্রাইভার। পাশে বসে আছে, যোগেন কুণ্ডু।

পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময়ে, যোগেন ড্রাইভার হাত-পা ছুঁড়ে একটা আর্তনাদ করে উঠল এবং ওদের গাড়িও জোরে ব্রেক করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঋজুদাও দাঁড় করাল মারুতি ভ্যান। টাটা-সিয়েরাটা ব্যাক করে এল এ-গাড়ির

পাশে।

যোগেন বলল, বড়বাবু, মানে আমার সাহেব আপনেরে ধইর‍্যা লইয়া যাইতে পাঠাইলেন। ও বাংলোয় না পাইয়া আপনাগো খুঁজে বাইরাইছি। আপনারা আইতেছেন কোথ্বনে?

যোগেনের কথার জবাব না দিয়ে ঋজুদা বলল, বড়বাবু মানে?

বড়বাবু মানে, থাঙ্গজম সিং সাহেব।

সেকী! তোমার মালিক তো থম্বি সিং বলেই জানতাম।

নানা। তিনি ফস-স্-স্-স্। তিনি মালিক হইতে যাইবেন কীসের লইগ্যা? বড়বাবুর একমাত্র ছাওয়াল ইবোবা সিং, কাল রাতে মার্ডার হইয়া গ্যাছে গিয়া। সেই খুনের তদন্তর ভার দ্যাওনের লইগ্যা বড়বাবু পাঠাইছেন আমারে। নইলে আমার আর কি আসার অবস্থা আছে বাবু? হায়। হায়। ভটকাবাবু যা খাওয়া কাল খাওয়াইলেন! পেরাণে যে বাঁইচ্যা আছি, তাই ঢের। আমার বউডায়তো গড়াগড়ি দিতাছে। এই ড্রাইভার আপনাগো চিনে না বইল্যাই কুনোক্রমে পাশে বইস্যা আইছি। তা ছাড়া, মার্ডার বইল্যা কথা। হায়। হায়। এ কী হইল কন দেহি? আমরা গাড়ি ঘুরাইয়া লইয়া আগে আগে যাইতাছি, আপনে আসেন আমাগো পিছে পিছে।

শোনো ভাই যোগেন। আমি সোজা যাচ্ছি থেংনোপালের দিকে। তুমি গিয়ে তোমার বড়বাবুকে সেখানেই আসতে বলো।

বডি তো পোস্টমর্টেমের লইগ্যা ইম্ফলেই লইয়া আইছে পুলিশে।

যোগেন বলল।

মর্গটা কোথায়?

আসেন না পিছে পিছে, চিনাইয়া দিতাছি। আমরাও তো যাইতাছি মর্গেই।

আমরা পরে আসব। এখন আমার একবার "মোরেতে" যেতেই হবে। থেংনোপাল হয়েই তো যাব। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরেই, তোমার বাবুর বাড়িতে পৌঁছব সোজা। আর যদি দেরি হয়ে যায় তো কাল সকালে যাব।

বাড়ি কি আপনি চিনেন? আজই আইয়্যা যান। দাহটাহ হইতে সময়তো লাগব। তার শ্বশুর আইব না আইজল থিক্যা। তার তো আবার প্যারালিছিস। আইব ক্যামনে? পোস্ট মর্টেমও কত সময় লাগব, কে জানে!

হ্যাঁ। বাড়ি আমি চিনি। তোমাদের দিদিমণি ফিরেছেন?

দিদিমণিরেও চিনেন না কি আপনি? ইতো ম্যাজিক দেখতাছি। সানাহানবি দেবী নন কিন্তুক...

হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। থৈবী দেবী। তিনি কোথায়?

তিনি তো সোজা থেংনোপালেই চইল্যা যাইতেছিলেন। ইম্ফলের পেট্রল পাম্প থিকা বড়বাবুরে একখান ফোন কইর‍্যা দিয়া।

বড়বাবু কোথায়?

উনি আছেন বাড়িতেই। পাথর হইয়া গেছেন গিয়া বাবু। এক্কেরে পাথর। হায়।

হায়। একখান মাত্র পোলা আছিল।

ঠিক আছে। আমরা ঘুরে আসছি।

ঋজুদা জোরে একসিলেটরে চাপ দিল এবারে। যেখানে রাতে থাকা হয়েছিল সেই "দ্য রিট্রিট" বাংলোটার একদিকে কাঙ্গপোকপি, কোহিমা; আর অন্য দিকে "মোরে"। মধ্যে ইম্ফল। তবে মোরে যেতে হলে ইম্ফল পেরিয়ে প্রায় তিরিশ কি.মি গিয়া লাংথাবাল পড়বে। লাংথাবালের পরে ওয়াইথু। তারপর থৌবল, প্যালেল। প্যালেল ইন্ডিয়ান আর্মির শেষ চেক-পোস্ট। প্যালেলের পরে থেংনোপাল। ছ' হাজার ফিটের বেশি উঁচু। থেংনোপালের পরে লোকাচো আর লোকাচোর পরেই মোরে। মোরের ওপাশে নো-ম্যানস ল্যান্ড আর তামুরও এপাশে। দুই দেশের মধ্যে পাঁচ কি.মি. নো-ম্যান্স ল্যান্ড। মধ্যে দিয়ে একটি ছিপছিপে নদী বইছে ঘন সেগুনবনের মধ্যে দিয়ে। চিন্দউইন নদীর একটি শাখা নদী। ওই অঞ্চলের মানুষেরা বলে বার্মা নদী। বার্মার তামু থেকে মান্দালয় দেড়শো কিমি মতন।

অনেকক্ষণ একটানা বলে থামল ঋজুদা।

থেংনোপাল জায়গাটা ভারী সুন্দর। কিন্তু খুন হওয়া লাশ দেখতে গেলে সৌন্দর্য দেখার মন আর থাকে না। রাস্তার উপরে আরও কয়েকজন উৎসাহী ভ্যাগাবন্ড দাঁড়িয়ে-বসে কাল রাতের খুন নিয়ে আলোচনা করছে। গাড়িটা রাখা আছে রাস্তার পাশে। লক-করা। লাশ নিয়ে গেছে মর্গ-এ। গাড়িটার পাশে চারজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের হাতে লাঠি। দুজনের হাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের ম্যাগাজিন রাইফেল।

ওরা যেন কিছু জানে না এমনি করে, কীসের ভিড় হে? বলে, গাড়ি থামিয়ে নামল।

ভিড় হয়েছে, ও হচ্ছে বলে, পথপাশের বড় বড় দুটি গাছতলাতে পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান ও আনারস আর বাতাবি লেবু নিয়ে বসে গেছে দুটি মেয়ে—। পথচারী মানুষ ও গাড়ির যাত্রীদের জন্যে।

গাড়িটার চারদিকে একবার ঘুরে এসে ঋজুদা বলল, চল ভটকাই, "মোরে" যাই।

কাঙ্গপোকপি থেকে লোকাচো হয়ে, মোরে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দুটো হয়ে গেল। খুব জোরে চালালেও প্রায় অচেনা জায়গার পাহাড়ি পথ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সময় লাগেই। তা ছাড়া, শেষ সেই কবে এসেছে!

সোজা থানাতে গিয়েই উঠল ঋজুদা। থানায় ঢুকে নিজের আইডেনটিটি কার্ডটা দেখাল। থানার ও. সি হাসলেন। বললেন, এ সব এখানে মান্য নয়। তখন ঋজুদা বলল, হোম সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলব। লাইন লাগিয়ে দিন।

প্রথমে বিশ্বাস করলেন না অফিসার।

ঋজুদা তখন বললেন, ডি. জি'র সঙ্গে কথা বলব।

তাতে অফিসার নরম হয়ে বললেন, কী চান আপনি?

আমি ইবোহাল সিং-এর বাংলোটা ঘুরে দেখতে চাই। কোন ঘরে খুন হয়েছিলেন? আপনাদের ডিটেকটিভ ডির্পাটমেন্টের ফাইন্ডিংস কী? কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কি?

চলুন দেখিয়ে আনছি। যা জানি, বলছিও।

থানার ও.সি. এবং ছ'জন পুলিশ চললেন, ওদের জিপ নিয়ে।

মোরের বাংলোটা "দ্যা রিট্রিট"-এর চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু কমপ্যাক্ট। ছোট বাগান। চওড়া বারান্দা তিনদিকে। বাংলোটা একটা টিলার উপরে। বাড়ি বলতে স্টাডিটাই আসল। প্রায় হাজার স্কোয়ার ফিটের মতন—ডুপ্লে—উপরেও আরও হাজার ফিট। এরকম বাড়ি দেখেনি ঋজুদাও আগে। আর মেজেনিন ফ্লোরে বেডরুম। একটাই বেডরুম। স্টাডির একতলাতে থ্রি-টিয়ার-স্লিপারের মতন দুটি বাঙ্ক করা আছে। অতিথি এলে বোধহয় শোন রাতে। ব্যবস্থা দেখে, কোনও অপরিচিত অতিথি এখানে আসতেন বলে মনে হয় না। এককোণে ডানলোপিলোর গদি থাক করে রাখা আছে। ওই বাঙ্কের উপর গদি বিছিয়ে দেওয়া হয়। ডাইনিংরুমটা, মেজিনিন ফ্লোরের অন্য দিকে, তার সঙ্গেই কিচেন—। কিচেনেরই পেছনে একটা স্পাইরাল সিঁড়ি, যা দিয়ে বেয়ারা-বাবুর্চিরা যাতায়াত করে বাংলোতে, তাদের কোয়ার্টার থেকে। তাদের কোয়ার্টার, মেইন গেট-এর দুপাশে। যে খুন করেছে ইবোহাল সিংকে সে সম্ভবত ওই স্পাইরাল সিঁড়ি দিয়েই উঠে এসেছে। তখন বাবুর্চি বেয়ারারা হয়তো ছিলও না কেউ। ওই ঢোকার পথটি সম্ভবত বাবুর্চি বেয়ারারা বাইরে থেকেই বন্ধ করত। চাবি হয়তো তাদের কারও কাছেই থাকত। খুনি, তার মানে, এই বাংলোর সবকিছুই জানত। আঁটঘাট। এখানে যাতায়াত ছিল নিয়মিত। বাবুর্চি বেয়ারাদের সঙ্গে সাঁটও হতে পারে। পাছে তার জুতোর বা পায়ের ছাপ পড়ে মেঝেতে, সেইজন্য ইবোহাল সিং সাহেবেরই ডাকব্যাকের "ওভার-শু্য"টি গলিয়ে নিয়েছিল, নিজের জুতোর উপরে। তার মানে, সে এও জানত যে, শু-র‍্যাকটি কোথায়? রাবারের "ওভার-শু"টি কোথায় রাখা থাকত? রাত তখন বারোটা হবে। ইবোহাল সিং তখন টেবিলে বসে পড়ছিলেন। নয়তো, চিঠি লিখছিলেন। তাঁর টেবিলের পেছনেই ছিল বিরাট খোলা জানালা। এবং ওইদিকে.বারান্দা ছিল না। জানালার প্রায় পনেরো ফিট নীচে বাগান এবং লন। খুনি, সাহেবের পেছনে, যে টিল্টিং চেয়ারটা আছে; সেটা পুরো হেলানোর পরও যে তিনচার ফিট জায়গা ছিল জানালা আর চেয়ারের মধ্যে, সেখানে দাঁড়িয়েই সিং সাহেবের গলাতে নাইলনের দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিয়ে, নিজে সেই দড়ির অন্যপ্রান্ত ধরে গরাদহীন জানালা দিয়ে ঝুলে পড়ে। তারপর লাফিয়ে নামে বাগানে। দড়ির উপরে নিজের শরীরের ভার পুরোটাই ততক্ষণই দিয়ে রাখে যতক্ষণ না ইবোহাল সিং-এর প্রাণ নিশ্চিতই না বেরোয়। প্রাণ বেরোবার আগে তিনি দমবন্ধ হওয়াতে হাত-পা ছোঁড়েন। কিন্তু দুটি পাই টেবিলের তলাতে থাকাতে বের করতে পারেননি। হাতের ঝটকানিতে বাঁ

পাশে-রাখা লাইটটা শব্দ করে মাটিতে পড়ে যায়। তাঁর বেডরুমের বারান্দাতে শুয়ে-থাকা চল্লিশ বছরের পুরনো বার্মিজ বেয়ারা, সেই শব্দ শুনে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। বুঝতে পারে না কী হল! পরক্ষণেই, যখন দৌড়ে আসে স্টাডিতে, ততক্ষণে উনি মারা গেছেন। গলার ফাঁসটা পরানোই ছিল। দড়ির অপরপ্রান্ত ঝুলছিল জানালা দিয়ে। বাগানে লুটিয়েছিল। একটা বাঁশের মই, কাঁচা-বাঁশ কেটে বানানো, লাগানো ছিল বাগানের দেওয়ালে। সেই মই বেয়েই শর্টেস্ট ডিসস্ট্যান্সের মধ্যে বাংলোর কম্পাউন্ডের ওপারে পৌঁছে যায় খুনি। স্টাডি থেকে তার বাগানে লাফিয়ে পড়া, মই দিয়ে ওঠা এবং ওপাশে রাস্তাতে লাফিয়ে পড়ার চিহ্ন স্পষ্ট ছিল ভেজা মাটিতে। কারণ, বছরে এই সময়ে এ-অঞ্চলে প্রায় রোজই বৃষ্টি হয়।

নাইট-ওয়াচম্যান আলাদা কেউই ছিল না কোনওদিনই।

দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই দারোয়ান ও বেয়ারা-বাবুর্চিরা, জোরে একটা গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পায়। খাস-বেয়ারা গাড়িটাকে দেখেও, কিন্তু গাড়ির মডেল বলতে পারে না, মেকও বলতে পারে না। সে ও সব জানেও না। শুধু নাকি বলে, বড় বড় লাল আলো ছিল পেছনে। উঁচু উঁচু। এমন আলো কোনও গাড়ির; ও আগে দেখেনি। কী রঙের গাড়ি? জিজ্ঞেস করাতে সে সঠিক বলতে পারেনি। বয়সও অনেক। রাতে ভাল দেখেও না।

পুলিশ অফিসারকে ঋজুদা জিজ্ঞাসা করলেন অন্য সকলকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে, এই খাস-বেয়ারা কেন করা হয়নি?

ও চল্লিশ বছরের লোক। স্থানীয় সব মানুষই চেনে একে বহুদিন থেকে। এর সততা নিয়ে কারোই কোনও সন্দেহ নেই। বুড়োর সংসারে কেউ নেই, মানে স্ত্রী গত হয়েছে বহুদিন আগে। ও বার্মিজ। তামু আর মান্দালয়ের মাঝের এক গ্রামে বাড়ি। একটিই মাত্র মেয়ে। বিবাহিত। সেও খুবই স্বচ্ছল। বুড়ো, সিং-সাহেবকে ছেড়ে যায় না কোনওদিনই। মেয়েই আসে প্রতি বছর, বার্মিজ নববর্ষের সময়ে। নানা উপহার দিয়ে যায় বাবাকে। মেয়েও নিঃসন্তান। খাস বেয়ারা সব সন্দেহের অতীত এবং বৃদ্ধ বলেই একে অ্যারেস্ট করা হয়নি।

ঋজুদা বলল, ওকে আমি একটু আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই। আপনারা ফিরে যান আমরা যাচ্ছি এখুনি। চা খাওয়াবেন তো? আপনাদের আই.জি-র কাছে আমার কথা জানতে পাবেনই। আপনার আতিথেয়তার কথাও, মানে, চা খাইয়েছেন যে, তখন আমিও ওঁকে জানাব।

জিপটা চলে গেল, ঋজুদা ভটকাইকে পেছনে বসতে বলে, বুড়োকে সামনে বসাল মারুতি ভ্যানের। বুড়োর বয়সের গাছ-পাথর নেই। কিন্তু এক ধরনের জ্ঞানী বুড়ো থাকে, সব জাতেই, চৈনিক কনফ্যুসিয়াসের মতো, যাদের বয়স চল্লিশও হতে পারে, একশো দশও হতে পারে। যাদের চেহারাতে বয়সজনিত কোনও পার্থক্যই হয় না।

ভটকাই ভাবছিল, এ বুড়ো সেই জাতের বুড়ো।

তোমার নাম কী?

ঋজুদা শুধোল।

উ-মঙ্গ।

তুমি ইবোহাল সিং সাহেবকে কত দিন জানো?

আজকে পঞ্চাশ বছরের বেশি আছি ওঁর সঙ্গে। তখন আমার তিরিশ বছর বয়স। জওয়ান। উনি ছাড়া তো আমার কেউই ছিল না। আমি ছাড়াও ওর কেউ ছিল না। ছিল, একজন ছিল। সে তো পালিয়ে গেছে।

সে কে? আচ্চাও সিং?

উ-মঙ্গ-এর ঘুমন্ত চোখে যেন ঝিলিক লাগল আচ্চাও-এর নামে।

বলল, চেনেন আপনি তাঁকে?

নামে জানি। সানাহানবিকেও জানি। আচ্চাও সিং মানুষ কেমন?

মানুষ তো ভালই সাহেব। কিন্তু রক্ত বড় গরম।

যথা?

ওই। এমনিই বললাম।

খোলসা করে বলো?

আচ্চাও সিং নাগাদের ভালবাসত।

আর তোমার সাহেব?

তিনিও। সানাহানবিকে তো তিনি মেয়ের মতোই ভালবাসতেন।

আচ্চাও-এর কিন্তু খুব বিপদ, উ-মঙ্গ।

আমাকে বলছেন আপনি? জানি আমি।

আচ্চাওকে খবর পাঠাতে হবে ও যেন এখন ভুলেও এদিকে না আসে। এলে সারাজীবন গারদে কাটাতে হবে।

ঋজুদা বলল।

বুড়ো উ-মঙ্গ কী বলতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে বলল, তাকে আমি কি খবর পাঠাব? কোথায় পাঠাব? আমি কি জানি, সে কোথায় গেছে?

তুমি ছাড়া আর কেউ যে জানে না উ-মঙ্গ, সে কথা আমি জানি। তোমার ভয় নেই, আমিও তোমারই মতো আচ্চাও এর বন্ধু। সানাহানবির বন্ধু। আমি শত্রু নই। ইবোহাল সিংকে যে খুন করেছে, তাকে আমি খুঁজে বের করবই। তুমি নিশ্চিত থেকো। এই খুনটা কে করতে পারে বলে তোমার মনে হয়, উ-মঙ্গ?

আপনার কী মনে হয়?

উ-মঙ্গ প্রশ্ন করল উলটে। বলল, আমি সহায়-সম্বলহীন গরিব লোক। এখন প্রায় জরা-গ্রস্তও। আমার বিপদ হলে কে দেখবে সাহেব?

আচ্চাওই দেখবে। আচ্চাও না দেখলে সানাহানবি দেখবে। সেও না দেখলে আমি দেখব উ-মঙ্গ।

আপনি? বিশ্বাস করব কী করে?

তোমার অভিজ্ঞতা দিয়েই বিশ্বাস করতে হবে উ-মঙ্গ। বিশ্বাস করার যখন অন্য কিছুই থাকে না তখন নিজের বুদ্ধি দিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বিশ্বাসযোগ্যতার অন্য কোনও আমানত আমার কাছে নেই। আমারও মনে হয় যে, আমি জানি কে খুন করেছে, কিন্তু সে নিজের জন্যে খুন করেনি। তাকে দিয়ে খুন করানো হয়েছে।

চমকে গেল উ-মঙ্গ। পিচুটি-পড়া চোখ দুখানি যেন চকচক করে উঠল। বুড়ো মাথা নাড়ল। বলল, শুনলাম আজ সকালে তো ইবোবা সিং, থাঙ্গজম সিংয়ের ছেলেটাও খুন হয়েছে থেংনোপালে। কী যে দিনকাল হল!

ঋজুদা বলল, তুমি আর চিন্তা করে কী করবে? এই টাকাটা রাখো। এটা পাঁচশো টাকার নোট। তোমার জন্যে নয়। তুমি আজই কাউকে দিয়ে আচ্চাওকে খবর পাঠাও। আমার মনে হয় যে, তোমার মেয়ের বাড়িতেই সে আছে। তাকে খবর পাঠাও আমার পরিচয় দিয়ে। এই নাও একটা কার্ড। বোলো যে, আমি ইবোহাল সিং-এর খুনি যে কে, তা খুঁজে বার করবই। খবর না দিলে, সে যেন এদিকে একেবারেই না আসে।

আমার মেয়ে আসছে কাল।

কেন?

আমার অবস্থা শুনে আমাকে নিয়ে যেতে আসছে। কার কাছে থাকব আমি এখানে? চলবে কী করে?

তুমি এখন গেলে খুনি ধরা যাবে না উ-মঙ্গ। আচ্চাও-এর উপকারও হবে না। ওদের বিয়েটাও তোমার খাওয়া হবে না। মেয়ে আসছে, ভাল হয়েছে। মেয়ের মুখেই সব খবর পাঠাও।

আরও একটা কথা।

কী?

তম্বি সিং মানুষটা কেমন?

মানুষ ভাল। কিন্তু, একটা ছাগল। চিরদিনের ছাগল। ওর ছাগলামির জন্যে ওও না খুন হয়ে যায় যে-কোনওদিন। চিন্তা হয় ওর জন্যেও। কত বছরের জানাশোনা আমার, এদের সকলের সঙ্গেই। যাবে তো একদিন সকলেই। কিন্তু যাওয়ার তো একটা রকম আছে।

উ-মঙ্গ, থাঙ্গজম সিং-এর মেয়ে থৈবী সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?

ওটা একটা ডাইনি।

যে রুবিটা ইবোহাল সিং-এর তরোয়ালে লাগানো ছিল তা কতবড় ছিল?

ও বাবা! এত্ত বড়। বছরের একদিনই তো বের হত। আমিই তো পালিশ করতাম তরোয়াল।

তরোয়ালটাকে সরাল কে? আর, ওই রুবির কথা জানত কি সকলেই?

রুবির কথা? না। সকলে জানত না। আচ্চাও জানত, সানাহানবি জানত, তম্বি

জানত, আর জানত থৈবী।

থৈবী জানল কী করে?

গত মাস ছয়েক হল, ও খুব ঘনঘনই আসত।

সানাহানবির সঙ্গে?

কখনও কখনও। কখনও একাও আসত। আচ্চাও-এর সঙ্গে দহরম-মহরম এর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আচ্চাও আর সানাহানবি ছেলেবেলার সঙ্গী। হাচিনসন সাহেবও আচ্চাওকে খুবই ভালবাসতেন। বড় আত্মসম্মানজ্ঞানী ছেলে আচ্চাও। থৈবীকে পাত্তা দিত না। আপনি দেখেছেন আচ্চাও সিংকে?

না।

ওরকম সুপুরুষ মণিপুরে কমই আছে।

ঋজুদা বলল, উ-মঙ্গ আর দুটো কথা তোমাকে বলতে হবে, আমাকে। সত্যি করে। আচ্চাও আর সানহানবির ভালর জন্যেই। প্রথমত, তোমাকে পুলিশে যদি ডাকে অথবা আদালতে, তুমি জবানবন্দি ও সাক্ষী দিতে অবশ্যই যাবে। জানবে, আমারই নির্দেশে তোমাকে ডাকা হচ্ছে। কোনও ভয় কোরো না। এখানে ডি. জি. এবং হোম-সেক্রেটারিকেও আমি চিনি। তা ছাড়া তুমি তো নির্দোষ। তুমি জানো।

আমিতো নিজেই যেতাম। কিন্তু ওই থৈবী! প্রথমে ও আমাকে টাকার লোভ দেখিয়েছিল। পঁচিশ হাজার টাকা। সাহেব, সারাজীবন "তামু" আর "মোরে" করলাম। হেরাফেরি করে টাকা কামালে কি সারাজীবন এই খাস-বেয়ারা হয়ে পড়ে থাকি? টাকার লোভ আমার নেই। ছিল না এক সময়ে, তা বলব না। কিন্তু টাকার লোভ করতে গিয়ে আমার স্ত্রীকে হারাই আমি। টাকা মানুষকে কিছুই দিতে পারে না। সারাজীবন টাকার মধ্যে বাস করে এই কথাই বুঝেছি, বুঝেছি জীবনের শেষে এসে।...

তোমার মালিক হেরাফেরি করতেন না কি একেবারে? নইলে মোরেতে এসে...

মিথ্যে কথা বলব না। করতেন হয়তো, তবে একটা বয়স পর্যন্ত। তারপর বহু টাকা করার পর সব ছেড়ে দিলেন। মানুষটার যে শিক্ষা ছিল সাহেব। টাকা, শিক্ষিত মানুষের হাতে এলে তার নানা ভাল ব্যবহার হয়, অশিক্ষিত মানুষের হাতে টাকা গেলে তারা রাবণ হয়ে ওঠে। শিক্ষা বলতে, ছাপের শিক্ষা বলছি না। আজকাল তো ছাপে ছাপে অস্থির। কিন্তু ছাপছাড়া হাচিনসন সাহেব, ছাপওয়ালা আমার সাহেব বা আচ্চাও-এর মতো মানুষ আজকাল দেখি কোথায়? সানাহানবির মতো মেয়ে? থৈবী নাম হওয়া উচিত ওরই, রাজ কুমারী থৈবী। যেমন চেহারা, তেমন ব্যবহার; সত্যিই রাজকুমারী! তা, থাঙ্গজম সিং-এর ডাইনি মেয়ের নাম হল থৈবী। আরও একটা কথা। আমার সাহেব ইবোহাল সিং মোরেতে পড়েছিলেন, অন্য কারণে। টাকার জন্যে নয়। উনি একজন বার্মিজ মেয়েকে ভালবেসেছিলেন, খুব অল্প বয়স থেকেই। কিন্তু মেয়েটি তাকে বিয়ে করেনি। তার নাম, উ-বাথিন। এখন মান্দালয়ে মস্ত বড় ব্যবসায়ীর বউ সে। সে প্রতিবছর বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিনে

তামুর প্যাগোডাতে পুজো দিতে আসে। যখন আসে, তখন মোরেতে এসে সাহেবের সঙ্গে একটা দিন কাটিয়ে যায়। গল্প করে, খায়-দায়। তার চার ছেলে মেয়ে। বড় বড় হয়ে গেছে সব। তারাও সকলে আসে। তার স্বামীও আসেন।

উ-মঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার বয়স হল আশির ওপর। কম তো দেখলাম না। এই পৃথিবীতে কে যে কীসের জন্যে কী করে, কে যে কী চায়, কেন চায়; এ সব আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। যে কোনও মানুষকে ভাল অথবা মন্দ বলার আগে দশবার বিচার করা উচিত। নিজের ভুলের কথা ভাবা উচিত।

ঠিক।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, চলি উ-মঙ্গ।

বলে, ঋজুদা নমস্কার করল বুড়োকে। ভটকাইকে বলল, প্রণাম কর।

ভটকাই মনে মনে বিরক্ত হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

উ-মঙ্গ অভিভূত হয়ে গেল, মনে হল। চোখ মুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, আমার সাহেবের খুনিকে ধরিয়ে দাও। তারপর আমি তোমাকে "ইরোম্বা" খাওয়াব একদিন। নিজে রেঁধে।

ঋজুদার জিভে যেন জল এল। বলল, ইরোম্বা। আঃ। কতদিন খাইনি। উ-মঙ্গ, জব্বর করে ঝাল দিয়ো কিন্তু।

উ-মঙ্গকে নামিয়ে দিয়ে ভটকাইরা এসে পুলিশ স্টেশনে চা খেল।

ঋজুদা বলল অফিসারকে, আমি নিজে হয়তো আসতে পারব না। একে পাঠাব, সঙ্গে আরও দুজনকে। ওদের একটু বার্মার তামুটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন স্যার—প্যাগোডা, বাজার, যদি টুকটাক কিছু শপিং করে। স্যুভেনির হিসেবে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমাদের যাওয়া-আসার উপরে কোনও বিধি-নিষেধ নেই। দুপক্ষেরই। ঝগড়া যা, নিউ দিল্লি আর রেঙ্গুনের মধ্যে। আমাদের মধ্যে ঝগড়া নেই। বলেই বললেন, স্যার ডি.জি. সাহেবের পি.এ. দুবার ফোন করেছিলেন আপনাকে। আমি এক্ষুনি জিপ পাঠাচ্ছিলাম, আপনার কাছে।

আমাকে? আমি তো এখনও যোগাযোগ করিনি।

না। উনি বললেন কলকাতা থেকে চিফ-সেক্রেটারি কারও ফোন পেয়ে হোম-সেক্রেটারিকে বলেছেন, উনি ডি. জি. সাহেবকে বলেছেন। মণিপুর পুলিশ এখন ইবোহাল সিং আর ইবোবা সিং-এর খুনিকে ছেড়ে আপনাকেই খোঁজা-খোঁজা করে বেড়াচ্ছে।

লাগান ফোন। নাম কী, ডি. জি. সাহেবের?

স্যার আমরা আদার ব্যাপারী। জাহাজের খবর কি রাখি? ডি. আই. জি-ই আমাদের ভগবান। তার উপরে আই. জি. তারও উপরে ডি. জি.। তবে শুনেছি যে, তিনি অন্য ক্যাডারের। মানে, মণিপুরের নন।

লাইন মেলাতে প্রথমেই পি. এ. কথা বললেন, তারপর ডি.জি. নিজে।

ঋজুদা বলল, গুড আফটারনুন। তারপরই হাসি।

তারপর ইংরেজিতে বলল, ইওর অফিসার হিয়ার হ্যাজ এক্সটেনডেড অল হেলপ টু মি। থ্যাঙ্ক য়্যু ভেরি মাচ। আই শ্যাল সি য়্যু দিস ইভনিং অ্যাট ইওর রেসিডেন্স। হোয়াট টাইম ডু য়্যু গো টু বেড? নো, নো, বিকজ আই মে বি লেট।

থ্যাঙ্ক য়্যু ভেরি মাচ। নো নো, নট টু নাইট। উই উইল হ্যাভ ডিনার আফটারওয়ার্ডস। বাট নট টু নাইট। থ্যাঙ্ক য়্যু।

থ্যাঙ্ক য়্যু।

ফেরার পথে, যেখানে মারুতি ওয়ান থাউজ্যান্ডটা ছিল পথের উপরে, খুনের জায়গাতে, সেখানেই মারুতি ভ্যানটা রেখে, ঋজুদা একা ডানদিকের একটা সুঁড়িপথ দিয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেল, ভটকাইকে একা বসিয়ে রেখে। এদিকে সন্ধে প্রায় হয়ে এল। ভয় করতে লাগল ভটকাই-এর।

ঋজুদা ফিরে এল যখন, তখন সঙ্গে একজন স্থানীয়, বয়স্ক মানুষ এগিয়ে দিয়ে গেল। ভ্যানটা স্টার্ট করে নিজেই বলল, একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এলাম। এঁর নাম রঘুমণি সিং। জোতদার। থেংনোপালে একবার একটা ম্যান-ইটিং টাইগার বেরিয়েছিল। তখন সেই বাঘ মারতে এসে রঘুমণি সিং-এর বাড়িতেই ছিলাম। এখানেই। সেই থেকেই বন্ধুত্ব।

একটু চুপ করে থেকে ভটকাই বলল, ঋজুদা "ইরোম্বা" কী জিনিস?

ওঃ। ইরোম্বা? শুঁটকি মাছের এক দারুণ মণিপুরি প্রিপারেশান। ভাল কথা, আমরা কলকাতা ফেরার আগে মনে করিয়ে দিস আমাকে, তিতিরকে একটা "পারিজাত-পারিং" কিনে দেব।

সেটা কী বস্তু?

মণিপুরি মেয়েদের গলার গয়না। এখানে এসেও ওকে একটা পারিজাত-পারিং কিনে না-দেওয়াটা অন্যায় হবে।

ডি. জি. সাহেবের বাড়ির সামনে গাড়ির মেলা লেগে গেছিল। আই. জি. ক্রাইম, আই. জি. বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সেস, আরও কে কে।

যখন ওদের নীল মারুতি ভ্যানটা বেরোল, তার পেছনে পেছনে একটা সাদা-রঙা মারুতি জিপসিও বেরোল। তার পেছনে পেছনে একটা পুলিশের জিপ।

পুলিশের জিপটাকে মোড়ে দাঁড় করিয়ে রেখে ঋজুদা থংগল-বাজারে পৌঁছেই পবন টাঁইওয়ালাদের দোকানের সামনে পিঁ পিঁ করে হর্ন বাজাতে লাগল। তখন রাত এগারোটা বাজে। ওরা শুয়ে পড়েছিল। দোতলার বারান্দাতে পবন এসে দাঁড়াতেই ঋজুদা বলল, এত রাতে বিরক্ত করার জন্যে মাপ করে দাও, পবন। তোমার সাভুভাই-এর গাড়ি অক্ষত অবস্থাতে ফেরত দিয়ে দিলাম। পেট্রল ট্যাঙ্ক ফুল করা আছে, যেমন ছিল। পরে যখন আসব তখন কথা হবে। তাড়াতাড়ি

কাউকে পাঠাও। চাবিটা দেব।

পবন নিজেই নেমে এল। ধুতির উপরে হাতকাটা গেঞ্জি পরে ছিল। ডানহাতের চারখানা আঙুল নেড়ে পবন বলল, হুয়া কা সাব, বলিয়ে না? ফিন খুন হুয়া থাঙ্গজম সিংকো নেক লেড়কা, ইবোবা সিং। ই ক্যা হো গ্যায়া ইম্ফল কা?

ঋজুদা বলল, সব বাতায় গা। আইস্তা, আইস্তা। আভিতক ম্যায়ভি অন্ধাই হুঁ।

ঋজুদা আর ভটকাই সাদা মারুতি জিপসিতে এসে বসল। সার্জেন্ট এসে ঋজুদাকে বলল, মে উই গো ব্যাক স্যার?

প্লিজ। থ্যাঙ্ক য়্যু ভেরি মাচ।

জিপসিটা বড় রাস্তায় পড়তেই ঋজুদা বলল, এই গাড়িগুলো দারুণ। শুধু সামনের সিটগুলো যদি একটু বেশি বড় করত। লম্বা-চওড়া মানুষের পক্ষে দূরের পথ ড্রাইভ করে যেতে একটু কষ্ট হয়।

ভটকাই অধৈর্য হয়ে গেছিল। বলল, কী হল বলো না ঋজুদা। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

শনৈঃ। শনৈঃ।

ভটকাই-এর কথাই ভটকাইকে গিলিয়ে দিল ঋজুদা। তোকে এখন সব বললে আবার তিতির আর রুদ্রকে দুবার করে বলতে হবে। তা ছাড়া বলার সময় এখনও আসেনি।

সানাহানবিই মেইন কালপ্রিট। অত সুন্দরী যে মেয়ে, তার মন কখনও সুন্দর হয়? কী মিষ্টি মিষ্টি কথা। কী কায়দা দাঁড়ানোর, হাসির; লেডি ডাই। তবে এ কথা ঠিক যে প্রিন্সেস ডায়ানার "ডাবল" বলে পৃথিবীর যে কোনও জায়গাতে গিয়েই ও দু নম্বরী করতে পারে। রূপও ওরকম আবার মানুষও ভাল হবে, তা কী হয়?

আচ্ছা ঋজুদা, ডায়নাকে "প্রিন্সেস ডাই" বলে কেন সকলে? এতই ভালবাসে তো মরতে বলে কেন?

গাধারে! ডায়ানা শব্দটির ইংরিজি উচ্চারণ ডাইআনা। তাই, নামের প্রথমটুকু ওরা বলে, ভালবেসে বলে, প্রিন্সেস ডাই।

ও। তাই বলো। অনেকদিন পরে এ একটা হল স্টক। বাগবাজারে রকে গিয়ে মন্টেদের তাক লাগিয়ে দেব।

আচ্ছা, তোমার যোগেন ড্রাইভারকে কেমন মনে হয়? ওতো স্পাই।

স্পাই কি না জানি না। কিন্তু আগে পেটটা পুরো ঠিক হোক বেচারার, তারপর ওর কথা। ওকে যা শাস্তি তুই দিয়েছিস, তাতো গারদবাসের চেয়েও বেশি।

আচ্ছা, একটা কথা অন্তত বলো? রুবিটা কোথায় আছে এখন? বার্মাতে পাচার হয়ে গেছে? আমার তো মনে হচ্ছে উ-মঙ্গ-এর মেয়ের বাড়িতে আছে।

তা হবে হয়তো। তুই যখন বলছিস। তার আগে বল যে, হিরে দামি না রুবি দামি?

হিরে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামি এ কথা আর কে না জানে!

ভুল কথা। বড় রুবির মতন দামি আর কোনও পাথরই নেই এই গ্রহে। তবে বড় রুবি পাওয়া ভারী দুষ্কর। ভাল রুবির রং কী রকম হয় জানিস?

কীরকম?

ঠিক পায়রার রক্তের মতন লাল।

পায়রার রক্তের লাল আবার অন্যরকম লাল না কি?

হ্যাঁ। লালের কতরকম হয়! চোখ খুলে দেখলেই দেখতে পাবি। কত রকমের সবুজ, কতরকমের হলুদও হয়।

এই সব পাথর কোথায় পাওয়া যায় ঋজুদা?

গাছে তো পাথর ফলে না। মাটির নীচে পাওয়া যায়, নানারকম প্রস্তরীভূত স্তরের ফাঁকে ফাঁকে। সোনা, রুপা, প্লাটিনাম, কয়লা, মানে, ব্ল্যাক-ডায়মন্ড, গ্রাফাইট, ব্রিসস্টোন, হিরে, এইসব হচ্ছে কার্বন মিনারেলস। আবার বেরিল, এমারাল্ড, অ্যাকুয়ামেরিন এ সব হচ্ছে বেরিলিয়াম মিনারেলস। ইউরেনিয়াম মিনারালস-এর মধ্যে আবার আছে পিচব্লেড, টর্বেনাইট। রুবি, স্যাফায়ার, করান্ডাম এ সব হচ্ছে অ্যালুমিনা মিনারেলস। ওপাল-ওনিক্স, ক্রাইসোপ্রেস, কার্নেশিয়ান, আগাটে এই সব আবার হচ্ছে চালসেডনি ভ্যারাইটির। আমার টোপাজ, গার্নেট আর কারনেশিয়ানের রং সবচেয়ে সুন্দর লাগে। এমারেল্ড, অ্যাকুয়ামেরিন এবং জারকন-এর হালকা ও গাঢ় সবজে রংও খুব ভাল লাগে।

আরও পাথর আছে?

আরও কতরকম আছে? আমি আর কতটুকু জানি। তোর সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে অরুণবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। জিওলজিস্ট। কত কী জানতে পারবি। তবে বার্মা কিন্তু রুবির জন্যে বিখ্যাত। বার্মাতে "মোগক" বলে একটা জায়গা আছে, সেখানকার রুবি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামি। যে রুবি নিয়ে এ কাণ্ড সেটা হয়তো খুব সম্ভব মোগক-রুবি। কলকাতা পি. সি. চন্দ্রর বড়বাবু শ্রীজওহরলাল চন্দ্র দেখলেই বলতে পারবেন। বার্মার রুবির মতন শ্রীলঙ্কার স্যাফায়ার, দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বারলির হিরে, ট্রানসভাল-এর কোরান্ডাম, অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস-এর ওপাল, ব্রাজিলের কোয়ার্টজ্ এ সব বিখ্যাত। এত কি আর মনে রাখা যায়, না আমি জিওলজির ছাত্র?

এগুলোর বাংলা নাম কী?

এই রে! এ সব দামি দামি জিনিসের খবর বড়লোকেরাই জানে। আমার মায়ের দুকানে দুটি মুক্তো, তাও ঝুটো ছিল কিনা জানি না, ছাড়া আর কিছুই তো নিজে চোখে দেখিনি। মুক্তো মাটির নীচে হয় না, জলে, সমুদ্রে হয়, ঝিনুকের মধ্যে। গরিবের ছেলেকে এ সব এমব্যারাসিং কথা জিজ্ঞেস করিস কীসের জন্যে?

আচ্ছা, তা হলে ইবোহাল সিং-এর সব সম্পত্তি কে পাবে? উইলের কোনও হদিস কি পেলে?

নাছোড়বান্দা ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, না।

ভটকাই বুঝল যে চেপে যাচ্ছে।

আচ্ছা ঋজুদা "উ-মঙ্গ" মানে কী?

বর্মী ভাষায় বড়দের বলে "উ", ছোটদের বলে "মাও" আর সমবয়সিদের বলে "কো"। বুঝেছিস।

বুঝেছি। মানে উ-ঋজু, কো-তিতির, আর মাও-পটলা।

পটলাটা কে?

আমার পিসতুতো ভাই। চার বছরের ছোট।

ও। বর্মি ভাষায় "র" অক্ষরটা নেই—মানে 'R'-এর উচ্চারণ করতে পারে না ওরা। রুদ্রকে বলবে উদ্র, রামকে বলবে ইয়াম। সাহেবরা যেমন "অ" বলতে পারে না।

পারে না? ভটকাই অবাক হয়ে শুধোল।

পারে কি? তা হলে তো ইংরেজরা বর্ধমানকে বর্ধমানই বলত, বার্ডোয়ান বলত কি? অনিতা বা অমিতাভ বলতে পারে কোনও ইংরেজ?

পাঞ্জাবিরাও পারে না। ভটকাই বলল।

অনিতাকে সাহেবরা বলবে অ্যানিটা, অমিতাভকে অ্যামিটাভ।

ভটকাই বলল, আর পাঞ্জাবিরা বলবে, আনিতা, আমিতাভ।

ঠিক।

তারপরই পেটে হাত দিয়ে বলল, ঋজুদা বারোটা বাজে। পেটটা পিঠের সঙ্গে লেগে গেছে। যা খিদে পেয়েছে না। এখন গিয়ে কাঙ্গপোকপিতে সানাহানবিদের বিরক্ত করবে? তার চেয়ে চলো "দ্যা রিট্রিট"-এ থেকে যাই রাতটা।

বিরক্ত কাউকেই করা ঠিক নয়।

তবে রাতটা কাটাবে কোথায়?

চল, কাঙ্গলোটোংবীর কোনও ধাবাতে চৌপায়াতে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই। রুটি আর আন্ডা তড়কা খেয়ে। কাল সকালে যাব কাঙ্গপোকপিতে।

যা বলবে তুমি। কিন্তু আবার আন্ডা? পেটে মুরগি ডাকবে যে।

তোর যা খুশি খাস।

পালক-পনির খাব।

একটা জিনিস ভাল হল যে, গাড়িটা নতুন। চিনবে না সহজে। মারুতি ভ্যানটা হয়তো চিনে গেছিল।

কারা? কাদের কথা বলছ?

যারা আমাদের চিনতে চায়।

খাওয়া দাওয়ার পর দড়ির খাটিয়াতে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে ভটকাই একটা বড় হাই তুলল।

কীরে। কী হল?

নাঃ। ভাবছিলাম, "দ্যা রিট্রিট"-এর ডানলোপিলো লাগানো বিছানাগুলো কী আরামের। গিজারও ছিল। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে চান করলে সব ক্লান্তি দূর হয়ে যেত।

কী হল? এরই মধ্যে ক্লান্তি? রুদ্র আর তিতির তো তিনদিন তিনরাত কিছু না খেয়ে একটুও না ঘুমিয়ে লড়ে গেছে, রুআহাতে, আর তুই...

ছারপোকা।

ছারপোকা, মাছি, মশা এইসব বাহ্যিক অসুবিধাই যে মানিয়ে নিতে না পারে সে কি সাধক হতে পারে? গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে একটা বিশেষ সাধনা। বুঝেছিস?

ভটকাই পাশ ফিরে শুতে শুতে দেখল যে, ঋজুদা চৌপায়ার উপরে আসনসিঁড়ি হয়ে বসে পাইপ খাচ্ছে আর পথের পাশের মস্ত কদম গাছটার দিকে চেয়ে কী সব ভাবছে। একমনে।

ভটকাই ঋজুদাকে পুরোপুরি চেনে না। চিনলে জানত যে, ঋজুদা আজকের রাতটা চিন্তা করেই কাটিয়ে দেবে। জ্যামিতি, অ্যালজাবরা, এরিথমেটিক, স্ট্যাটিসটিকস, সব মস্তিষ্কের কম্পিউটারে জ্বলবে আর নিভবে। নিভবে আর জ্বলবে।

ভটকাই-এর খুবই ইচ্ছে করে যে, ঋজুদার শাগরেদ হয়। কিন্তু ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল। আর চিন্তা করা গেল না।

আগামীকাল দ্বিজেন মেসোর শ্রাদ্ধ। রাসবিহারী অ্যাভিনিউতেই হবে। থাকলে যেতাম। আমাকে কেন জানি না, উনি বিশেষ ভালবাসতেন। ওঁর একটা ডজ কিংগসওয়ে গাড়ি ছিল, হালকা হলুদ রঙা। গাড়িটা আমাকে চালাতে দিতেন, যখন আমি বেশ ছোট, তখনই।

আজ পূর্ণিমা। বালিশের তলা থেকে হাতঘড়িটা বার করে দেখলাম। রাত সাড়ে বারোটা। বাইরে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। হাচিনসন সাহেবের ফার্ম হাউসের যেখানে যেখানে ফাঁকা জায়গা আছে, গাছ গাছালির ছায়া নেই, সেই সব জায়গা রুপোঝুরি। ছায়া বসে আছে এখানে ওখানে, ঘাপটি মেরে, বাঘের বা চিতার মতো। আর আলো-ছায়ার সাদা কালো ছড়িয়ে গেছে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া উপত্যকায়। বাঁদিকে, নাগাল্যান্ডের দিকে।

প্রকৃতির কোনও ভাগ নেই, দাগ নেই, চেকপোস্ট নেই, সে আদিগন্ত, বিস্তৃত, উদাত্ত। মানুষই তার ভাষা, তার গায়ের রং, তার আচার ব্যবহারের পার্থক্য দিয়ে প্রকৃতির চোখে গড়ে তুলেছে নানা বিভেদ। চেক-পোস্ট বসিয়ে রাজ্যকে ভাগ করেছে, প্রকৃতির মধ্যে। সীমানা চিহ্ন দিয়ে দেশকে ভাগ করেছে, দেশের সঙ্গে।

কিছুদূরেই 'মাও'। যেখান থেকে নাগাল্যান্ড আরম্ভ। জানলা খুলে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, সানাহানবির প্রিয় কুকুর টাইগারের কবরের দিকে চেয়ে। তিতির

শুয়েছে সানাহানাবির লাগোয়া ঘরে। আমার ঘরটা দূরে।

অল্প অল্প হাওয়াতে আন্দোলিত হচ্ছে গাছগাছালির হাত, হাতের আঙুল। নানা গড়নের ছায়ারা কালোতে আলপনা আঁকছে আলোর চাদরে। না, সন্দেহজনক কিছুই এ পর্যন্ত দেখা যায়নি কবরের কাছে।

জানলাটা খোলা রেখেই শুয়ে পড়লাম আবার। ঘুমের মধ্যেও কান সজাগ থাকে আমার। ঋজুদার কল্যাণে নানা জায়গার জঙ্গল পাহাড়ে তৃণভূমিতে রাতের পর রাত কাটিয়ে, আমার ইন্দ্রিয়গুলোর ধার বেড়ে গেছে অনেক। চোখ, কান, নাকের ক্ষমতা তো বহুগুণান্বিত হয়েছেই, অসাধারণ হয়েছে ষষ্ঠবোধের ক্ষমতা। এ বারবার অনুভব করে পরীক্ষিত সত্য হয়ে গেছে। তাই আবার ঘুমিয়ে পড়লেও আমি জানি, সামান্যতম শব্দতেও আমার ঘুম ভেঙে যাবে। এমনকী কবরের দিকে শব্দহীন পায়ে কেউ এগোলেও আমি জেগে যাব। অনেক মানুষখেকো বাঘের মোকাবিলা করে আমি নিজেও মানুষখেকো বাঘের মতো সাবধানি ও সজাগ হয়ে গেছি।

বেচারি ভটকাই এখন কোথায় কে জানে! ঋজুদার খপ্পরে আমরা এখন অভ্যস্ত। ওর সময় লাগবে অনেক।

* * *

ভটকাই অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ পেটের পাশে আচমকা খোঁচা খেয়ে চোখ মেলল। দেখল, ঋজুদা তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঋজুদা বলল, উঠে পড়। এখুনি ভোর হবে। চোখমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে তৈরি হয়ে নে। এখুনি তোকে বাস ধরে যেতে হবে ইম্ফলে।

ইম্ফলে?

হ্যাঁ।

কেন?

এত প্রশ্ন করিস কেন? যা বলছি শোন। এই নে, চা খেয়ে এই চিঠিটা নিয়ে যাবি পুলিশের ডি. জি-র বাড়িতে। আমার একটা কার্ডও রইল। এই কার্ডটা দেখাবি, যদি কেউ ছেলেমানুষ বলে ঢুকতে না দেয়। তারপ জি. ডি-এর হাতে এই চিঠিটা দিবি। সিল করা আছে।

ইম্ফল যাব আবার? পথে "দ্যা রিট্রিট"-এ নেমে পড়ে একটা ফোন করে দিলে হত না।

না। হত না। যা বলছি তাই কর। চিঠি দিয়ে আবার বাসে করেই ফিরে আসবি হাচিনসন-এর বাংলোতে। গাড়িটা যদি চালাতে পারতিস তবে জিপসিটা নিয়েই যেতে পারতিস। যতদিন না ভাল গাড়ি চালাতে শিখছিস, ভাল হিন্দি আর ইংরিজি বলতে শিখছিস তোকে নিয়ে আর কোথাও আসব না। তিতিরকে দেখতো?

কতগুলো ভাষা জানে। ওই সব ভাষা কি স্কুলে শিখেছে? রামকৃষ্ণ মিশনে শিখেছে, তারপর ওই ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে ভাষাগুলো রপ্ত করেছে। ইচ্ছা থাকা চাই। তা তো নয়। খালি সমানে লোকের পেছনে লাগবি, ভাঁড়ামো করবি আর ভাববি সেইটেই সবচেয়ে বাহাদুরির। এই নে, একশো টাকা রাখ। খিদে তো পাবেই। ইম্ফলে কোনও দোকানে ভাল করে করে খেয়ে নিয়ে তারপর বাসে উঠিস। কোহিমার বাসে উঠবি। টিকিট কাটবি 'মোরাং'-এর, কিন্তু নেমে যাবি কাঙ্গপোকপিতে।

টাকা তো আমার কাছে আছে। 'মোরাং'-এর টিকিট কাটব কেন?

কেউ যাতে আগে থেকে বুঝতে না পারে তুই কাঙ্গপোকপিতে আসছিস সেই বাসে তো আমাদের ভাল চায় না এমন কেউও থাকতে পারে। মাথা দিয়েছেন ঈশ্বর, মাথাটাকে খাটা। যত খাটাবি মাথা তত খাটবে। এই একটিই যন্ত্র আছে দুনিয়াতে, যা খাটনিতে তেজি হয়, ঝিমিয়ে পড়ে না।

ঋজুদা, তুমি রাতে কোথায় গেছিলে? আমি দুটো নাগাদ একবার ঘুম ভেঙে উঠেছিলাম। দেখলাম তুমি নেই। মারুতি জিপসিটাও নেই।

আর বলিস না। গেছিলাম 'দ্য রিট্রিট'-এর কাছেই। দেখলি না, পথের উপরে একটা এস. টি. ডি, আই.এস.ডি-র দোকান ছিল। সেখানে গেছিলাম কলকাতায় ফোন করতে।

কাকে?

সনৎদাকে। গ্রেড ডেন কুকুর এবং তাদের অসুখ বিসুখ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।

জিজ্ঞেস? রাত আড়াইটায়?

কী আর করা যাবে! রেগে একেবারে কাঁই। তারপর যখন বললাম, ইম্ফল থেকে বলছি, তখন রাগ পড়ল। তবে যা যা জানার, জানা হল। এই বড় কথা।

আর? আর কাকে করলে ফোন?

গদাধরটার কথা মনে হচ্ছিল খুব। তাকেও করলাম একটা।

রাত আড়াইটাতে? সেও তো হার্টফেল করে মরতে পারত।

না, না, তার অভ্যেস আছে। কিন্তু মনে যা হয়েছিল, তাই।

কী?

জ্বর হয়েছে গদাধরের। বেশ ভাল জ্বর। আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে এখান থেকে। আমি ছাড়া গদাধরের কে আছে বল আর? সারাটা জীবন, বিয়ে-থা করল না। আমার সেবাতেই কাটিয়ে দিল। তাকে আমি না দেখলে অত্যন্ত অন্যায় কাজ হবে।

তা ঠিকই বলেছ।

বলল বটে ভটকাই, কিন্তু মনে মনে মোটেই খুশি হল না। "সাঙ্গাই", অর্থাৎ নাচুনে হরিণ দেখা হয়নি এখনও, লাকটাক লেক-এ যাওয়া হয়নি, সেই হ্রদের উপরে উদ্ভিদের ভাসমান গালচে, "ফুমডি" দেখা হয়নি। বার্মার তামুও দেখা হল

না। আরও কত কী। মনে হচ্ছে যাত্রাটা একবারেই ভাল হয়নি।

তারপর বলল, ওই যে বাস আসছে। আমি তবে যাই।

চা খেলি না?

না এখনও তো অন্ধকার আছে। ইম্ফলে গিয়েই খাব এখন, কাজ সেরে।

ভটকাই ফিরে এল সকাল দশটা নাগাদ। আমার আর তিতিরের কোনও কথার উত্তর না দিয়ে সোজা ঘরে গিয়ে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

ঋজুদা ফিরল তার ঘণ্টা দুয়েক পরে, সাদা মারুতি জিপসি নিয়ে। তবে সেদিন নয়। তার পরদিন। চিন্তাতে ফেলেছিল আমাদের। গাড়ি বদল কখন হয়েছে জানি না। ভটকাই হয়তো জানত। কিন্তু পাকা গোয়েন্দার মতো সব কিছুই চেপে গেছে, আমাদের কাছে।

হর্ন বাজিয়ে গাড়ি নিয়ে বাংলোর ভিতরে ঢুকতেই, আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম, ঋজুদার দিকে।

বললাম, কী ব্যাপার ঋজুদা? কী হল? ভটকাই কোথায় গেছিল, তুমিই বা কোথা থেকে এলে? ছিলে কোথায়?

ভটকাই ফিরে এসেছে?

হ্যাঁ। গতকাল, দশটা নাগাদ, সকালে। আর ফিরে থেকে এমন হাবভাব করছে, যেন রাজ্য জয় করে এসেছে। আর, কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলছে, শনৈঃ। শনৈঃ।

ঋজুদা হাসল। তারপর, গাড়ি থেকে নেমে বাংলোর দিকে যেতে যেতে বলল, বলব পরে সব। এখনও আসলে বলার মতো কিছুই হয়নি। এখানে কি কিছু ঘটেছে, কাল এবং পরশু রাতে?

আমি মাথা নাড়লাম।

চল। ঘরে গিয়ে চানটান করে রেস্ট করি। খুব ক্লান্ত লাগছে। বিকেলে আবার বেরোব।

বিকেল থাকতেই আমি আর ঋজুদা বেরোলাম—সাদা মারুতি জিপসিতে।

ঋজুদা বলল, তুইই চালা রুদ্র। আমি একটু পাইপ খাই আর ভাবি।

কোথায় যাব এখন?

অনেক জায়গাতে। প্রথমে যাব থাঙ্গজম সিং-এর বাড়ি, পাওনা বাজারে। বেচারার একমাত্র ছেলেটা খুন হয়ে গেল। ভদ্রতার খাতিরেও যাওয়া দরকার। তা ছাড়া গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে তো পরশু সকালেই যোগেনকে পাঠিয়েছিল।

ইম্ফলের পাওনা বাজারের কাছে পৌঁছতে, ঋজুদার নির্দেশে ডাইনে বাঁয়ে করতে করতে বিরাট কম্পাউন্ডওয়ালা আর উঁচু দেওয়াল দেওয়া একটা বিরাট

বাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। ইম্ফল শহরে যে এতরকম গাড়ি আছে, তা ওখানে না এলে জানতাম না। কত লোকই গেছেন, সমবেদনা জানাতে।

জিপসিটা দূরে পার্ক করিয়ে রেখে আমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখলাম, বিরাট লম্বা চওড়া একজন গুণ্ডামতো মানুষ, প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমের মধ্যের মস্ত একটি সোফাতে বসে আছেন, আর অগণ্য মানুষ তাঁর চারদিকে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

এই আপনার আসার সময় হল, বোস সাহেব?

কী করব। হাতের যে কাজ নিয়েছি সেটা শেষ না করে যে আসতে পারছিলাম না।

সেই কাজ শেষ হয়ে গেছে?

পুরো নয়। প্রায়।

বলেন কী?

হ্যাঁ।

কনগ্রাচুলেশানস। আমার এই অবস্থাতেও...

ঋজুদা বলল, আপনার পুত্রবধূ কোথায়?

তারপরই বলল, সমবেদনা জানাবার ভাষা আমার নেই সিং সাহেব।

অন্যমনস্ক গলায় মিস্টার সিং বললেন, হ্যাঁ ডাকছি। বলে, কাকে যেন কী বললেন, মণিপুরিতে। সম্ভবত কোনও আত্মীয়কে।

আলুথালু বেশে একজন অল্পবয়সি মহিলা ঘরে এলেন। বুঝলাম যে ইনিই ইবোবা সিং-এর স্ত্রী যমুনা। ঋজুদাকে সে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল। যমুনার চেহারাতে ভারী একটা শান্ত শ্রী আছে। সানাহানবি একধরনের সুন্দরী আর যমুনা অন্যধরনের। সৌন্দর্যেরও কতরকম থাকে। সত্যি।

ঋজুদা এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় হাত দিল। ঘরের সকলে এই অপরিচিত ঋজুদাকে দেখে, ইবোবা সিং-এর স্ত্রীর শোক কেন উথলে উঠল তা বুঝতে না পেরে, অবাক চোখে যমুনা, ঋজুদা এবং থাঙ্গজম সিং-এর দিকে চেয়ে রইল। ফিসফিস করে কী সব বলাবলিও করতে লাগল।

থাঙ্গজম সিং বললেন হাঞ্জোও...শুনেছেন তো! একেকজনের গায়ে, কম করে কুড়িটা গুলি লেগেছিল। গভর্নমেন্ট কী যে করছে, কে জানে! মানুষের পক্ষে তো ঘরের বাইরে বার হওয়া অসম্ভব। মোরের কাঠগোদাম থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সেগুনের লগ পাচার হয়ে গেছে বার্মাতে, এই খবর পেয়েই হাঞ্জো আর ইবোবাকে পাঠালাম—তাদের সঙ্গে রিভলভারও ছিল। কিন্তু তা বের করার সময় পেল কই। থেংনোপালের ঘাটিতে একটা হেয়ারপিন বেন্ড পেরোনোর পরেই, রোড ব্লক। আর কী ব্যাপার বোঝার আগেই, গুলিতে মারুতি ওয়ান থাউজ্যান্ড ঝাঁঝরা হয়ে গেল। আমার একমাত্র ছেলে—বোস সাহেব।...কত কী ভেবেছিলাম। একটা লিমিটেড কোম্পানি করব। কলকাতা থেকে অনীক সেন সাহেবকে...

এতবড় লম্বাচওড়া গুণ্ডার মতো মানুষটা, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

ঋজুদা ওর কাছে গিয়ে, কাঁধে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দু একদিনের মধ্যে আমি আবার আসব। কী করবেন বলুন? ম্যান প্রপোজেস, গড ডিসপোজেস।

ওদের কাছে বিদায় নিয়ে ঋজুদা বেরিয়ে এল। আমার চোখের সামনে প্রকাণ্ড ঝাড়লণ্ঠন জ্বালা, আলো ঝলমল পিওর বার্মাটিকের আসবাবে ভরা, ঐশ্বর্যের প্রতিমূর্তি, ওই বসবার ঘরে—সেই সন্তানহারা বাবার মূর্তিটা চিরজীবনের মতো আঁকা হয়ে গেল।

গেট অবধিও যাইনি, এমন সময়ে যোগেন কুণ্ডু দৌড়ে এল। টাটা সিয়েরা গাড়িতে সে অন্য দুজন ড্রাইভারের সঙ্গে বসে গল্প করছিল। দৌড়ে এসে বলল, সেদিন না-আইয়া ভালই করছেন। দাহ হইতে হইতে আজ ভোর। পোস্টমর্টেম-টর্টেম—পুলিশের যা হ্যাপা। অবশ্য এক দিক দিয়া ভালই হইছে—বৌদির মামা, যে নাকি গুয়াহাটিতে ইনক্যামটাক্সো কষেন, তিনিও দাহর আগে আগে আইস্যা পৌঁছ্যাইয়া গেলেন।

তোমার পেট কেমন আছে, যোগেন বাবু?

আমি বললাম।

হ। এহনে ভালই কম্যু। তবে প্যাটের কথা ভাবনের সময় কই কন? তবে একটা ডিসিশিন লইয়া লিছি। আমার ওয়াইফেরেও কইয়া দিছি যে, লাইফে ঘোষেগো দুকান থিক্যা আর কোনও মিষ্টিই কিনুম না। আমার ওয়াইফতো এখনও এক্কেরে ন্যাতাইয়া আছে দেহি। বিচারি! অবলা জীব!

বলেই, ঋজুদাকে বলল, আপনাগো অবস্থা কেমন। তাই কহেন দেহি।

একই রকম। আর কী হবে! ঋজুদা, বলেই, চুপ করে, সামান্য বিরক্তির সঙ্গে আমার দিকে চেয়েছিল। আমি বললাম, এক যাত্রায় পৃথক ফল তো হয় না।

ভালবেসে কি পান্তুয়াই যে খাওয়ালেন,যোগেন বাবু! যুধিষ্ঠির ঋজু বোসও মিথ্যে কথা বলল, পাণ্ডব বংশকে বাঁচাতে।

আমাদের জিপসি অবধি পায়ে হেঁটে পৌঁছে দিয়ে যোগেন বলল, বাসরে! ঘণ্টায় ঘণ্টায় গাড়ি বদলাইতে আছেন দেহি আপনারা। ব্যাপারটা কী?

আরে ভাড়ার গাড়ি, বোঝো তো। যখন যেমন দেয়। আমাদের কি আর বাছাবাছির উপায় আছে? তবে ড্রাইভার ছাড়া তো। ভাড়াটা একটু কম পড়ে, আর মারুতিতে তেলের খরচ নেই বললেই চলে। এই আর কী!

বড় রাস্তায় পড়তেই ঋজুদা বলল, জোরে চালা। আর, কোনও গাড়ি আমাদের ফলো করছে কি না তা দেখবি মাঝে মাঝেই, রিয়ার-ভিউ মিরারে। ভুলে যাস না। মিরারটা তো তোর দিকেই ঘোরানো।

যাব কোথায়?

চল না। জোরে চল। বলব।

মিনিট সাতেক চালাবার পরই ঋজুদা বলল, সামনে ওই যে, বাঁদিকে প্রকাণ্ড

কম্পাউন্ডওয়ালা বাংলোটা—আলো জ্বলছে গেটের দুপাশে। পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, ওর ভিতরে ঢোকা। গেটে স্লো করিস গাড়ি। সিকিউরিটির খুব কড়াকড়ি, টেররিস্টদের যা দৌরাত্ম্য।

এটা কার বাড়ি?

ডি.জি. অফ পুলিশ। ডিরেক্টর জেনারেল।

এটি ডি.জি-র বাড়ি। বাড়িতেও পুরোদস্তুর অফিস একটি। পি. বি. এক্স. বোর্ড থেকে শুরু করে, সব কিছু। এঁদের চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ।

কাম ইন, কাম ইন, বলে দাঁড়িয়ে উঠে আপ্যায়ন করলেন ডি.জি.। দেখলে মনে হয়, ইংরিজির অ্যাবসেন্ড-মাইন্ডেড প্রফেসর। বুদ্ধিমান, সংস্কৃতিসম্পন্ন। "পুলিশ" বললে আমাদের মনে যে ছবি ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে কোনওই মিল নেই।

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, উ-মঙ্গ কি আজ মোরে থেকে এসেছে, তম্বি সিং-এর বাড়িতে?

হ্যাঁ, এসেছে। বিকেলের বাসে। ইওর গেস ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।

তম্বি সিং কি বাড়িতেই আছেন, না কাঙ্গপোকপির দিকে বেরিয়ে পড়েছেন?

আজ বোধহয় বেরোতে পারবেন না। কারণ উ-মঙ্গ-এর বাসই পৌঁছেছে বিকেলে। আমার মনে হয় আগামীকাল দুপুরের দিকে বেরোবে। আমার লোক ওদের কনস্ট্যান্টলি ওয়াচ করছে। হয়তো থাঙ্গজম সিং-এর সঙ্গে দেখা করবে। তার কোনও গাড়িও নেবে হয়তো। নয়তো, ভাড়া গাড়ি। এবং ওরা কাঙ্গলোটংবী থেকে হেঁটে যেতে পারবে না রাতের বেলা। মনে হয়, কাঙ্গপোকপি থেকেই যাবার চেষ্টা করবে। দুজনেরই তো পায়ে আর্থারাইটিস। বয়স তো কম হল না।

বয়স হল বটে, কিন্তু লোভ তো কমল না।

হাসলেন ডি. জি.। বললেন, দেখা যাক কী করে ওরা। ওরা এখান থেকে রওয়ানা হলেই, কাঙ্গপোকপিতে আপনাদের ফোন করে দেব।

ঋজুদা বলল, তম্বি সিং এবং উ-মঙ্গ দুজনের কারোই যেন মৃত্যু না হয় পুলিশের গুলিতে। স্ট্রিক্ট ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখবেন।

ইয়েস। ইয়েস। দেওয়া আছে। প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি। ডি. জি. বললেন, ইবোবা সিং-এর মার্ডারটা সম্বন্ধে আপনার কোনও হাঞ্চ আছে? বোস সাহেব? আপনি যদি বলেন তো ওই কেসটাও আপনাকে...

না না। ওতো আপনারাও ভাল করেই জানেন যে টেররিস্টদের কাজ। কোনও পার্সোনাল লিঙ্কস ছিল না হয়তো। নেহাতই ভুল করে মেরেছে। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, তখন গুলিগোলা ছোঁড়ার পেছনে কোনও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকে না। পুরো ব্যাপারটা ইমপারসোনাল হয়ে ওঠে। ব্যাড লাক। তা ছাড়া আপনি তো জানেন যে, আমি এখানে এসেছি রুবিটা খুঁজে বের করতে, আর রাজা ইবোহাল সিং-এর খুনের তদন্ত করতে।

আ! বোস সাহেব। ডোন্ট কল হিম আ রাজা। হি ওয়াজ অ্যান ইমপোস্টর

রাইট ফ্রম দ্যা বিগিনিং।

বাট হিজ ম্যানারস, অ্যান্ড লাইফস্টাইল ওয়ার ভেরি মাচ লাইক আ রাজা। হি ওয়াজ অ্যান অ্যারিস্টোক্রাট—বাই হোয়াটেভার নেম ইউ মে কল হিম।

ঋজুদা ডি. জি-র অফার করা চায়ে এক চুমুক দিয়ে বলল, একটা কথা, এখানের মানে, এই খুন প্রসঙ্গে যাঁরাই জড়িত, তাঁরা প্রত্যেকেই জেনে আশ্চর্য হচ্ছেন হয়তো যে, মণিপুর ও নাগাল্যান্ড এমনকী বার্মার তামু ইত্যাদি জায়গাও এত ভাল করে জানলাম কী করে। এতে বাহাদুরি কিছুই নেই কারণ, নানা সূত্রে উনিশশো ছাপান্ন থেকে সত্তরের দশকের গোড়া অবধি আমি প্রায় বার দশেক এসেছি এখানে। একবার এসেছিলাম মণিপুর বার্মা এবং নাগাল্যান্ড, এই দুই প্রদেশ এবং এক দেশে যার বিচরণ ছিল, এমন এক নরখাদক বাঘ মারতে। অবশ্যই একা আসিনি। সঙ্গে আরও নানাজনে এসেছিলেন। তাদের নামোল্লেখ করছি না। কারণ, করলে, আপনি বোর হবেন প্রথমত, এবং দ্বিতীয়ত ভাবতেও পারেন যে, নেমড্রপিং করছি।

ডি. জি. হেসে বললেন, নেমড্রপিং করেন তাঁরাই, যাঁরা নিজেরা নন-এনটিটি। আপনি কোন দুঃখে নেমড্রপিং করতে যাবেন?

ঋজুদা হেসে বলল, সেই সব সময়েই আলাপ হয়েছিল থেংনোপাল-এর অত্যন্ত অবস্থাপন্ন চাষি রঘুমণি এবং আরও কত অগণ্য মানুষের সঙ্গে। থংগল-বাজার ও পাওনা-বাজার এবং খইরামবন্দ-বাজারের বহু ব্যবসায়ীর সঙ্গে। এই তথ্যটা, আমাকে যে নিয়োগ করেছেন, তিনি আগে জানলে হয়তো, প্রকৃত খুনিকে ধরবার জন্যে, নিজে অপাপবিদ্ধ বলে নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে, ওভার-কনভিডেন্ট হয়ে আমাকে ডেকে এনে নিজের বিপদ ঘটাতেন না।

আপনাকে আপ্যায়ন করেছেন কে? যদি আপত্তি না থাকে তা জানতে পারি কি, মিস্টার বোস?

প্রথমত, আপত্তি আছে স্বাভাবিক কারণে, তাঁর নাম এখনই জানাতে। দ্বিতীয়ত, আমার কাছে যিনি গেছিলেন প্রকৃত নিয়োগকারীর একজন দূত মাত্র। তিনি আসলে কার হয়ে সে কাজটি করেছিলেন, সে সম্বন্ধে এখনও আমি নিঃসংশয় নই। তবে নিঃসংশয় হব। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন হবে, কারণ আমার মনে হওয়া, অর্থাৎ ASSUMPTIONS-কে সত্যে পরিণত করতে পারবে, আপনার বিভাগের অফিসারদের জেরাই! অপরাধী সবসময়েই মিথ্যা বলবে, অপরাধ অস্বীকার করবে, কিন্তু আমার দেওয়া Clueগুলো নিয়ে আপনার অফিসারেরা যদি সিরিয়াসলি, ওঁদের পেশাদারি যোগ্যতা এবং সততা, আই রিপিট স্যার, সততা, যদি সততার সঙ্গে এগোন, তা হলে আমার কাজ আর বারো ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

তারপরই থেমে বলল, আশা করি, আপনার সঙ্গে আমার আগের মিটিং-এ যে কটি অনুরোধ করেছিলাম, তা ঠিকঠাক পালন করবার জন্যে আপনার

অফিসারদের বলে দিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে। এবং এমন সিক্রেসির সঙ্গে তা করা হয়েছে যে, ক্রাইম ডিটেকশনের যে সব অফিসারেরা সাধারণত এই সব কাজে যুক্ত থাকেন, তাঁদের পর্যন্ত জানানো হয়নি। য়্যু মে রেস্ট অ্যাসিওরড, মিস্টার বোস। দিনে রাতের চব্বিশ ঘণ্টা...

আরও চব্বিশ ঘণ্টা লাগবে না।...

আমার আই. জি. ক্রাইম কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন না?

না, না, তা রাখছেন। ওঁর নিজের রাখার প্রয়োজন নেই। যাঁদের রাখার, তাঁরা রাখছেন।

তবু, যখনই দরকার হবে আমাকে ফোন করবেন। যদি কোনও কারণে আমাকে না পান তবে আমার পি. এ-কে জানাবেন। আপনার কথা তাকে সবই বলা আছে। উনি জানেনও, সঙ্গে সঙ্গে কাজ হবে। আমি না থাকলে আমার ডায়রেক্ট লাইনের কল উনিই ওঠাবেন। দিনে রাতে দুজনে থাকেন। টোয়েন্টি-ফোর আওয়ার্স। আপনি শুধু বলবেন আর. বি. বলছি—ডি. জি-কে এই মেসেজটা দিয়ে দেবেন।

থ্যাঙ্ক য়্যু স্যার।

ঋজুদা বলল।

ঋজুদা ঘুম থেকে উঠল, প্রায় আটটাতে। এমনটি কখনওই করে না। গতরাতে যদিও আমাদের পৌঁছতে এমন কিছু দেরি হয়নি, কাঙ্গপোকপিতে।

গতরাতে ইম্ফল আসবার সময়ে আমরা মৈরাঙ্গখম-এ তম্বি সিং-এর সঙ্গে ও দেখা করে এসেছিলাম। সে এক অভিজ্ঞতা।

না বলে-কয়ে যাওয়াতে তম্বি সিং চমকে গেলেন। এই তম্বি সিং সেই শহুরে তম্বি সিং নন। একেবারেই অন্য তম্বি সিং। ঋজুদা তাঁর ভেকটা কলকাতায় প্রথম দর্শনেই ধরে ফেলেছিল যে তা এখন বোঝা গেল।

পরনে এখন ধুতি তাঁর। গায়ে ছিটের একটা বগল-ছেঁড়া শার্ট। হাতে, পাহাড়িদের মতো পাইপ। তামার তার দিয়ে বাঁধা, ঋজুদা যেমন বলেছিল, থুথুতে-তামাকে একাকার। কখনও বোধহয় পাইপটা পরিষ্কারও করেন না তম্বি সিং, পাইপ ক্লিনার দিয়ে। টেবলের ওপরে একটা বোতল। লাল-রঙা কিছু তার মধ্যে। পানীয়। তম্বি সিং-এর উলটোদিকের চেয়ারে বসে একজন বুড়ো চেকচেক লুঙ্গি-পরা। মাথায় বার্মিজ টুপি। গায়ে লাল-রঙা হাফশার্ট।

ঋজুদাকে দেখেই, দুজনেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন।

বয়সও হয়েছে দুজনেরই। মনে হচ্ছে, আর্থারাইটিসও আছে।

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল।

তম্বি সিং-এর উলটোদিকে-বসা সেই বুড়োকে ঋজুদা বলল, আমার কাজটা কি করেছ? কী উ-মঙ্গ, শরীর ভাল তো?

না কাজটা করিনি। সেই জন্যেই তো মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে এখানে চলে এলাম।

তোমার উপরে ইবোহাল সিং-এর বাড়ির জিম্মা, আর তুমি...

না। এখানে এলাম, কারণ, কাজ নেই সেখানে। তম্বি সিং-এরও শরীরটা ভাল না। আসার আরও একটা কারণ, থাঙ্গজম সিং-এর সঙ্গে দেখা করা। এত বড় শোক! আর জানাশোনা তো আমাদের সঙ্গে কম দিনের নয়! একটা মাত্র ছেলে, এরকম...

ভালই করেছ।

তা, মোরের বাড়ি এখন দেখছে কে?

আমার এক ভাইপোকে রেখে এসেছি। ঝাড়পোঁছ করবে। আর কাউকে যে ঠিক করব পয়সা দিয়ে, উপায় তারও নেই। বাড়ির মালিক যে কে, তাইতো জানি না। আমি টাকাই বা পাব কোথা থেকে?

ঋজুদা কী যেন বলতে গেছিল, বলতে গিয়েই থেমে গেল। উ-মঙ্গ নামক বার্মিজ লোকটা ঋজুদার দিকে চোখ তুলে চাইল।

তা হলে আমি চলি। তোমরাও বেরোবে। সাড়ে সাতটা তো বাজে।

এই ছেলেটা কে? আপনার ছেলে?

না, না, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। এও গোয়েন্দা।

আর সেদিন যাঁকে এনেছিলেন?

উ-মঙ্গ বলল।

সেও। তারপরে বলল, চলি। তোমরা বেরোবে না?

ইচ্ছে করেই দেরি করে যাব একটু। যাতে ভিড় কমে। এ সব দুর্গন্ধ পানীয় খেয়ে দশজনের সামনে শোকের বাড়িতে যেতে চাই না।

ঠিক।

আমার কেস-এর সল্যুশানের কী হল? কাঙ্গপোকপিতে যত্ন-আত্তির ত্রুটি হচ্ছে না তো? তম্বি সিং বললেন।

বিন্দুমাত্র না।

হ্যাঁ। পাইপে একটা টান দিয়ে তম্বি সিং বলল, হয়। যত্ন-আত্তি সকলেরই হয়। নিজের বাপের ছাড়া।

বলেই বলল, একটু ভাল তামাক দিন তো মি: বোস আপনার। কী তামাক এটা? ভারী সুগন্ধ ছাড়ছে তো!

হ্যাঁ, কিন্তু আমি যে তামাকটা খাই, সেটা পাইনি বলেই এটা খাচ্ছি। এইটা, যে-মানুষেরা কাছে থাকেন তাঁদের খুশির জন্যে যতটা খাওয়া, তাঁর নিজের জন্য ততটা নয়।

তাই? নাম কী এই তামাকের?

অ্যাম্ফোরা। ডাচ তামাক।

সেটা কোথায়?

ডাচ আবার কোন দেশ?

ডাচ কোনও দেশের নাম নয়?

না না। ডাচ মানে, হল্যান্ডের মানুষ, জিনিস।

ও, আই সি।

বার্মিজ লোকটা কড়া এবং খুব কটুগন্ধের সিগার খাচ্ছিল।

আমার অবাক লাগল, তম্বি সিং-এর পোশাক ও রাজাগিরির এমন হঠাৎ পরিবর্তন সম্বন্ধে ঋজুদা একটিও প্রশ্ন করল না দেখে।

চলি আমরা তা হলে।

ঋজুদা বলল।

আচ্ছা।

এবারও দুজনে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াতে গেল।

ঋজুদা মানা করল।

আজ দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর, আমরা সকলে মিলে কোহিমাতে গেছিলাম। নাগাল্যান্ডের রাজধানী। "মাও"তে বর্ডার পেরিয়ে। সিকিওরিটির বড় কড়াকড়ি, বর্ডারে। অদ্ভুত অদ্ভুত নাম সব এদিকের জায়গাগুলোর। গভীর জঙ্গল, পাহাড়, উপত্যকা আর শুধুই মিলিটারি, চারদিকে। নাগা টেররিজমও চলছে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর হয়ে গেল। এখন মণিপুরে নাগা-কুকিদের লড়াই জোরদার হয়েছে। কুকিরাও বাধ্য হয়ে টেররিস্ট হয়েছে।

ভটকাই বলল, কী সব নাম রে বাবা!

মারান, মাও, খুজামা, জুকুমা, কিগওয়েমা, তারপরে কোহিমা।

কোহিমাতে পৌঁছে সিমেট্রি দেখতে গেলাম আমরা। কবরখানা। বাচ্চাবাচ্চা সব ইংরেজ, স্কটিশ, ওয়েলস ছেলেদের কবরে, তাদের মা-বাবারা যা লিখে পাঠিয়েছেন এবং লেখা আছে স্মৃতি ফলকে, মার্বল ট্যাবে তা পড়লে, চোখে জল আসে।

ঋজুদা বলল, এইরকম সিমেটরি এবং এর চেয়ে অনেকেই বড় আছে। ইম্ফলেও। পারলে, দেখিস।

ভটকাই বলল, তোরা তো দেখলিই না এখনও, 'মোরে'র পথের দুপাশে কত ট্যাঙ্ক পড়ে আছে দুপক্ষেরই। জাপানিরা তো প্রায় ডিমাপুর অবধি পৌঁছে গেছিল। সেখানেই তো রেইল-হেড। পৌঁছতে পারলে আর কথাই ছিল না। দুপক্ষেরই কত সৈন্য মরেছে তখন, আর মরেছে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে বার্মা থেকে যারা

ওই পথেই মান্দালয় হয়ে, তামু হয়ে, মোরে হয়ে বার্মা ছেড়ে পালিয়ে আসতে চেয়েছিল, প্রাণ নিয়ে। গুলিতে, বোমাতে, মাইনে মরেছে অগণ্য মানুষ। তার চেয়েও বেশি মরেছে পথে, অসুখে, খিদেতে, জলের অভাবে।

সানাহানবি বলল, এইসব কবরখানা দেখে একটা কথাই মনে হয় বারে বারে, যুদ্ধ করে মূর্খরা। সে নিজের ঘরের মধ্যে যুদ্ধই হোক আর সিভিল ওয়ারই হোক অথবা একদেশের সঙ্গে অন্য দেশের যুদ্ধই হোক। এখনও যদি মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে, তো আর হবে না কোনওদিনও।

ঠিকই।

ঋজুদা বলল।

ফিরে আসার সময়ে, দারুণ মেঘ করে বৃষ্টি এল। আর সে বৃষ্টির কী শোভা! নাগাল্যান্ডের এলাকা তখনও ছাড়াইনি আমরা, একটা জায়গাতে পৌঁছেই তীব্র সুগন্ধে, যেন চমকে উঠলাম সকলে।

এ কী?

তীব্র চিৎকার করে উঠল ভটকাই। ওর চিৎকারে আমাদের হার্ট ফেল হবার জোগাড় হল।

কীসের গন্ধ?

তিতির শুধোল, সানাহানবিকে। মারুতি জিপসিটা সেই চালাচ্ছিল।

পেছন থেকে ঋজুদা বলল, চাঁপা।

আমি বললাম, কী চাঁপা?

কনকচাঁপা।

কনকচাঁপা? দেখি। দেখি বলে, ভটকাই এমন করে তার ঘাড় সারসের মতো লম্বা করল, যে মনে হল ছিঁড়েই যাবে। তারপর ঘাড় ভিতরে করে বলল, সেই ছেলেবেলাতে পড়েছিলুম "বাঁশবনের কাছে, ভুঁড়োশেয়ালি নাচে, তার গোঁফজোড়াটি পাকা, তার মাথায় কনকচাঁপা।"

তারপরই বলল, আমাদের বাড়ির দুগ্গন্দ চাঁপাকে নিয়ে একবার এই চাঁপার গন্ধ শুঁকিয়ে নিয়ে যেতেই হবে।

দুগ্গন্দ চাঁপা মানে?

তিতির বলল।

আমাদের ঠিকে ঝি। ঈসসরে, কী দুগ্গন্দ যে হতে পারে, তা না শুঁকলে বিশ্বাস করবি না। তার মাথায় দুগ্গন্দ। তার গায়ে দুগ্গন্দ, তার শাড়িতে দুগ্গন্দ...

থাম। থাম। বললাম আমি।

ভটকাই-এর এই দোষ। আরম্ভটা ভালই করে, কিন্তু কোথায় যে থামতে হবে তা জানে না।

তিতির, সানাহানবিকে ইংরিজিতে অনুবাদ করে করে, ভটকাইয়ের রসিকতা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আর সানাহানবি হেসে কুটোপাটি হচ্ছিল।

হাসলে যে সানাহানবিকে কী সুন্দরই দেখায়!

সকলের হাসি থামলে সানাহানবি বলল, আরও মাসখানেক আগে এলে কদমফুলের গন্ধ পেতে। মাইলের পর মাইল কদমের বন আছে, এই সব বনে। পাগল হয়ে যেতে তা হলে। মিস্টার হাচিনসন আমার মাকে ডাকতেন 'কাডাম্বা' বলে। 'কাডাম্বা' মানে, স্যাংস্ক্রিট কডম্ব। উচ্চারণ করতে পারতেন না তো ঠিক মতো।

ভটকাই হেসে উঠল। বিড়বিড়িয়ে বলল, গোয়েন্দাগিরিতে ফেল করলাম বটে আমরা তবে কনকচাঁপা আর কদম্বগাছের স্বপ্ন নিয়ে ফিরে যাব। খালি হাতে যে যাব না তাই বা কম কী!

বিকেল বেলাটা, দুপুরের হেভি-লাঞ্চের পরে আমি আর ভটকাই ঘুমিয়ে কাটালাম। কাজ থাকলে ঋজুদা বলত। তবে ঋজুদা সানাহানবিকে নিয়ে লাঞ্চের পরই ফার্মে গেছিল। ঘুমের মাঝে আমি একবার বাথরুমে গেছিলাম। বিছানাতে ফেরার সময়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি, অনেক নীচে ঋজুদা আর সানাহানবি সাদা রং-করা একটা কাঠের বেঞ্চে বসে আছে, উপত্যকার কাছে। তাদের গায়ের কাছ দিয়ে বয়ে বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ি ঝোরা। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর গাছগাছালি থেকে টুপ-টাপ জল ঝরছে। ঋজুদাই মনে হল কথা বলছে, সানাহানবি শুনছে। হলুদরঙা প্রজাপতি উড়ছে একঝাঁক।

আমার মন বলল, একটা হেস্তনেস্ত হতে চলেছে। আমাদের আসাটা ব্যর্থ হবে না। কারণ, আমি যেন ঋজুদাকে একবার বলতেও শুনলাম তিতিরকে, দুপুরে ভাল করে ঘুমিয়ে নে তিতির, রাত জাগতে হতে পারে। ঘুম থেকে উঠে, আমি আর ভটকাই বারান্দাতে বসে আছি। চায়ের সময় হয়ে গেছে। অথচ নেতা না এলে চা খাওয়ার কথা বলাও যাচ্ছে না। ভটকাই বিড়বিড় করে নিজের মনেই একটার পর একটা কল্পিত খাবারের নাম বলে চলেছে, যা এই বৃষ্টি-ভেজা পূর্ব-পার্বতী কাঙ্গপোকপির বারান্দায় বসে চা-এর সঙ্গে খাওয়া চলে। ঠিক সেই সময়ে খুব জোরে একটা গাড়ি মোরম বিছানো পথে টায়ারের শব্দ তুলে এসে ঢুকল। আমি আর ভটকাই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। আমার পিস্তলটা বালিশের নীচে রেখে দুপুরে ঘুমিয়ে ছিলাম। দৌড়ে গেলাম সেটাকে আনতে। ফিরেই দেখি, একটি সাদা মারুতি। মারুতি পার্ক করে থৈবী দৈবী নামলেন। একটা সাদা শাড়ি। উস্কোখুস্কো চুল। লাল চোখ।

থৈবী বললেন ইংরেজিতে, সানাহানবি কোথায়? আপনারা কারা?

আমি বললাম, আমরা মিস্টার ঋজু বোসের সঙ্গে এসেছি। মিস্টার বোস আর সানাহানবি ফার্মে গেছেন। আপনি বসুন না ড্রয়িংরুমে। লোকজনদের ডাকব কি?

এমন সময় তিতির তার ঘর থেকে বেরুলো। শাড়ি পরে। একটা হলুদের উপর হালকা সাদা পোলকা ডট-এর মুর্শিদাবাদ সিল্ক-এর শাড়ি। গায়ে সাদা ব্লাউজ। হাত কাটা।

বলল, হাই।

হাই, বলল থৈবী। বলেই বলল, মাই নেম ইজ থৈ...

আমি বললাম, আপনার বিষয়ে, আপনার পরিবারের লোক-এর বিষয়ে আমরা সকলেই জানি। মিস্টার বোস তো খবরটা শোনার পর আপনাদের বাড়িও গেছিলেন।

থৈবী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, উইল সামওয়ান টেল দ্যা কুক টু ব্রিঙ্গ মি আ পটফুল অফ কফি।

তিতির বলল, আমি নিয়ে আসছি। আপনি বসুন। আমার নাম তিতির সেন। আমিও মিস্টার বোসের সঙ্গেই এসেছি।

ও।

আমি বললাম, দেখে মনে হচ্ছে সারারাত আপনার ঘুম হয়নি।

না। হবে কী করে? হওয়ার কথা তো নয়। আমার বউদিটা! এত ভাল মেয়ে। বেচারি।

আর বাবার কথাও তো ভাববার।

ভটকাই বলল, তার বাগবাজারি হিন্দিতে। এত হিন্দি ফিল্ম দেখে, তবুও হিন্দি উচ্চারণটা ঠিক করতে পারল না।

থৈবী দেবী বললেন, না, বাবার কথা আলাদা। বাবা মানুষ নন। মানুষের দুঃখকষ্ট তাঁকে ছোঁয় না।

বলছেন, সুপারম্যান?

তা আমি জানি না। তুষারমানবও হতে পারেন।

ইয়েতি?

ভটকাই বলল।

আমি ওর হাঁটুতে চিমটি কেটে চুপ করতে বললাম। কোন কথার পিঠে কোন কথা বলতে হয় সেটুকুও শিখল না।

থৈবী দেবীর মুখে শেষ-বেলার সিঁদুরে আলো এসে পড়েছিল, সেদিন যেমন পড়েছিল সানাহানবির মুখে। কী বীভৎস দানবীর মতো দেখাচ্ছিল থৈবীকে। যতই বড়লোক হোক, যতই বাড়িতে ছ'খানা গাড়ি থাকুক না কেন, ঐশ্বর্য মানুষকে কিছু দিতে পারে। সব নয়। চেহারা, ব্যবহার, চালচলন, চরিত্র এই সব মিলিয়েই সম্ভ্রান্ততার সৃষ্টি হয়। শুধু টাকা, শুধু সম্পত্তি, শুধু যশ, যা ন্যায্যমূল্যে পাওয়া হয়নি, তা আর যাই দিক, সম্ভ্রান্ততা কোনও মানুষকেই দিতে পারে না। তার জ্বলন্ত উদাহরণ চোখের সামনে এই থৈবী দেবী।

তিতির নিজে ট্রেতে করে কফির কাপ আর বিস্কিট নিয়ে আসছিল। পেছনে পেছনে কুলা সিং।

থৈবী বলল, টাইগারের কবরে কি মার্বল ফলকটা বসে গেছে?

তিতিরই বলল, না, না আপনার জন্যেই তো উনি অপেক্ষা করছেন। তা ছাড়া,

শুনলাম মার্বল-ট্যাবটা আসেওনি। যা শুরু হয়েছে সারা মণিপুর জুড়ে।

তা ঠিক। আপনারা বহিরাগত। আপনাদের উচিত, যত তাড়াতাড়ি পারেন এখান থেকে চলে যাওয়া। পারলে, আজই চলে যান ইম্ফল। যাতে প্লেন ধরে কলকাতা পৌঁছতে পারেন।

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছিল যে, তাইতো যাচ্ছি। কিন্তু ঋজুদার ট্রেনিং, প্রাণ যাবে তো, মুখ দিয়ে কথা বেরোবে না। তিতির আর ভটকাইও যা জানে না, তা থৈবী দেবীকে বলতে যাব কেন? আর উনি তো আমাদের বিদেয় করতে পারলেই বাঁচেন।

ইতিমধ্যে ঋজুদা আর সানাহানবি ফিরে এল। সারা দুপুর দুজনে কী যে এত কথা বলল, কে জানে। কিন্তু সানাহানবির চোখ দুটি তখনও ভিজে ছিল। বোঝাই গেল যে, একটু আগেই কাঁদছিল।

কিন্তু কেন?

কিন্তু কেন? কথা না বলে আমি তিতিরের মুখের দিকে তাকালাম।

কিন্তু কেন? কথা না বলে ভটকাই, আমার মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু কেন? কথা না বলে আমি ঋজুদার মুখের দিকে তাকালাম, কারণ ঋজুদাকে আমিই সবচেয়ে বেশি দিন থেকে জানি।

কিন্তু আমিও এই প্রথমবার, ঋজুদার চোখের ভাষা পড়তে পড়লাম না।

সানাহানবিকে দেখতে পেয়েই থৈবী উঠে দাঁড়াল। সানাহানবি তার ওভারশ্যুটা তারের পাপোষের উপরেই খুলে রেখে, বড় বড় পায়ে এগিয়ে এল থৈবীর দিকে। তারপর দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। একজন কাঁদতে লাগল, গ্রাম্য অশিক্ষিত রমণীর মতো চিৎকার করে, প্রেতিনীর মতো। আর অন্যজন দেবীর মতো; নিরুচ্চারে।

আমি তিতির আর ভটকাই একটু হাঁটতে বেরোলাম।

ভটকাই বলল, জানিস তো, ঋজুদা বলছিল যে, এখানে থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের চলে যেতে হবে।

কেন? গদাধরদার অসুখের জন্যে?

সেজন্যে তো বটেই, তবে শুধু সেই জন্যেই নয়।

তার মানে?

মানে, মণিপুরের অবস্থা প্রতিদিনই খারাপের দিকে যাচ্ছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ রীতিমতো অরাজক অবস্থা হয়ে যাবে। মানে, সেই গোপাল ভাঁড়ের গল্পের মতো অবস্থা আর কী। "কে দেখবে মান্নার জাত? কে দেয় কার পেছনে হাত।"

আঃ। ভটকাই। মেয়েদের সামনে কী ভাবে কথা বলতে হয়, তাও শিখলে না। তিতির বলল।

তোমরা কখন যে কী ভেক ধরো, তা বোঝা আমার মতো মাথামোটা মানুষের

কর্ম নয়। চাকরি পাওয়ার বেলাতে ছেলে। "রুআহা"-তে রুদ্রর চেয়ে কোনও অংশে কম ছেলে নও। অথচ আবার ট্রামের সিটের বেলাতে, ঘোরতর মেয়ে। তোমাদের তল পাওয়া ভার।

আমি বললাম, পৃথিবীতে এত ও এতরকম ঝগড়া চলছে তার মধ্যে বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে এমন কাজিয়ার দরকার কী আছে? বন্ধ কর। ওই শোন কতরকম পাখি ডাকছে।

ভটকাই চটেই ছিল। বলল, হুঃ। শোন তোর স্বপ্নের পাখির ডাক। পাখি-ফাখি আর আছে না কি? সব মেরে আর খেয়ে হাপিস করে দিয়েছে।

ভটকাই বলল, কেন জানি না, প্রথম দর্শন থেকেই আমার ওই ডাইনিকেই সন্দেহ হচ্ছে। তোদের হচ্ছে না কারও?

আমাদেরও হচ্ছে নিশ্চয়ই, কাউকে না কাউকে, তবে সেটা তোর মতের সঙ্গে মিলতে নাও পারে।

ভটকাই বলল, তোমার কী গেসস, তিতির?

আমার কেন জানি না...

কী? বলেই ফেল না। নিজেদের মধ্যেও আলোচনা না করলে এসে লাভ কী হল। ঋজুদাকে তো একাই আসতে দেওয়া উচিত ছিল তা হলে।

হয়তো তাই ছিল। আমরা কোন উপকারে আসছি ঋজুকাকার?

আহা, ঝেড়ে কাশো না। তোমার কাকে সন্দেহ হয়?

তোমার লেডি ডাই, সানাহানবিকে।

আর রুদ্র, তোর?

আমার তো কোনও চয়েসই রইল না। এবার তো ঋজুদা তোকে গোয়েন্দা বানাবার জন্যে তোকেই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছে, তোর সঙ্গে শলাপরমার্শ করছে, তুইই ভাল জানবি।

ন্যাকামি না করে, বলবি? তোর মতো হিঃ আর দুটো নেই।

'হিঃ' মানে, হিংসুক আর কী?

তাতো বলবিই। ছিলি বাগবাজারের রকবাজ, ঋজুদার হাতে পায়ে ধরে দলে ভেড়ালাম। এমন করেই তো বন্ধুকৃত্য করবি।

আচ্ছা ইয়ে তো তুই। বলবি কি না বল?

আমার সন্দেহ হয় তোর জালি-তম্বিকে। সেই যেদিন কলকাতায় গেছিলেন, সেইদিন থেকেই।

হুঁ, আচ্ছা এবার মনে মনে ভাব। আমাদের প্রত্যেকেরই এই মনে হওয়ার মধ্যে কোথায় কোথায় ফাঁক থাকতে পারে।

তিতির বলল, ওক্কে!

আমরা বাংলোতে ফিরে গিয়ে দেখলাম সানাহানবি আর থৈবী. থৈবীর ঘরের মধ্যেই ছিল।

এক কাপ করে চা খেয়ে আবার একটু হাঁটিতে বেরুলাম। ঋজুদাও সঙ্গে এল।

ঋজুদা বলল, ভটকাই, তুই আমার সঙ্গে থাকবি। তিতির আর রুদ্র ফিরে যাবে বাংলোতে। রুদ্র, তুই তোর পিস্তলটা তিতিরকে দিয়ে দিবি। তিতির, তুই যদি দেখিস যে, সানাহানবি বা থৈবীর কোনও ক্ষতি করতে আসছে কেউ, সে তোর কোনও পরিচিত লোক হলেও, সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে দ্বিধা করবি না। আর তোর ঘর থেকে সন্ধের পর থেকেই কবরটার দিকে নজর রাখবি।

সন্ধের পর থেকেই চাঁদ যা জোর হবে। তোর দেখতে কোনও অসুবিধা হবে না।

ভটকাই বলল।

আকাশের অবস্থা দেখেছিস। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে এবং সে বৃষ্টি চলবে সারারাত।

ঋজুদা বলল।

কী করে বুঝলে?

ভটকাই শুধোল।

এখন বেশি কথা বলার সময় নয়। যা বলছি শুনতে দে ওদের। যদি কবরটা কেউ খুঁড়তে আসে তা হলে নজর রাখবি। কিছু বলবি না। কবরটা খুঁড়ে ওরা গ্রেট-ডেন কুকুরটাকে বের করবে। কী যেন নাম তার?

টাইগার।

ভটকাই বলল।

হ্যাঁ, টাইগার।

টাইগারকে খুঁড়ে বের করলে বিচ্ছিরি পচা গন্ধ বেরুবে না?

ভটকাই আবারও বলল।

তা, বেরুবে। কিন্তু—তুই চুপ করবি ভটকাই? তবুও তখনও তাদের কিছু বলবি না। যখন তারা কুকুরটার গলা অথবা পেট চিরে ফেলার আয়োজন করবে তখনই তিতির আর রুদ্র, উপরে নয় কিন্তু তাদের খুব কাছে, মাটিতে গুলি করবি। তাদের ওয়ার্নিং দেবারও কোনও দরকার নেই। বাড়ির চাকর-বাকরদেরও কিছু বলার দরকার নেই। আমার ধারণা, যারা আসবে তারা রাত এগারোটার পরে আসবে। পিস্তলটা কে নিবি, ঠিক করে নিস।

"কেনেলে" অতগুলো কুকুর, তারা কি লম্ফঝম্প করবে না? ডাকবে না? তাতেই তো পালাবে আগন্তুকেরা।

না। আজ রাতে কোনও কুকুরই যাতে না ডাকে, তার বন্দোবস্ত আমি করে রেখেছি। তা নিয়ে কারওই চিন্তা নেই। তোরা এবারে যা, সন্ধে হয়ে এল। তোরা তো ভাল বাবুর্চির খানা খাবি, পেটে কিল দিয়ে জেগে থাকতে হবে ভটকাই-এর।

তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করলে কী বলব?

তিতির শুধোল।

বলবি, আমরা বিশেষ কাজে ইম্ফলে গেছি। যা রুদ্র, জিপসিটা নিয়ে আয় বাড়ি থেকে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই রুদ্র জিপসি নিয়ে এলে, ঋজুদা উঠে বসে ভটকাইকে উঠে পড়তে বলল।

ভটকাই বলল, রাতে ঠাণ্ডা লাগবে না? সোয়েটারটা নিয়ে আসব?

কিছু আনবে না। খিদে-তৃষ্ণা-গরম-ঠাণ্ডা এ সব থাকলে গোয়েন্দা হবার শিক্ষানবিশি করা যায় না। বুঝেছ!

আমি আর তিতির বাংলোয় ফিরে গল্প ফাঁদলাম যে, ঋজুদারা হাইওয়ের উপরের এস. টি. ডি. বুথ থেকে কলকাতাতে গদাধরদার খোঁজ নিতে গেছে। যদি তার জ্বর ভাল না হয়ে গিয়ে থাকে তবে হয়তো সোজা ইম্ফলেই যাবে, কালকের টিকিটের বন্দোবস্ত করতে।

কালকেই!

খুব হতাশ ও আশাভঙ্গতার গলাতে বলল, সানাহানবি।

বলেই, থৈবীকে কী যেন বলতে গিয়ে, থেমে গিয়ে বলল, যদিও বয়সে আমার চেয়ে অনেকই বড় হবেন, কিন্তু মিস্টার ঋজু বোসের প্রেমেই পড়ে গেছি আমি।

তিতির হেসে বলল, নো ওয়ান্ডার। অনেকেই পড়েন।

থৈবী দুঃখের মধ্যেই হেসে উঠল।

সানাহানবি হাসল না। ওর চোয়ালদুটি শক্ত হয়ে এল।

ভটকাইকে না-খেয়ে থাকতে হয়নি। জিপসি নিয়ে কাংলোটোংবির সেই ধাবাতে আজকে আন্ডা কারী আর তড়কা-রোটি খেয়েছিল ওরা। তারপর কাংলোটংবী আর কাঙ্গপোকপির মধ্যে, হাচিনসনন'স লজ-এর কাছেই একটা সরু কাঁচা পথের মধ্যে ঢুকিয়ে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে জিপসিটাকে পার্ক করে, ঋজুদা ভটকাইকে সঙ্গে করে এগোল। ঋজুদার ভবিষ্যদ্বাণী আজ ফলেনি। আকাশে এখনও ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ঋজুদা বলল, চল, আলো থাকতে থাকতে আমরা নীচে নেমে যাই। তোকে পদে পদে আছাড় খেয়ে নাক-দাঁত ভাঙতে হবে না।

সাবধানে নামতে নামতে ভটকাই বলল, এখন কী হবে, ঋজুদা?

আলো থাকলেও, পিছল কম নয়; পাথুরে মাটিতে।

ঋজুদা বলল শনৈঃ, শনৈঃ।

ভটকাই নিজের কথাগুলো, এই যাত্রায় দুবার গিলল।

যে-বেঞ্চে ঋজুদা আর সানাহানবি বসেছিল বিকেলে, সেই বেঞ্চ অবধি

পৌঁছেই, ভটকাই ভীষণ হাঁপাতে লাগল। খাবার খাওয়া ততক্ষণে হজম হয়ে গেছে।

ঋজুদা বলল, তোকে দেখে মনে হচ্ছে, তুই আমার জ্যাঠামশাই। কম খাবি। শিকারই বল, গোয়েন্দাগিরিই বল, চাই কি ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্যেই বল, কম খাওয়াটা খুবই জরুরি। বিকাম আ বিলিভার ইন কোয়ালিটি, নট ইন কোয়ানটিটি। এই বেঞ্চটাতে ইচ্ছে করলে শুয়ে থাকতে পারিস। তোর সাদা জামাটা খুলে, খালি গায়ে শুয়ে পড়।

এ মাঃ! ভেজা যে!

তা হলে, বসে থাক। কারণ, জামাটা খুলতেই হবে। চাঁদের আলো যদি এমনই থাকে, তবে রুদ্রও তোকে দেখতে পাবে বাংলো থেকে। সাদা রঙের মতো এমন সহজে দৃষ্টিগোচর আর কিছু তো নেই।

কেন? সাদা মন? আমার মতন। সেটাতো কারও চোখে পড়ে না! সাদা জামাটাই শুধু পড়ে।

আমরাও তো তোমাদের দেখছিলাম। দুপুরে।

আমাদের?

হ্যাঁ। তোমাকে আর সানাহানবিকে। তোমরা যখন দুপুরে এই বেঞ্চটাকে বসে, সারা দুপুর গল্প করছিলে।

ঋজুদা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, তাই?

ইয়েস।

ভটকাই বলল, আচ্ছা ঋজুদা এখানে টেররিজম চলছে—এত দৌরাত্ম্য টেররটিরস্টদের, কেন?

সেতো অনেক লম্বা কাহিনী রে। নাগাল্যান্ডে তো ছিলই। আমরা যখন স্কুলের ছাত্র, প্রায় তখন থেকেই বলা হত, insurgency। নাগারা আলাদা রাজ্য চেয়ে টেররিজম শুরু করেছিল। এবং তার পেছনে চীনের ও বার্মারও হয়তো মদত ছিল। আজকে যে সারা ভারত জুড়ে এই বিচ্ছিন্নতাবাদ, ভারতবর্ষ যে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার মুখে, তার জন্যে কিন্তু ইংরেজরাই দায়ী। স্বাধীনতা তারা দিয়ে গেছিল বটে এবং সেই দেশকে টুকরো করা স্বাধীনতা নেবার জন্যে নেতাদের আকুলি বিকুলিও কম ছিল না, কিন্তু সেই খণ্ড স্বাধীনতার মধ্যে, তোর পান্তুয়ার মধ্যে লুকিয়ে রাখা ডালকুলাক্স-এরই মতো; খণ্ড-বীজ লুকোনো ছিল। ওরা বলত, "ডিভাইড অ্যান্ড রুল।"

অবশ্য এখনকার সন্ত্রাসবাদীরা অধুনা ভারতবর্ষকেও একই অপবাদ দেয়। তবে এই এখনকার মারামারিটা নাগা আর কুকিদের মধ্যে। কুকিরা যাযাবর ছিল। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে পাহাড়ে বসতি গড়ত। ওদের কোনও কোনও প্রবক্তারা বলেন যে, চীন হিলস থেকে ১৮৩০-১৮৪০ নাগাদ ওরা মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে বসে। তবে কুকিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পছন্দ করে।

নাগাদের মতো বিরাট গ্রাম কুকিদের মধ্যে পাবি না।

এই গোলমালটার বাড়াবাড়ি হয়েছে জুন মাসের গোড়া থেকে, নাগাদের এন. এস. সি. এন. আছে, ন্যাশনালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড, মুইভা ফ্যাকশন কুকিরা কিন্তু কোনওদিনই এমন দাবি করেনি যে, তাঁদের আলাদা রাজ্য চাই। মণিপুরের মতো। নাগাল্যান্ডেও অনেক কুকি আছে। কুকিদের নাগাল্যান্ডের অন্যতম উপজাতি বলে স্বীকারও করা হয়। নাগা ও কুকিরা অধিকাংশই কিন্তু খ্রিস্টান। যাই হোক, তেসরা জুন ওনথুলেট হাওকিপকে, যিনি একজন কুকি স্কুলমাস্টার ছিলেন, নাগারা বলজাঙ্গ বলে একটা গ্রামে খুন করে, তুলে নিয়ে গিয়ে। নাগারা বলছেন যে, এন. এস. সি. এন. (নাগা সন্ত্রাসবাদীদল) আর কে. এন. এ. (কুকি ন্যাশনালিস্ট আর্মি) কুকিদের সন্ত্রাসবাদী দলের মধ্যে লড়াইয়ে হাওকিপ খুন হন। যাই হোক, এই খুনের পরে কুকি ছাত্ররা মণিপুরের চান্ডেল জেলাতে (যার মধ্যে "মোরে"ও পড়ে) "বনধ" ডাকে পরদিন এবং তখন থেকেই এই গণ্ডগোল বাড়তে থাকে। প্রতিদিনই এই গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ছে। মাস দুয়েকের মধ্যে মণিপুরেই প্রায় একশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে, আহত যে কত হয়েছে, কত মানুষ গৃহহীন হয়েছে; তার ইয়ত্তা নেই। সবচেয়ে বড় কথা এই গোলমালের পরিবেশে চাষবাসও করতে পারছে না এবং মণিপুর মূলত কৃষি রাজ্য—তোদের বলছিলাম না—মণিপুরকে আগে বলত "দ্যা গ্রানারি অফ দি ইস্ট"—পারছে না বলেই দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়বে বৃষ্টির পরই। যখন ধান কাটবার সময়—তখন ধানই থাকবে না ক্ষেতে।

এখন পর্যন্ত নাগাল্যান্ডে গোলমাল ছড়ায়নি। নাগাল্যান্ড শান্তিপূর্ণই আছে। কিন্তু নাগারা এইভাবে কুকি নিধন করতে থাকলে, কুকিরাও তার বদলা নিতে থাকলে, কতদিন পাশাপাশি রাজ্য নাগাল্যান্ড এই তাপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে, তাতে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।

শুনে তো ভটকাইচন্দ্রর চোখের ঘুম চলে গেল । ও বলল, চতুর্দিকেই তো রোড ব্লক। কোথাও যাওয়া আসার উপায়ও তো নেই।

হ্যাঁ। এই সব নানা কারণে এবং গদাধরের অসুখের কারণেও আমি ঠিক করেছি, কাল পরশুই ফিরে যাব।

ভটকাই বলল, আচ্ছা ঋজুদা, আচ্চাও সিং-এর ব্যাপারটা কী বলে মনে হয় তোমার?

আসলে ইবোহাল সিং এবং আচ্চাও সিং নাগা টেররিস্টদের সঙ্গে ছিল। ইবোহালের পরেই যে ওর পালা, তা ও বুঝেছিল বলেই বার্মাতে পালিয়ে গেছিল। পরে বলব ও সব তোদের। এখনও সময় হয়নি। এই মার্ডারগুলো আমার মনে হয় স্মাগলিং-এর কারণে যতটা, ততটাই রাজনৈতিক কারণে।

একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, একটু আগেই ভাবছিলাম উনিশ শো ছাপান্নতে যখন প্রথমবার এখানে এসেছিলাম—মা, বাবা, দাশগুপ্ত কাকা, কাকিমা,

সেন জেঠু, জেঠিমা, "পিক হোটেলে" ছিলাম। শীতকাল, সঙ্গে নেপালদা'ও ছিলেন। কী সুন্দর, শান্ত, শান্তির ছবির মতোই না ছিল এই শহর। আসলে, বুঝলি ভটকাই, আমরা নিজেরাই কোনও সুন্দর কিছুর যোগ্য নেই। ইঁদুরের মতো নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে করে এখন নিজেদেরই জায়গা নেই থাকবার, খাদ্য নেই খাবার, গাছ নেই ছায়াতে বসবার বা তার কাঠ জ্বেলে রান্না করবার বা আগুন পোহাবার। অথচ তুই পশ্চিমি দেশের অনেক জায়গাতেই দেখবি, বিশেষ করে ইয়ারোপে এক-একটি শহর, এক-একটি গ্রাম, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে যেমন ছিল, তা থেকে খুব একটা বেশি বদলায়নি। সব মানুষেরই যে সুবুদ্ধি থাকে তা নয়। কিন্তু সেই সব দেশে আইনের শাসন কায়েম আছে। দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা আইন মানতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া জনসংখ্যা শুয়োর বা ইঁদুরের মতো না বাড়াতে, মানুষ এখনও মানুষের জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। আমাদের এই স্বাধীনতা পাওয়ার চল্লিশ বছর পরে, আমরা পরম নির্লজ্জতার সঙ্গে প্রমাণ করেছি যে, আমরা "স্বাধীন" আফগানিস্থান বা জায়রে বা উগান্ডার মানুষদের চেয়ে খুব বেশি উঁচুদরের মানুষ নই। দিল্লি শহর, আর কিছু ফ্লাই-ওভার আর আলো-জ্বলা ব্রিজ, এমনকী অ্যাটম-বোমাও একটা দেশের অগ্রগতির পরিচায়ক নয়। তার পরিচায়ক একজন গড়পড়তা মানুষ। তার শিক্ষা, তার, রুচি, তার চরিত্র, তার মানসিকতা, আমার, তোর, গদাধরের মতো সাধারণ সব মানুষের মানসিকতা। উচ্চাশা।

আমরা তো আর দশ কুড়ি বছরের মধ্যে টেঁসে গিয়ে বেঁচে যাব। তোদের জন্যে যে কী অভিশাপ, কী দুঃস্বপ্ন আমরা রেখে যাচ্ছি, সে কথা ভাবলে আত্মহত্যা করে মরে যেতে ইচ্ছে হয়।

ভটকাই-এর চোখ জ্বালা করছিল। এতখানি উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হয়েছিল ও, ঋজুদার হৃদয়-মথিত এ সব কথা শুনে, যে হয়তো ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেলত। কোনওক্রমে মুখটা ঘুরিয়ে, সামলে নিল।

তারপর একটু পরে, ঋজুদার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, শান্ত হও ঋজুদা। তোমার কথা আমি বুঝেছি। তোমার কথা আমরা, আমি, রুদ্র, তিতির, আমরা বুঝি, বুঝব। আমরা মানুষের মতো মানুষ হব, ঋজুদা। তুমি দেখো, শুধু মানুষের চেহারার মানুষ নয়, মানুষের মতো মানুষ। যে-মানুষে একটা দেশকে গড়ে তোলে, তুমি দেখো। তোমার আশীর্বাদের অপমান আমরা করব না।

আধঘন্টার মধ্যেই চাঁদ আবার নেমে গেল এবং এমন মেঘ করল যে পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা ঋজুদাকেও দেখতে পাচ্ছিল না ভটকাই।

ঋজুদা পাইপটা ভরে ভটকাইকে বলল, আমার পেছনে, ডানপাশে দাঁড়িয়ে, আমাকে একটু কভার করত। লাইটারের আলো দেখা যাবে নইলে। পাইপের আগুনটা শুধু ধরাবার সময় দেখা যায়। ধরে গেলে, আগুনটা সোজা উপর থেকে ছাড়া, দেখাই যায় না। পাইপ ধরিয়ে ঋজুদা বলল, তুই ইচ্ছে করলে রিল্যাক্স করতে পারিস। আমি তো আছিই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল যে, বলার নয়। আর ঘন ঘন বিদ্যুৎচমক একে চারিদিকে ঝড়ের দমকে দমকে দোলা খাওয়া এই সব পর্বতবেষ্টিত বন পাহাড়ে উপত্যকার গভীর অরণ্যানী তার উপর আবার এই ইম্ফল-কোহিমা-বার্মা এ সব নামের মধ্যেই এমন সব গুপ্ত উত্তেজনা লুকিয়ে আছে যে, বাজ পড়ার শব্দে ভটকাই কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

ঘণ্টা খানেক অমনি চলার পরও যখন দুর্যোগ থামার লক্ষণ দেখা গেল না, তখন ঋজুদা বলল, চল, আমরা আস্তে আস্তে বাংলোর দিকে এগোই। এখন স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারিস। যা তর্জন-গর্জন চলছে, আধমাইলের মধ্যেও আমাদের কথা কেউ শুনতে পাবে না।

এত তাড়াতাড়ি উপরে যাবে?

হ্যাঁ। এই ওয়েদারের অ্যাডভান্টেজ নিতে পারে, যারা আসবে, তারা। এই আবহাওয়ার আড়ালে আধঘণ্টার মধ্যেই কাজ হাসিল করে চলে যেতে পারলে কোন বোকা সারা রাত অপেক্ষা করে? তা ছাড়া, ওরা তো জানে না, যে কুকুরদের আমি ঘুম পাড়িয়ে রাখার বন্দোবস্ত করেছি। ওদের সবচেয়ে বড় ভয় তো কুকুরেরাই। যারা আসবে তারা তো জানে না, আমি তাদের মতলব আগেই জেনে গেছি। চাইকি, তারা কবরখোঁড়ার কলংকটা আমাদেরই উপরে চাপিয়ে দিতে পারে। কারণ, আমরাই এখানে আগন্তুক।

থৈবী দেবী যখনই এসে পৌঁছল সন্ধের মুখে মুখে তখনই জানি কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ভটকাই বলল।

তোর থৈবীর উপরে এত রাগ কেন?

রাগ হবে না? ওর চেহারা দেখলেই তো মনে হয় ও নরকের জীব।

তা হলে তোর মনটা অন্যে সহজে দেখতে পায় না বলে আর দুঃখ করিস কেন? যা-কিছুই দেখতে সুন্দর, তাই কি সুন্দর?

ভটকাই-এর মনের খটকাটা আরও বেড়ে গেল। ওর এখন পাগল-পাগল লাগছে। প্রত্যেকটা মানুষকেই সন্দেহ হচ্ছে এদের মধ্যে কে যে কে, আর কে যে না, তা ঋজুদা কেন তাড়াতাড়ি বলে দিচ্ছে না তা ওর বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না। পোষা কুকুর। সে মরল। কবর হল। সে কবরে স্মৃতিফলক পড়বে। এই সময়ে সেই কবর খুঁড়তেই বা এল কারা? পুলিশের সন্দেহ হলে, কবর থেকে ডেড বডি এক্সহিউম করে পরীক্ষা চালায় নতুন করে তা ও শুনেছে। কিন্তু কুকুরের ডেড-বডি নিয়ে, একী?

ওরা পায়ে পায়ে প্রায় অর্ধেক পথ উঠে গেছে। যখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তখন কেনেলটাকে দেখা যাচ্ছে, এক সারি নিচু লম্বা ঘর। বাংলোটা—আলোঝলমল—নানা শৌখিন গাছগাছালির মধ্যে মধ্যে দারুণ দেখাচ্ছে। কে যেন স্টিরিও চালিয়েছে। কার আবার চিত্তে এত সুখ হল? কী চিৎকাররে বাবা!

কোন পাগলে চিৎকার করে, ঋজুদা?

চুপ কর। মাইকেল জ্যাকসন।

সেডা আবার কেডা? খালি গায়ে, ভিজে ঝোড়ো-কাকের মতো, ভটকাই বলল।

আঃ। কথা বলিস না এখন।

সর্বনাশ হয়ে গেল ঋজুদা।

কী হল? সাপে কামড়াল না কি? দেখি দাঁড়া।

না না। টিকিটগুলো। বিভাস চক্রবর্তীর "মাধব-মালঞ্চী কইন্যা" আর উষা গাঙ্গুলীর "হোলি"-র। সব গেল। "দক্ষিণী"র অরূপরতনের টিকিটও ছিল। সেও। ছ্যাঃ। ছ্যাঃ।

টিকিট কেউ সঙ্গে করে আনে? ইডিয়ট।

আমি তো ইডিয়টই। নইলে অন্যেরা যখন সাইকেল স্যাকসন শোনে সোফায় বসে বসে, চা খেতে খেতে, তখন আমার এমন—হুঁ।

সাইকেল নয়, মাইকেল! স্যাকসন নয়, জ্যাকসন।

ভটকাই-এর এই কথার সঙ্গে সঙ্গে, টক্ করে একটা শব্দ হল উপর থেকে।

ঋজুদা, বাঁ হাত দিয়ে ভটকাই-এর গলা টিপে ধরল।

ভটকাই দু হাতে দু কান ধরে বোঝাল যে, আর কথা নয়। আর একটু, মানে গজ বিশেক উঠে, ঋজুদা একটা বড় ঝোপের আড়ালে একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ল। নিজের সাধের প্যান্টটার দিকে একবার করুণ চোখে চেয়ে, ভটকাইও শুয়ে পড়ল।

আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাতেই, দেখা গেল, দুজন লোকে মিলে সত্যি সত্যিই কবরটাকে খুঁড়ছে। বৃষ্টিতে মাটি আরও নরম হয়ে গেছে বলে, সুবিধে যেমন হচ্ছে ওদের, তেমন মাটি ভারী হয়ে গেছে বলে মাটি সরাতে কষ্টও হচ্ছে।

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কথা বলতে বারণ করে দিয়ে, ঋজুদা দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে দুই হাতের তেলোর মধ্যে মুখটি রেখে সেদিকে চেয়ে রইল। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টাতে তারা মাটি সরিয়ে সম্ভবত কুকুরটার নাগাল পেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরটাকে বের না করে, দুজনে একটি ঝোপের আড়ালে এসে, ভটকাইদের দিকে পিছন করে, যাতে বাংলো থেকে দেখা না যায়, দুটো পাথরে বসে, দেশলাই জ্বালাল। দুজনের মধ্যে একটা লোককে ভটকাই-এর চেনা চেনা মনে হল। যে ধাবাতে আজ সন্ধেতে খেয়েছিল, সেই ধাবাতেই লোকটাও ওদের পাশে বসে খাচ্ছিল। কোনও ট্রাকের ড্রাইভার হবে। ভেবেছিল, ভটকাই।

লোকদুটো আরেকবার দেশলাই জ্বালল। একটা বোতল থেকে সাদা জল খাচ্ছিল ওরা। একজন সম্ভবত পাইপ খাচ্ছে। ওই লোকটার কথাই ভাবছিল ভটকাই। অন্যজন বোধহয় সিগারেট খাচ্ছে। টানের সঙ্গে সঙ্গে আগুনটা জোর হচ্ছে আর কম হচ্ছে।

গায়ে একটু জোর করে নিয়ে, ততক্ষণে বৃষ্টিটাও ধরে গেছে; লোকদুটো আরও

উঠে গিয়ে, কবর থেকে কুকুরটাকে তুলল। একজন নীচে নেমে গেল কোমর-সমান গর্তে, অন্যজন সম্ভবত কুকুরের পায়ের দিকটা ধরে টেনে হেঁচড়ে তাকে উপরে তুলল। তোলার পরে কুকুরটার শরীরে আধখানা আবার কবরের মধ্যে ঢুকে গেল। আবারও দশ মিনিট কসরত করে তারা তুলল, কুকুরটাকে। তোলার পর কবরের পাশে লম্বা করে শুইয়ে, মাটিতে শোয়ানো ঝোলা থেকে কী যেন বের করল। জিনিসটা কী, তা প্রথমে বুঝতে পারল না ভটকাই। তারপরই একবার বিদ্যুৎ-চমকে বুঝতে পারল যে, একটা দা। সেইটা দিয়ে একজন কুকুরটাকে কাটতে গেল।

ঠিক সেই সময়ে ঋজুদা ভটকাইকে বলল, সিগন্যাল।

ভটকাই-এর পকেটে একটা টিনের কটকটি রাখতে দিয়েছিল, ঋজুদা। আগেই বলে রেখেছিল যে, যখন বলবে, সমানে বাজিয়ে যেতে হবে। উঠে পড়ে পকেট থেকে কটকটি বের করে, কটকটি ব্যাঙ হয়ে গেল ও। এবং ঋজুদার সঙ্গে উপরে উঠে ওই দিকে এগোতে লাগল।

কটকটির আওয়াজ এই বৃষ্টিভেজা নিঝুম পরিবেশে কতদূরে যে ছড়িয়ে গেল, তা বলার নয়। এবং ওই শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বাংলো থেকে সুতীব্র সার্চ লাইট একের পর এক জ্বলে উঠে, সমস্ত জায়গাটাকে আলোকিত করে দিল। প্রতি ঘরে ঘরেও আলো জ্বলে উঠল। বাড়ির সমস্ত কাজের লোকজনও যে যা পেয়েছে হাতের কাছে, লাঠি, দা, বল্লম নিয়ে, বেরিয়ে এল।

আমি আর তিতির দেখলাম যে হতভম্ব হয়ে গিয়ে একজন লোক ঝোলা থেকে কী একটা বের করতেই ঋজুদা গুলি করল, তার গোড়ালি থেকে এক হাত পেছনে। আমিও গুলি করলাম, ওদের কাছেই। এবং এদিক থেকে আমি পিস্তল ও টর্চ হাতে নিয়ে এবং ওদিক থেকে ঋজুদা আর পেছনে পেছনে খালি গায়ে নাদুবাগানো, ফরসা, ভটকাই বাবু এগিয়ে আসতে লাগল।

ঋজুদা গলা তুলে বলল, ওটা হাত থেকে ফেলে দিন মিস্টার তন্বি সিং।

তন্বি সিং?

চমকে গেল, ভটকাই।

তন্বি সিং তার চেয়েও বেশি চমকে গিয়ে, পেছনে ফিরে তাকাল, ঋজুদার পিস্তলটার দিকে।

ততক্ষণে ভটকাইরা ওদের কাছে পৌঁছে গেছে। আমিও কাছে চলে এসেছি।

ঋজুদা বলল, পিস্তলটা ফেলে দিন মিস্টার সিং। প্লিজ।

হঃ হঃ হঃ হঃ করে, অদ্ভুত এক অট্টহাসি হেসে উঠলেন মিস্টার তন্বি সিং। বললেন, মিস্টার বোস। য়্যু হ্যাভ ডান আ ফাইন জব। বাট য়্যু উইল নট গেট মি।

বলেই, গাছের গোড়ায় যে বোতলটা রাখা ছিল, সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ডোন্ট মুভ মিস্টার সিং। আমি আপনাকে ওটা দিচ্ছি। বলেই বলল, ভটকাই, বোতলটা মিস্টার সিংকে দে। বি কেয়ারফুল মিস্টার সিং। ডোন্ট ট্রাই টু বি ফানি। তা হলে মাথার ঘিলু উড়ে যাবে।

হঃ। হঃ। হঃ। আমার মাথাতে যদি ঘিলুই থাকবে তা হলে কি আমার জীবনের এই অবস্থা হয়? ভটকাই বোতলটা নিয়ে, ওঁর হাতে দিল। ওঁর হাত থেকে পিস্তলটা নিতে যেতেই উনি হিন্দিতে বললেন, খবরদার ছোকরা, আমি জিন্দা থাকতে আমার হাত থেকে পিস্তল কেউ নিতে পারবে না। এটা শেষ করেনি। আমি নিজেই দেব।

ঋজুদা আমাকে বলল, রুদ্র, য়্যু টেক কেয়ার অফ দ্যা আদার গাই।

উ-মঙ্গ?

ভটকাই বলল।

ভটকাই উ-মঙ্গকে চেনে দেখে আমি অবাক হলাম। ভটকাই গুটি গুটি আমার পেছনে এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে সানাহানবি, থৈবী ও তিতিরও এসে দাঁড়িয়েছে একটু দূরে। টাইগারের দুর্গন্ধ গলিত দেহ দেখে সানাহানবি আর থৈবী দেবী নতুন করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

ঋজুদা সানাহানবিকে বলল, হ্যাভ য়্যু ফোনড দ্য নাম্বার আই গেভ য়্যু?

ইয়া।

থ্যাঙ্ক য়্যু।

তোমরা সবাই এখন ঘরে যাও। ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে।

ওরা কারা?

তম্বি সিং বলল।

পুলিশ।

পুলিশ, বলেই আবার হাসল হঃ হঃ হঃ করে।

সানাহানবিরা ফিরে গেল। শুধু আমরা রইলাম। আর কাজের লোকজন। তম্বি সিং আর উ-মঙ্গ দুজনেই ভাগাভাগি করে ওই সাদা জল খাচ্ছিল।

এমন সময় পিঁ-পাঁ পিঁ-পাঁ করে বাঁশি বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি এল। এবং ঠিক সেই সময়েই পিস্তল-ধরা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই একই সঙ্গে দুটি গুলির শব্দ হল। এবং কিছু বোঝার আগেই, আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। এবং মিস্টার তম্বি সিংও। ভটকাই বাঘের মতো সাহসে, খালি হাতে, তম্বি সিং-এর উপরে লাফিয়ে পড়ে তাকে চেপে রেখে, তার পাশে পড়ে-থাকা পিস্তলটা তুলে নিয়ে, রাগের চোটে পিস্তলের বাঁটের এক বাড়ি মারল, তার মাথায়। বলল, নিমক হারাম। তুই আমার বন্ধুকে...এত্ব সাহস। তোর মাথা আমি কচুর শাক দিয়ে রান্না করে খাব।

তম্বি সিং-এর গুলিটা আমার ডান বাহু ছুঁয়ে চলে গিয়ে বাংলোর একটি থামে লেগে ছিটকে গিয়ে, বৃষ্টির জল জমানোর জন্যে রাখা একটা টিনের ড্রামে গিয়ে

আঘাত করায়, সেই ড্রাম ফুটো হয়ে, তীরের বেগে জল পড়তে লাগল। আসলে তম্বি মারতে চেয়েছিল উ-মঙ্গকে। তারপরে নিজেকে মারত। কিন্তু ওর গুলি বেরুবার আগের মুহূর্তে ঋজুদার নির্ভুল নিশানাতে করা গুলি গিয়ে তম্বির কবজিতে লাগে—আর লাগার ফলেই উ-মঙ্গ বেঁচে গেল এ-যাত্রা। এবং হয়তো আমিও।

গুলির শব্দ শুনে সানাহানবিরা বেরিয়ে আসতে আসতেই পুলিশও এসে গেল। আমাকে ও তম্বি সিংকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে মেয়েরা চেঁচামেচি করে উঠল। মেয়েরা বলতে, থৈবী এবং সানাহানবি। তিতির নয়।

পুলিশের অফিসারকে ঋজুদা বললেন, এদের দুজনকে অ্যারেস্ট করুন। লোকাল ডাক্তারকে এখুনি ধরে নিয়ে আসুন নিয়ারেস্ট হসপিটাল থেকে এবং অপারেশনের সব সরঞ্জাম, নার্সসমেত; এখানেই আনানোর বন্দোবস্ত করুন। ওয়্যারলেসে খবর পাঠান। ইমিডিয়েটলি।

আমি ততক্ষণে উঠে বসেছিলাম। তম্বি সিংও। শুনলাম ঋজুদা বলছে, সানাহানবিকে, আই অ্যাম সরি। আই হ্যাভ টু টেক দেম ইনসাইড। ইওর বিউটিফুল বাংলো উইল বি ব্লাডি।

সানাহানবি নিচু স্বরে বলল, লেট ইট বি। আই ক্যুড নট কেয়ারলেস। অ্যাট লিস্ট, আই অ্যাম লাকি দ্যাট আই অ্যাম নট ব্লাডি ইনসাইড মি।

বলেই একটু থেমে, প্রায় কেঁদে বলল, ইট রিয়্যালি হার্টস; হার্টস। অ্যান্ড আই ট্রিটেড দিস ম্যান অ্যাজ মাই ফাদার।

ঋজুদা পুলিশ অফিসারকে বললেন, দশজন আর্মড পুলিশকে দিন, কুকুরটাকে পাহারা দেবার জন্য, যতখন না ভেট আসছেন ইম্ফল থেকে।

রাইট স্যার।

অফিসার বললেন।

ডি. আই. জি. ক্রাইম আসছেন?

হ্যাঁ, স্যার। মেসেজ তো পৌঁছে গেছে। উনি পথেই এই মেসেজ-এর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমার তো মনে হয়, মিনিট পনেরোর মধ্যে এসে পৌঁছবেন।

আমাকে এবং তম্বিকে ধরে ধরে বাড়ির লোকেরাই নিয়ে গিয়ে সোফাতে বসালেন। আমি বললাম, বারান্দাতে বসি। রক্ত পড়ে কার্পেট নষ্ট হবে, সোফা নষ্ট হবে।

ঋজুদা বলল, বারান্দাতে বসলে গুলি খেয়ে মরতে পারিস। তুই তো পারিসই, আমরা সকলেই পারি। পুলিশ যেমন খবর পেয়েছে, তম্বি সিং এর মালিকেরাও খবর পেয়েছে। ভেতরে চল।

সানাহানবি বলল, কী যে বলেন! আমার জন্যে আপনার প্রাণটাই যাচ্ছিল আর আমার কার্পেট আর সোফাই কি বেশি দামি হল, প্রাণের চেয়ে?

সানাহানবির কাছে প্রক্সিভন ছিল। তাই দুটো করে ঋজুদা খাইয়ে দিল আমাকে ও তম্বি সিংকে। রক্তে চ্যাটচ্যাট করছে শরীর।

ঋজুদা বলল, কী খাবেন মিস্টার সিং? যে কোনও ভাল জিনিসের নাম করুন। সবই আছে সানাহানবির কাছে। চা খাবেন? কফি? অন্য কিছু?

হুইস্কি আছে? মিস্টার বোস? স্কচ হুইস্কি? আপনাকে সেদিন আমি মিথ্যে বলেছিলাম।

আপনাকে আমি খুব ভাল জিনিস পাঠিয়ে দেব, আমার বন্ধু অনীক সেনের কাছ থেকে নিয়ে।

কোথায়? জেলে? হঃ। হঃ। হঃ।

হ্যাঁ। প্রয়োজন হলে জেলেও।

মিস্টার সিং হাসলেন। বললেন, আপনার মতো প্রেমিক দেখা যায় না। গুলি করে, জেলে পাঠিয়ে; তাও আবার স্বপ্ন-পূরণ করবেন বলছেন।

ঋজুদাই সানাহানবি ও থৈবীকে বলে, কীসের যেন একটা বোতল তম্বি সিংকে আর অন্য একটি বোতল উ-মঙ্গকে আনিয়ে দিল। উ-মঙ্গ-এর তখনও শক কাটেনি। তম্বি সিং যে তাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল একটু আগে, এ কথা সে যেন বিশ্বাসও করতে পারছিল না।

সে বলল, আমার কিছু চাই না এ সব। বিষ থাকলে সানাহানবি, বিষ এনে দাও একটু আমাকে।

এখন রাত কত, কে জানে! ভোর হতে বেশি দেরি নেই। ডি. আই. জি. ক্রাইম, কোহিমার ভেটেরিনারি সার্জন, মি. হোক্কেকেসিমা, উখরুলের বৃদ্ধ উকিল...জরাগ্রস্ত মিস্টার ছাওবি সিং—আরও অনেকে এসেছেন। ডি. আই. জি. মি. আলুয়ালিয়া, পাঞ্জাবের লোক। কে. পি. এস. গিলের অধীনে চাকরি করেছেন। তাঁর একজন "ব্লু-আইড বয়", তাই মণিপুরের ডি. জি. বিশেষ তদ্বির করে ওঁকে আনিয়েছেন এখানে। উনি হয়তো শিগগির নতুন পদ, ডি. আই. জি. টেররিস্ট কন্ট্রোল-এর দায়িত্ব নেবেন।

মি. আলুয়ালিয়া বললেন, আমার চেয়েও বেশি ইন্টারেস্ট অন্যদের। আপনি সামিং-আপ করুন, মি. বোস। ওঃ। এই যে আপনাদের টিকিট। ওক্কে করা আছে। কালকের।

ঋজুদা সেগুলো নিয়ে বুক পকেটে রেখে বলল, ধন্যবাদ।

প্রথমে বলুন, রুবিটার কথা।

ঘরে সকলেই বসে ছিলেন। আমি, ভটকাই, তিতির, সানাহানবি, থৈবী দেবী ছাড়াও পুলিশের নানা অফিসার এবং ভেট। দরজার সামনে ভিড় করেছিল কাজের লোকজন। এবং বাংলোর চারপাশ ঘিরে ছিল সেমি-অটোমেটিক ওয়েপন

নিয়ে কমপক্ষে দশটি পুলিশের গাড়ি। এবং একটি অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানও দাঁড়িয়েছিল বাইরে।

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, দেখুন, প্রথমেই মি. তম্বি সিং আমার মনে সন্দেহ ঢুকিয়েছিলেন যে, তিনি নিজে মালিক নন। তাই এখানে এসেই আমার প্রথম কাজ খুঁজে বের করা, তাঁর আসল মালিককে। সানাহানবির উপরে অন্য যে-কোনও মানুষেরই সন্দেহ হতে পারত। কিন্তু আমি ফেস-রিডিং কিছুটা করতে পারি। না, শাস্ত্র পড়ে নয়। শিশুকাল থেকেই উৎসাহ ছিল এ ব্যাপারে—তারপর সারা পৃথিবীর অগণ্য দেশের অগণ্য নারী পুরুষের সঙ্গে মেশার অভিজ্ঞতাও আমাকে সাহায্য করেছে। অনেক জ্যোতিষিও যা না বলতে পারবেন, আমি হয়তো শুধুমাত্র মুখ দেখেই, একজন মানুষ সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি বলতে না পারলেও, বুঝতে পারি।

এতগুলো ভাল ভাল কথা নিজের সম্বন্ধে একসঙ্গে বলে ফেলে ঋজুদাকে ক্লান্ত ও লজ্জিত দেখাচ্ছিল। নিজের প্রশংসা নিজে করা অথবা ধূর্তামি দেখিয়ে অন্যদের দিয়ে কাজ করানোর বিদ্যা ঋজুদার তো জানা নেইই, বরং এ সব তীব্রভাবে অপছন্দই করে।

এটাতো আপনারই ধারণা, বোস সাহেব।

রাইট। শুধুমাত্র ধারণাই। কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত সিদ্ধান্তের জন্মই তো নিছকই কোনও এক বা একাধিক জনের ধারণা থেকেই। এই "ধারণা" শব্দটা ফেলে দেওয়ার নয়। এটি একটি বীজ, যা থেকে মহীরূহ জন্মায়।

আমিই বললাম, ঋজুদাকে যাতে নিজমুখে উত্তর দিতে না হয়, সে জন্যে।

থাঙ্গজম সিং-এর কাছে গিয়েই, আমার প্রথমে যা মনে হয়েছিল তা এই যে, মানুষটা গত কয়েক বছরে বদলে গেছেন অনেকই। ওর স্ত্রীকেও আমি জানতাম। মানে, যখন আগে ওর সঙ্গে আলাপিত হয়েছিলাম। মহীয়সী, ধার্মিক, নম্র মহিলা। মনে হয় যে, সেই মহিলার প্রভাব থাঙ্গজম সিং-এর স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যের খারাপ, বন্য, লোভী ও নিষ্ঠুর দিকটাকে প্রতিমুহূর্তেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বলেই হয়তো, এইরকম বদলে গেলেন মানুষটা।

হঠাৎই থৈবী সিং বলে উঠলেন, আপনি ঠিক বলেছেন দাদা। আপনি জ্যোতিষির চেয়ে অনেক ভাল ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। তা ছাড়া মানুষকে বোঝার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ!

আমরা ঘর সুদ্ধ সকলেই চমকে উঠলাম, থৈবী সিং-এর কথা শুনে।

ঋজুদা বললেন, তোমার বাবা সম্বন্ধে আমার অ্যাসেসমেন্ট যে ঠিক তা তোমার কাছ থেকে শুনে, আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল থৈবী। ধন্যবাদ।

একটা জিনিস লক্ষ করেছিলাম যে, থাঙ্গজম সিং, তম্বি সিংকে মানুষ বলেই গণ্য করেন না। বললেন, ও লোকটা একটা ক্লাউন, একটা বাফুন।

তারপর পাইপে আরেক টান দিয়ে বলল, তোমার বাবুর্চিকে আমাদের একটু চা

দিতে বলতে পারো সানাহানবি? সময় তো বেশি বাকি নেই। আলো ফুটলেই আমরা বেরুব।

অনেক মানুষই ক্লাউন বা বাফুন কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবনের এবং সংসারের হাতে মার খেয়ে এমন হয়ে যান। যাঁরা এমন ভাবে বাফুন বা ক্লাউন হয়ে ওঠেন, তাঁদের প্রতি অনুকম্পা, ক্ষমা, এবং দয়া থাকা উচিত।

কার? সমাজের?

ডি. আই. জি. সাহেব প্রচণ্ড বোদ্ধার মতো বললেন।

ঋজুদার উচিত, সোজা কেসটার তলাতে চলে গিয়ে যা বলার বলে দেওয়া, অথচ এটাও ঠিক যে, খুনের মোটিভ ব্যাখ্যা করতে খুনির এবং যে খুন হয়েছে তার, খুনির সাহায্যকারীদের সকলেরই মনস্তত্ত্বর ব্যাখ্যারও দরকার। কিন্তু এই ডি. আই. জি-র বোধহয় অত ধৈর্য-টৈর্য নেই।

ঋজুদা বলল, সমাজ তো একটা ধারণা-বিশেষ। আমি মানুষের কথা বলছি। অনেক মানুষে মিলে মিশে যাই করে, তাই সমাজ-স্বীকৃত; সামাজিক।

তারপর বলো, ভটকাই অধৈর্য গলাতে বলল।

তম্বি সিংকে যেমন থাঙ্গজম সিং মনুষ্যেতর জীব বলে গণ্য করেন, তেমনি ইবোহাল সিং-এর উপরও দেখলাম ওর প্রচণ্ড রাগ এবং ঘৃণা। বললেন, ও তো রাজাই নয়, রাজ পরিবারের আস্তাবলের কোনও সহিসের সঙ্গেও ওর কোনওদিন আত্মীয়তা ছিল না। তম্বি যেমন ওর চামচে ছিল ইবোহালের বাবাও ছিল তেমনই রাজা লাইহারোবার চামচে। সেই সুবাদে কাকা বলত।

যা মনে হয়েছিল আমার, থাঙ্গজম সিং-এর কথা শুনে; তা হল, দেখতে শুনতে ভাল ছিল ইবোহাল, বুদ্ধিমান ছিল, পড়াশোনাতেও ভাল ছিল। অথচ বিনয়ের বদলে এদেশের নিরানব্বই ভাগ শিক্ষিত মানুষেরই মধ্যে যা থাকেই, অর্থহীন অন্ধ অহং, লজ্জাকর একধরনের গর্ব; তা ইবোহালের ছিল না, সে গান বেয়ারার থেকে সহিস, কুক থেকে ম্যানেজার, ম্যানেজার থেকে সেক্রেটারি, সব কাজই করতে পারত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে—যেমন করত আচ্চাও সিং, ইবোহালের জন্যে। এবং সে কারণে, রাজা লাইহারোবারই মতো সম্ভবত ইবোহালেরও আচ্চা সিং-এর উপরে এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল...

এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই আচ্চাও সিং...

ডি. আই. জি. সাহেব বললেন...

ঋজুদা থেমে, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো তা হলে কেসের সল্যুশান করেই ফেলেছেন। আমরা তা হলে চা টা এলেই খেয়ে উঠে পড়ি।

ডি. আই. জি. সাহেব নিজের ভুল বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আই বেগ ইওর আনকন্ডিশনাল পার্ডন স্যার। আপনি বলুন। আর আমি ইন্টারাপট করব না।

ইন্টারাপট অবশ্যই করবেন। না হলে, জিনিসটা পরিষ্কার না হলে, চার্জ ফ্রেম কী করে? আসামিদের দায়রাতে সোর্পদ করবেন কী করে?

রাইট স্যার।

পুলিশের টেপ রেকর্ডারটা নিঃশব্দে ঘুরছিল যে, এটা ডি. আই. জি. সাহেব ভুলে গেছিলেন। ভটকাই-এর সামনে রাখা আমাদের টেপ-রেকর্ডারও ঘুরছিল। দেখতে ছোট, কিন্তু মাইক্রো-ক্যাসেট ভরা যায়। বহুক্ষণ টেপ করা যায়। জাপান থেকে মিস্টার নাকাটাসো, ঋজুদার জাপানি মক্কেল পাঠিয়েছে ঋজুদাকে, কাজের সুবিধার জন্যে।

সানাহানবি বলল, বলুন মিস্টার বোস।

থৈবী বলল, ইবোহাল আংকল-এর মার্ডার আর রুবিটা চুরি যাওয়া তো একদিনেই ঘটেনি। তরোয়ালটা তো কদিন আগে চুরি গেছিল। বাগান থেকে যখন পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল যে, রুবিটা নেই। ইবোহাল আংকল-এর মার্ডার তো তার কদিন পরে হল।

দ্যাটস রাইট।

তা এমন করলেন কেন, আংকল তম্বি আর উ-মঙ্গ? পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্যেই কি?

না।

তবে?

রুবিটা চুরি করেছিল তম্বি আর উ-মঙ্গ, সানাহানবি সেদিন মোরেতে গেছিল "টাইগারকে" নিয়ে। সাধারণত সঙ্গে সাদা বুলটেরিয়ার 'জিম' যায়। থৈবী সেদিন বড় গাড়ি নিয়ে গেছিল বলেই একটু 'চেঞ্জ' হবে বলে, টাইগারকে নিয়ে গেছিল সঙ্গে, সানাহানবি। আর ঠিক সেইদিনই তরোয়ালটা খুঁজে পাওয়া যায় বাগানে, পোঁতা অবস্থায়। টাইগারকে দেখে তম্বির মাথাতে রুবিটাকে টাইগারের পেটে চালান করে দেওয়ার কথা আসে। টাইগারের শরীর এমনিতেই ভাল যাচ্ছিল না। খিদে কম ছিল। বয়সও হয়ে গেছিল মরার মতো। কি মানুষ আর কি কুকুর মরার বয়সে পৌঁছলে তাকে কোনও না কোনও ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মরতেই হয়, এর কোনও ব্যতিক্রম হয় না। সেই সুযোগটাও ওরা নিয়েছিল। সানাহানবি যখন আচ্চাও-এর সঙ্গে তামুতে বেড়াতে গেল তখন থৈবী টাইগারকে খাওয়ানোর ভার নিয়েছিল। না থৈবী?

হ্যাঁ।

বলেই, থৈবী রুমাল দিয়ে নাক মুছল।

কিন্তু তুমি শেষ পর্যন্ত খাওয়াওনি টাইগারকে?

সানাহানবি চমকে উঠল। কী। একটা চাপা অভিব্যক্তি করল। আর সঙ্গে সঙ্গে থৈবী, সানাহানবির হাত ধরে কেঁদে উঠল।

না। থৈবীর এ ব্যাপারে কোনও দোষ নেই। বলতে গেলে, চক্রান্ত করেই তম্বি

আর উ-মঙ্গ যত্ন করে খাওয়াবে বলে এবং ইবোহাল সাহেব ডাকছে বলে ওকে ভিতরে পাঠিয়ে, কাণ্ডটা ঘটায়।

কাণ্ডটা ঘটাল কী করে?

তিতির শুধোল।

গ্রেট গেন কুকুর তো কম বড় নয়! বাঘেরই মতো। বিস্তারিত না জানিয়ে, "শত্রু কুকুরকে" পাথর খাইয়ে মারবে বলে—এই প্রক্রিয়া ভেট-এর কাছ থেকে জেনে নিয়ে তম্বি ভেটকে দুশোটাকা ঘুষ দিয়ে এসেছিল। এদিকে টাইগারের মতো বড় কুকুরও, অতবড় রুবিটা গিলতে পারেনি। যতখানি ঠেলতে পেরেছিল তম্বি এবং উ-মঙ্গ ততখানিই গেছিল এবং এমন একটা জায়গাতে গিয়ে আটকে গেছিল যাতে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল না বটে, কোনও খাবারও নামতে পারছিল না। ওরা জানত যে, কয়েকদিনের মধ্যেই টাইগার মরবে এবং মরলে ফার্মেরই মধ্যে কবর দেবে সানাহানবি, আর তখন ধীরে-সুস্থে সময় বুঝে, টাইগারের বডি কবর থেকে তুলে রুবিটাকে কেটে বের করে নেবে।

কিন্তু থৈবী ভিতরে চলে গেছিল কেন, নিজে টাইগারকে না খাইয়ে?

আমি বললাম।

ইবোহাল সিং দুপুরে ভদকা খেতেন অ্যাঙ্গোস্টুরা বিটার্স দিয়ে। তার মধ্যে আবার মণিপুরের তীব্র গন্ধ-ওয়ালা গোঁড় লেবুর একটি স্লাইস ফেলে দিতেন। তার মধ্যে একটি কাঁচা লঙ্কা ভেঙে দু টুকরো করে, সিডলেস অবস্থাতে গ্লাসের মধ্যে ফেলে দিতেন।

তাতে কী হত?

ডি. আই. জি. সাহেব, উদ্বেগের সঙ্গে শুধোলেন।

আমার মনে হল যে, উনি নিশ্চয়ই ওই পানীয় ইস্তেমাল করেন।

ঋজুদা বলল, কাঁচা লঙ্কা আর গোঁড় লেবুর গন্ধ, ইটালিয়ান অ্যাঙ্গোস্টুরা বিটার্স-এর সঙ্গে মিশে রীতিমতো এক গান্ধর্ব সুগন্ধর পায়দা করত। তা, এইসব বানিয়ে দিত আচ্চাও। ইবোহালের শরীরে রাজরক্ত না থাকলেও অনেক রাজাকে সে কান ধরে 'রইসি' শেখাতে পারত। থৈবীকে ভিতরে পাঠিয়েছিল, তম্বি, ইবোহালকে ড্রিংক্স "ফিক্স" করে দিতে। তারপর থৈবীকেও অফার করেছিল ইবোহাল। থৈবী বেশি খায়নি—হয়তো ছোট-পেগ দুয়েক—কিন্তু সেই সময়টুকুই তম্বি আর উ-মঙ্গ-এর পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

তারপর?

সানাহানবি যখন কাঙ্গপোকপিতে ফিরে এল, তখন বুঝতে পারল যে, টাইগার অসুস্থ। কিছু খেতে পারছে না। তখন কোহিমা থেকে ভেটকে ডেকে পাঠাল না কেন?

ভটকাই বলল।

তম্বি, 'রুবিটা' গিলিয়ে দেওয়ার পরদিনই ইম্ফলের ভেট সাহেবকে 'ভেট' পাঠাল। দুটো বড় বড় মোরগ, দু বোতল বার্মিজ মদ এবং পাঁচশো টাকা। লিখে

দিল যে, রাতের বাসে গিয়ে দেখা করবে। রাতে গিয়ে আরও পাঁচশো টাকা দিয়ে ভেটকে বলে এল, কাঙ্গপোকপি থেকে একটা কল আসতে পারে। যেও, তবে যদি বোঝো যে, সে কুকুর কোনও কিছু গিলেছে এবং সেই জন্যেই খেতে পারছে না, তবে অন্য কিছু হয়েছে বলে দিয়ে চলে এসো। এক্স-রে করতে বললে বলবে, মেশিন খারাপ। ফিরে এলে, আবারও হাজার টাকা পাবে। পারলে, এমন কিছু করো, যাতে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় কুকুর। ভেট বলেছিল, এমনিতেই অনেক অন্যায় করছি। সেটা আমি করতে পারব না। তম্বি বুঝিয়েছিল কেসটা খুবই গণ্ডগোলের—ফেরার সময় পথে মার্ডার হয়ে যাবে। যদি তোমাকে ডাকে তুমি যাবে না কথা দিলে, তোমাকে আরও হাজার টাকা আমি কালই লোক মারফত পাঠিয়ে দেব। ভেবে দেখ। "A Bird in hand is as good as two in the bush"। ভেট টোপ খেলেন। ভবিষ্যতে কোনও টাকা পাওয়া যাবে না যাবে—তা ছাড়া নতুন এক ছোকরা, গৌহাটি থেকে পাশ করে এসে থংগলবাজারে চেম্বার খুলেছে, এমনিতেই রুজি রোজগার খুবই কমে গেছে।

নতুন ভেট যে এসেছে, সে কুকি। এসেছিল যে, তাও জানত তম্বি। তম্বি সিংকে যত ভোলেভালা মানুষে ভাবে, তা নয়। এক কোটি টাকার জিনিস হস্তগত হলে বোকারও বুদ্ধি খুলে যায়। সে ন্যাশানাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড—মুইভা ফ্যাকশানের (সংক্ষেপে এন. এস. সি. এন) নামে প্যাড ছাপিয়ে, সেই প্যাডে হুমকি দিয়ে চিঠি লিখে দেয় যে, ইম্ফল শহরের মধ্যে প্র্যাকটিস করতে পার। যদি শহরের বাইরে যাও, বিশেষ করে কাঙ্গলোটোংবীর দিকে তা হলে, তোমার মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে। ইচ্ছা করে কাঙ্গপোকপি লেখেনি। ওই সব অঞ্চলই নাগাল্যান্ডে যাওয়ার পথেই পড়ে। অতএব সানাহানবি যে তাকে নিয়ে যাবে, সে পথও বন্ধ করে রেখেছিল। কোহিমার একমাত্র ভেট ওযে ডিমাপুরে গিয়ে মারাত্মক হার্ট-অ্যাটাকে শয্যাশায়ী থাকবেন আরও মাসখানেক, তাও তম্বি খোঁজ নিয়ে রেখেছিল। অতএব বিনা চিকিৎসাতে নয়, ভুয়া চিকিৎসাতে মারা গেল, টাইগার। ইম্ফলের ভেট এসেছিলেন। তম্বির টাকাও হজম করেছিলেন এবং থৈবীর দেওয়া মোটা টাকাও। সানাহানবি এবং থৈবী টাইগারকে বাঁচাবার চেষ্টার কোনও কসুর করেনি।

আচ্ছা রুবিটা যে টাইগারকে গেলানো হয়েছে, তা তোমার মনে এল কীভাবে? ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

কুকুরদের নানারকম রোগ হয়। ইনফেকশাস ডিজিজ। এর মধ্যে আছে ভাইরাল ডিজিজ, রিকেটসিয়াল ডিজিজ, ফাঙ্গাল ডিজিজ। আবার নন ইনফেকসাস ডিজিজের মধ্যে আছে...

আরে, তুমি শর্টকার্টে বলো। ভটকাই বলল।

তবে শোন, বলেইছি তো তোদের যে, ইম্ফলের ভেট বলে গেছিলেন যে, টাইগারের "পাপিলোমাটোসিস" হয়েছে। তখনই আমার সন্দেহ হয়। তখন আমি

রাত দুটোতে কলকাতাতে সনৎদাকে ফোন করে শিওর হই পাপিলোমাটোসিস হয় বাচ্চা কুকুরদের। দেখবি এক্ষুন জেরার মুখে পড়ে ভেট বাবাজি সবই স্বীকার করে নেবেন। পুলিশের জেরা যে কী জিনিস তা তো সকলে জানে না। মারধোরের বাবা তা! এই জেরা ব্যাপারটা এঁরা একটা আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন।

আপনি এত ডিটেইলস-এ এ সব জানলেন কী করে, মিস্টার বোস?

ডি. আই. জি. বললেন।

ডিটেইলসগুলো আমার অনুমান। সঠিক তথ্য আপনাদের জেরা আর মারের মুখে বেরিয়ে আসবে। তবে আমার কনক্লুশানে কোনও ভুল নেই। ডিটেইলসে পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ ভুল বেরোবে হয়তো, কিন্তু ডিসিশান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।

তম্বি সিং উ-মঙ্গকে মারতে গেল কেন, গুলি ছুঁড়ে? মত্ত অবস্থাতে ছিল বলে?

হ্যাঁ। আমাদের সামনে মারতে যাওয়া, মত্ততারই কারণে। তবে উ-মঙ্গকে ও আজই মারত এবং এই ফার্মেরই মধ্যে। নীচে গিয়ে। হয়তো ওই ঝোরার পাশের বেঞ্চে বসে থাকতে থাকতেই। তারপর পা দিয়ে ডেডবডি ঠেলে ফেলে দিত জলে। উ-মঙ্গকে ও ব্যবহার করেছিল। আরেকজনকেও করেছিল, সে হাঞ্জো। ওরা যখন টাইগারকে রুবিটা গেলাচ্ছিল তখন হাঞ্জোকে বলেছিল, থৈবী মেম সাহেবের বা সাহেবের খিদমদগারী করতে। ওদের নোকরি বাঁচাতে। ওকে মদ খাওয়ার জন্যে কুড়ি টাকা দিয়েছিল। ব্যাপারটা ওরা উ-মঙ্গের কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে করেছিল। রুবি রহস্যের কথা হাঞ্জো জানত না।

তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তম্বি আর উ-মঙ্গ ইবোহাল সিংকে খুন করল কখন?

তিতির বলল।

ঋজুদা চায়ের কাপটা তুলে নিল। একটা বড় চুমুক দিল। সকলেই চায়ে চুমুক দিলেন। ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স এসে তম্বি সিং এবং উ-মঙ্গকে নিয়ে গেছে, একটু আগে। পেছনে পেছনে গেছে প্রিজন ভ্যান। আমাকে এখানেই চিকিৎসা করে পেইন-কিলার ও অন্য ইনজেকশান দিয়ে, হাতটাকে ব্যান্ডেজের একটি স্লিং লাগিয়ে দিয়ে চলে গেছেন ডাক্তার। ওষুধও দিয়ে গেছেন, চারঘণ্টা অন্তর খেতে। ব্যথা বাড়লেও খাবার জন্যে একটা ওষুধ দিয়ে গেছেন। বাকিটা কলকাতাতে গিয়ে হবে।

ঋজুদা আরও এক চুমুক চা খেয়ে, পাইপটা ধরিয়ে দু তিনটি বড় টান লাগিয়ে বলল, তম্বি সিং বা উ-মঙ্গ খুন করেনি ইবোহাল সিংকে।

ওরা খুন করেনি?

ঘরের মধ্যে আমাদের সম্মিলিত রুদ্ধ করে-রাখা শ্বাস, একসঙ্গে পড়ল।

না।

ঋজুদা বলল।

তারপরই থৈবীর দিকে ফিরে বলল, তোমাদের বাড়িতে যে পুলিশ সার্চ করেছিল তন্ন তন্ন করে, ইবোহাল সিং-এর তরোয়াল নিখোঁজ হওয়ার পরে রুবির খোঁজে—তা কি তুমি জানতে?

সানাহানবি চমকে উঠে তাকাল, থৈবীর দিকে।

থৈবী মুখ নামিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

কাউকে জানাওনি কেন?

লজ্জায়।

লজ্জা কীসের? থাঙ্গজম সিং-এর মতো অবস্থাপন্ন মানুষ তো এক কোটি টাকার জন্যে বন্ধুস্থানীয় মানুষের রুবি চুরি করতে যেতেন না। এই সার্চ করানো ব্যাপারটা ইবোহাল সিংই করিয়েছিলেন, পুলিশকে ইনফ্লুয়েন্স করে। এবং থাঙ্গজম সিং যে চুরি করেননি, তা জেনেও।

তবে? কেন?

রুবি চুরি যাওয়ার সাতদিন আগে ইবোহাল সিং ইম্ফলে এসেছিলেন। সেখানে থংগল বাজারের এক মদের দোকানে ওদের মধ্যে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হয়। দোকানের নাম আমি বলে দেব। জেরাতেও বলবেন, থাঙ্গজম সিং। ইবোহাল সিং নাকি বলেন যে, চাকর-বাকরের পয়সা হলেই কি তারা বাবুর সমান হয়ে যেতে পারে? না যায়?

কেন? এ কথা উনি বললেন কেন?

থাঙ্গজম সিং নাকি বছর পঁয়ত্রিশ আগে সত্যিই চাকরের কাজ করতেন ইবোহাল সিং-এর কাছে। তম্বি সিং এবং উ-মঙ্গ তা জানে। এই কথাতে থাঙ্গজম সিং নাকি বলেন, যে নাম-ভাঁড়িয়ে রাজা, সে আবার রাজা না কি? আর যা করে তুমি বড়লোক আমিও তো তাই করেই বড়লোক। বাইরের ভড়ং আমাদের যাই থাক। এই রাগেই ইবোহাল চুরির দায়ে থাঙ্গজম সিং-এর বাড়ি সার্চ করিয়ে তার বদলা নেয়। তবে থাঙ্গজম বাড়ির চাকর বাকর সকলকে মোটা টাকা দিয়ে, কথাটা যাতে প্রচার না হয়, তার সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাড়ির আশেপাশের মানুষেরা জেনে তাকে টিটকিরি দিতে থাকেন। থৈবী ও তার দাদা ইবোবা এবং ইবোবার স্ত্রী যমুনাকেও এর জন্যে অনেক অপমান সইতে হয়। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে থাঙ্গজম সিং হাঞ্জোকে দিয়ে খুন করান ইবোহাল সিংকে। তা ছাড়া অন্য কারণও ছিল। তা আমি ডি. জি-কে জানাব।

ঋজুদা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে থৈবী একটি আর্তনাদ করে সোফা থেকে মূর্ছা গিয়ে কার্পেটে পড়ে গেল।

ঋজুদা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, স্মেলিং-সল্ট আছে, সানাহানবি? থাকলে এক্ষুনি দাও। না থাকলে গরম দুধের সঙ্গে দু চামচ ব্র্যান্ডি দিয়ে খাইয়ে দাও। ও ঠিক হয়ে যাবে।

ডি.আই.জি বললেন, হাঞ্জো কী করে খুন করল, ইবোহাল সিংকে?

ওকে নিয়ে গেছিল পুরনো ড্রাইভার ইরাবন্ত সিং। রাতের বেলা, স্টিল-গ্রে মারুতি ওয়ান থাউজ্যান্ড নিয়ে। ড্রাইভার জানত না, যাবার উদ্দেশ্য। তবে সন্দেহ একটু করে, যখন গাড়িটা বাড়ির ভিতরে না ঢুকিয়ে ইরাবন্ত সিংকে বাজার থেকে খাওয়া দাওয়া করে এসে বাড়ির বাইরের দেওয়ালের পাশে একটি বিশেষ জায়গাতে দাঁড় করিয়ে রেখে, ঘুমিয়ে থাকতে বলে। বলে, ওর ফিরতে রাত হবে। বলে, ইবোহাল সাহেবকে বিরক্ত করতে চায় না। ওর কাজ আছে উ-মঙ্গ এর সঙ্গে। উ-মঙ্গ-এর সঙ্গে আগেই টেলিফোনে যুক্তি করে রাখে। তম্বি সিং তখন ইম্ফলে ছিল। একটা ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছের গা বেয়ে কম্পাউন্ডের ভিতরে নামে হাঞ্জো সিং। হাঞ্জো এমনিতেই দাগি খুনি। সবরকম খুন-জখমে সিদ্ধহস্ত। আপনাদের রেকর্ডস ও বার্মা পুলিশের রেকর্ডস দেখলে ওর সম্বন্ধে জানতে পারবেন। ওইরকম লোক বলেই বডিগার্ড হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন থাঙ্গজম সিং।

তারপর?

তারপর, উ-মঙ্গ তাকে, সে যেখানে শোয়; সেখানে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে রাখে। নিজে গিয়ে খেয়ে আসে। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের সব আলো নিভে গেলে, ফিরে আসে। ইবোহাল তখনও পড়েছিলেন। ইবোহাল যে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ এবং তাঁর সম্বন্ধে যে যাই বলুক, তিনি যে ও সব বাজে ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—তা আমার মনে হয় না। আমার ভুল হতে পারে না, এমন নয়—কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলব যে, মনে হয় না। তারপর কী করে খুন করে, তা তো ভটকাইই তোদের বলেছে।

ডি.আই.জি. সাহেবও বললেন, হ্যাঁ। আমার কাছেও সেই রিপোর্ট আছে। তবে ইবোহাল সাহেবের গুভারশ্যুটা পরে অপকর্মটি করাতে পুলিশ পারপ্লেক্সড হয়ে গেছিল।

ভাল করে চারদিকে দেখলে, ভিজে মাটিতে, বাগানের অন্য প্রান্তে যেখানে ওই ভারী শরীর নিয়ে হাঞ্জো লাফিয়ে পড়েছিল, সেখানে তার পায়ের চামড়ার জুতো পরা দাগ খুঁজে পেতে পারত। যত্ন নিয়ে খোঁজেনি। থাক, হাঞ্জো নিজেই যখন নেই, তখন এই আলোচনা অনর্থক। কিন্তু ছাঁচটি আমি প্লাস্টার অফ প্যারিসে তুলে রেখেছি—যা তো রুদ্র। আমার স্যুটকেস থেকে নিয়ে এনে দে ডি.আই.জি. সাহেবকে। ফোটোও তোলা আছে। হত্যাকারী কে, তা স্থিরীকৃত না হলে তো বহুবছর ধরে অগণ্য মানুষের হয়রানি হবে।

তা ঠিক।

ব্র্যান্ডি মেশানো দুধ খেয়ে থৈবী আবার উঠে বসেছে, কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে, ও যেন ভাল না হলেই খুশি হত।

থৈবী যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে, এমনভাবে বলল, তা হলে বাবার তো

জেল হয়ে যাবে।

নাও হতে পারে। কিছু মনে কোরো না থৈবী, এই দেশে কেন, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই যাদের পয়সা আছে, তাদের জেল প্রায়ই হয় না, ফাঁসিও হয় না। দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা থেকে বড় বড় ফৌজদারি উকিল, ব্যারিস্টার নিয়ে আসতে বলবে। তাঁদের সওয়ালের ভারে এই ছোট জায়গার জজ সাহেব এবং আমার দেওয়া তথ্য-প্রমাণ ধুলোর মতো উড়ে যাবে। তবে জেল হবে তম্বি সিং-এর আর উ-মঙ্গ-এর, অবশ্যই। তাদের বাঁচাবার তো কেউই নেই! এদেশের জেল গরিবরাই চিরদিন ভরে এসেছে।

আমার ভাই ইবোবা সিংকে কে খুন করেছে?

ওঁরা তো টেররিস্টদের গুলিতে মারা গেছেন। তা ছাড়া থৈবী, আমি তো এসেছিলাম ইবোহাল সিং-এর মৃত্যুর তদন্ত করতে। টেররিস্টদের গুলিতে মারা যাবার সম্ভাবনাই বেশি। রোড-ব্লকও তো করে রেখেছিল তারা।

থৈবী কী যেন ভাবছিল। কথা বলল না।

ঋজুদা বলল, তোমার বাবা, তিন তিনটে হঠকারিতা করেছিলেন, যে জন্যে আমার সন্দেহ জোরদার হল। (১) তম্বি সিংকে আমার কাছে পাঠানো উচিত হয়নি ওঁর। তম্বি সিং-এর পটভূমি, অবস্থা এবং আরও সবকিছু তাঁর সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলে শুধু আমি কেন, এই এরাও বুঝেছিল। পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স ওর পক্ষে দেওয়া যে সম্ভব নয়, এমন সন্দেহ প্রথমেই হয়েছিল। (২) উনি ওঁর বাড়িতে পুলিশের তল্লাসির খবরটা আমার কাছে চেপে গিয়ে ভাল করেননি। বিশেষত আমাকে যখন আগে থেকেই চিনতেন। অথচ আমি যমুনার মুখের বিষাদ দেখেই বুঝেছিলাম যে এ বাড়িতে তাকে বিষণ্ণ করার মতো কিছু ঘটেছে। (৩) ইরাবন্ত সিং, পুরনো ড্রাইভারকে সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে দিয়ে আমাদেরই জন্যে বাঙালি ড্রাইভার যোগেনকে রাখা উচিত হয়নি। বাঙালিরা গরিব সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনও খুঁজলে অন্য প্রদেশীয়দের তুলনাতে বাঙালিদের মধ্যেই সৎমানুষের সংখ্যা বেশি হবে। যোগেন বেশি কথা বলে, গরিব; কিন্তু অসৎ নয় সে। পয়সার জন্যে আমাদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে রাজি হয়নি। এটাই সৌভাগ্যের কথা যে পয়সা এখনও সব মানুষকে কিনতে পারে না। (৪) নতুন মারুতি ওয়ান থাউজ্যান্ড এর স্টিল-গ্রে রংকে কেউ ক্যাটক্যাটে লাল রং করায় না, প্রায় রাতারাতি। এতেও আমার সন্দেহ হয়। তা ছাড়া আমি ইরাবন্ত সিং-এর বাড়িও গেছিলাম। তাকে টাকা দিয়ে এবং জেলের ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে জবানবন্দিও নিয়ে এসেছি যে, সে তোমার বাবার আদেশে হাঞ্জো সিংকে সঙ্গে নিয়ে সেই রাতে 'মোরে'তে গেছিল—এবং চারঘণ্টা বাজারে খেয়ে দেয়ে আড্ডা মেরে, হাঞ্জোর নির্দেশমতো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাংলোর বাইরে রাত বারোটা অবধি। তারপর দেওয়াল টপকে লাফিয়ে-আসা হাঞ্জোকে নিয়ে ফিরে আসা ছাড়া, অন্য কোনও কাজও তার ছিল না। তোমার বাবা তার মুখ বন্ধ

করার জন্যে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তাও সে কবুল করেছে।

ভটকাই বলল, আচ্ছা ঋজুদা, উ-মঙ্গ যদি খুনের কথা জানতই, তবে তাকে অ্যারেস্ট করা দূরে থাক, তাকে জেরা করার জন্যেও পুলিশে ধরে কেন নিয়ে গেল না, তাতো আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না।

তোর বুদ্ধি নেই, তাই। পুলিশেরা ইচ্ছে করেই তা করেনি। আর কেন করেনি তা ডি. আই. জি. সাহেবকে বল, যেন তদন্ত করে অপরাধীদের সাসপেন্ড করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশান নেন স্যাক করেন।

তিতির বলল, ইবোহাল সিং-এর সম্পত্তি কে পাবে? আর রুবিটা?

রুবিটা টেবলের পরে রাখা ছিল। ভাল করে ধুয়ে, স্পিরিট দিয়ে মুছে রেখেছিলেন ভেট।

এই ভেট-এরও শাস্তি হবে। জেরার মুখে সব স্বীকার করবেন। বুদ্ধিমান হলে, প্রথমেই স্বীকার করবেন। তা ছাড়া, সানাহানবি তুমি টাইগারের মৃত্যুর জন্যে ওঁর উপরে ড্যামেজ স্যুটও ফাইল করবে। যাতে ড্যামেজ দিতে গিয়ে বাড়ি, ঘর বিক্রি করে তাকেও ইম্ফল ছেড়ে চলে যেতে হয়। দুর্নীতি যে সমাজের কোন স্তরে, কোন মহল্লাতে না পৌঁছেছে এখন, তা ঈশ্বরই জানেন। এমন না হলে, দুর্নীতি আর চোরাচালান আর খুন আরও বাড়বে। রসাতলে যাবে পুরো দেশ।

এই চোরাচালানের টাকা শেষ অবধি কোথায় যায়, ঋজুকাকা?

তিতির শুধোল।

দেশের যেখানেই চোরাচালানি জিনিস কিনিস, তা সুগন্ধ সাবান বা পারফ্যুম বা টেপ-ডেক বা ভি. সি. আরই হোক, তা ফিরে আসছে এ. কে. ফর্টিসেভেন রাইফেল, গোলা বারুদ আর আর. ডি. এক্স, বিস্ফোরক, বোমা, রিমোট কন্ট্রোল; এই সব হয়ে। এ কথা শিক্ষিত মানুষেরাই বোঝে না তা সাধারণদের দোষ দিয়ে লাভ কী। চোরাচালানের পথে যা কিছু আসে—খৈবী তোমার বাবার ব্লু-লেবেল হুইস্কি থেকে আরম্ভ করে তোমার নেইল পালিশ—হেয়ার-ড্রায়ার, জাপানিজ সিল্কের শাড়ি, সব কিছুই—তা ব্যবহার যারা করেন, তাঁরা সমান অপরাধী। আমার এই অ্যাস্কোরা তামাকও! আমিও...

হঠাৎ থেমে ঋজুদা বলল, একী। ভোর হয়ে গেল যে! এবার আমরা বেরিয়ে পড়ব, সানাহানবি। আরেক কাপ করে চা কি হবে? সঙ্গে দুটো করে বিস্কিট?

সানাহানবি উঠে পড়ে বলল, একেবারে ক্রিসপ, গরম গরম চিজ-টোস্ট করে দিচ্ছি আপনাদের।

যা দাও। বড় চিন্তায় আছি, আমার গদাধরের জন্যে।

কলিং বেল টিপতেই বাবুর্চি এসে দাঁড়াল। অর্ডার দিয়ে দিল সানাহানবি।

তিতির বলল, বললে না তো মিস্টার ইবোহাল সিং-এর সব সম্পত্তির, এই রুবিটা সুদ্ধু কে মালিক হবে?

ঋজুদা বলল, আমি মালিক হলে কি তুই খুশি হতিস?

হতাম না? ওরকম দুটো বাংলো। নদী পেরুলেই বার্মা? ব্যাঙ্কে কত টাকা কে জানে! ওই রকম সব ফার্নিচার, ক্রকারী, কাটলারি...“দ্যা রিট্টি”!

থাম থাম। এ সবের তো শেষ নেইরে। জীবনে সত্যিকারের শিক্ষা যাদের আছে, তারা প্লেইন-লিভিং হাই-থিংকিং-এ বিশ্বাস করে। আনন্দ তাতেই। আড়ম্বরে আনন্দ নেই। তবে না। আমি পাব না। এ সব পাবে, সানাহানবি।

ঘর সুদ্ধু লোক একসঙ্গে বলে উঠল, সানাহানবি?

সানাহানবি আর থৈবী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

হ্যাঁ, তোরা ভাবছিস যে, আচ্চাও সিংকে দিয়ে গেছেন ইবোহাল সিং সাহেব? না। লাইহারোবা সিং-এর, অকৃতদার কাকার সম্পত্তি পেয়ে নিজের জীবনেই একটা সত্য ইবোহাল সিং জেনে গেছিলেন, হয়তো, নিজে শিক্ষিত ছিলেন বলেই যে, পড়ে-পাওয়া ধন আর বসে-খাওয়া জীবন মানুষকে নষ্ট করে দেয়। যতটুকু মানুষ সৎ পরিশ্রমে পায়, সেইটুকুর স্বাদই আলাদা, সেটুকুই শেষ পর্যন্ত থাকে। আর থাকে মান-সম্মান। এই সত্য বুঝতে দেরি হয় মানুষের, কিন্তু এইটাই সত্য। আচ্চাও সিং ভাল ছেলে এবং ইবোহাল সিং তাঁকে সত্যিই ভালবাসতেন বলে জাগতিক সম্পত্তি দিয়ে যাননি। তাঁর মনের মতো গড়ে দিয়ে গেছিলেন তাঁকে, সেইটাই সবচেয়ে বড় সম্পত্তি। চিরদিনের সম্পত্তি।

বলেই বলল, ডি. আই. জি. সাহেবকে, বলুন স্যার, আর কোনও প্রশ্ন আছে আপনার? ক্যাসেটটাও বোধহয় ভরে এল। অনেক কথাই বাকি রইল। ডি. জি-কে চিঠি লিখে জানাব।

ওয়েলকাম।

তারপর ঋজুদা বলল, আমার একটা অনুরোধ। এই টাকাটা তম্বি সিংকে ফেরত দেবেন—এ টাকা তিনি তাঁর মামলার খরচ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। যদিও টাকাটা থাঙ্গজম সিং-এর, কিন্তু এখন এর মালিক আমি। রসিদও দিয়েছি। মোট পঞ্চাশ হাজার থেকে আমাদের খরচ হয়েছে পনেরোশ ছাপান্ন টাকা—কী করে ভটকাই?

ইয়েস। ইনক্লুডিং, কস্ট আফ পাস্তুয়া অ্যান্ড ডালকুলাক্স।

কত আছে হাতে?

দাঁড়াও। ক্যালকুলেটরটা বের কর না, রুদ্র।

ভটকাই উত্তেজিত হয়ে বলল।

তিতির হেসে বলল, আটচল্লিশ হাজার চারশো চুয়াল্লিশ।

একটা খাম, সানাহানবি।

সানাহানবি উঠে গেল, খাম আনতে।

একটা রসিদ...।

ডি.আই.জি. সাহেব বললেন, এতো ট্রেজারিতে জমা পড়বে না। আমি পার্সোনাল রসিদ দিয়ে সানাহানবি মেমসাহেবকে দিয়ে উইটনেস করিয়ে নিচ্ছি।

ঠিক আছে। সকলেরই যখন বাঁচার চেষ্টা করার অধিকার আছে, তখন তম্বি সিংই বা করবে না কেন? তবে উ-মঙ্গ-এর প্রতি আমার কোনও সিমপ্যাথি নেই। ও শুধু চোরই নয়, মিথ্যেবাদী, লোভী, চক্রান্তকারী। উ-মঙ্গ মেরে ফেলতে পারত তম্বিকে, রুবিটা হাতাবার পর। বিরাশির বুড়োরও যখন লোভের নিবৃত্তি হল না, ও থাকুক বাকি জীবনটা জেলে।

আমার বাবা যদি পালিয়ে গিয়ে থাকেন?

থৈবী প্রশ্ন করল।

পালাবার সম্ভাবনা নেই, থৈবী। তোমার বাবাকে পুলিশ মনে হয়, রাত বারোটা নাগাদ অ্যারেস্ট করেছেন।

সেকী! তা হলে যমুনা যে বাড়িতে একা আছে।

ও, এই যমুনা। ভারী ভাল মেয়ে, তোমার মতো থৈবী। তোমার বাবাকে তোমরা বাঁচাতে পারো। ভাল উকিল দিয়ে দেখো। আইনের অনেক ফাঁক-ফোকর থাকে। কিন্তু বাঁচাতে পারলে, ওঁকে সৎপথে চালিত কোরো। সৎভাবে কাজ করে, মাথা উঁচু করে কোটি কোটি মানুষ সব রকম বৃত্তিতে, আজও বেঁচে আছে। উনিই বা পারবেন না কেন? তোমার বাবার জীবনের সবচেয়ে বড় সুকৃতি তুমি এবং যমুনা। তোমার দাদাকে আমি দেখিনি, মিশিনি; বলতে পারব না তাই তার সম্বন্ধে।

দাদা খুব ভাল ছেলে। এই সব কারণেই বাবার সঙ্গে বনত না দাদার। দাদার মৃত্যুর রহস্য ভেদ করার ভার আপনি কি নেবেন? কলকাতায় কদিন থেকে ফিরে এসে?

ভেবে দেখব। তুমি ফোন কোরো।

নাম্বার?

সব আছে সানাহানবির কাছে। তুমি ডি. জি-র সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। তিনিই বলবেন, যা বলার।

সানাহানবি খাম নিয়ে ফিরে এল। মুখ নিচু করে বলল, কী প্রমাণ যে, আমিই ইবোহাল আংকল এর সব সম্পত্তির মালিক?

উইল আছে। উখরুলের উকিল একজন এগজিকুটর এবং তম্বি সিং নিজে আরেকজন।

তম্বি সিং? চমকে উঠল সানাহানবি এবং থৈবীও।

ডি. আই.জি. সাহেব, আপনি উইলটার একটা প্রোবেট করিয়ে নেবেন উকিল দিয়ে, কারণ ওই বুড়ো উকিলের শরীরের অবস্থা ভাল নয়। ওঁর পক্ষে দু একদিনের বেশি ইম্ফলে থাকাও সম্ভব নয়। ডি. জি. সব জানেন। জবানবন্দি নিয়ে ও প্রবেট করিয়ে ওঁকে ছেড়ে দেবেন।

ততক্ষণে চা আর চিজ টোস্ট এসে গেছে। রোদও উঠে গেছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। একটু দূরের ন্যাশানাল হাইওয়ে দিয়ে কোহিমা ও ইম্ফলের দিকে

গাড়ি বাস ও ট্রাকের যাতায়াতের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সানাহানবি ও থৈবী সকলের প্লেটে প্লেটে খাবার তুলে দিয়ে আবার বসল।

ঋজুদা বলল, কনগ্রাচুলেশনস!

সানাহানবি, লেডি ডাই; মুখ নিচু করে এমন একটা "স্মাইল" দিল, ভটকাই-এর ভাষাতে, যে রিয়্যাল লেডি ডাইও লজ্জা পেতেন দেখলে।

একটা ফোন করো থৈবী, যমুনাকে।

ঠিক বলেছেন।

থৈবী বলল।

ফোনের ডায়াল যখন থৈবী ঘোরাচ্ছিল, ঋজুদা বলল, টাইগারকে নতুন করে কবর দিয়েই তোমরা দুজনেই চলে যাও ইম্ফলে, তারপর যমুনাকে গৌহাটি পাঠিয়ে দাও।

ও যেতে চায় না।

ওর বাবার কাছে?

বাবার কাছেও নয়।

বাবার প্যারালিসিস। ও না দেখলে, কে দেখবে?

ও ওর বাবাকে ঘেন্না করে।

ও ভগবান! এ কোন পৃথিবীতে বাস করছি আমরা!

ভটকাই হঠাৎ বলল, আচ্ছা ঋজুদা, তুমি আমাকে দিয়ে উ-মঙ্গকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করালে কেন?

ঋজুদা হেসে উঠল।

বলল, সরি। করিয়েছিলাম, যাতে ধূর্ত, ভণ্ড, পাজি, লোভী উ-মঙ্গ বুঝতে না পারে যে, ওর আসল রূপ আমি ধরে ফেলেছি।

তোর প্রণামটা ও খেয়েছিল। বল?

একটা চিজ টোস্ট মুখে দিয়ে ঋজুদা বলল, তা হলে যমুনাকে তোমরা তোমাদের সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসো। কদিন তোমরা তিনজনে একসঙ্গে থাক, মজা করো। জীবনটা তোমাদেরই। আর, মাত্র একটাই জীবন। কালো মেঘ আসে, ভেসে যায়, আবার সকাল হয়, ফুল ফোটে, পাখি ডাকে। দুঃখ, কষ্ট, আঘাত, শোক, জীবন থাকলেই থাকে। তা সত্ত্বেও বাঁচতে হবে। বাঁচবে। আনন্দে বাঁচবে তোমরা থ্রি-কমরেডস।

বলেই, চায়ে বড় একটা চুমুক দিয়েই ঋজুদা উঠে পড়ে চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দাতে এল। বলল আঃ। কী সুন্দর সকালটা!

সকলেই সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

সানাহানবিকে, এই রুবিটা ইম্ফলের ব্যাঙ্কের লকারে রাখতে সাহায্য করবেন একটু আপনি। আজই। ঋজুদা বলল।

নিশ্চয়। ডি. আই. জি. বললেন।

যতদিন না উনি উঠিয়ে নিতে বলছেন, ততদিন আর্মি-পিকেটও থাকবে এ বাড়িতে। কোনও চিন্তা নেই আপনার। এয়ারপোর্ট অবধি আপনাদের সঙ্গেও দুটি জিপ যাবে এসকর্ট হিসেবে।

ডি.আই.জি. বললেন।

ফাইন।

হাতঘড়ির দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ঋজুদা বলল, তা হলে আমরা এগোই। এই রুদ্র, জিপসিটা যে পড়ে রইল সেই কোন বাদাড়ে? যা তো, সেটাকে নিয়ে আয়। চাবিটা নিয়ে যা।

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, চল ভটকাই। চল কলকাতা এবারে, দেখিস এবারে তোকে কেমন চটকাই।

ঋজুদা বলল, প্লেন থেকে নেমে ভটকাই-এর প্রথম কাজ মোটর-ট্রেনিং স্কুলে গিয়ে ভর্তি হওয়া।

বাংলো থেকে বেরিয়ে ভটকাই বলল, আমার মনে হচ্ছে ঋজুদা সব কথা খোলসা করে বলল না এখনও।

বলেনিই তো। আর বলবেই বা কেন? খুনিকে ধরা, চুরি-যাওয়া রুবির হদিস করা; এ সব তো পুলিশেরই কাজ। তাদের কি চামচে করে তুলে পায়েস খাইয়ে দেওয়া কাজ ঋজুদার? তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে।

কী?

তা হলে আমাদের পরীক্ষাটা নেবে কীভাবে? আমি তোকে বলে দিলাম কলকাতাতে ফিরে আমাদেরই বলবে ইবোবা সিংকে কে বা কারা মারল তা বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁজে বের করতে। ঋজুদাই যদি সব করবে, তবে আমরা কি শোভা?

তাই?

ইয়েস স্যার। তা ছাড়া মদের দোকানের ঝগড়াই শুধু নয়, বাড়ি তল্লাশিও নয়; আমার ধারণা ইবোহাল সিং-এর খুন, ইবোবা সিংয়ের মৃত্যু এবং আচ্চাও সিং-এর বার্মাতে পালিয়ে যাওয়ার পেছনে নাগা ও কুকি টেররিস্টদেরও হাত আছে। ইবোহাল সিং নাগাদের মদত দিতেন আর থাঙ্গজম সিং কুকিদের। ঋজুদা সেটা ভাল করেই জানে। কিন্তু এই কথা অত লোকের সামনে বলাতে অনেকেই অসুবিধা ছিল। কারণ, ইস্যুটা পোলিটিক্যাল। এই কথাই নিশ্চয়ই পরে লিখবে ডি.জি-কে, দেখিস।

মারুতি জিপসিটা কোথায় ছিল, তা ভটকাই জানত। সেই জায়গাতে পৌঁছে দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে উঠে, জিপসিটা ব্যাক করে বড় রাস্তাতে পড়ে 'হাচিনসন'স লজ'-এর দিকে মুখ ঘোরাতে যাব জিপসির, এমন সময় ভটকাই বলল, একটু আগেই কাঙ্গপোকপির সেই ধাবা। চল, দুটো করে পোড়া মবিলে ভাজা জিলিপি আর কচুরি লড়িয়ে আসি। আলুর তরকারিটার যা স্বাদ না! ইস্‌স। নিশ্চয়ই দাদ চুলকোতে চুলকোতে ঝোলের মধ্যে দাদের ঝাল দিয়ে দেয়।

ইস্‌স। স্টুপিড। সকালবেলা, এমন একটা সবদিক দিয়ে সুন্দর সকালবেলা, আর তুই...

কাঙ্গপোকপির ধাবাতে পৌঁছেই তাড়াতাড়ি অর্ডার দিয়ে দিল ভটকাই নেমে। আমি জিপসিটা সরিয়ে নিয়ে একটা মস্ত সেগুনগাছের নীচে রাখলাম ওটাকে। খাবার এলে, গাড়িতে বসেই খেলাম। তারপর চাও। বেশি দুধ, বেশি চিনি দিয়ে।

সানাহানবির বাড়ির এত ভাল চায়ের স্বাদটা এতক্ষণ মুখে লেগে ছিল। দিলি সব মাটি করে।

হ্যাঁরে। একদিন সবই মাটি হয়। এই নে মর্নিং নিউজপেপার। ইংলিশ।

কাগজের নামটা ভাল করে পড়ার আগেই ভটকাই ছোঁ মেরে কাগজটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিল। চায়ের গ্লাস থেকে চা চলকে পড়ল আমার জিনস-এর উপরে।

চটে গিয়ে বললাম, কী হল? এটা?

আরে সেই লোকটাও মার্ডারড?

কে?

আরে ঋজুদার পুরনো বন্ধু। থেংনোপালের পাহাড়ের জোতদার রঘুমণি সিং। যেখানে ইবোবা সিংদের রোড ব্লক করে মারা হয়েছে, তার কাছেই তার বাড়ি।

আমি বললাম। হুমম্।

বাবাঃ। তুইও দেখি "দিল হুম্ হুম" করছিস—ঋজুদা স্টাইলে।

ভটকাই বলল।

না। ব্যাপারটা সিরিয়াস। এই খুনের বদলা আবার কাল অন্যেরা নেবে। আসলে এই মণিপুরের এই নাগা এবং কুকিদের বিরোধের সঙ্গে অগণ্য বড়লোক ও গরিব শান্তিপ্রিয় মণিপুরিও জড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কারণ, অগণ্য মানুষের ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে একদলের সুরক্ষা এবং অন্যদলের বিনাশের পিছনে। বড়ই চিন্তার কথারে ভটকাই। এমনি করে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পথেই এগিয়ে চলেছে।

আমি জানতাম।

কী জানতিস?

ছাগলের দুধ খেয়ে, চরকা কেটে, খদ্দর পরে আর নেহরু সাহেব আর জিন্না সাহেবের জ্বালাময়ী ইংরিজি বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে যে স্বাধীনতা এসেছিল, তা থাকবার নয়। স্বাধীনতা, রক্তর মূল্যে না কিনলে সে স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখা ভারী মুশকিল। ঠাকুমার হাতের মোয়া নয় এ, যে হাত ঘোরালি আর ঠাকুমা তোর হাতে তুলে দিল। বাংলাদেশের মানুষ বুকের রক্ত আর নারীর সম্মানের মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। দেখিস, ওরা স্বাধীনতার দাম বুঝবেন।

হুমম্।

ভটকাই বলল, তুই দিচ্ছিস বটে গুরু। একেই বলে গুরু গুড় আর চেলা চিনি।

মানে কী হল?

মানে জানিস না? বিখ্যাত হিন্দি প্রবচন রে। মানে, গুরু যে সে গুড়ই রয়ে গেল, কিন্তু চেলা যে, সে সুপারফাইন চিনি হয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি বললাম, কী জানি। গদাধরদাতো ঋজুদাকে বলে, তোকে দেখিয়েই, "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।"

আমরা লজ-এর ভিতরে জিপসিটা ঢুকিয়ে দিতেই, ঋজুদা আর তিতির তাদের ব্যাগ হাতে করে এগিয়ে গেল। পেছনে পেছনে অন্যরা। সানাহানবি, থৈবী, ডি.আই.জি. সাহেব এবং তাঁর অগণ্য চেলা—চামুণ্ডারা।

ঋজুদা বলল আমাদের, যা, নেমে তোদের ব্যাগ তোল। অনেক সময় লাগবে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে।

সকলেই এখন গাড়িতে উঠেছি। ঋজুদা পাশে বসেছে, তিতির চালাবে। আমরা পেছনে। সানাহানবি ঋজুদার কাছে এসে স্বগতোক্তির মতো বলল, আবার কবে আসবেন?

আমি বুঝলাম, যে এই প্রশ্নর মধ্যে, অনেকই প্রশ্ন জড়িয়ে-মড়িয়ে ছিল।

ঋজুদা কাঁধ শ্রাগ করে বলল, (কখনওই করে না। অবাক হলাম আমরা, ঋজুদার এই অধঃপতন দেখে) যাওয়াটা সোজা, ফিরে আসাটাই ভারী কঠিন।

বলেই, এক মুহূর্তের জন্যে বিষণ্ণ ও উদাস হয়ে গেল। সানাহানবি ও থৈবীকে "বাই" বলে, তিতির জিপসিটা ব্যাক করল। তারপর ড্রাইভের কোনাতে ঘুরিয়ে নেবার পর, সকলে মিলে হাত নাড়লাম। ওরাও হাত নাড়ল। সানাহানবির সুন্দর, শিষ্ট, বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত দাঁড়িয়ে-থাকার ভঙ্গিটি, আমাদের সকলেরই চোখের মণিতে, চিরদিনের মতো আঁকা রইল।

জিপসির চাকা পিচ-এর পথে পড়েই জোরে ঘুরতে লাগল। হঠাৎ ভটকাই গেয়ে উঠল,

"তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে
তখন ছিলেম বহুদূরে কীসের অন্বেষণে।
কুলে যখন এলেম ফিরে তখন অস্ত শিখরশিরে
চাইল রবি শেষ চাওয়া তার কনকচাঁপার বনে।
আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে।"

বাঃ! ভারী ভাল গাস তো তুই, ভটকাই!

ঋজুদা নিজের মনেই বলল।

ভটকাই রঘুমণি সিং খুন হবার খবর-ছাপা খবরের কাগজটা, ঋজুদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ঋজুদা।

আমি এক টানে কাগজটা ওর হাত থেকে নিয়ে তার উপর চেপে বসলাম।

ভটকাই আমার চোখের দিকে চেয়ে আমার চোখের ভাষা বুঝল।

ঋজুদা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কী?

ভটকাই বলল, কিছু না।

আমি বললাম, গানটা শেষ কর না।

ঋজুদা কিছু বলল না।

ভটকাই আবার ধরল:

"লিখন তোমার বিনিসুতোর শিউলিফুলের মালা,
বাণী যে তার সোনায় ছোঁওয়া অরুণ-আলোয় ঢালা—
এল আমার ক্লান্ত হাতে, ফুল-ঝরানো শীতের রাতে।
কুহেলিকায় মন্থর কোন মৌন সমীরণে।
তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে",
তুমি আমায়.......।

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ না থাকলে আমাদের যে কী দশা হত!

ভটকাই বলল, কী আবার হত! কাকে-চিলে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলত।

জিপসিটা জোরে চলছিল। চারদিকের বন-পাহাড়ের সকালবেলার গন্ধ, সকালবেলার আলো, হু হু করে কলুষহীন হাওয়া আসছে, উড়ে-যাওয়া পাখির চিকন স্বর......।

তিতিরের, আমার, ভটাকই-এর এবং হয়তো ঋজুদারও, সানাহানবির কথা মনে পড়ছিল খুবই। পৃথিবীটা ছোট্ট হলে; পায়ে হেঁটেই একে অন্যের কাছে এমন সুগন্ধি সকালবেলায় পৌঁছতে পারলে, কী ভালই না হত!

ভাবছিলাম আমি।

(এই উপন্যাসের পটভূমি বাস্তব কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্রই কাল্পনিক।)

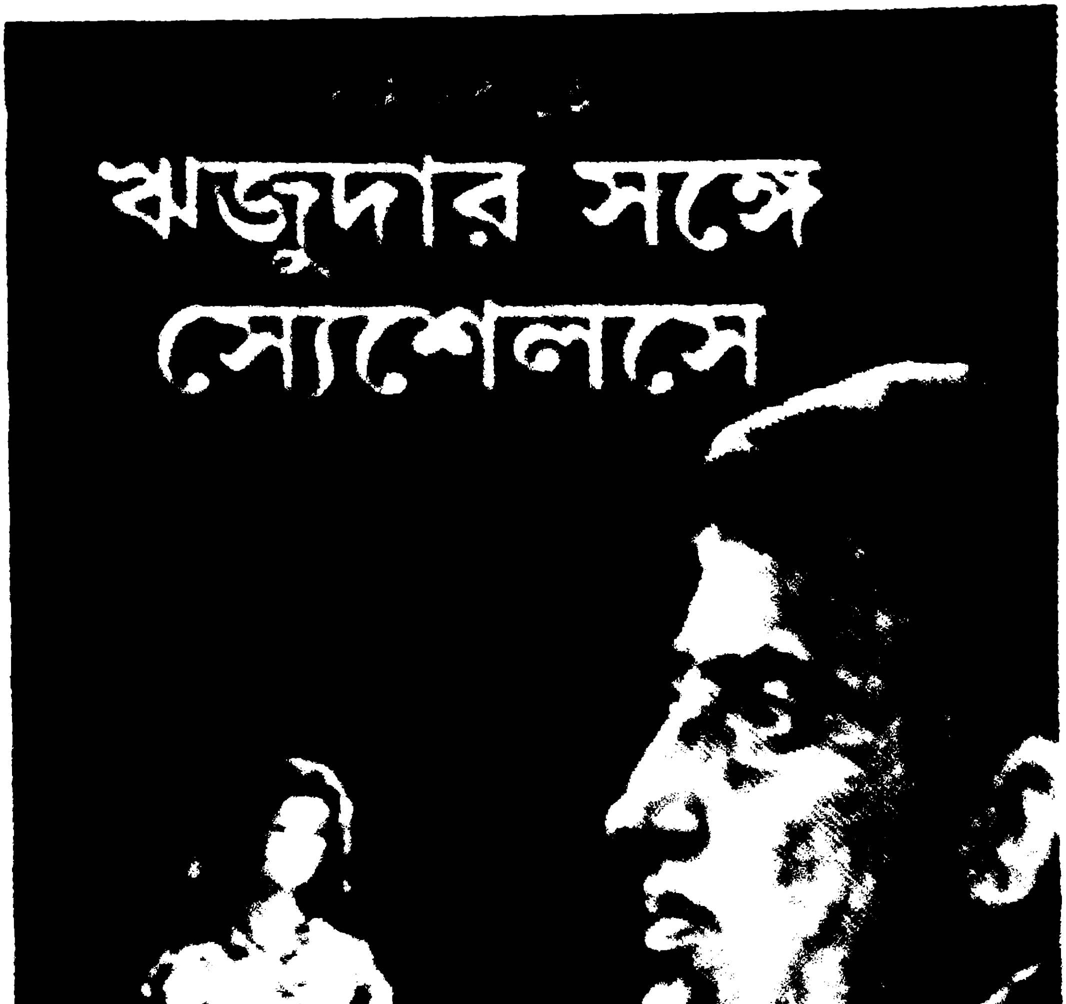

ঋজুদার সঙ্গে স্যেশেলসে

স্কুল থেকে ফিরতেই মা বললেন, ঋজু ফোন করেছিল। তোদের সকলকে যেতে বলেছে আগামীকাল সন্ধেবেলা। রাতে ওখানেই খেয়ে আসতে বলেছে।

সন্ধেবেলা?

হ্যাঁ। সিক্স-ও-ক্লক শার্প।

সেটা না বললেও হত।

মনে মনে বললাম।

ঋজুদার সঙ্গে এতদিন ঘুরছি আর সময়জ্ঞান হয়নি কি আর! পারলে, পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছব। পরে যাইনি কখনই। কিন্তু সকলকে মানে?

জিজ্ঞেস করলাম মা-কে। জুতো খুলতে খুলতেই জিজ্ঞেস করলাম।

তার মানে আমি কী করে জানব? তোদের পুরো দলই হবে।

মানে, তিতির কি ফিরেছে নাকি?

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

আশ্চর্য তো! তা আমি কী করে জানব? সে গেছে কোথায়?

মা বিরক্তির গলাতে বললেন।

বাঃ, সে তো কবেই দিল্লি চলে গেছে। জে এন ইউ-তে পড়ে তো এখন।

তা কেন পড়বে না? পড়াশুনোতে তো সে তোমাদের মতো নয়। ভাল মেয়ে, ভাল করছে। আর তোমরা তো বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরেই দিন কাটাচ্ছ। তোমাদের ঋজুদাই তো তোমাদের তার সব সম্পত্তি দিয়ে যাবে। তাই ভাঙিয়েই চলবে। আর চিন্তা কী? ভাবছ তাই।

আমি বললাম। হাঃ! ঋজুদা বলে, 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি চাপা পড়ে সে।' তা ছাড়া, জীবনে স্কোয়ার হতে হয়। শুধু বুক-ওয়ার্ম হলেই হয় না। তুমিই না বলো যে, আমাকে 'পূর্ণ মানুষ' হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন মানুষ হওয়ার কথা বলতেন।

হ্যাঁ। তা তো বলিই। কিন্তু এমন করে ঋজুর সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়ালে আর পূর্ণ মানুষ হতে হবে না। বনমানুষ হবে। পূর্ণ বনমানুষ!

মা বললেন।

তারপরই বললেন, এবারে দয়া করে খেয়ে নিয়ে আমাকে ধন্য করো। বড়মামা দুপুরে আম পাঠিয়েছেন নবীনকে দিয়ে, বহরমপুর থেকে। আর নকশি পাটিসাপটাও দিয়ে গেছেন।

আমি বললাম, বাঃ। ফারস্ট ক্লাস। কিন্তু নোনতা কিছুই নেই?

সত্যি! ঋজু বোসের যোগ্য চেলা হয়েছিস বটে। খাদ্যরসিক!

তারপরেই বললেন, আছে। ডালপুরি।

ডালপুরি খাব কী দিয়ে? আলুরদম?

তারপর স্বগতোক্তি করলাম, আমার একটাই চিন্তা। ঋজুদা আবার না ভটকাইকে সঙ্গে নেয় এবারেও। নিনিকুমারীর বাঘ মারতে গিয়ে কী কেলোটাই না করেছিল! ঋজুদার লাই পেয়ে পেয়ে ও দিনে দিনে একেবারে আনম্যানেজেবল হয়ে উঠছে। নাগাল্যান্ডের 'কাঙ্গপোকপি'-তে গিয়েও কি কম ঝামেলা করেছিল?

সে সব তুমি আর তোমার ঋজুদাই বুঝো। এখন মুখ হাত পা ধুয়ে দয়া করে খেয়ে নাও। আলুরদমটা মাখো-মাখোই করেছি, তুই যেমন ভালবাসিস।

আমি আমার মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, এই নইলে আমার মা। ইউ আর গ্রেট। মা-আ-আ।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। বিশপ লেফ্রয় রোডে পৌঁছে দেখি, তিনি আমার আগেই গিয়ে পৌঁছে গেছেন। আর ঋজুদা, যথারীতি বাড়ি নেই। তবে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম দশ মিনিট দেরি আছে। আর ঋজুদা ঠিক সময়েই এসে যাবে। কারণ, ঋজু বোস কথা দিলে বা সময় দিলে, তার 'ডেড' বডিও কথা এবং সময় রাখবে।

গদাধরদা বলল, তিনি এই এইলেন বইলে। তোমরা কী খাবেন তাই বল। এট্টু লেমন স্কোয়াশ কইরে দেব কি? আর চারটে কইরে কে. সি. দাসের রসগোল্লা?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়েই বললাম, রাতে কি না-খাওয়াবার মতলব করেছ নাকি? তোমার বাবু কি এতই গরিব হয়ে গেলেন?

আরে না না। সে কী কতা গো! আমার বাবু কোন শত্তুরের অভিশাপে গরিব হবেন! তুমি নোক মোটেই ভাল লয় গো রোদদুর দাদা। আজ অবধি একদিনও কি এমন হইয়েচে যে ঋজু বোসের বাড়ি এইয়ে পেটপুরে না খেইয়ে গেছ তোমরা কেউ?

আমি রোদদুর বাবু নই। আমার নাম রুদ্র। তোমার কি ভীমরতি ধরেছে?

ওই হল। আমি তোমাকে আজ থেকে রোদদুর বলেই ডাকব।

সে আবার কী কথা?

হ্যাঁ। আমার ওই নামটাই একনে পছন্দ।

ভটকাই বলল, রোদদুর না বলে ওকে বরং অন্ধকার বলো।

তারপরই বলল, তোমার বয়স ক'কুড়ি হল গো গদাধর দাদা?

তা তিন-চার কুড়ি হবে বইকী!

তবু বুদ্ধি পাকল না? তোমার রোদদুরবাবু যে লোক খারাপ তা বুঝতে তোমার এত বছর লাগল?

এমন সময়ে ডোর-বেলটা বাজল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ভটকাই মালিককে তেল-মারা ডোবারম্যান কুকুরের মতো লেজ নাড়াতে-নাড়াতে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল। খুলেই, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউটটার্ন করেই ঘরের ভেতরে সেঁধিয়ে গিয়ে আমার দিকে ফিরে প্রায় কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, এক সায়েব এয়েচে।

সাহেব দেখলেই ভটকাইয়ের অবস্থা মুখে নুন-পড়া জোঁকের মতো হয়ে যায়।

বাইরে না দেখালেও, মনে মনে খুবই খুশি হলাম আমি।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, এক সাহেব দরজায় দাঁড়িয়ে। চেহারা দেখে মনে হল না ইংরেজ বলে। তবে কোথাকার মানুষ আমি ঠিক বুঝলামও না। আমি অবশ্য কতটুকুই বা বুঝি।

সাহেব তাঁর হাতের 'পাতেক ফিলিপ' ঘড়িটার দিকে এক ঝলক চেয়ে বললেন, অ্যাম আই আর্লি? ইজ নট মিস্টার বোস ইন?

বললাম, প্লিজ কাম অন ইন। হি উইল বি হিয়ার এনি মোমেন্ট। প্লিজ বি সিটেড।

তারপরে সাহেবকে আমার আর ভটকাইয়ের পরিচয় দিয়ে, আমরাও বসলাম। সাহেব কিন্তু নিজের পরিচয় দিলেন না আমাদের।

আগন্তুক সাহেব মাঝবয়সী, ছিপছিপে। পরনে একটি নীল জিনসের ট্রাউজার, এবং ওপরে লালরঙা গেঞ্জি। ব্যাঙ্গলনের। চোখে রিমলেস চশমা। প্লাস্টিক লেন্সের। তার রং, হালকা হলুদ। পায়ে নীল মোজা এবং হালকা খয়েরি-রঙা মোকাসিন। চেহারাটা ধূর্ত-ধূর্ত। সাহেব তিনি বিলক্ষণ। কিন্তু ইংরেজ নন। কোন দেশি তা বুঝলাম না। তবু বুঝলাম যে, আমাদের চেহারা-ছবি সাহেবের বিশেষ পছন্দ হল না। আমাদের দুজনের দিকেই সন্দিগ্ধ চোখে তাকাতে লাগলেন উনি বারবার।

ভাবলাম, বয়েই গেল! আমরা ওর জামাই থোড়াই হতে যাচ্ছি!

ভটকাই আবার আজকে ডান পায়ে লাল আর বাঁ পায়ে নীল মোজা পরে এসেছিল ভুল করেই। সম্ভবত আমার চেয়ে আগে ঋজুদার বাড়িতে পৌঁছনোর তাগিদেই এমন ভুলটা করেছিল। আমার অ্যাডিডাসের হলুদ গেঞ্জির ডান কাঁধের কাছে ছেঁড়া ছিল কিছুটা। সাহেব সবই লক্ষ করলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। সাহেব মাঝে মাঝেই বুনো শুয়োরের মতো একটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করছিলেন নাক দিয়ে। তবে খুবই আস্তে। আর তারই সঙ্গে নিকার-বোকারের লাল-রঙা ইলাস্টিকটাকে

টেনে টেনে বারবার ওপরে তুলছিলেন।

আমি ভাবলাম, সাহেব বাতিকগ্রস্ত। ভটকাইয়ের দিকে তাকালাম। ভটকাই তার বেগুনচেরা চোখের নীরব দৃষ্টি দিয়ে আমার ভাবনাকে সমর্থন করল।

এমন সময়ে ডোর-বেলটা আবারও বাজল। ভটকাই-ই গিয়ে খুলল আবার।

ঋজুদা ঘরে ঢুকেই বলল, হাই! মঁসিয়ে পঁপাদু। আই অ্যাম অ-ফুলি সরি।

তারপরেই বলল, হাউ লং?

ওনলি আ কাপল অফ মিনিটস।

মঁসিয়ে পঁপাদু বললেন।

ঋজুদা মঁসিয়ে পঁপাদুর চোখমুখ দেখেই বুঝেছিল যে, আমাদের তাঁর বিশেষ পছন্দ হয়নি। তাই হুড়হুড়িয়ে আমাদের গুণপনার কথা সবিস্তারে বলতে লাগল মঁসিয়ে পঁপাদুকে।

লজ্জাই করতে লাগল আমার। এমনকী নির্লজ্জ ভটকাইয়ের মুখ দেখে মনে হল, তারও লজ্জা করছে। ঋজুদাই যেন আমাদের ভিজিটিং কার্ড। এমন সব ভাল ভাল কথা বলছে আমাদের সম্বন্ধে ওই বুনো শুয়োর-মার্কা পঁপাদুকে যে, কাছাকাছি কোনও মেয়ের বাবা থাকলে আমাদের দুজনের একজনকে জামাই না করেই ছাড়তেন না।

পঁপাদু সাহেব বড় ঘন ঘন ঘড়ি দেখেন। এও যেন নাক ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করারই মতন আরেক বাতিক।

এবারে মঁসিয়ে পঁপাদু তাঁর হাতের ব্রিফকেসটি খুলে একগোছা প্লেনের টিকিট বের করলেন। তারপর একটি প্লাস্টিকের ফোল্ডার। বললেন, এতে পাঁচ হাজার ডলার আছে। আমার সঙ্গে আপনার সেখানে দেখা না হওয়াই ভাল। আমি সেখানে থাকবও না। থাকব মরিশাসে। হয়তো। অথবা পারিতেই। ফোনেই যোগাযোগ রাখব। আমার মোবাইল ফোনের নাম্বারটা রেখেছেন তো ঠিক করে? সেখানে পৌঁছানোমাত্র ওখানের কনটাক্টের নাম ঠিকানা, ফোন নাম্বার সব দিয়ে দেবে যে আপনাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করবে। আমারই লোক। সে কিন্তু নিয়ে যাবে না আপনাকে সঙ্গে করে। একটা ক্যাব নিয়ে নেবেন। গতবার আপনি যে বাড়িতে উঠেছিলেন মাহে এয়ারপোর্টের একেবারে গায়েই, সেই বাড়িতে নেমে ক্যাব ছেড়ে দেবেন। ক্যাব চলে গেলেই একটি কালো টয়োটা গাড়ি এসে আপনাদের তুলে নেবে। এয়ারপোর্টের দিক থেকেই আসবে। আপনারা ওখানে পৌঁছালে আপনাদের যা কিছুর দরকার, আর্মস-অ্যামুনিশানসুদ্ধু, আমার কনটাক্টই জুগিয়ে যাবে। মানে, যদি দরকার হয়। আর ডলারের দরকার হলে তাও সে দেবে।

মঁসিয়ে পঁপাদু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার আমি উঠব। একজনের সঙ্গে দেখা করার আছে। তারপর বললেন, কতদিনের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারবেন বলে মনে হয়?

ঋজুদা বলল, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, নো আইডিয়া। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করে ফিরে আসার চেষ্টাই করব।

মঁসিয়ে পঁপাদু বললেন, আমার কাজটা কিন্তু হওয়া চাই মিস্টার বোস।

ঋজুদা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হবে।

তারপর বলল, কাল যাওয়ার আগে একটা ফোন করলে আপনার কনটাক্ট সম্বন্ধে আর একটু বিস্তারিত কথা বলে নেব।

ঠিক আছে।

আমি একটু অবাকই হলাম। কোথায় যাবে, কোন বিদেশে তাও অজানা, কী কাজ তাও জানা নেই, আর্মস-অ্যামুনিশানের প্রশ্ন যখন উঠছে, তখন কাজটা যে বিপজ্জনক তাতেও সন্দেহ নেই, কিন্তু কাজটা যে হবেই এমন গ্যারান্টি ঋজুদা যে কলকাতার বিশপ লেফ্রয় রোডে বসেই দেয় কী করে তা একটুও বুঝলাম না। তা ছাড়া, ঋজুদা ভদ্রলোককে আর একটু বসতে বলল না, চা-কফি কিছু খেতেও বলল না। অবাক হওয়ারই কথা।

ভটকাই আমার চেয়ে বেশি অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল ঋজুদার মুখে।

ঋজুদা মঁসিয়ে পঁপাদুকে ল্যান্ডিং অবধি এগিয়ে দিল। সঙ্গে চামচে ভটকাইও গেল। ফিরে এসে ড্রইংরুমে ঢুকেই বলল, গদাধরদা, এই সৈন্যদের কিছু খাইয়েছ।

এই ভাবতে চিনু কী খাওয়াই।

সে কী! তোমার ভাবনা শেষ হতে হতে ওরা যে আমার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। তুমি কি চেনো না ওদের?

রাতের জন্যে কী রান্না হচ্ছে এখনও তো বললে না গদাধরদা।

ভটকাই বলল, মাঝে পড়ে।

সেই কথাই তো শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ করার সুযোগ আর পেলাম কোতা? কে একটা হলুদ-ব্যাঙের মতো দেখতে উটকো লোক এইসে হাজির হল যে। তা আজ রাতে রাঁধতিচি হলুদ পোলাউ...

মিষ্টি তো?

আমি বললাম।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, মিষ্টিই। আমি কি এই পরথম হলুদ...

আর কী? ভটকাই ইন্টারাপ্ট করল।

আর ভাপা-ইলিশ, চিংড়ি মাছের কাটলেট, দই-রুই, রুই মাছের মাথা-দেওয়া মুগের ডাল, আর আর মুড়িঘণ্ট।

ভটকাই বলল, তুমি কি গো গদাধরদা। বলছ যে চার-কুড়ি বয়স হল আর এটাও জানো না যে, পোলাউ দিয়ে মুড়িঘণ্ট খাওয়া যায় না?

আঃ। তাও কি জানিনি নাকি। ভাতও করতেছি, গোবিন্দভোগ চালের । জুঁইফুলের মতন, মুড়িঘণ্ট আর ডাল দিয়ে খাবে বলে।

আর টক? ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে টক করবে না?

করব তালে।

গুড। আর কী? মধুরেণ সমাপয়েৎ নেই? ভটকাই আবার বলল।

সেটা আবার কী মিষ্টি? কখনও তো নামও শুনিনি বাপের জন্মে।

গদাধরদা বলল।

তারপর বলল, না মধুরেণ-টেন নেই। তবে আচে কে সি দাসের রসগোল্লা। রবিদাদা নিজে পাইট্যে দেচেন।

রবিদাদাটা আবার কে?

ঋজুদা বলল, আরে কে সি দাসের রবি দাস। আমাদের নরেনের দাদা রে। আমাদের সকলেরই রবিদাদা।

ও বুঝেছি।

আর নেপালচন্দ্রের রাবড়িও। শর্মার রাবড়িতে তো আবার তোমার পোড়া পোড়া গন্দ লাগে।

গদাধরদা বলল।

এবারে আমার জন্যে এক কাপ লেবু-দেওয়া চায়ের লিকার দাও আর এরা কী খাবে তা জিজ্ঞেস করে নাও তো গদাধরদা। তারপর নিজের কাজ করো গিয়ে। আমাদেরও কাজ আছে। ততক্ষণে আমরা তা সেরে ফেলি।

ঠিক আ।

গদাধরদা আমাদেরও পরের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মতো শেষ অক্ষর ফেলে দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করে।

গদাধরদা দিনকে দিন মড, মডার, মডেস্ট হচ্ছে।

ভটকাই বলল।

আমি আর ঋজুদা হেসে উঠলাম ভটাকাইয়ের কথাতে।

আমি বললাম, ইংরিজিটা একটু কম বল ভটকাই, নইলে অন্যে ভাবতে পারে খাদ্য হচ্ছে Fodder।

ভটকাই চুপ করে গেল।

গদাধরদা চলে গেলে ঋজুদা ভটকাইকে বলল, গ্লোবটা বের কর তো কাচের আলমারি থেকে।

ভটকাই ল্যাজারাস কোম্পানির কারুকার্য-করা কাচের আলমারি থেকে মস্তবড় গ্লোবটা বের করে এনে সেন্টার-টেবলের ওপরে রাখল।

ঋজুদা তখন আমাদের দুজনেরই দিকে তাকিয়ে থাকল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, আমি চা'টা খেয়ে একটু পাইপ খাই, তোরা এই গ্লোবের মধ্যে একটা দেশ খুঁজে বের কর তো দেখি। দেশটা ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপপুঞ্জ। নাম...

বলেই, কী ভেবে বুক পকেট থেকে মঁ ব্লাঁ কলমটি তুলে নিয়ে স্লিপ প্যাডে

ক্যাপিটাল লেটারে লিখল SEYCHELLES. তারপর বলল, একজন পর্তুগিজ ভদ্রলোক এই দেশটার কথা অস্পষ্ট উল্লেখ করেন তাঁর Plainsphere-এ। ভদ্রলোকের নাম ছিল অ্যালবার্টো ক্যানটিনো।

Plainsphere মানে কী?

প্লেইনস্ফিয়ার হচ্ছে এই যে গ্লোব দেখছিস, তারই পূর্বসূরি। প্লেইন কাগজের ওপরে বিভিন্ন, Sphere, বৃত্ত এঁকে বোঝানো হত—নর্থ পোল, সাউথ পোল, তারাদের অবস্থান। সেই বৃত্তগুলোকে ওপরে নীচে করে আবার অ্যাডজাস্ট করা যেত। এই Plainsphere সামনে ফেলেই পালতোলা জাহাজের নাবিকেরা সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরত তখন।

ভটকাই বানান করে বলল, SEYCHELLES. এ আবার কী দেশ রে বাবা। দেশের নাম সাইকেল?

সাইকেল হয় নাকি অক্ষরগুলো জুড়লে?

ঋজুদা একটু বিরক্তির গলাতে বলল।

খুব খুশি হলাম ভটকাইয়ের কিঞ্চিৎ হেনস্থা দেখে।

রুদ্র?

বললাম, সিকেলেস।

তাও নয়।

নয়? কেন?

নয়, কারণ, শব্দটা ফরাসি। উচ্চারণ স্যেশেল্‌স।

আমরা বোকা বনে গেলাম।

এবারে খুঁজে বের কর দেশটাকে। গ্লোব-এ। ভারত মহাসাগরে। ভারত উপমহাদেশ আর আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে।

তারপর ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে, পাইপটা ভরে নিয়ে ধরাল। গোল্ড-ব্লক পাইপ টোব্যাকোর মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে গেল। এদিকে গোলাকৃতি গ্লোবটাকে চাঁটি মেরে মেরে ভটকাই প্রায় ফ্ল্যাট করে আনল। কিন্তু ভটকাইয়ের সাইকেল বা আমার সিকেলেস এবং ঋজুদার স্যেশেলসকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঋজুদা কী যেন ভাবছিল, বুদ্ধির গোড়াতে পাইপের ধোঁয়া দিতে দিতে, অন্যমনস্ক হয়ে। হঠাৎই যেন মনে পড়ে যাওয়াতে বলল, কী হল রে? পেলি?

কী আবার হবে? পবননন্দন হনুমানকে বললেও খুঁজে পেতেন না। আমরা তো কোন ছার।

ভটকাই বলল।

মানে?

ঋজুদা অবাক হয়ে বলল।

মানে, গন্ধমাদন পর্বতের মধ্যে যদি বা বিশল্যকরণী খুঁজে পাওয়া যায়, ভারত মহাসাগরে তোমার স্যেশেলস খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

আমি বললাম।

ইমপসিবল্‌।

ভটকাই জোর দিয়ে বলল।

ইমপসিবল্‌ ইজ আ ওয়ার্ড ফাউন্ড ইন দ্যা ডিকশনারি অফ ফুলস।

ঋজুদা বলল।

তারপর ঋজুদা তার ইজিচেয়ারের ওপরে সোজা হয়ে বসে বলল, আন দেখি এদিকে।

গ্লোব নিয়ে আমরা দুজনেই ঋজুদার কাছে গেলাম। যেতেই, ঋজুদা দেখিয়ে দিল আমাদের। তবে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে দেখা আদৌ যেত না হয়তো। সরষে দানার চেয়েও ছোট ছোট প্রায় অদৃশ্য কতগুলি দ্বীপ, দারুচিনি, লবঙ্গ এবং আরও নানা মশলার দেশ জাঞ্জিবার আর মরিশাসের কাছাকাছি।

আমরা লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলাম।

ঋজুদা বলল, তোরা কি ভাবিস দেশ মানেই হাজার হাজার মাইল লম্বা-চওড়া হতে হবে? ইয়ারোপে গেলে দেখবি একদিনে গাড়ি করে চারটি দেশ পেরিয়ে গেলি। দেশ তো বড় শুধুমাত্র আয়তন দিয়েই হয় না রে, দেশ বড় হয় সেই দেশের মানুষের চরিত্র দিয়ে, জাত্যাভিমান দিয়ে, দেশপ্রেম দিয়ে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, এই স্যেশেলসের রাজধানী যে দ্বীপটিতে, তার নাম মাহে। রাজধানীর নাম অবশ্য ভিক্টোরিয়া। সে দ্বীপ সতেরো মাইল লম্বা আর তিন মাইল চওড়া। অর্থাৎ একান্ন বর্গমাইল। বোঝ তা হলে।

তা এই পুঁচকে দেশ নিয়ে আমরা কী করব? দেশ-দেশ পুতুল খেলব?

হেসে ফেলল ঋজুদা, ভটকাইয়ের ফাজলামিতে।

ওই মঁসিয়ে পঁপাদু মানুষটি কে?

ভটকাই বলল।

ছটফট করছিল ও জানবার জন্যে।

সময়ে সবই জানতে পারবি, মানে, তুই যখন আমাকে আর রুদ্রকে দমদমের এয়ারপোর্টে ছাড়তে যাবি।

ঋজুদা বলল।

ভটকাইয়ের মুখটা একেবারে কালো হয়ে গেল। তুতুলে বলল, তা-তা হলে আ-আ-আ-মি কি যাব না?

না। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয় তা কি জানো না? এবারের ব্যাপারটা খুবই ডেঞ্জারাস। তোমাকে এবারে হয়তো নেওয়া সম্ভব হবে না ভটকাই। সরি!

ভটকাই, গরম দুধে-ফেলা মুড়িরই মতন চুপসে গেল। পরক্ষণেই তেড়েফুঁড়ে বলল, 'নিনিকুমারীর বাঘ' মারতে যাওয়া বা 'কাঙ্গপোকপি'-তে চুরি-যাওয়া হিরে উদ্ধার করতে যাওয়া কি কিছু কম বিপজ্জনক ছিল?

গদাধরদা হাতের ট্রে-তে করে ঋজুদার জন্য এক কাপ চায়ের পাতলা লিকার

নিয়ে এসে ঋজুদাকে দিয়ে, আমাদের বলল, দাদাবাবুরা, তোমরা এসো দিকিনি এবার খাবারঘরে। খাবার নাইগ্যে দিচি।

এখানে কী দোষ করল?

মনমরা ভটকাই বলল।

নতুন কার্পেট এইয়েচে দিকতিচো না। রসগোল্লার রস-টস ফেইল্যে তাকে তো দেবে এক্কিরি চিক্কিরি চইটকে। তোমায় নিয়েই তো ভয়টা বেশি আমার। বড় ট্যালা তুমি!

অগত্যা ভটকাই এল আমার পেছন পেছন। আসার আগে আমার সঙ্গে ঋজুদার একটি চকিত দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। ভটকাইটা আজকাল এমনই চালু হয়েছে যে সেটুকুও তার দৃষ্টি এড়াল না।

বিড়বিড় করে খাওয়ার ঘরে যেতে যেতে বলল, সে সব দিন চলে গেছে। ভটকাইকে এখন আর তোমাদের লায়াবিলিটি বলে ভেব না। এখন আমি তোমাদের অ্যাসেট। আমাকে না নিয়ে উপায় আছে তোমাদের কোনও?

কলকাতা থেকে বম্বের সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে আসতে আসতে ঋজুদা আমাকে আর ভটকাইকে একটু ব্রিফ করল। সান্টাক্রুজে পৌঁছে আমরা শাটল-বাস ধরে সাহার-এর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যাব। তারপর এয়ার-ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ধরে যাব স্যেশেলসের 'মাহে'-তে।

ঋজুদা বলছিল উনিশশো উনআশিতে যখন প্রথমবার স্যেশেলসে আসে, তখন তানজানিয়ার দার-এস-সালাম যাওয়ার পথে নেমেছিল কয়েক ঘণ্টার জন্যে মাত্র। তখন এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানের স্যেশেলস হয়ে দার-এস-সালামে যাওয়ার বাধা ছিল। কেনিয়ার নাইরোবি যেতে পারত অবশ্য।

পরে আরেকবার স্যেশেলশে এসেছিল ঋজুদা, ছুটি কাটাতে। পনেরো দিন ছিল। আফ্রিকা ফেরত।

ঋজুদা আমাদের যা বলল, তার সারাংশ এরকম।

স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থান ম্যাডাগাসকারের উত্তরে বিষুবরেখার চার ডিগ্রি দক্ষিণে। পুরনো দিনে যে সব চালু জলপথ ছিল, সে পথে যেতে-আসতে ওই সর্ষেদানার মতন দ্বীপপুঞ্জ কোনও নাবিকেরই চোখে পড়ত না। পশ্চিমের আরব দেশ, পূর্বের ইন্দোনেশিয়া (আগের সুমাত্রা ও জাভা) থেকে আসা জাহাজের কিছু কিছু নাবিক মিষ্টি জল ও খাবারের খোঁজে ওই দ্বীপপুঞ্জের দু-একটি ছোট দ্বীপে নেমেছিল। তারা যে আদৌ নেমেছিল, তা অনুমান করেন ভৌগোলিকেরা অনেকদিন পরে সেখানে কিছু কবরের খোঁজ পেয়ে। তারপরে পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দের গোড়াতে ভাসকো-দা-গামা তাঁর ভারতযাত্রার পথে এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যের একটি দ্বীপ, যার নাম 'আমিরান্টেস', দেখতে পান। সেই

কারণে, সেই দ্বীপের আদি নাম বদলে রাখা হয় অ্যাডমিরাল দ্বীপ। কোনও কোনও দ্বীপ পর্তুগিজ নাবিকদেরও চোখে পড়ে। তারা এই দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করে ASSETE IRAMS (সাত বোন) এবং OSIR MAUS (সাত ভায়ারা)।

নানা দেশের জলদস্যুরাই এই নির্জন দ্বীপপুঞ্জে তাদের গোপন আস্তানা গড়ে তোলে। এই দ্বীপপুঞ্জ চালু জলপথের ওপরে নয় বলেই তাদের সুবিধেও হত নানারকম। বহু জলদস্যুর গুপ্তধন এখনও পোঁতা আছে এই স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জের নানা দ্বীপে। এমনই শুনতে পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অ্যালবার্ট ক্যানটিনো নামের এক মানচিত্রী, যিনি, PLAINSPHERE এর প্রবর্তক, তাঁর আঁকা মানচিত্রে প্রথম স্যেশেলসকে আঁকেন। তার অনেকই পরে, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াতে, ইংরেজ বণিকদের একটি দল যখন ভারতের পশ্চিম উপকূলের সুরাটের দিকে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে আসছিলেন, তখন তাঁদের চোখে পড়ে যায় এই স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জ। এক ইংরেজ সাহেব, জন জরডেইনের লেখা, স্যেশেলস সম্বন্ধে বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো পাঁচ সালে। তারপর ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ষোড়শ নয় খ্রিস্টাব্দে 'Ascension' এবং 'Good Hope' জাহাজে করে কিছু ইংরেজ ব্যবসায়ী স্যেশেলসের মাহে এবং অন্য একটি দ্বীপে নেমেছিলেন। তারও পর, সতেরশো শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসিরা এসে, বলতে গেলে, স্যেশেলসে রীতিমতো একাধিপত্য জারি করে। জাঞ্জিবার থেকে তারা বারবার আক্রমণ করে পুরো দ্বীপপুঞ্জের মালিক বনে যায়। সবচেয়ে আগে যে দ্বীপটি তারা দখল করে, তার নাম ST. ANNE ISLAND.

এখনও দ্বীপটি ওই নামেই পরিচিত।

তখন ফরাসি রাজত্বের প্রথম ভাগ। ফরাসি দেশের কন্ট্রোলার-জেনারেল যিনি ছিলেন তাঁর নাম ছিল ভাইকাউন্ট মোরে দ্য স্যেশেলস। ওঁরই নামানুকরণে জয়-করা নতুন দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখেন ফরাসিরা 'স্যেশেলস'। কিন্তু তখন ওই দ্বীপপুঞ্জে কোনও জনবসতি ছিল না। আদিবাসী বলতেও কেউই ছিল না। ফরাসিরা তাই মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকা, মরিশাস এবং ফরাসি দেশ থেকেও অনেক পরিবারকে এনে ওখানে বসতি করিয়ে দারুচিনি, নারকেল, তামাক, তুলো ইত্যাদি চাষ শুরু করল। কিন্তু হলে কী হয়, তার বছর-পঞ্চাশের মধ্যেই ইংরেজরা এসে ওই দ্বীপপুঞ্জ ফরাসিদের কাছ থেকে কবজা করে নিল। তারও কিছু পরে, কিছু ভারতীয় এবং অবাক কাণ্ড, চীনারাও এসে হাজির হল। তার ফলে কালো, সাদা এবং বাদামি নানা ধরনের মানুষের বাসভূমি হয়ে উঠল স্যেশেলস। তবে যেহেতু আফ্রিকানরাই শ্রমিক হিসেবে বেশি সংখ্যাতে এসেছিল, তাদের প্রভাবই এখনও তাই বেশিই আছে।

কোন ভাষাতে কথা বলে স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জের মানুষেরা? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ভাষা চলে স্যেশেলসে তিনটি। ফরাসি, ইংরেজি এবং...

এবং সোয়াহিলি?

বাহাদুরি করে বললাম আমি।

ঋজুদা আমার বাহাদুরির মাথাতে জল ঢেলে দিয়ে বলল, না রে! এখানের সেই মিশ্র ভাষার নাম 'ক্রেওল'। তাতে সোয়াহিলির প্রভাব আছে কি না জানি না, কিন্তু ফরাসি ভাষার প্রভাব বেশ আছে। তবে, ইংরেজির প্রভাবও কিছু আছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা সঠিক বলতে পারবেন। ক্রেওল এক খিচুড়ি ভাষা। তবে ওই তিন ভাষাই সরকারিভাবে স্বীকৃত।

বম্বেতে সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে নেমে, শাটল-বাসে উঠে সাহার এয়ারপোর্টের দিকে যখন আমরা যাচ্ছি, তখন ভটকাই প্রায় চিৎকার করে উঠল। অ্যাই রে। ঋজুদা। কেলো হয়েছে। আমাদের স্যুটকেসগুলোই নেওয়া হল না!

আমি বললাম, ওগুলো চলে যাবে আমাদের নতুন প্লেনে। তোর মাথাব্যথা নেই। তোর হ্যান্ডব্যাগটা নিয়েছিস তো?

হ্যাঁ। এই তো।

তা হলেই হবে।

ভটকাই বলল, আচ্ছা ঋজুদা, স্যেশেলসে যাওয়ার কারণটা কী তার আভাস তো কিছু দেবে? তোমার মিস্টার পঁপাদু কি ভূগোল পড়াতেই নেমন্তন্ন করেছেন? না ইতিহাস?

ঋজুদা ভটকাইয়ের কথাতে হেসে ফেলল।

ঋজুদা হাসে কম, কিন্তু হাসলে দারুণ দেখায়।

আমি বললাম, তোর মুখের ভূগোল পাল্টাবে এবারে মঁসিয়ে পঁপাদু। তাই তো ঋজুদা তোকে নিয়ে এসেছে এবারে।

রহস্য সবে জমাট বাঁধছে। একবার এসেই সেই রহস্যের ফোড়া-ফাটানো যাবে কি না তাও বলতে পারছি না। তবে রহস্য অবশ্যই আছে। নইলে মিস্টার পঁপাদু ওখান থেকে পুরো ভারতবর্ষ পেরিয়ে পূর্বপ্রান্তের কলকাতাতে এসে পৌঁছবেন কেন হাঁচোর-পাঁচোর করে এই ঋজু বোসের ডেরাতে?

টার্মিনাল-বিল্ডিংয়ে ঢুকে ঋজুদা বলল, একসঙ্গে থাকব না কিন্তু আমরা। এবার থেকে একটু ছাড়া ছাড়া থাকব। যেন একে অন্যকে চিনি না। অথচ নজর রাখব অন্য দুজনের ওপরে প্রত্যেকেই। পিয়েরের লোকজন এখানেও থাকতে পারে।

বললাম, এবার আমারও হেঁয়ালি-হেঁয়ালি ঠেকছে। যা বলবে তা একটু খুলেই বলো না ঋজুদা। এই পিয়েরটি আবার কোথা থেকে এল? এক পঁপাদুকে নিয়েই তো ভটকাই হয়রান।

বলব, বলব। সবই বলব যথাসময়ে। তাড়া কীসের? বম্বে থেকে প্লেন ছাড়লেই তো সাড়ে চার ঘণ্টাতে পৌঁছে যাব একেবারে অপারেশনাল এরিয়াতে। তখন সব যদি জানা না থাকে তা হলেই তো কড়াক্-পিঙ।

কড়াক্-পিঙটা আবার কী জিনিস?

ভটকাই বোকার মতো প্রশ্নটা অত্যন্ত বিজ্ঞর মতো করল।

বললাম, অপার অশিক্ষিত তুই। সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের 'দেশে বিদেশে' বইটা পড়ে নিস। অমন বই বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি লেখা হয়নি।

বোয়িং প্লেনটা যখন নীচে নামতে লাগল, সমুদ্রকে যখন সমুদ্র বলেই চেনা গেল, তখনই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। প্লেন যখন উঁচু দিয়ে ওড়ে তখন সমুদ্রকে সমুদ্র বলে বোঝাই যায় না। মেঘের নীচেই থাকে। এখন আকাশে মেঘ নেই বলে সমুদ্রকে একটা কালো চাদরের মতো দেখাচ্ছে, যার ওপরে সাদা সাদা অসংখ্য অস্থির রেখা। সেগুলো ফেনা-ভাঙা ঢেউ আর কী! অত ওপর থেকে ওইরকমই মনে হয়।

প্লেনটা ঘুরে ঘুরে নীচে নামতে লাগল। মনে হল, একেই বোধহয় বলে। পরীদের দেশ, স্বর্গের দেশ। সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে পাহাড় ঘেরা সব ছোট ছোট দ্বীপ। কোনও দ্বীপকে ঘিরে রয়েছে কমলা-রঙা ছায়া চারদিকে, কোনও দ্বীপকে ফিকে নীল, কাউকে বা গাঢ় গোলাপি। আরও কত যে রং, তা কী বলব! এমন সুন্দর কোনও দেশ যে পৃথিবীতে আছে, তা জানাই ছিল না।

ভটকাই বিস্ময়ে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বলল, এ কী! এমন সব রং কেন?

একেই বলে প্রবাল-দ্বীপ! বুঝেছিস। জলের নীচে যে রঙের প্রবাল, সেই রঙেরই আভা ফুটেছে জলে।

ঋজুদা বলল।

প্লেনটা আরও এক চক্কর মারল দ্বীপপুঞ্জের ওপরে, যেন এই স্বপ্নের দেশকে ভাল করে দেখাবারই জন্যে। তারপরই নেমে পড়ল রানওয়েতে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যে, পাইলট বুঝি সামলাতে পারবে না আর, প্লেনসুদ্ধু আমাদের অবধারিত সলিল সমাধি কেউই আর ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু যাই হোক, দৈববলে একেবারে জলের কিনারে গিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ব্রেক কষে, পাইলট প্লেনের মুখটা ঘোরাল।

ঋজুদা স্বগতোক্তি করল। আরে! এয়ারপোর্টটা তো এখন অনেক লম্বা হয়েছে মনে হচ্ছে। নাকি, চোখেরই ভুল? প্রথমবার যখন এসেছিলাম উনিশশো উনআশিতে, তখন সত্যিই মনে হয়েছিল যে, জলেই পড়ে যাবে প্লেনটা। তা করবেটাই বা কী? জায়গা কোথায়? এই হচ্ছে স্যেশেলসের রাজধানী ভিক্টোরিয়া। মাহে দ্বীপে। এই দ্বীপটারই নাম 'মাহে'। বলেছি তো! এই দ্বীপ লম্বাতে সতেরো মাইল আর চওড়াতে তিন মাইল। তাও আবার শুধুই সমতল জমি নয়, পাহাড়-টাহাড় নিয়ে। আর পাহাড়ও তো এখানে কম নেই। প্রহরীর মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় প্রত্যেকটি দ্বীপের আধো-চাঁদা তটরেখার পেছনে

পেছনে। স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপ ওই স্বাধীন দেশের যদি রাজধানী হয় তবে অন্য দ্বীপগুলি যে কত ছোট তা তো অনুমানই করতে পারছিস।

প্লেন থেকে নেমে, টারম্যাকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখি, সামনেই কাছে-দূরে তিনটি দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। দ্বীপপুঞ্জ যখন, তখন দ্বীপ তো থাকবেই অনেক।

ভটকাই বলল, ঋজুদা স্যেশেলসের মানুষদের কী বলে?

আমি বললাম, কী আর বলবে, মানুষই বলে।

বোকার মতো কথা বলিস না। ইন্ডিয়ার মানুষদের যেমন বলে ইন্ডিয়ান, অ্যামেরিকার মানুষদের 'অ্যামেরিকান' তেমনই আর কী?

নারে! স্যেশেলসের মানুষদের বলে স্যোশেলোয়া। ঋজুদা বলল।

স্যেশেলোয়া!

ভটকাই পুলকিত হয়ে পুনরাবৃত্তি করল।

ঋজুদা বলল, এখানে আমি ছাড়া আর কেউই অন্যদের সঙ্গে কথা বলবে না। বুঝেছ। মানে, যখন আমার সঙ্গে থাকবে। যখন আমি সঙ্গে থাকব না, তখন তো অন্যদের সঙ্গে তোমাদের কথা বলতেই হবে। এবং ইংরেজিই বলতে হবে।

অত ইংরেজি! উরি বাবা!

ভটকাই বলল।

আমরা নিজেদের মধ্যে অবশ্য সবসময়েই বাংলাতেই কথা বলব।

তারপর বলল, 'ক্রেওল' ভাষাটা এত স্বল্প দিনে আয়ত্ত করা গেল না। তোরা তো আবার ফরাসি জানিস না কেউই। তিতিরটা থাকলে খুবই ভাল হত। সে মেয়েটা তো রীতিমতো একজন ভাষাবিদ। লিঙ্গুইস্ট।

প্রতিভা যাহাকেই স্পর্শ করে, তাহাই...

ভটকাইকে বকাবকি অবশ্যই করি বটে, কিন্তু ও না থাকলে আমাদের এই অভিযানগুলো একটু বেশিই সিরিয়াস হয়ে যেত। ভটকাই সঙ্গে থাকে বলেই কখনওই আমাদের 'টেন্স' হয়ে ওঠা হয় না। ও একটা ওরিজিনাল মানুষ।

কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন-এর কাউন্টার সহজেই পেরনো গেল। ঋজুদা বলল, এটা ট্যুরিস্ট-স্পট। সারা পৃথিবী থেকে পর্যটকরা আসছেন প্রবাল দ্বীপের সৌন্দর্য দেখতে, স্কুবা-ডাইভিং করতে, স্নরকেলিং করতে, সাঁতার কাটতে, সাদা বালুবেলাতে সাঁতরাগাছির ওল-এর মতন সারে সারে শুয়ে থেকে গায়ের সাদা বা লাল রং পুড়িয়ে পোড়া-মাটির মতো রাঙা হয়ে উঠতে। যত বেশি বিখ্যাত-স্পট, তত বাতিকগ্রস্ত আর হাফ-পাগল আর পাগল এসে জোটে সেখানে।

স্কুবা-ডাইভিং আর স্নরকেলিং মানে কী? ভটকাই বলল।

অভিধানে দেখে নিবি। পশ্চিমি জগতে কেউ আমাদের মতন সবকিছুই অন্যের কাছ থেকে জেনে নিতে চায় না। নিজেরাই কষ্ট করে জানে। তাই, মনে থাকে।

লক্ষ করে দেখিস, ওরা পারতপক্ষে পথঘাটের হদিসও জিজ্ঞেস করে না। নিজেরাই ম্যাপ দেখে বের করে।

ঋজুদা হঠাৎই বলল, শোন, তোরা দুজনে একটু পাগল-পাগল ভাব করবি। আর ভাব করবি, যেন তোরা দুজনেই আমার ছেলে। দুই ন্যালাখ্যাপা। ভুলে যাস না।

ছেলে!

ভটকাই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলল, বাবা জানলে কিন্তু ভীষণ রাগ করবে। বাবার একমাত্র বংশধরকে তুমি মেরে দেবে?

ঋজুদা বলল, সেটা কোনও কথা নয়। মা জানলে আরও বেশি রাগ করবেন হয়তো। কিন্তু কী করা যাবে। কার্যসিদ্ধি করে এবং প্রত্যেকেরই পৈতৃক প্রাণ বাঁচিয়ে কলকাতায় ফেরার চেষ্টা তো করতে হবে।

আমি বললাম, কাস্টমস আর ইমিগ্রেশনে তো আমাদের দুজনের বাবার নাম পাসপোর্টেই দেখতে পাবেন ওঁরা।

আঃ। ওদের জন্যে তো বলছি না। তুইও আজকাল বড় এঁড়ে-তর্ক করিস।

ভটকাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, আমার হেনস্থাটা পুরোপুরি উপভোগ করল।

কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন খুবই ভাল ব্যবহার করল। ছোট এয়ারপোর্ট। সকলেই যেন পর্যটকদের অভ্যর্থনা করতেই উৎসুক হয়ে আছেন। তা ছাড়া, আমরা এসেছিও তো ট্যুরিস্ট-ভিসা নিয়েই।

লাগেজ এসে গেলে, আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ দেখিয়ে আমরা ট্রলিতে লাগেজ চাপিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে এলাম। গ্রিন-চ্যানেল রেড-চ্যানেল ও সবের বালাই-ই নেই এখানে।

এখানে ট্যাক্সি ও গাড়িগুলো দেখলাম ছোট ছোট। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। তুঁতে-নীল আকাশ। ঝকঝক করছে রোদ্দুর। সামনেই একটা গাঢ় সবুজ পাহাড়। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

ঋজুদা বলল, প্রথমবার জাপানে গিয়েও আমার এরকমই মনে হয়েছিল। ছোটখাটো মানুষ, সরু-সরু রাস্তা, ছোট-ছোট গাড়ি, পাঁচ কাঠার ধানখেত, সবই কিম্ভূত। কিন্তু অতটুকু দেশের বাঁটকুলে মানুষগুলো সারা পৃথিবীকে প্রায় কবজাই তো করে ফেলেছিল আর একটু হলে। তাই না? দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দিয়ে দেশের মাপও যেমন হয় না, মানুষের মাপও হয় না। আমার মতন লম্বা-চওড়া মানুষেরা বোকাই হয় সচরাচর।

একটা ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে ঋজুদা সামনে বসল। আর ঋজুদার দুই ন্যালাখ্যাপা ছেলে, পেছনে। মালপত্র পেছনেই রাখা হয়েছিল। তিনজনেরই একটি করে মাঝারিমাপের স্যুটকেস আর একটি করে হ্যান্ডব্যাগ।

অনেকগুলো ছাদহীন ছোট-ছোট নানা-রঙা গাড়ি দেখলাম। শর্টস-পরা, মাথায় স্ট্র-হ্যাট চড়ানো সাহেব ট্যুরিস্টরা চালিয়ে বেড়াচ্ছে। ঋজুদা বলল, দ্যাখ, দ্যাখ, ওই

গাড়িগুলোর নাম 'মিনিমক'। ভাড়া পাওয়া যায় এখানে।

দেশটা ছোট হতে পারে, গাড়িটাও ছোট হতে পারে, কিন্তু গন্তব্যও যে এত সামান্য দূরত্বে হতে পারে, তা জানা ছিল না। বলতে গেলে, ট্যাক্সিতে উঠলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই নামলাম। ঋজুদা কি রসিকতা করছে না কি আমাদের সঙ্গে? করছে কি না, তা বোঝার আগেই ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল ঋজুদা। আমরা স্যুটকেসগুলো নামিয়ে নিলাম। ট্যাক্সিওয়ালা ক্রেওল ভাষাতে বিড়বিড় করে কী সব গালাগালি দিল আমাদের। তারপর বেশ বিরক্ত হয়ে দড়াম করে প্রায়ই ভটকাই-এর কড়ে-আঙুলটা চাপা দিয়েই দরজাটা বন্ধ করে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক জোরে ট্যাক্সি চালিয়ে ভিক্টোরিয়া শহরের দিকে চলে গেল। ওর দোষ কী? ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে তো কোনও ট্যাক্সিওয়ালাই পাঁচশো গজ যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে না। বেচারি ভেবেছিল দূরে যাব আমরা। বড় হোটেলে উঠব। মোটা ভাড়াও বকশিস পাবে ও।

বকশিস অবশ্য দিল ঋজুদা। তারপর সামনে একটু ঝুঁকে, 'বাও' করে বলল, মেরসি।

ড্রাইভার বলল, ইউ আর ওয়েলকাম স্যার।

এমনভাবে বলল যে, শুনে মনে হল বলল, জাহান্নামে যাও।

রাস্তার যেখানে নামলাম, তার সামনেই একটি গেট। একটি একতলা বাংলো বাড়ি। যেন সমুদ্রর মধ্যে থেকেই গেঁথে তোলা হয়েছে। একটা চওড়া প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে ঢুকতে হয় সে বাড়িতে। বাড়ির সামনেই একটা চওড়া সমুদ্রমুখী বারান্দা।

ভটকাই বলল, আঃ সারা দিন-রাত সমুদ্র দেখেই দিন কেটে যাবে। কী বল রুদ্র?

তারপর বলল, তাইলে? 'ইরেই' কয় ইন্ডিয়ান ওশান?

স্যুটকেসগুলো তুলে নিয়ে গেট খুলে ভিতরে ঢুকতে যাব, এমন সময়ে ভরদুপুরের টুকরো-টাকরা রোদের অগণ্য হলুদ-রঙা প্রজাপতি উড়িয়ে হাওয়াটা বাংলোটার পাশের নারকোল বনের মাথা আঁচড়ে, নানা অদৃশ্য অলিগলি দিয়ে ঝাঁপিয়ে জলে ইলিবিলি কেটে পরক্ষণেই আমাদের চুল এলোমেলো করে দিল।

বাংলোটার ভেতরে কিন্তু আর ঢোকা হল না। ঠিক তখনই এয়ারপোর্টের দিক থেকে একটা কালো কাচ-তোলা কালো-রঙা এয়ারকন্ডিশন্ড টোয়োটা গাড়ি জোরে এসে আমাদের সামনে ব্রেক করে থেমে গেল।

তখনই মনে পড়ল মঁসিয়ে পাঁপাদু সেইরকমই বলেছিলেন বটে।

একজন বয়স্ক কিন্তু অত্যন্ত সপ্রতিভ ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমেই স্যুটকেস তিনটে ফটাফট গাড়ির বুটে তুলে নিয়েই আবার স্টিয়ারিং-এ বসল গিয়ে।

ঋজুদার দেখাদেখি ঋজুদার দুই কলকাতার মাখনবাবু ছেলেও সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে পড়ল।

তারপর গাড়ি চলতে লাগল তো লাগলই।

সতেরো মাইল বাই তিন মাইল ইজ ইকুয়ালটু একান্ন বর্গমাইল দ্বীপ এই মাত্র। তার মাঝামাঝি ফুঁড়লেও হয় পঁচিশ মাইল। কিন্তু বেশ জোরে গাড়ি যাওয়া সত্ত্বেও প্রায় আধঘণ্টা এঁকেবেঁকে একবার সমুদ্রতীরে, একবার পাহাড়ের গা, একবার সমতল হয়ে গাড়িটা চলতেই লাগল। কোনও কোনও জায়গাতে পথ চলে গেছে সমুদ্রের কোনা ঘেঁষে 'কজওয়ের' ওপর দিয়ে। ভারী সুন্দর দেখায়। অন্যদিকে ব্যাকওয়াটারের সৃষ্টি হয়েছে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল কজওয়ের কংক্রিটের ঢালাইয়ের ইঞ্চি ছয়েক তলা দিয়ে বয়ে যায়। বর্ষা যখন প্রবল হয়, তখন কখনও কখনও পথের ওপর দিয়েই নিশ্চয়ই বয়ে যায় সমুদ্র। নইলে আর CAUSEWAY বানানো কেন?

গাড়ি চলছে তো চলেইছে। বেশ জোরেই চলছে। আরও মিনিট দশেক কেটে গেল, এমন সময়ে ড্রাইভার গাড়ির রিয়ার-ভিউ-মিররে তাকিয়ে ইংরেজিতে স্বগতোক্তি করল, এতক্ষণে পোকাটাকে ঝেড়ে ফেলা গেল। আর ও ফলো করতে পারবে না আমাদের।

পোকা? পোকা কীরে?

ভটকাই বলল।

আমি বললাম, 'পুকা'। মানে টিকটিকি। বোঝলা কিছু?

হ। হ।

বলল, ভটকাই। বুঝছি। বুঝছি! পিছু নিয়েছিল।

তখনও গন্তব্যেই পৌঁছনো গেল না। খিদে অবশ্য ছিল না। কারণ, এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে চমৎকার লাঞ্চ দিয়েছিল। কিন্তু প্রবাসে এসে যেখানে থাকব সেখানে একটু গুছিয়ে বসতে না পারলে কি ভাল লাগে। নামতে না নামতেই এ কী পোকার উপদ্রব!

ড্রাইভারের নাম কার্লোস। সে মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা ব্যাক করে নিয়ে যে পথে আমরা প্রথমেই এগিয়েছিলাম সে পথেই মিনিট পনেরো গিয়ে একটি ছোট পাহাড়ের প্রায় মাথাতে ঘুরে ঘুরে উঠে ছোট্ট কিন্তু ছবির মতন একটি সাদা রং-করা ভিলার গেটের সামনে পৌঁছে, গাড়ি দাঁড় করাল। ভিলাটার প্রবেশ পথের এক পাশের পিলারের ওপর কালো পাথরের ওপরে সাদাতে লেখা আছে: 'দি ঈগলস রুস্ট'। আমি বললাম, ঈগলের বাসা!

বাড়ির নাম? অসাধারণ নাম।

ঋজুদা বলল।

তারপরে কার্লোস নিজেই পকেট থেকে চাবি বের করে গেট খুলে প্রধান প্রবেশদ্বারে গাড়ি দাঁড় না-করিয়ে নানারকম গাছের সারির মধ্যে ড্রাইভ দিয়ে চালিয়ে গিয়ে পেছনের প্রবেশদ্বারের সামনে এনে গাড়ি দাঁড় করাল। শুধুই সমুদ্র ভিলাটার পেছন দিকে। ভারত মহাসাগর। সুনীল। আদিগন্ত। কোনও দ্বীপও

চোখে পড়ে না এখান থেকে। সম্ভবত এদিকে কোনও দ্বীপ নেইও।

আমরা মালপত্র নামিয়ে নিলে, ঋজুদাকে একগোছা চাবি দিয়ে ঋজুদার সঙ্গে এবারে ফরাসিতে কী সব কথা বলে স্যালুট করে চলে গেল কার্লোস। মাঝেমাঝেই কার্লোস বলছে, পাঁর্দো মঁসিয়ে, পাঁর্দো মঁসিয়ে।

ফরাসিতে পাঁর্দো, ইংরেজিতে পার্ডন। ওইটুকু ফরাসি জানতাম।

এরা সব অতীব ভদ্রলোকের জাত তো। কারও কথা না বুঝতে পারলে, ধমকে কখনওই বলে না, 'কী বললেন, বোঝা গেল না।' ওরা বলে, ক্ষমা করবেন। পার্ডন। পাঁর্দো। আরও একটা কারণ আমার মনে এল। ঋজুদার ফরাসিটা অনভ্যাসের ফোঁটার মতন চড়চড় করছিল বলেই ঋজুদার সব কথা হয়তো কার্লোস বুঝতে পারছিল না। তাই কার্লোস-এর অত পাঁর্দোর তুবড়ি।

এখানে এই বিজাতীয়দের দেশে পৌঁছে দুর্বোধ্য ভাষাভাষী মানুষজনের মধ্যে পড়ে তিতিরের অনুপস্থিতি খুবই অনুভব করছিলাম। ও মেয়ে তো নয়, সাক্ষাৎ দুর্গা, রূপে গুণে। দশপ্রহরণধারিণী।

ভটকাই গলা নামিয়ে আমাকে বলল, আরে ও রোদদুরবাবু! বেয়ারা-বাবুর্চিরা সব গেল কোথায়? একটা ডাবল-ডিমের ওমলেট, মধ্যে একটু চিজ আর চিকেন দিয়ে করে দিলে, সঙ্গে এক গ্লাস ড্রিংকিং-চকোলেট, ইক্কেরে জমে যেত।

বলেই বলল, কী ব্যাপার ঋজুদা? তোমার কি কোনও ইজ্জত নেই? তোমার ছেলে দুটোর এমন হেনস্থা। ন্যালাখ্যাপা বলে কি তারা মানুষ নয়? নো খাতির! অথচ জান-লড়াতে এলাম।

ঋজুদা বলল, এখানে বেয়ারাও নেই, বাবুর্চিও নেই। ঝাড়ুদারও নেই, এমনকী জমাদারও নেই। আজ রাতের রান্না তুমিই করবে ভটকাই। ফ্রিজ খুলে দেখ, মঁসিয়ে পঁপাদুর লোকজন দয়া করে কিছু রেখে গেছে কিনা, হ্যাম, সসেজ, ডিম, মাছ, দুধ ইত্যাদি কিছু নিশ্চয়ই থাকবে।

ভটকাই বিরাট ফ্রিজটা খুলেই চেঁচিয়ে বলল, ফক্কা! এ কী! খাবারদাবার নট কিচ্ছু। গোটা ত্রিশেক ইলেকট্রিক বালব আছে শুধু।

বলিস কীরে! ফ্রিজের মধ্যে ইলেকট্রিক বালব।

ভটকাই বলল, হাঃ। জোক অফ দ্য ইয়ার।

অবাক হলাম আমি। ভটকাইটাও পুরোপুরি সাহেব হয়ে উঠেছে। কোথায় বলবে 'হায় কপাল'! তা না, বলছে 'জোক অফ দ্য ইয়ার।'

ঋজুদা স্বগতোক্তির মতন বলল, এই ভিলাতে রাতে কোনও আলো জ্বললে তা সমুদ্র থেকে তো বটেই, ভিক্টোরিয়া শহরের অনেক জায়গা থেকেই দেখা যাবে। সে জন্যেই বালবগুলো খুলে রেখেছে। তবে এখন শুক্লপক্ষ। খুব একটা অসুবিধা হবে না। ঘরের মধ্যে ছোট আলো জ্বালিয়ে পরদা ভাল করে টেনে ভেতরে থাকতে হবে।

গরমে সেদ্ধ হয়ে যাব যে! জানালা বন্ধ করে, পরদাও বন্ধ করে?

ভটকাই বলল।

ইডিয়ট। ভিলাটা সেন্ট্রালি-এয়ারকন্ডিশনড। এতক্ষণেও বুঝলি না?

আমি বললাম।

তাই? আরে তাই তো দেখি! বিজবিজ করে ঠাণ্ডা বেরুচ্ছে। বলিস কী রে। এটা কার ভিলা?

ঋজুদা এতক্ষণে পাইপের পোড়া-ছাই খুঁচিয়ে বের করে অ্যাশট্রেতে ফেলে বলল, ভিলাটা আমার বেয়াই-এর।

মানে? বেয়াই কাকে বলে?

মেয়ের শ্বশুরকে।

ভটকাই বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে বলল খালি ঠাট্টা। এখন পর্যন্ত কেসটা কী তাই জানালে না। তোমার ন্যালা-ক্ষ্যাপা ছেলে দুটোকে কি আজীবন এমনি হাবাগোবাই করে রাখবে?

না। এবারে সব বলব। শনৈঃ শনৈঃ বৎস। চলো। এবারে বসবার ঘরে গিয়ে স্থির হয়ে বোসো।

তারপরেই আমার দিকে ফিরে পকেট থেকে একটা চাবি বের করে বলল, এই চাবিটা নিয়ে গিয়ে বাইরের গেটে তালা মেরে দিয়ে আয় রুদ্র। ভেতর দিয়ে মারবি না কিন্তু। বাইরের দিকে লাগাতে হবে, যাতে বাইরে থেকে মনে হয় যে, ভিলার মালিক থাকেন না এখানে। অথবা এখন নেই। মানে, ভিলাটা আন-অকুপায়েড।

ওক্কে। কিন্তু বাইরে বাইরে দিয়ে তালা লাগিয়ে যদি ভেতরে ঢুকতে না পারি?

হাত বাড়িয়ে থেকেই যদি বাইরে তালা না লাগাতে পারিস, তা হলে বাইরে বেরিয়েই লাগাতে হবে। তারপর সে-গেট ডিঙিয়ে অথবা অন্য যেভাবেই হোক, ভেতরে ঢুকতেও হবে। 'রুআহা', 'গুগুনোগুম্বারের দেশে', 'অ্যালবিনো', 'নিনিকুমারীর বাঘ', 'কাঙ্গপোকপি'র-পার্টনার যদি এইটুকুও করতে না পারে, তবে তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করব। ভটকাইকেই রাজসিংহাসনে বসাব।

ভটকাই আমাকে কিছু না বলে একবার অপাঙ্গে আমার দিকে তাকাল শুধু।

আর কথা না-বাড়িয়ে চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে গেলাম পেছনের দরজা দিয়ে।

বাইরে থেকে গেট-এ তালা দিয়ে গেট টপকে পেছন দিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখি ঋজুদা সেন্টার টেবিলের ওপরে একটি ম্যাপ ছড়িয়ে বসেছে। আর মিস্টার ভটকাই, বড় জাহাজের বুড়ো ক্যাপ্টেনরা যেমন হাফ-আই রিডিং গ্লাস চোখে লাগিয়ে সরু সরু লাল-নীল শিরা-উপশিরায় ভরা শীর্ণ অগণ্য হাতের মতন দেখতে ন্যাভিগেশন ম্যাপের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েন, তেমন ভাবেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, যেন শত্রুপক্ষের ডুবো-জাহাজ টর্পেডো ছুঁড়ে এখনই তার নিজের জাহাজের পেট-ফাঁসাবার কু-মতলবে আছে।

ঋজুদা ম্যাপ থেকে মুখ তুলে বলল, এবারে তোদের ব্রিফ করে দেওয়া দরকার। এতক্ষণ তো অনেক ইয়ার্কি-ফাজলামি হল। ভটকাই, এবারে আজেবাজে ইয়ার্কি করলে ভাল হবে না। মঁসিয়ে পঁপাদু আমাদের এত খরচপত্র করে এত দূরে ইয়ার্কি মারার জন্যে নিয়ে আসেননি।

সে তো জানা কথাই। তা আমরাও তো জানতেই চাচ্ছি। তুমিই তো বলছ না।

ভটকাই ঋজুদার কথা কেটে বলল।

আমাদের কাজটা খুবই বিপজ্জনক। তার ওপরে বিদেশ-বিভুঁই জায়গা। ইয়ার্কি মারাটা একেবারে বন্ধ কর। আরও একটা কথা, তোরা যখনই বাইরে বেরুবি, সঙ্গে নিজের নিজের পাসপোর্টটা নিয়ে বেরুবি।

কেন?

আমি প্রশ্ন করলাম।

যদি খুন হয়ে যাস, তা হলে স্যেশেলস-এর কর্তৃপক্ষের পক্ষে বডি আইডেন্টিফিকেশনে সুবিধা হবে। কারণ আমাদের মধ্যে কেউ খুন হয়ে গেলে অন্য দুজনের কেউই কারও বডি আইডেন্টিফাই করতে যাব না।

মরলেই বে-ওয়ারিশ হয়ে যাব? এ আবার কেমন ব্যাপার?

হ্যাঁ। কারণ, কেউ যদি খুনই হই তো অন্যে, যে, সেই লাশ আইডেন্টিফাই করবে সেও পরে অবশ্যই খুন হয়ে যাবে। লাশ আইডেন্টিফাই করতে এসে নিজেই আইডেন্টিফায়েড হয়ে যাবে।

কেন?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

কমোন সেন্স। সব গাধার সব 'কেন'র উত্তর দেওয়ার সময় বা ইচ্ছা আমার নেই।

এবারে বলো ঋজুদা খোলসা করে, কেন আমরা এখানে এসেছি। আমাদের কী করতে হবে।

আমি ভটকাইয়ের ওপরে ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললাম।

কাজটা অতি সোজা, আবার অতি কঠিনও। হাসিল করতে পারলে তিনদিনেই হয়ে যাবে। না হলে, তিন বছরেও হবে না। এই দ্যাখ ম্যাপটা। ভাল করে দ্যাখ। যাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সে যে মাহেতেই আছে এই মুহূর্তে, তার কোনওই মানে নেই। তার সম্বন্ধে পরে বলছি। আগে জায়গাটা সম্বন্ধে ভাল করে জেনে নে। তোরা দেখি আমেরিকান ট্যুরিস্টদের মতো অধৈর্য হয়ে গেলি।

ঠিক আছে, বলো। আমি বললাম।

ম্যাপটা দ্যাখ, দেশটার ইতিহাস সম্বন্ধে আরও একটু জেনেনে। সুবিধে হবে তোদেরই।

তুমি যে ইতিহাস পড়াবার জন্যে এতো খরচা-পাতি করে আমাদের এতদূরে নিয়ে আসবে কে ভেবেছিল? নিজেদের আসল বাবারাও হয়তো করতেন না।

চুপ করবি তুই ভটকাই।

আমি ধমকে বললাম।

সবচেয়ে আগে কিন্তু আরব, ইন্দোনেশিয়া এ সব দেশের নাবিকেরাই জল, খাবারদাবারের খোঁজে স্যেশেলস-এর দু-একটা দ্বীপে নেমেছিল। তার অনেক পরে অন্যরা আসে। এর প্রমাণস্বরূপ শিল্যুট দ্বীপে আরব নাবিকদের কবর পাওয়া গেছে। ফরাসিরা এই দ্বীপপুঞ্জের দখল নেওয়ার পরেই মরিশাস আর পুব এবং মধ্য আফ্রিকা থেকে ওরা ক্রীতদাসদের নিয়ে আসে নানারকম চাষবাস করার জন্যে।

কীসের চাষ?

যা কিছুরই চাষ এখানে হতে পারত। তুলো, তামাক, নারকেল, দারচিনি এবং আরও অনেক কিছু।

কতগুলো দ্বীপ আছে এই দ্বীপপুঞ্জে ঋজুদা?

আমি শুধোলাম।

ম্যাপে হয়তো অল্পকটা অস্পষ্ট বিন্দু দেখতে পাবি, কিন্তু দ্বীপ আছে অনেকগুলোই। শুনেছি, এই দ্বীপপুঞ্জের ভূভাগের পরিমাণ চারশো বর্গ মাইল মতন হলেও দ্বীপ আছে নাকি প্রায় শ'খানেক। তার মধ্যে গোটা চল্লিশেক প্রবাল দ্বীপ আর গোটা ষাটেক গ্রানাইট পাথরের।

এখন বলো, আমাদের এখানে কী করতে হবে। আর ধৈর্য ধরা তো সম্ভব হচ্ছে না।

ভটকাই বলল।

কেন? অত অধৈর্য কেন? মনে কর, বেড়ানোর জন্যেই এসেছিস। খারাপ লাগছে কি? কলকাতার ক'জন মানুষ স্যেশেলসে সশরীরে এসেছেন তা হাতে গুনে বলা যায়। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, হংকং ঘোরা লক্ষ লক্ষ মানুষ পাবি, কিন্তু স্যেশেলস বা সেরেঙ্গেটি বা রুআহা দেখছেন এমন মানুষ ডান হাতের কর গুনেই হয়তো শেষ করতে পারবি।

সেটা ঠিক। কিন্তু মঁসিয়ে পঁপাদুর জন্যেও তো আমাদের কিছু করা দরকার।

নিশ্চয়ই। করব বলেই তো আসা। এখন যা বলি, তা মনোযোগ দিয়ে শোন।

কত শত কোটি টাকার লুণ্ঠিত হিরে জহরত সোনাদানা যে এই সব দ্বীপে লুকোনো আছে, তা সমুদ্রের হাওয়া আর এই গাছেরাই জানে। যা লুকোনো হয়েছিল, তার খুব সামান্য অংশই জলদস্যুরা পরে ফিরে এসে নিয়ে গেছে। কত জলদস্যু আর এদিকে আসতেই পারেনি। কেউ মরে গেছে তিনশো বছর আগে, কারও জাহাজডুবি হয়েছে দুশো বছর আগে, কেউ বা মারা গেছে লুটপাট করার সময়ে বা অন্য জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াইয়ে, দেশে ফেরার পথে। তাদের মধ্যে যাঁরা বেঁচেছিল, তাদেরও অনেকেই গুপ্তধনের কথা অন্য কাউকে বলে যেতে পারেনি, পাছে দলের কেউ তা জেনে ফেলে। যারা দলবদ্ধভাবে লুণ্ঠিত জিনিস

লুকিয়ে রেখেছিল, তাদের তো উপায়ই ছিল না দলের বাইরের কাউকেই বলার।

ঋজুদা একটু থেমে পাইপটা ধরাতেই ভটকাই বলল, বলো, থামলে কেন?

বলছি।

তারপরই সেন্টার টেবলের ওপরে ছড়ানো ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে, পাইপের স্টেমটা দিয়ে একটি ছোট বিন্দু দেখিয়ে ঋজুদা বলল, দ্যাখ। এই দ্বীপটার নাম হচ্ছে শ্যিলুট। মাহে থেকে মাইল তিরিশ দূরে। এখন এখানের বাসিন্দার সংখ্যা হবে শ'আড়াই। হোটেল আছে। তবে মাত্র একটি। এই দ্বীপেই পৃথিবীময় কুখ্যাত জলদস্যু ইঁদুল মারা যায় আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে। খুব ঘটা করে তার অন্ত্যেষ্টি হয়েছিল এখানে। এখনও স্থানীয় মানুষদের মুখে সেই বেরিয়াল-এর গল্প শোনা যায়। অবশ্য তারাও শুনেছে তাদের পূর্বপুরুষদের মুখ থেকেই।

জলদস্যুর আবার অন্ত্যেষ্টি! তাও ঘটা করে। শুনেছি তো সলিল সমাধি হয় তাদের।

আমি বললাম।

কেন হবে না? সবাই কি আর সমুদ্রের ওপরে চলন্ত জাহাজে মারা যায়? আর যাই হোক, মানুষগুলো তো সাহসী ছিল। ঘুষঘাষ খেত না, ফিস-ফাস করে। দেশের হয়ে বিদেশ থেকে জিনিস কেনার সময়ে কিক-ব্যাক বা কাট-মানিও নিত না।

তখন দস্যুতা একটি খোলাখুলি জীবিকা ছিল। অপরাধী অবশ্যই ছিল তারা। কিন্তু দেশদ্রোহী ছিল না। দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে অনেকেই তাই ফিরে যেতে পেরেছিল নিজের নিজের দেশে। কেউ কেউ আবার নতুন জীবনের আশায় নোঙর ফেলে থেকেও গেছে নতুন নতুন দেশে।

নামটা কী বললে ঋজুদা? ইঁদুর?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

ঋজুদা হেসে বলল, না রে। ইঁদুল।

কোন দেশি?

জানি না, সম্ভবত ফরাসি, কারণ আমাদের মঁসিয়ে পঁপাদু তো তাঁরই নাতির পুতি। তবে ফরাসি না হয়েও পাঁচ পুরুষ ফরাসি দেশে বাস করলে তো আচারে-আচরণে, ভাষাতে ফরাসিই হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

তা ঠিক। কিন্তু পুতি মানে? আমি আর ভটকাই একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

পুতি মানে জানিস না? আরে নাতির ছেলেকে বলে পুতি। তোদের মতো সাহেবদের জন্যেই দেশটা গোল্লায় গেল। 'নাতি-পুতি' কথাটাও শুনিসনি?

ভটকাই ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলল, বাঃ। মঁসিয়ে পঁপাদু তো নিজেই প্রায় ঘাটের মড়া। তিনি আবার কার পুতি?

হাসিরই কথা। হাঁ। তবে পরে হেসো। এখন যা বলছি, তা শোনো।

বলো।

মঁসিয়ে পঁপাদুর পূর্বপুরুষেরা এমনিতেই যথেষ্ট বড়লোক ছিলেন। বুঝতেই পারছিস মঁসিয়ে ইঁদুল না হয় কিছু গুপ্তধন স্যেশেলসেই পুঁতে রেখে গেছিলেন. কিন্তু সারা জীবন যা লুটপাট করেছিলেন, তার অধিকাংশই তো ফ্রান্সেই নিয়ে গেছিলেন। তা দিয়েই চার-পুরুষের হেসেখেলে ফুটানি করে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল। মঁসিয়ে পঁপাদুর ছেলেবেলাও ভালই কেটেছিল। কিন্তু জালার জল, সে জালা যত বড়ই হোক না কেন, গড়িয়ে খেলে আর কতদিন চলে! মধ্য-যৌবন থেকেই অবস্থা একটু খারাপ তাঁর। তবে এখনও বহু মিলিয়নেয়রকেই চাকর রাখতে পারেন। কিন্তু কষ্ট ব্যাপারটাতো তো আপেক্ষিক ব্যাপার। আমার তোর পক্ষে যে আর্থিক অবস্থা পরম আরামের, তাই অন্যের পক্ষে কষ্টকর বলে গণ্য হতে পারে। পারে না কি?

তা পারে।

আমি বললাম।

মঁসিয়ে পঁপাদু অর্থকষ্টে পড়েন। কিন্তু সেই অর্থকষ্ট মানে ভাবিস না যে আমার মতো মানুষের অর্থকষ্ট। তারপরে শোন! অর্থকষ্টে পড়ার পরে প্যারিসের বি. এন. পি-র একটি শাখার লকারে যে তাঁর দাদু পূর্বপুরুষের কিছু পারিবারিক সম্পত্তি রেখে গেছিলেন, সে কথা হঠাৎই মনে পড়ে যায় মঁসিয়ে পঁপাদুর।

বি. এন. পি-টা কী জিনিস?

আমি বললাম।

নাঃ। তোদের জ্ঞানগম্যি বড় কম। বি.এন. পি-রও নাম শুনিসনি?

ব্যাঙ্কোয়া নাশিওনাল দ্য পারি'-র সংক্ষিপ্ত নাম বি.এন. পি। ফ্রান্সের জাতীয় ব্যাঙ্ক। ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টের প্রধান স্পনসর। সুইজারল্যান্ডেও প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা।

তাই? জানতাম না তো। আমরা দুজনেই অবাক হয়ে বললাম। আমরা অবশ্য কতটুকুই বা জানি!

তা, সেই বি.এন.পি-এর লকার থেকে একটা ম্যাপ বেরোল স্যেশেলস-এর তিনটি দ্বীপের। মানে, কোন কোন দ্বীপে যে গুপ্তধন পোঁতা ছিল তার মোট হদিস দেওয়া ছিল তাতে। কিন্তু ঠিক কোথায় কোথায় যে গুপ্তধন পোঁতা ছিল, তা তাতে দেখানো ছিল না। সেই তথ্য ছিল অন্য একটি ম্যাপে এবং সেই ম্যাপটি তিনটুকরো করে ইঁদুল এবং তার দুই সহ-জলদস্যু, ফ্রেদরিক এবং দেনির ব্যাঙ্কের আলাদা আলাদা লকারে রাখা ছিল। এই ম্যাপটির কথা ইঁদুল তার বংশধরদের বলে যেতে পেরেছিল। কিন্তু দেনি আর ফ্রেদরিক তা পারেনি। ফ্রেদরিক হঠাৎই মারা গেছিল একদিনের জ্বরে বেহুঁশ হয়ে। আর দেনি মারা গেছিল জাহাজডুবি হয়ে ম্যাডাগাস্কারের কাছে, খুবই অল্প বয়সে। তার একমাত্র ছেলের বয়স তখন সাত।

তারপর?

বলো বলো, এতক্ষণে রহস্যের গন্ধ একটু একটু পেতে আরম্ভ করলাম।

এতক্ষণ যে কী ভূগোল আর ইতিহাস নিয়ে পড়েছিলে ঋজুদা।

ভটকাই বলল।

যে মঁসিয়ে পঁপাদুকে তোরা দেখলি কলকাতাতে, সে হচ্ছে ইঁদুলের পৃতি। দেনির পৃতির নাম হচ্ছে মঁসিয়ে ব্লঁদা। আর ফ্রেদরিকের বংশধর একটি মেয়ে। তার নাম জাকলিন প্লুজেঁ। মাদমোয়াজেল প্লুজেঁ অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাঁর প্রপিতামহর বিশাল সম্পত্তি নিয়ে তাঁর পিতামহ ও পিতা পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা ফেঁদেছিল। ওদের পারিবারিক গ্রুপের নাম এখন এফ. জি. এফ. এস. এ। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। ওরা করে না এমন ব্যবসা নেই। কয়েক লক্ষ কোটি ডলারের মালিক এখন প্লুজেঁ। বিয়ে করেনি এখনও। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। অপরূপ সুন্দরী। ওরই লোক হচ্ছে পিয়ের।

বাবাঃ অতবড় নাম? এফ. জি. এফ. এস. এ।

না, নামটা এফ. জি. এফ। আর 'এস. এ.' হচ্ছে সুইস লিমিটেড কোম্পানি। আমাদের যেমন লিমিটেড বা LTD। তারপর একটু থেমে বলল, পঁপাদুর মতো প্লুজেঁও ফ্রেদরিকের লকার থেকে ছেঁড়া ম্যাপের টুকরো পেয়েছে। ম্যাপের টুকরো পেয়েছে মঁসিয়ে ব্লঁদাও। ব্লঁদা আর পঁপাদু মাদমোয়াজেল প্লুজেঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরে প্লুজেঁ বলেছে, আমার টুকরো আমি দেব না। তোমরা নিজেরা তো আর অত পয়সা খরচ করে এই বিরাট ঝুঁকি এবং ঝামেলার কাজ সামলে উঠতে পারবে না, তাই তোমরা বরং তোমাদের ম্যাপের টুকরো দুটি আমাকে বিক্রি করে দাও। খুব ভাল দাম দিচ্ছি আমি যাতে তোমাদের লাভ হবে অনেক এবং তা হবে কোনওরকম ঝক্কি-ঝামেলা ছাড়াই।

এ কথা প্লুজেঁ যে বলেছে তা তুমি জানলে কী করে? আমি বললাম।

আমাকে বলেছে, মঁসিয়ে পঁপাদু। তবে এ কথার সত্য সম্বন্ধে আমরা অন্ধ বিশ্বাস নাও রাখতে পারি।

আমি বললাম।

ভটকাই বলল, 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

ঋজদা বলল, তারপরে শোন।

এতেই মঁসিয়ে পঁপাদু এবং ব্লঁদার সন্দেহ গভীর হয়েছে যে, ফ্রেদরিকের কাছে যে ম্যাপের টুকরোটি ছিল তাতে গুপ্তধনের পুরো হদিসই প্রায় রয়েছে এবং ইঁদুল এবং দেনির কাছে যে টুকরো ছিল, সে দুটি অসম্পূর্ণ। ওদের দুজনের ভাগ বিপুল অর্থ দিয়ে কিনতে চাইছে প্লুজেঁ ওদের দুজনকে বুঝিয়েছে যে, যাই পাওয়া যাক না কেন, স্যেশেলস সরকারের ন্যায্য পাওনা ট্যাক্সও তো তাদের দিতে হবে। তা ছাড়া, কী পাওয়া যাবে, তাও তো অনিশ্চিত। ওরা গুপ্তধন সন্ধানের কোটি কোটি ডলার খরচ অনির্দিষ্টকাল ধরে দিতে কি রাজি আছে?

তারপরে?

ভটকাই বলল।

প্লুজেঁর সব শর্ত ব্লঁদা আর মঁসিয়ে পঁপাদু মেনে নেওয়ার পরও প্লুজেঁ বেঁকে বসেছে। বলেছে, ওর অন্যান্য ব্যবসা নিয়ে ও খুবই ব্যস্ত, তাই এখনই ওর পক্ষে ওই 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো', বা 'ওয়াইল্ড-গুজ চেজ' সম্ভব নয়।

তাতে মঁসিয়ে পঁপাদু এবং ব্লঁদা না-দমে নিজেদের সামর্থ্য একসঙ্গে করে প্লুঁজেকে না জানিয়ে নিজেরাই এসে এখানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। দ্বীপগুলির হদিস তো ছিলই, কিন্তু কোন দ্বীপের ঠিক কোন জায়গাতে যে গুপ্তধন পোঁতা আছে, তার হদিস ছিল না।

ওরা কি খোঁড়াখুঁড়িও শুরু করে দিয়েছে?

খোঁড়াখুঁড়ি ওরা শুরু করতে পারেনি, কারণ ওদের ধারণা, বিরাট ধনী প্লুজেঁ তা হলে সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে যাবে। কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি না হলেও খোঁজাখুঁজি যে শুরু হয়েছে সে খবরও নাকি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে প্লুজেঁর কাছে এবং তার ফলে যা ঘটার কথা, তাই ঘটেছে।

কী।

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম।

প্লুজেঁ মঁসিয়ে ব্লঁদা এবং মঁসিয়ে পঁপাদুকে খতম করার জন্যে স্যেশেলস-এ তার চর পাঠিয়েছে।

তারপর ঋজুদা বলল, যা বললাম এ পর্যন্ত, তাই হল মঁসিয়ে পঁপাদুর ব্রিফ।

ওরা তো ব্ল্যাক-ক্যাটের মতন নিজেদের জন্যে বডিগার্ডের বন্দোবস্তই করতে পারে। ব্ল্যাক-ক্যাটের মতো পেশাদারেরা যা পারবে, আমরা কি তা পারব?

আমি আর ভটকাই প্রায় একই সঙ্গে বললাম।

সব পেশারই একই দোষ। পেশার সীমিত ক্ষেত্রের বাইরে তাদের চোখ বা মগজ চলতেই চায় না। স্যেশেলস-এর মতো আন্তর্জাতিক কিন্তু ছোট্ট ট্যুরিস্ট-স্পটে গুলি করে কেউ কাউকে মারবার মতন মূর্খ নয়। মারতে চাইলে, একজনকে এখানে কতভাবে মারা যেতে পারে। হোটেলের পাশের ঘরে ট্যুরিস্ট সেজে এসে সমুদ্রে স্নান করতে, বা স্কুবা-ডাইভিং বা স্নরকেলিং করতে করতে জলের তলায় লোকের চোখের আড়ালে একজনকে মেরে দেওয়া খুবই সোজা। খাদ্য বা পানীয়র সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে মারাও সোজা। ধর, যে গাড়ি একজন ব্যবহার করছে এই পাহাড় আর সমুদ্র-ঘেরা দ্বীপগুলিতে, সেই গাড়ির ব্রেক-শু্য জ্যাম করে দিয়ে, টাইরড-এর অবস্থা এমনই করে দিয়ে, যাতে পাহাড়ের মাথায় চড়ার পর টাইরড কেটে বা খুলে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি সমুদ্রে পড়ে। আরও কতরকম করে মারা যায়। আজকাল তো কারোকে বাঁচানোর চেয়ে মারাটা অনেকই সোজা। গাড়িতে, রেস্তোঁরার খাবার টেবিলের নীচে, টাইমবম্ব রেখে দিয়ে, বহু দূরে বসে ইলেকট্রনিকালি বোমা ফাটিয়েও মানুষকে মারা যায়।

ভটকাই শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, কী দরকার ছিল এই

ঝামেলাতে ফাঁসবার? তার চেয়ে কায়দা করে ওই ছেঁড়া ম্যাপের তিনটি খণ্ডই কোনওরকমে হাতিয়ে নিয়ে চলো ঋজুদা, আমরা কলকাতাতে ভাগলবা হই। আমাদের নাতিরা এসে পরে কোটিপতি হবে।

তারপরে একটু চুপ করে থেকে বলল, আরও একটা পথ আছে।

কী?

আমি আর ঋজুদা সমস্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

তুমি প্লুজেঁকে বিয়ে করে নাও।

ওর কথাতে আমি আর ঋজুদা খুব জোরে হেসে উঠলাম।

হাসির কী আছে? তোমার মতো বর সে কোথায় পাবে? যত বড় রাজকন্যাই সে হোক না কেন!

ঋজুদা বলল, অনেক ভাঁড়ামো করেছিস। সিরিয়াস হ। কারণ, মঁসিয়ে পঁপাদু কলকাতাতে আমাকে এই খবরটাই দিতে এসেছিলেন যে, প্লুজেঁ পরশুদিন জিনিভা থেকে মাহেতে এসে পৌঁছচ্ছে। লোকে জানছে ছুটি কাটাতেই আসছে। আসলে নাকি আসছে সরেজমিনে তদন্ত করতে।

ভটকাই বলল, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে ঋজুদা। গলা শুকিয়ে কাঠ। এ কোথায় আনলে। চারদিকে হাজার হাজার মাইল সমুদ্র আর এক ফোঁটা খাবার জলও নেই। শেষে কি ইলেকট্রিক বালব খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে হবে?

ঋজুদা বলল, ভয়ে?

মানে?

গলা শুকিয়ে কাঠ কি তেষ্টাতে হয়েছে? না ভয়ে? আমি বললাম।

তোকে ওই জন্যেই নিয়ে আসতে চাইনি। বিপজ্জনক কাজ তো বটেই। জেনেশুনেই তো এসেছি আমরা।

ঋজুদা বলল।

বিপজ্জনক কি না জানি না, তবে কাজটা যত না রহস্যের, তোমার কাজের ফিরিস্তি আরও বেশি রহস্যের। মোদ্দা কথায় আমাদের যে কী করণীয়, তাই তো এখনও বুঝতে পারলাম না।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, সেটা ঠিক। কারণ আমি নিজেই এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, তা তোদের বোঝাব কী করে! চল পেছনের বারান্দাতে গিয়ে বসি। সূর্য ডুববে একটু পরে। পুরীতে, দীঘাতে, গোপালপুরে বা কোভালমে বা গোয়ার সূর্যাস্ত দেখা এক আর এখানে আর এক। তবে আন্দামান বা লাক্ষাদ্বীপও কম সুন্দর নয়। আসলে আমাদের দেশের মতো সুন্দর দেশ পৃথিবীতে নেই। যদি আমরা মানুষের মতো মানুষ হতাম তবে এই দেশ নিয়ে কী যে আমরা করতে পারতাম তা ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়। 'কাজ না করলে, সৎ না হলে, জেদ না থাকলে কোনও দেশই কি বড় হতে পারে রে! চালাকির দ্বারা কোনও বড় কাজই হয় না।

এমন সময়ে ফোনটা বাজল।

ভটকাই রিসিভারটা তুলেই ঋজুদাকে দিয়ে বলল, কে রে বাবা! বলছে, মঁসিয়ে বোঁস?

রিসিভারটা ভটকাই-এর হাত থেকে নিয়ে ঋজুদা বলল।

আই অ্যাম কার্লোস মঁসিয়ে। আই অ্যাম কামিং আপ উইথ আ লেডি।

হু ইজ শি?

মাদমোয়াজেল ভৈঁয়সা।

মাদমোয়াজেল ভৈঁয়সা?

ইয়া। শি উইল টেক য়্যু ডাউন টু হার হোটেল অ্যাট বো ভাঁলো।

হোয়াই?

পিয়ের হ্যাজ অলরেডি স্পটেড য়্যু অল। ইট উডনট বি সেফ ফর য়্যু অল টু স্পেন্ড দ্য নাইট অ্যাট দ্য ভিলা।

ওকে। প্লিজ কাম আপ। উই আর থারস্টি।

কার্লোস বলল, আই নো। আই উইল টেক কেয়ার। বলেই, ফোনটা ছেড়ে দিল।

ভঁইষাটা কী ব্যাপার ঋজুদা? এখানে মোষ আছে না কি? মানে, আমাদের হিন্দুস্থানি ভঁইষা?

সদা-ইনকুইজিটিভ ভটকাই বলল।

ঋজুদা খুব জোরে হেসে উঠল ভটকাইয়ের কথাতে।

বলল, ভঁইষা না রে। মাদমোয়াজেল ভৈঁয়সা। ভৈঁয়সাটা পদবি। নাম মারিয়েল। Marielle আর ভৈঁয়সা বানান হচ্ছে Vincent।

ভাল জায়গাতেই নিয়ে এলে। পদে পদে নামে-পদবিতে হোঁচট খাব, না নিজের পথ দেখে পা ফেলব। Vincent-এর উচ্চারণ যে ভৈঁয়সা তা কে জানবে বলো!

আমি হাসছিলাম। নিঃশব্দে। ভটকাই যে কথাটা খুব অযৌক্তিক বলেছে এমন নয়।

ঋজুদা বলল, ভাগ্যিস আমরা কিছুই আনপ্যাক করিনি। করলে, ঝামেলা হত। এখন চল দেখি কোথায় নিয়ে গিয়ে ওঠায় কার্লোস আর মারিয়েল ভৈঁয়সা। তবে বোঁ ভালো হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর সি-বিচ। আমি তো হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জের ওয়াইকিকিতেও গেছি। বোঁভালো ওয়াইকিকির চেয়েও অনেক বেশি লম্বা বিচ এবং অনেক বেশি সুন্দর। পাঁচ মাইল লম্বা।

তুমি কি ভৈঁয়সাকে আগেই চিনতে নাকি?

চাক্ষুষ আলাপ নেই, তবে চিনি। ফোটো দেখেছি নানা ভঙ্গিমাতে। আসলে, মারিয়েল ভৈঁয়সা, মঁসিয়ে পঁপাদু আর মঁসিয়ে ব্লঁদার সঙ্গে পার্টনারশিপে গেছে। অথচ ওর কিন্তু পয়সার লোভ নেই। অপরূপ সুন্দরী। জাকলিন প্লুজেঁরই মতো। ওর সঙ্গে জাকলিনের একটি ব্যক্তিগত বৈরিতা আছে দীর্ঘদিনের। ওরা দুজনে

দুজনকে চেনে। এবং সমবয়সী। কোনও বিশেষ কারণের বৈরিতা। মেয়েদের, এবং বিশেষ করে ওই বয়সী মেয়েদের বৈরিতা নানা কারণে হতে পারে। আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

জাকলিনটা আবার কে রে বাবা! উঃ, কী মুশকিলেই ফেললে তুমি ঋজুদা আমাদের।

এবারে, আমিই বললাম।

এ যে স্নেক-ল্যাডার। যতটা উঠছি সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাচ্ছি আরও বেশি।

ভটকাই আমাদের অবস্থা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল।

ঋজুদা বলল, কী আশ্চর্য! একটু আগেই তো বললাম মাদমোয়াজেল প্লুজেঁর পুরো নাম জাকলিন প্লুঁজো। বলিনি?

মারিয়েল ভেঁসাঁ নিজে শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি।

শাঁতাল, কার্লোস-এর সঙ্গে আমাদের নিতে এসেছিল 'দ্য ঈগ্‌লস রুস্ট' থেকে। আমাদের দেখাশোনা করার জন্যে তাকে নিযুক্ত করেছেন মারিয়েল ভেঁয়সা। বয়স আমার বা ভটকাইয়ের থেকে বেশি বোধহয় নয়, কিন্তু সপ্রতিভতা আর ব্যক্তিত্বে আমরা ওর কাছাকাছিও নই। ওরই তত্ত্বাবধানে আমাদের রাতের খাওয়াদাওয়া হয়েছে। খেতে গিয়েও দাঁত ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। না, খাদ্যদ্রব্যের জন্যে নয়, রান্না-খাবারের পদ উচ্চারণ করতে গিয়ে।

আমরা পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই মারিয়েল ভেঁয়সা এসে পৌঁছলেন। আমাদের সকলের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিল শাঁতাল।

মারিয়েল ভেঁয়সার হোটেলটা একটা পাহাড়ের ওপরে, সামনে সমুদ্র। সেটি এই পৃথিবীর অন্যতম সেরা সমুদ্রতট। "বো ভাঁলো।" সাদা বালির তটরেখা। এই বালি দেখতে দুধ-সাদা। কারণ, আসলে বালি বলতে যা বোঝাই আমরা, এ তা নয়। প্রবালের গুঁড়ো। ঋজুদা বলছিল। সাধে কি আর পৃথিবীর সব সমুদ্র-পাগল মানুষ "স্যেশেলস, স্যেশেলস" আর নাচানাচি করে।

রাতের খাওয়া সারলেও মারিয়েল ভেঁয়সার হোটেলে আমাদের রাত্রিবাস করা হচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এখান থেকে চলে যাব। আপাতত আমরা হোটেলের একটি ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে বসে আছি। আমাদের ঘরের আলো নেভানো। কার্লোস আর শাঁতাল একটি ঢাকা ভ্যানে করে আমাদের নিয়ে এসেছে 'The Eagle's Roost' থেকে। মারিয়েল ভেঁয়সা নিজে যাননি পিয়ের সন্দেহ করতে পারে বলে। জাকলিন প্লুজেঁ এখনও জানে না যে, মঁসিয়ে ব্লঁদা আর মঁসিয়ে পঁপাদুর সঙ্গে মারিয়েল ভেঁয়সা হাত মিলিয়েছে।

কার্লোস একটা ব্যাগ খুলে স্মল-আর্মস দেখাল। আমি নিয়েছি স্পেইন দেশে তৈরি একটি পয়েন্ট টু টু ব্যারেটা পিস্তল। ভটকাইকে দিয়েছে ঋজুদা একটা থ্রি

পয়েন্ট টু ওয়েবলি-স্কট-এর ইংলিশ রিভলভার। আর নিজে নিয়েছে সাইলেন্সার লাগানো থ্রি এইট অ্যামেরিকান কোল্ট পিস্তল। নিজেদের জীবন রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুর জন্যেই গুলি ছোঁড়া যে যাবে না, তা বার বার বলে দিয়েছে ঋজুদা। একটি ছুঁড়লে অপরপক্ষ যে অবহেলায় দশটি ছুঁড়তে পারে, এই সাধারণ বুদ্ধিটা যেন আমাদের থাকে, সে কথাও বলে দিয়েছে। এগুলো সঙ্গে রাখা ততটা ব্যবহারের জন্যে নয়, যতটা মনের শান্তির জন্যে।

আমরা এখনও স্যুটকেস আনপ্যাক করিনি, কারণ এখান থেকে আবার নাকি আমাদের স্যেশেলসের সেরা হোটেল, এই সি-বিচেরই ওপরে, হোটেল "বোঁ ভালো বে"-তে গিয়ে উঠতে হবে। মারিয়েল অ্যান্ড কোং অর্থাৎ মারিয়েল, ব্লঁদা আর পঁপাদু ঠিক করেছে আমাদের প্লুজেঁর একেবারে নাকের ডগাতেই রাখবে। প্রদীপের নীচেই যেমন অন্ধকার, তেমন তার অত কাছে থাকাতে আমাদের সন্দেহ করবে না হয়তো। আমরা যে হোটেলে এখন আছি, সাবধানতার কারণেই আমাদের এখানে আনা হয়েছে। বো ভাঁলোতে মারিয়েল এবং কার্লোসের সঙ্গে ঋজুদার এই মিটিং মোটেই সহজ ছিল না। রাত ন'টা নাগাদ আমরা 'বো ভাঁলো বে হোটেলে' যাব। কারণ, ওই সময়েই নাইরোবি থেকে একটা ফ্লাইট আসে। ওই সময়ে চেক-ইন করলে কেউই সন্দেহ করবে না। কার্লোস, কিনিয়া এয়ার-ওয়েজের কিছু ব্যাগেজ-ট্যাগও দিয়ে দিয়েছে আমাদের। এয়ার-ইন্ডিয়ার ট্যাগ ছিঁড়ে ফেলে ওগুলো আমাদের ব্যাগেজে লাগিয়ে নিতে হবে, যাতে কারও সন্দেহ না হয়।

সমুদ্র থেকে হু-হু করে হাওয়া আসছে। এখানের নারকেল গাছগুলো ভারী মজার। পাড়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রকে যেন নুয়ে পড়ে প্রণাম করছে এমনভাবে সমুদ্রের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। নারকেলগুলোর রং হলুদ। এখানে কোকো-ডে-মেয়্যার নামের এক ধরনের বিরাট বিরাট কালো আর হলদেটে, সামুদ্রিক নারকেল হয় নাকি। এই কোকো-ডে-মেয়্যার পৃথিবীর আর কোথাওই নাকি পাওয়া যায় না, বলছিল ঋজুদা। এখনও দেখা হয়নি, দেখতে হবে। আর আছে বিরাট বিরাট দৈত্য-কচ্ছপ। অলিভ রিডলের চেয়ে অনেকই বড়। ল্যান্ড টরটয়েজ। আরও কত কী আছে। ক'দিন থাকলেই জানতে পাব।

ঋজুদা বলল, মাদমোয়াজেল প্লুজেঁকে নিয়ে তোদের ভাবতে হবে না। তোরা শুধু পিয়ের কে হতে পারে, সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করবি। কার্লোস এখনও তার ছবি আমাদের হাতে তুলে দিতে পারেনি। সুতরাং কাজটা খুব সহজ হবে না। তবে পিয়ের বা তার লোকজন যে আমাদের কাছাকাছি থাকবেই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কাজে লাগাতে হবে অনুমানশক্তি। তোদের দুজনকেই অনেক টাকা, মানে লোকাল-কারেন্সি, দিয়ে দেব। যাতে অর্থকষ্ট না হয়। জিন-এর ব্যাগ ওরা আনিয়েই রেখেছে। তার মধ্যে ইনফ্রা-রে দূরবীন, অন্ধকারে দেখার জন্যে, আর পিস্তল রিভলভার যার যার, রাখবি। কার্লোস বন্দোবস্ত করে দেবে। পাসপোর্ট

আর টাকা থাকবে কোমরে বাঁধা। তেমন বেগতিক দেখলে জিন-এর ব্যাগটা ফেলে নিজের নিজের প্রাণ নিয়ে সটকাবি। তোদের যে হোটেলেই ফিরে আসতে হবে, তার কোনও মানে নেই। কাজের সুবিধার জন্যে যেখানে খুশি থাকতে পারিস। টাকার অকুলান হবে না। কার্লোস মোবাইল-ফোনও দিয়ে দেবে এখুনি একটা করে, যাতে অসুবিধে না হয়। বো ভাঁলো হোটেলের গেট দিয়ে একবার ঢুকে পড়ে ভিতরে চলে এলে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এর চারদিকে ক্লোজড-সার্কিট টিভি আছে। ছদ্মবেশে অনেক গার্ড আছে। কেউ ড্রাইভার, কেউ হোটেলের বেল-বয়, কেউ ট্রাভেল সার্ভিসের লোক—এই সব ভেক ধরে। প্রত্যেকে ক্যারাটের ব্ল্যাক-বেল্ট। তা ছাড়া তাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে আছে, পিস্তলও, সাইলেন্সার লাগানো। ভিতরে ঢুকে এলে কেউই আর তোদের অনিষ্ট করতে পারবে না। প্রাণ কোনও কারণে বিপন্ন বোধ করলে বো ভাঁলোর চত্বরে ঢুকে পড়বি। তবে কাল আমরা একসঙ্গেই বেরোব। যাব Praslin নামে একটি দ্বীপে।

কী করে যাব?

কেন? প্লেনে। আইল্যান্ডার প্লেন আছে ছোট ছোট। সেই ফ্লিটের কম্যান্ডার আবার একজন ভারতীয়। প্লেন-এ জনা কয়েক বসতে পারে। সিঙ্গল প্রপেলারের প্লেন। সমুদ্র টপকে গিয়ে নারকেল গাছেদের মাথার ওপর দিয়ে নেমে পড়বে প্লেন দ্বীপে।

টিকিট পাব কোথায়?

আহা রে। মাখনবাবুরা।

ঋজুদা বিরক্তির গলায় বলল।

তারপর বলল, এয়ারপোর্টে গেলেই টিকিট পাবি। শাটল-সার্ভিস। যায় আর আসে। প্যাসেঞ্জার অনুযায়ী ফ্লাইট যায়। সন্ধের পরে চলাচল করে না। সেই জন্যে খুব ভোরে ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়ব আমরা। আমিওতো যাচ্ছি তোদেরই সঙ্গে, না, কি?

'মাহে' দ্বীপের নাম। তবে স্যেশেলসের রাজধানী যদিও মাহেতেই কিন্তু রাজধানীর নাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়া। ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট শহর। একবার পাহাড়ে উঠেছে আরেকবার সমুদ্রে নেমেছে। আর সে সমুদ্রের কী মনোহর রূপ। অমন সাদা তটভূমিও কোথাওই দেখিনি আমরা আগে।

ঋজুদার কাছে তো শুনলামই যে 'বো ভাঁলো বে' এই সমুদ্রতটের সেরা হোটেল। সে তো হোটেল নয়, মনে হয় একটা আলাদা শহরই। সামনে সে হোটেলের বাঁকা-চাঁদের মতো নিজস্ব তটভূমি, তিন কিলোমিটার লম্বা।

পরিকল্পনামতোই কাল রাতে এখানে এসে উঠেছি আমরা। আমি আর ভটকাই এক ঘরে আছি, আর ঋজুদা অন্য ঘরে। ব্রেকফাস্ট করছিলাম ঋজুদার ঘরেই,

ডাইনিংরুমে যাইনি। কারণ, মাদমোয়াজেল প্লুঁজের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তাঁর বিশাল স্যুইট নেওয়া আছে এই হোটেলেই। পৌঁছেও গেছেন। ঋজুদারও ঘর নয়, স্যুইট। তবে ছোট স্যুইট। আলাদা বসার ঘর আছে। তাতে ফ্রিজ। ফ্রিজে কোকোকালা, লেমনেড আরও কত কী রাখা আছে। ফ্রিজের ওপরে নানারকম চকোলেট আর নোনতা বিস্কিট। বিরাট ফ্রুট-বোল-এ নানারকম ফল। ফল অবশ্য আমাদের ঘরেও আছে।

ভটকাই মুখভর্তি স্ক্র্যাম্বলড্ এগস আর বেকন নিয়ে চকোলেটগুলোর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

ঋজুদা বলল, ইংরেজিতে একটা কথা আছে রে ভটকাই। 'ড্যু নট বাইট মোর দ্যান উ্য ক্যান চ্যু'। যতখানি চিবোতে পারবি অনায়াসে, ততখানি খাবার মুখে কখনও পুরিস না।

ভটকাই লজ্জা পেল। ঋজুদা সেটা লক্ষ্য করে বলল, এ কথাটা শুধু খাবার সম্পর্কেই ব্যবহার করা হয় না রে। হাতের কাছে চলে-আসা যে কোনও জিনিস সম্পর্কেই কথাটা খাটে। অনেকই গভীর কথা। ভেবে দেখিস।

সকাল আটটার মধ্যে সারাদিনের মতো বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

এয়ারপোর্টে পৌঁছেই কাউন্টারে গিয়ে বললাম, প্রাসলিন-এর তিনটে টিকিট দিন।

কাউন্টারের কালো, কিন্তু সুন্দরী মেয়েটি, হেসেই বাঁচে না। সে দুচোখে দুষ্টুমি নাচিয়ে বলল, উই প্রনাউন্স ইট অ্যাজ প্রালেঁ।

প্রাসলিন হল প্রালেঁ। প্রথমেই ধাক্কা খেলাম একটা।

মিনিট পনেরোরও কম সময়ে গিয়ে নামলাম প্রালেঁতে নারকেল বনের মধ্যের একটি মাঠে। এখানের জমিতে কাদা হয় না। মাটির রং দেখলাম লাল। এয়ার স্ট্রিপ-এর পাশে টার্মিনাল বিল্ডিং। রাডার-টাডার কিছু নেই। নারকেল পাতার ছাউনি দেওয়া একটি ঘর। বৃষ্টি নামলে তার নীচে এসে জড়ো হয় যাত্রীরা। নয়তো বাইরেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। আমরা নামতেই, যারা প্লেনের অপেক্ষাতে ছিল, তারা সেই প্লেনে উঠে পড়ল। মাহেতেই যাবে, না অন্য কোথাও, তা জানতে ইচ্ছে করলেও তাঁদের জিজ্ঞেস করা হল না। অনেক দ্বীপইতো আছে। এখান থেকে অন্য কোনও দ্বীপেও যেতে পারে প্লেনটা।

দু-একটা ট্যাক্সি ছিল। কিন্তু অনেকেই দেখলাম হেঁটে বা সাইকেলেই যাচ্ছে। নারকেল গাছের ছায়ায় ছায়ায় কাঁচা রাস্তা। মাঝে মাঝেই দমক দমক বৃষ্টি আসছে দমকা হাওয়ার সঙ্গে। আফ্রিকাতে যে সময়ে শীতকাল, জুন-জুলাই মাসে, এখানে তখন আমাদেরই মতো বর্ষাকাল। দু কিলোমিটারের মতো হাঁটার পরে দেখা গেল একটি রেস্তোরাঁ। সমুদ্রের ওপরেই। লোকজন কেউই নেই। যাঁরা প্লেন থেকে

নামল তাদের মধ্যে অধিকাংশই সম্ভবত স্থানীয় বাসিন্দা।

এক মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা, লম্বা, কালো কিন্তু খুব মিষ্টি চেহারার, ঋজুদাকে হেসে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, 'লং টাইম নো সি'।

ঋজুদা হেসে বলল, দ্যাটস ট্রু। নাইস টু সি উ্য মাদমোয়াজেল ব্লঁশ আফটার আ লং টাইম। হাউ আর থিংগস। হাউ ইজ মঁসিয়ে ব্লঁশ?

উনি চলে গেছেন।

চলে গেছেন মানে?

মানে, স্বর্গে যাননি। তাঁর তো গৃহীর স্বভাব নয়। তোমারই মতো স্বভাব। তোমার গল্প করতেন সপ্তাহে অন্তত একবার। খাবার টেবিলে বসে। তোমাকে খুবই পছন্দ ওঁর।

তা তিনি গেলেন কোথায়? আবারও তানজানিয়াতেই?

হ্যাঁ। আবারও। এবারে মাউন্ট কিলিমানজারোর কাছাকাছিই আছেন। তারপর সেরেঙ্গেটিতে ফোটোগ্রাফিক-সাফারিতে যাবেন কিছু স্যুয়েড পর্যটক নিয়ে।

ততক্ষণে ঋজুদার দেখাদেখি আমরাও বারান্দাতে চেয়ার টেনে বসেছি।

ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে তাকিয়ে ঋজুদাকে প্রশ্ন করলেন চোখ দিয়ে।

ঋজুদা বলল, আমি এখন একটি কিশোরদের মাসির পত্রিকার সম্পাদক হয়েছি। এরা দুজনে আমার সহকারী। স্যেশেলসের ওপরে একটি বিশেষ সংখ্যা বেরোবে আমাদের পুজোর সময়ে।

হোয়াট ইজ পুজো?

আমাদের দুর্গাপুজো, তোমাদের ক্রিসমাসেরই মতো। অন্যতম প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। শরৎকালে হয়।

ও।

তারপর বলল, এরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা জানে না, তাই হয়েছে মুশকিল। আমাকেই সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে।

তা তোমাদের ফোটোগ্রাফারেরা কোথায়?

তারা আজ গেছে 'লা ডিগ' আইল্যান্ডে। এদিকেও আসবে। তবে কবে, তা সে তারাই জানে।

কেয়ার ফর সাম কফি?

মাদমোয়াজেল ব্লঁশ বললেন।

একটু পরে।

ঋজুদা বলল।

ভদ্রমহিলা বেশ ঘনঘন সিগারেট খান। যতবারই সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, ঋজুদা তার লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর ভদ্রমহিলা বলছিলেন, 'মেরসি'।

দাঁতগুলো খুব সুন্দর। মুক্তোর মতো। আরও সুন্দর হাসিটি।

ঋজুদা বলল, বলুন, গল্পসল্প সব শুনি। মঁসিয়ে ব্লঁশ যে গুপ্তধন খোঁড়ার

কোম্পানি শুরু করার কথা বলছিলেন, তার কী হল? খুবই তো ভাল আইডিয়া আমিও তো জয়েন করব বলেছিলাম পার্টনার হিসেবে। তারপর আর কোনও খবর তো দিলেন না।

উনি আর কী করবেন? মাহেতে তো সরকারই একজনকে সাহায্য করছে। তিন হাজার পাউন্ড স্টারলিং দিয়েছে। কিন্তু খুঁড়ে কিছুই বেরোয়নি। ঠিক হদিশ জানা না থাকলে পাওয়া যাবে কী করে? ঠাকুরদা-বাবার কাছ থেকে শুনেছি, সব চেয়ে বেশি গুপ্তধন পোঁতা আছে অ্যাস্টভ দ্বীপে। সেখানে তো এখনও কেউ খোঁড়াখুঁড়ি করছে বলে শুনিনি।

তারপর বললেন, আসলে জাহাজডুবি, গুপ্তধন, নির্বাসিত ও জাহাজডুবির পরে সাঁতরে গিয়ে উঠে বেঁচে থাকা মানুষদের যত লোককাহিনী, যত রূপকথা, সবই তো অ্যাস্টভ দ্বীপ নিয়েই। শুনতে পাচ্ছি, ইঁদুলের এক বংশধর, মঁসিয়ে পিয়ের, নাকি গুপ্তধন খুঁজতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। ইঁদুলের দলের আর এক ডাকাত ফ্রেদরিকের পরিবারের মেয়ে প্রচুর ধনী মাদমোয়াজেল প্লুজেঁও ভিক্টোরিয়াতে এসে 'বো ভাঁলো বে' হোটেলে উঠেছেন। তাঁরও উদ্দেশ্য নাকি অ্যাস্টভে গোপনে খোঁড়াখুঁড়ি করা।

আপনাকে কে বলল?

ঋজুদা আমাদের দিকে তাকিয়েই মাদাম ব্লঁশকে জিজ্ঞেস করল।

আরে! মঁসিয়ে পিয়ের তো কালই রাতে মোটর বোটে করে এসে আমার হোটেলেই ছিলেন। সারারাত ম্যাপ-ট্যাপ নিয়ে কাজ করার পর প্রায় সকাল চারটে অবধি জেগে তারপর ঘণ্টা দুয়েক শুয়েই সকালের প্রথম ফ্লাইটে মাহেতে ফিরে গেছেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, মাদমোয়াজেল প্লুজেঁর হয়েই কাজ করছেন এখন।

আর উনি যে বোটে এসেছিলেন, সেই বোট?

বোট তো ওঁকে নামিয়ে দিয়েই ফিরে গেছিল রাতারাতি। ঘণ্টাচারেক তো লাগে। বোটে চার ঘণ্টা, প্লেনে পনেরো মিনিট।

তা উনি এলেনেই বা কেন, আর গেলেনই বা কেন?

তা বলতে পারব না। প্রালেঁতে একজন খুব বড়লোক থাকেন। মঁসিয়ে দেনো। তিনিও কাল রাতে আমার হোটেলে এসেছিলেন। রাত দুটো অবধি ছিলেন। কী একটা চুপ-চুপ গোপন-গোপন ভাব দেখলাম। তারপর মঁসিয়ে দেনো চলে গেলেন।

তাই?

হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে, কোনও রহস্য আছে মঁসিয়ে পিয়েরের আসা সম্বন্ধে। আসলে মানুষটার বদনাম তো আছেই।

কীসের বদনাম?

কীসের নয়। ওর বাবাও ওইরকম ছিল।

বাবা খারাপ হলেই যে ছেলে খারাপ হবে, তার কী মানে আছে?

মানে নেই। তবে অনেক সময়েই তো হয়। ও ভাড়াটে খুনিও বটে। বাবা, আমি তো একাই থাকি। ফ্রেঞ্চ মেয়েটি চলে যায় রাত দশটায়, আসে সকাল ছটাতে। কুক, বেয়ারা ওরাও সব আসে ছটাতে। রাতে যদি হুজ্জত করত? তবে সারারাতই দুজনে মিলে মদই খেয়েছে। অন্য ঝামেলা বিশেষ করেনি।

আপনার এখানে বার-এর লাইসেন্স নিয়েছেন নাকি?

না, না। আমি কেন নিতে যাব? ওই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। কোনও গোপন ব্যাপারে এসেছিল বটে কিন্তু মঁসিয়ে পিয়ের কিছু ম্যাপ-ট্যাপ ফেলে গেছে। ভুলে।

কী করবেন এখন আপনি?

তাই ভাবছি। মঁসিয়ে দেনোকে কি ফোন করব?

করা তো উচিত। তবে মঁসিয়ে পিয়েরের কাগজপত্র অন্য কাউকেই দেওয়া উচিত নয়। যদি গুপ্তধনের খোঁজটোজ থেকে থাকে তাতে। ইঁদুল আর ফ্রেদরিক তো কুখ্যাত জলদস্যুই ছিল। প্লুজেঁ তো বলছেন সেই ফ্রেদরিকেরই বংশধর।

সেই জন্যেই। মঁসিয়ে দেনোকে বলব কি না ভাবছি।

না বলাই তো ভাল। যার জিনিস তাকেই জানানো উচিত।

ঠিক বলেছ। আমার স্বামী মানুষ চেনেন বলেই তোমার কথা এত বলেন।

তবে...

তবে কী?

ওই ম্যাপ আমি দেখে নিয়েছি।

ঋজুদা কথা বলল না। পাইপ টানতে লাগল। যেন, ওই ম্যাপ সম্বন্ধে তার কোনও ইন্টারেস্টই নেই এমন মুখ করে মনোযোগের সঙ্গে পাইপ টেনে যেতে লাগল। আমাদেরও যেন কোনওই ইন্টারেস্ট নেই এমন ভাবে আমরা বাইরে তাকিয়ে রইলাম। ইদানীং বহুতই স্মার্ট হয়ে-ওঠা ভটকাই আমাকে বাংলায় বলল, এই রোদদুর, এটা কী পাখি রে?

কোথায়?

ওই যে রোদদুরে বসে আছে।

ভটকাই অভিনয়টা ভালই করল। আমরা ইংরেজি জানিই না, তাই ঋজুদার সঙ্গে মিসেস ব্লঁশের কী কথা হচ্ছিল, তা আমাদের বোঝবার কথাই নয়।

আমি পাখিটার দিকে ভাল করে চেয়ে বললাম, মনে হচ্ছে টার্ন।

ঋজুদা বলল নডি-টার্ন। এখানে দুরকমের দেখা যায়। বড় আর ছোট। এ ছাড়া আছে সুটি-টার্ন। সাদা-কালো। এ সব পাখি তো সমুদ্রপারেই দেখা যায়। টার্ন, স্যান্ডপাইপার, সোয়ালো, বুবি আরও কত পাখি। এখানে একটা অভয়ারণ্য আছে। লোকে তাকে বলে 'গার্ডেন অফ ইডেন'। কতরকম গাছ যে আছে সেখানে, কতরকম পাখি, তা বলার নয়।

আমাদের এই কথোপকথন শুনে মাদমোয়াজেল ব্লঁশ বুঝতেই পারলেন যে,

মঁসিয়ে পিয়েরের বা মঁসিয়ে দেলো বা কারও পুঁতে রাখা গুপ্তধন নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কিন্তু কিছু মানুষ থাকেন, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে, যাঁরা পেটে কথা মোটেই রাখতে পারেন না। তা ছাড়া, ভদ্রমহিলা একা থাকেন। স্বামী আবার আফ্রিকাতে চলে গেছেন। হয়তো মাঝে মাঝে ফোনে কথা বলেন। ছেলেমেয়ে আছে কি না তাও আমাদের জানা নেই। তা ছাড়া, দ্বীপে দেখছি এমনই জায়গা যে, এখানে খুব বেশি মানুষও পান না উনি কথা বলার, তাই একটু বাচালতায় তো পেতেই পারে ওঁকে।

আমাদের কথা শেষ হলে উনি বললেন, গুপ্তধনের ম্যাপগুলো কিন্তু অ্যান্টেভ দ্বীপেরই। পুব দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠে তারপর দক্ষিণে পাঁচশো গজ গিয়ে সেখান থেকে উত্তরে...

ঋজুদা বলল, আপনি বিপদে পড়ে যাবেন মাদমোয়াজেল ব্লুঁশ। আপনিই বলছেন যে, পিয়ের ভালমানুষ নয়। আপনিই বলছেন মাদমোয়াজেল প্লুর্তে ওকে লাগিয়েছেন ওঁর কাছে, আবার আপনিই সব গোপন খবর জানিয়ে দিচ্ছেন। এতে আপনার প্রাণহানিও হতে পারে।

কেন? বলেছি তো শুধু আপনাকেই। আপনি তো আর গুপ্তধন খুঁজতে যাচ্ছেন না।

না। তা যাচ্ছি না। কিন্তু দেওয়ালেরও কান আছে। আপনার কাজের মেয়েটি, হোটেলের কুক, বেয়ারারা, এত লোক আছে। তা ছাড়া টাকা-সম্পত্তি এমনই একটা খারাপ জিনিস যে, যার জন্যে ছেলে বাবাকে খুন করে, জামাই শ্বশুরকে। তা ছাড়া এ সব তো পড়ে-পাওয়া ধন। অন্যের উপার্জিত সম্পত্তিতেই বেশি আঠা থাকে। কী দরকার আপনার?

এমন সময়ে ওঁর অফিসে ফোনটা বাজল। অফিসটা, সমুদ্রের ওপরের প্রকাণ্ড কাঠের উঁচু বারান্দাটা, যেটা ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম, তারই এক প্রান্তের একটি ছোট্ট চেম্বারে।

মাদমোয়াজেল ব্লুঁশ ফোন ধরতে উঠে গেলেন। আমরা লক্ষ করলাম যে, তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। মিনিট দু-তিন কথা বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখলেন। আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জোর করে হেসে বললেন, ন্যাউ, আই থিংক ইটস টাইম ফর আ কাপ অফ কফি।

ঋজুদা বলল, ওকে।

উনি কফির অর্ডার দেওয়ার জন্য টেবিলে রাখা ঘণ্টাটা বাজালেন। বললেন , ইটস অন দ্য হাউস।

বেয়ারা এল। একটি স্যেশেলোয়া। মাঝবয়সি। তাকে ক্রেওল ভাষাতেই কফির অর্ডার দিলেন উনি। আমরা শুধু 'কফি' শব্দটা বুঝলাম।

বেয়ারা যেতে না যেতেই ফোনটা আবার বাজল।

কর্ডলেসটা তিনি চেম্বার থেকে নিয়ে এসেছিলেন আসবার সময়ে। বললেন,

'কাফে দ্য প্রালেঁ'।

তারপরই খুব উত্তেজিত শোনাল তাঁর গলা। বার বার বলছিলেন, মঁসিয়ে পিয়ের!

তারপরই বললেন, মঁসিয়ে বোস ফ্রম কালকুত্তা।

ঋজুদার কান খাড়া হয়ে উঠল।

মঁসিয়ে পিয়ের মনে হল, মাদাম ব্লঁশকে খুব শাসালেন। ভয়ে মুখ কালো হয়ে গেল মহিলার। উনি বার বার বলছিলেন মঁসিয়ে বোস ইজ ফ্রম কালকুত্তা, ইন্দিয়া, হি ইজ আ ন্যাচারালিস্ট, আ রাইটার। নো নো আই অ্যাম শুওর। মাই হাজব্যান্ড ইজ ভেরি চাম্মি উইথ হিম।

তারপর বললেন, আমি সবই রেখে দিয়েছি। লোক পাঠালেই বন্ধ খামে দিয়ে দেব।

তারপর বললেন, কী? কী বলছেন? অ্যাস্টভ দ্বীপের কথা বলেছি কিনা? হ্যাঁ বলেছি। মঁসিয়ে বোস তো আমার সামনেই বসে আছেন। আপনার কোনও ক্ষতি কি আমি করতে পারি? মঁসিয়ে বোসের এতে কী ইন্টারেস্ট থাকতে পারে?

তারপরই ও প্রান্ত থেকে লাইনটা কেটে দেওয়া হল।

উনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

ঋজুদা বলল, পৃথিবীতে শান্তির জন্যে, সে ঘরের শান্তিই হোক কি বাইরের শান্তি, দুটো একটা মিথ্যা বললে কোনও দোষ হয় না মাদমোয়াজেল ব্লঁশ।

তা হয় না। কিন্তু আপনাকে তো মঁসিয়ে পিয়ের বা মাদমোয়াজেল প্লুঁজে চেনেনই না। তবে আপনার সম্বন্ধে মঁসিয়ে পিয়েরের এত ভীতি কেন?

ভীতির কথা কেউ বলতে পারে? কেন যে কার ভীতি? আমাদের দেশে লজ্জাবতী নামের এক রকম লতা হয়। তার কাছাকাছি কেউ হাত নিলেও, কি তাকে ছুঁলেও, অবশ্যই সে কুঁকড়ে যায়। অনেক মানুষও ওইরকমই হয়। লজ্জাবতীরই মতো বাড়াবাড়িরকম অনুভূতিশীল।

ঋজুদা বলল, ওই যে অ্যাস্টভ দ্বীপ, সেটা ঠিক কোথায়? যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁরা তো সেখানে যান না। গতবারে আমি এসে তো মাহে, প্রালেঁ, লা-ডিগ্‌-এই ছিলাম। ওই দ্বীপের নাম তো শুনিনি।

মাদাম ব্লঁশ বললেন, ওগুলো ইনার আইল্যান্ডস। ওই তিনটে ছাড়াও আরও আছে কাছাকাছি। ফ্রিগেট আর আরিড। আরিডে বার্ড স্যাংচুয়ারি আছে। আরিডের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে আছে বার্ড আইল্যান্ড।

দ্বীপের নামই বার্ড আইল্যান্ড?

হ্যাঁ।

আসলে স্যেশেলস বলতে অধিকাংশ মানুষ মাহে, প্রালেঁ বা লা-ডিগই বোঝে। প্রালেঁতে এসেও এখানের যা আসল দ্রষ্টব্য 'ভ্যালি দ্য মেইতেই' বা কজন যায় তোমার মতো? তুমিও আমার স্বামীরই মতো জঙ্গল-পাগল বলেই তো।

তা ঠিক, মঁসিয়ে ব্লঁশ সঙ্গে না থাকলে তো অত ভাল করে দেখতেও পারতাম না।

'মিলিয়নিয়রস স্যালাড' কাকে বলে জান?

মহিলা বললেন।

আমাদের কান নড়ে উঠল। কুকুরের কান যেমন শব্দ শুনে নড়ে ওঠে। কিন্তু আমরা অনেক কষ্টে কান কন্ট্রোল করলাম পাছে উনি বুঝে ফেলেন যে, আমাদেরও ইংরেজি একটু একটু 'আসে'।

ঋজুদা বলল, লম্বা, পামিস গাছ, তার মাথায় তালের মুকুট। সেই তালেরই শাঁস তো। কোটিপতির রাঁধুনিরা পুরো গাছকে মেরে ওই স্যালাড বের করতেন আগে। এখন অবশ্য এমনি বেঁটে তালের শাঁস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কোকো-ডে-মেয়ের তো স্যেশেলস ছাড়া অন্য কোথাও দেখাও যায় না।

তা যায় না। আমাদের প্রালেঁর সৌন্দর্যও কম নয়। মানুষে 'বো ভাঁলো' 'বো ভাঁলো' করে বটে, কিন্তু সে তো পৃথিবীর সব মানুষের ভিড়ে একটা বাজার হয়ে গেছে। এমন শান্তি আর কোথায় আছে? স্যামন মাছের রঙের রুপোলি গ্রানাইটের নানা আকৃতির বড় ছোট চাঙড়, সাদা কোরাল—গুঁড়ো বালির পাশে পাশে। টাকামাকা গাছেরা উজ্জ্বল সবুজ, বড় বড় পাতার ব্রেড-ফ্রুটের গাছের সারি। আর ভিতরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে গাঢ়-লাল প্রবাল-রঙা পাহাড় চুড়ো। রাতেরবেলা এখানে জলের নীচে রং-বেরঙের ফুলের মতো প্রবালেরা তারাদের ছায়াতে ঘুমিয়ে থাকে।

বাঃ। আপনি কী সুন্দর বলেন, আপনি আমাদের কাগজের জন্যে একটি লেখা লিখুন না প্রালেঁ সম্বন্ধে।

হাঃ। লেখা-টেখা কি সকলের আসে মঁসিয়ে বোস? লেখক হতে হলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাগে। এ তো পাহাড়ে চড়া নয় যে, পড়তে পড়তে, উঠতে উঠতে, অধ্যবসায় থাকলে একদিন না একদিন ওঠাই যাবে! লেখক হতে গেলে ইন্সপিরেশন লাগে। 'Genius is one percent inspiration and ninety nine per-cent perspiration.' এই বাক্যটি লেখালেখির ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। লিখতে গেলে ইন্সপিরেশন দরকার হয় ঢের ঢের বেশি। বলে, একটু থেমে যোগ করলেন, পারলে হয়তো আমার স্বামী পারতেন। উনি যখন আমাকে আফ্রিকার গল্প বলেন কখনও অন্ধকার অথবা চাঁদের রাতে, আমার মনে হয় আমি যেন সেখানেই চলে গেছি। আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ওঁর। কিন্তু ওই...

ওই কী?

কুঁড়েমি। ইন্সপিরেশন যথেষ্টই, কিন্তু পারস্পিরেশনের অংশটা শূন্য। লেখার টেবিলে ঘাম ঝরানোর কোনও ইচ্ছেই যে ওঁর নেই। তার চেয়ে ওঁর ঢের বেশি পছন্দ অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য খুঁজে বার করা, নতুন পথে পুরনো জায়গায় যাওয়ার হদিস-এর সন্ধান করা।

তা হলে, কলম চালাতেও perspiration লাগে বলছেন।

হাসতে হাসতে বলল, ঋজুদা।

হেসে উঠলেন মাদাম ব্লঁশ।

কফি এসে গেল। সঙ্গে টিনের কাজুবাদাম আর টাটকা-ধরা ম্যাকারেল মাছের ফ্রাই।

আরে, আমরা তো সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েছি।

তাতে কী, এখন তো প্রায় এগারোটা বাজে। ওদের নিয়ে ঘুরে-ঘারে ফিরবেন তো সেই সন্ধের মুখে। ভালই হল, লাঞ্চের জন্যে সময় নষ্ট করতে হবে না আর।

তারপরই আমাদের দিকে ফিরে বললেন, ইয়াং ল্যাডস। প্লিজ ক্যারি অন।

তারপর ঋজুদাকে বললেন, এদের নাম তো বললেন না?

ও হ্যাঁ।

ঋজুদা লজ্জিত হয়ে বললেন, প্রথমেই আলাপ করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এঁরা হলেন মঁসিয়ে পিপু, আর মঁসিয়ে ফিসু।

কী নাম বললে?

আমরা নিজেদের নাম শুনে নিজেরা হেসে উঠতে গিয়েও জোর ব্রেক-কষে থেমে গেলাম। ভটকাই একটা হেঁচকি তুলল, ইন দ্যা প্রসেস।

ঋজুদা কথা ঘুরিয়ে বলল, জানিস তো, যে কোকো-ডে-মেয়ের গাছ প্রালেঁর 'ভ্যালি দ্য মেই'তে পাওয়া যায়। আগে অনেকের ধারণা ছিল ওই গাছ জন্মায় সমুদ্রের গভীরে।

সত্যি?

আমরা বললাম অবাক হয়ে।

হ্যাঁ। এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতার মতো গাছগুলো আকাশ ঢেকে রাখে। নানারকম সরীসৃপ ডাকাডাকি করতে করতে এ গাছ থেকে সে গাছে দৌড়ে বেড়ায়। তলায় গভীর রহস্যময় অন্ধকার। তারই মধ্যে মধ্যে স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জের কালো টিয়ারা শিস দিতে দিতে উড়ে যায়। ওই বনভূমি দেখলে মনে হয় যেন অন্য কোনও যুগের কোনও বনভূমি দৈব-অভিশাপে এই পৃথিবীতে রয়ে গেছে। মানুষের এই বনভূমিতে কিছু করণীয় নেই, ওই সৃষ্টির পেছনে কোনও কেরামতিও নেই। এই বনভূমি, দূর থেকে দেখলেও মনে সম্ভ্রম জাগে। এই বনভূমিতে সব গাছই ঊর্ধ্বমুখী, সূর্যমুখী। নিজের নিজের আকাশটুকুর জন্যে যেন প্রত্যেকেই সংগ্রাম করছে।

এখানে এলে শুধু ওপর দিকেই তাকাতে হয়। মাঝে মাঝে হাওয়া দিলে মস্ত বড় বড় পাতা ছিঁড়ে নীচে পড়লে নিথর বনের মধ্যে যে শব্দ ওঠে, তা প্রতিধ্বনিত হয়। ঝড় উঠলে, ওই আশ্চর্য নারকেল বনের পাতায় পাতায় এক আওয়াজ ওঠে। যে, তা না শুনেছেন, তাঁর পক্ষে অনুমান করাও মুশকিল। তারই মধ্যে ধুপ করে শব্দ করে কোনও একটি কোকো-ডে-মেয়ের হয়তো খসে পড়ে নীচে। রোদ্দুর

ভরা দিনের বেলায় ওপরে রোদ ঝলমল করলে কী হয়, নীচে যখন সে আলো নামে, তখন তা সবুজাভ হয়ে যায়।

ভটকাই বলল, ম্যাকারেল মাছের মধ্যে একেবারে কদবেলের মতো মজে গিয়ে, 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'।

আমি বললাম, জ্যোৎস্না কোথায় পেলি। বল, বনরোদ্দুরে, সবুজ অন্ধকারে।

ওই হল।

কিন্তু বইটা কি পড়েছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বলল, ভটকাই। মাছভাজার টুকরোটা মুখে পুরে।

কফি, ম্যাকারেল ভাজা আর কাজুবাদাম খাওয়া শেষ হলে ঋজুদা বলল, আপনার কাছে স্যেশেলসের আউটার আইল্যান্ডগুলোর কোনও ম্যাপ আছে? না থাকলে কোথায় পাব?

পাবে হয়তো ট্যুরিস্ট অফিসে, কিন্তু আমার কাছে একটা একস্ট্রা থাকলেও থাকতে পারে।

বলেই, তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

কী বুঝছিস?

ঋজুদা বলল।

ভারী ভাল মহিলা। কিন্তু আমাদের শত্রু তো জেনে গেল যে, আমরা অ্যাস্টভ দ্বীপের ম্যাপের হদিস পেয়ে গেলাম ওঁর কাছ থেকে।

তা গেল।

তো কী হবে?

যা হওয়ার তা হবে।

আমরা কি কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব সেদিকে? কী করে যাবে? বোট চার্টার করে? খাবারদাবার এবং পানীয় জলও তো নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে। কতদিন থাকতে হবে তার তো ঠিক নেই।

ভটকাই বলল।

দেখি।

কী যেন ভাবতে ভাবতে ঋজুদা বলল।

এমন সময় মাদাম ব্লঁশ একটি ম্যাপ নিয়ে এসে টেবিলের ওপরে মেলে ধরলেন। ধরে, তাঁর হাতে ধরা একটা রুপোর বলপয়েন্ট পেন দিয়ে দেখালেন...

ঋজুদা বলল, এই কলমটা শারানডাশ নয়?

হ্যাঁ। তুমি চেন?

চিনি। সুইজারল্যান্ডের নামকরা পেন আর বলপয়েন্ট। সোনার হয় আর রুপোর হয়।

তুমি দেখছি পেন-বিশারদ।

আমি যে লেখক। পেনই যে আমার হাতিয়ার। পেন, বলপয়েন্ট, তুলি।

এই দেখ, স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে কত অসংখ্য দ্বীপ আছে। অগণ্য দ্বীপের এখনও নামকরণ হয়নি। তাদের সার্ভেও করা হয়নি। সেখানে কী কী গাছ বা কী কী প্রাণী থাকে, তারও খোঁজ নেওয়া হয়নি। মিষ্টিজল পাওয়া যায় কি না, তারও না। এই দ্যাখো, ইনার আইল্যান্ডসের কথা তো আগেই বলেছি। আউটার আইল্যান্ডসে চারটে পুঞ্জ আছে। আমিরান্তেস, আলফোঁস, ফারকুহার আর অ্যালডাবরা। এর মধ্যে স্বর্গের মতো সুন্দর অ্যাটলও আছে অনেক।

ঋজুদা মন দিয়ে শুনছিল। মাদাম ব্লঁশ থামতেই বলল, অনেক ধন্যবাদ। তবে, হাতে সময় তো বেশি নেই, ওদের যতটা সম্ভব ঘুরিয়ে দেখাই। একটা ট্যাক্সি কি ডাকা যাবে ফোনে?

তারপরই ঋজুদা বলল, টেক কেয়ার।

বলে, ওঁর ডান হাতটা ধরে, হাতের পাতার পিঠে আলতো করে চুমু খেল।

উনি বললেন, বাঈ!

বাঈ!

ট্যাক্সিটা এসে গেল। আমরা উঠে হাত নাড়লাম ওঁকে।

উনি হাসছিলেন, খোলা আকাশের পটভূমিতে সাদা রংকরা কাঠের বনবাংলোর মতো বাংলো-হোটেলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। ডান হাতের আঙুল দিয়ে গলার মুক্তোর মালার মুক্তোগুলো নাড়ছিলেন আর বাঁ হাত দিয়ে এলোমেলো-হওয়া চুল ঠিক করছিলেন। একটা ছাই-রঙা সিল্কের স্কার্ট পরেছিলেন উনি আর সাদা সিল্কের ব্লাউজ। সাদা জুতো। স্কার্টটা উড়ছিল জোর সামুদ্রিক হাওয়াতে। খুবই স্নেহময়ী মহিলা। আমার মায়েরই বয়সী হবেন। বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ।

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিতেই উনিও হাত নাড়লেন।

কোনদিকে যাব এবারে?

ভটকাই-এর বকবকানি শুরু হল।

ঋজুদা যেন কী গভীর ভাবনাতে বুঁদ হয়ে গেল। ভটকাইয়ের কথার উত্তর না দিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, জেটি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জেটিতে পৌঁছে গেলাম। ঋজুদা একটা বোটের সঙ্গে কথা বলে আমাদের নিয়ে উঠল। ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, জেটিতে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে সব সময়ে, না সে-ই ফিরে আসবে আমাদের ফেরার সময়?

সে বলল, আমিই ফিরে আসব। যাবেন কোথায় জেটি থেকে? মাদাম ব্লঁশের হোটেলেই?

আমরা যাব এয়ারপোর্টে। কিন্তু ঋজুদা সে কথা বলল না তাকে। বলল, পৌনে পাঁচটা নাগাদ এসো। বকশিস দেব।

সে বলল, বকশিস লাগবে না। আসব।

বোট ছেড়ে দিল। সাদারঙা বোট। খুব শক্তিশালী ইঞ্জিন। মাথায় ছাদ আছে। নীচে আট-দশজনের বসার চেয়ার। সামনে-পেছনে ডেক। ইঞ্জিন-রুম পেছনে।

একে ইঞ্জিনের শব্দ, তার ওপরে সমুদ্রের শব্দ আর হাওয়ায় কথাগুলো উড়ে যাচ্ছিল মুখ থেকে।

ভটকাই চিৎকার করে উঠল, ওটা কী পাখি ঋজুদা? লাল ঠোঁট, লাল লেজ।

ঋজুদা দেখে বলল, ওর নাম টুপিক বার্ড। কী সুন্দর-মসৃণ সাদা দেখেছিস। মনে হয়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিই। সামুদ্রিক পাখি। এদিকে কম দেখা যায়। আলডাবরাতে অনেক আছে।

আর ওই যে! পাড়ের খয়েরি-রঙা পাখিটা?

সেটাও দেখনি। ব্রাউন নডি-টার্ন। আমাদের দেশের ধনেশ পাখির যেমন গ্রেটার আর লেসার হয়, এই ব্রাউন-নডিদেরও দুটো ভ্যারাইটি। ছোটটাকে বলে লেসার। আর ওই দ্যাখ স্যুটি টার্ন। ওদের আরেকটা নাম হচ্ছে ওয়াইড-অ্যাওয়েক টার্ন।

কেন? ওরকম নাম কেন?

সবসময়েই তীক্ষ্ণ নজর। আর কিছু দেখলেই চিল-চিৎকার জুড়ে দেয়, তাই।

অনেকটা আমাদের টিটি পাখি, মানে ল্যাপউইঙের মতো বলছ?

হ্যাঁ। অনেকটা, তবে ওয়াইড-অ্যাওয়েক টার্ন-এর আওয়াজ শুনলে আঁতকে উঠতে হয়।

ল্যাপউইঙের ডাকেও তো আমার গা ছমছম করে। বিশেষ করে রাতে। হুটিটি হুট্। হুট্। হুট্। হুট্।

ভটকাই বলল।

সাদা-কালো। আরও একরকমের টার্ন দেখা যায় এখানে, তাদের নাম ফেরারি টার্ন। পুরো সাদা ঠোঁট, পা আর চোখ কালো। পাখি দেখতে গেলে আরিড আইল্যান্ডে যেতে হয়।

ওখানে একরকমের Ibis আছে, যা শুধুমাত্র ওখানেই পাওয়া যায়।

Ibis মানে?

ভটকাই বলল।

আঃ! একরকমের পাখি।

আমি বললাম।

তারপর ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে মানে?

আলডাবরা দ্বীপপুঞ্জে। ওদের নামই, আলডাবরা স্যাক্রেড আইবিস।

স্যাক্রেড? তা পবিত্র কেন?

পবিত্র বলে, বোধহয় ওদের চোখের জন্যে। আশ্চর্য নীল চোখ ওদের। চায়না-ব্লু। আলডাবরাতে আরেকরকম পাখি দেখতে পাওয়া যায়, ছোট পাখি,

হোয়াইট-থ্রোটেড রেইল। ও পাখিগুলো উড়তে পারে না। কত পাখিই তো উড়তে পারে না। তবে সেইসব পাখির প্রজাতি অবশ্য খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য। এই সামুদ্রিক দ্বীপগুলোতেই কিন্তু এই সব পাখি বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

কীরকম?

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে একরকমের উড়তে না-পারা পাখি একসময়ে অনেক ছিল। এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। নাম 'নেনে'। আমাদের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আছে মেগাপড। 'ডোডো' পাখি আছে মরিশাসে। স্যেশেলসের কাছেই। মরিশাস হয়েই আমাদের ফিরতে হবে মুম্বাইতে, যদি এয়ার ইন্ডিয়াতেই ফিরি।

যদি আদৌ ফিরি বলো। তোমার প্লুজেঁ আর পিয়ের যে কী খেলা খেলবে আর খেলাবে তা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আমি বললাম।

একেবারেই কি বোঝা যাচ্ছে না?

ঋজুদা বলল, রহস্যময় গলাতে, আমাদের দুজনের দিকেই তাকিয়ে।

তারপর বলল, নামগুলো অন্যদের সামনে না বলাই ভাল। অন্য নাম দে ওদের।

ভটকাই বলল, মাছের নাম দেব?

দে।

ল্যাটা আর পোটকা।

কে কোন জন?

প্লুজেঁ ল্যাটা আর পিয়ের পোটকা।

ওক্কে।

আমি বললাম, ওকথা বললে কেন ঋজুদা?

কী কথা?

কিছুই কি বোঝা যাচ্ছে না?

ঋজুদা পাইপটাকে নিজের ডানদিকের জুলপির কাছে একবার ছুঁইয়ে বলল, ভাব। ভাব। ঈশ্বর মস্তিষ্ক দিয়েছেন, সেটাকে যতই কাজে লাগাবি ততই সেটা উর্বর হবে।

আমি আর ভটকাই অবাক হয়ে গেলাম। সকাল থেকে যা কিছুই ঘটেছে, তার সঙ্গে আমাদের রহস্য সম্বন্ধে বোঝাবুঝির সম্পর্ক কী যে তা কিছুই বুঝলাম না।

ঋজুদা বলল, ওই দ্যাখ টাকামাকা বে। টাকামাকা গাছগুলো দেখছিস। কী সুন্দর তটভূমি, দেখেছিস? পাউডারের মতো সাদা। বালিও প্রবালের গুঁড়ো।

ভটকাই বলল, যেখানে সৌন্দর্য সেখানেই ভয়। ফুল থাকলেই কাঁটা থাকবে। রামকুমারবাবুর গান শুনিসনি?

বিরক্ত হয়ে বললাম, কী গান?

যেমনি শুধোনো, অমনি ভটকাই চোখ-মুখ ভেটকে টপ্পা ধরে দিল:

'গেলাম ফুল তুলিবারে, যত্নে মালা গাঁথিবারে
অমনি কাল ভুজঙ্গ দংশিল আমায়
এখন বাঁচি কি না বাঁচি, বল প্রাণে-এ-এ-এ-এ...'

ঋজুদা বলল, টপ্পার দানা আর বেশি দিস না। বোট এবারে উল্টোবে। উল্টোলেই জলে পড়বি। আর জলে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে হাঙর ক্যাচ করবে। এত গভীরে তো কেউ সাঁতার কাটে না!

হাঙর আসে না কি?

আসে বইকী! কম আসে। তবে ভটকাইয়ের টপ্পা শুনে আসতেও পারে।

কী হাঙর?

খুব সুন্দর দেখতে। ইস্পাতের মতো ছাই-ছাই রং আর গায়ে কালো ফুটি-ফুটি দাগ।

নাম কী?

হোয়েল শার্ক। তবে ওরা কিন্তু মাড়োয়ারি, গুজরাটিদের মতোই নিরামিষাশী। প্ল্যাঙ্কটন খেয়ে থাকে। বুঝলি তো। তবে মাড়োয়ারি-গুজরাটিরা যেমন মাঝেমধ্যে নিরামিষ-গণ্য করে ডিম খান, তেমন প্ল্যাঙ্কটনের মধ্যেও অনেক সময়ে তোর আমার মতো মানুষের পো আমিষও খেয়ে থাকে। অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। কী বল?

প্ল্যাঙ্কটনটা আবার কী জিনিস?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

প্ল্যাঙ্কটন-এর মানে, আমি বলতে গেলাম ভটকাইকে। কিন্তু ঋজুদা বলল, বলবি না।

তারপর ভটকাইকে বলল, একটা Webster-এর ডিকশনারি আজই কিনে নিবি, আর Roget-এর Thesarus of English Words and Phrases। অন্যে বলে দিলে, শেখা হয় না। যে-কোনও ইংরেজি শব্দর মানে তুই না জানলে বানানটা শুধু ঠিক করে জেনে নিবি তারপরে ডিকশনারি দেখবি। বাংলার ব্যাপারেও তাই করবি। সংসদের একটা অভিধান এবং এক সেট বঙ্গীয় শব্দকোষ, সাহিত্য আকাদেমির, হাতের কাছে রাখবি কলকাতাতে সব সময়। বাংলা তোর মাতৃভাষা বলেই তুই যে সে কারণেই সে ভাষাতে পণ্ডিত, এমন ভাবিস না। আমরা কেউই ইংরেজি তো ভাল জানিই না, বাংলাও জানি না। সব সময় নতুন নতুন শব্দ শেখার চেষ্টা করবি। শিখতে তো কোনও লজ্জা নেই। আমি তো চিতাতে ওঠার আগের মুহূর্ত অবধিও শিখতে রাজি আছি।

বোটটা যখন প্রালেঁর জেটির দিকে মুখ ফেরাল, তখন আমি বললাম, স্যেশেলসের পাহাড়গুলো দেখলে ভয় করে। কত বড় বড় পাথর। পূর্ব-আফ্রিকার সেরেঙ্গেটির Kopjeগুলো তো এদের কাছে পিঁপড়ে।

রুআহাতে তো Kopje ছিল না।

ভটকাই বলল।

কে বলল, ছিল না? সেখানেও ছিল। তুইতো আর রুআহা বা গুগুনোগুম্বারের দেশেতে যাসনি। তবে সেরেঙ্গেটির Kopje অন্যরকম। রুদ্রর 'গুগুনোগুম্বারের দেশে'তে আছে তার বর্ণনা। বানান Kopje, উচ্চারণ কিন্তু কোপি।

ঋজুদা বলল।

হায়। হায়। সোয়াহিলি ভাষাও দেখি কম যায় না ধাঁধায়।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, এই সব দ্বীপেই গ্র্যানাইট পাথরের পাহাড়। কালোটাই বেশি। সাদা ও খয়েরিও আছে। হাজার বছরের জলের আর বরফের চাপে, হাওয়ার ফুৎকারে এরা ক্ষয়ে গেছে। কত বিচিত্র সব আকার নিয়েছে। মনে হয়, কোনও স্থপতিই বুঝি বানিয়েছেন অথবা ভাস্কর, বিশাল মাপের হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে। তা ছাড়া, যেহেতু অধিকাংশ তটভূমিই জনহীন, সে জন্যেও গা ছমছম করে।

তারপর বলল, জানিসতো, স্যেশেলসেও একজন নামকরা ভাস্কর আছেন। দারুণ কাজ করেন। যদি বেশিদিন থাকা হয়, তবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব তোদের। তাঁর স্টুডিয়োতেও নিয়ে যাব। তাঁর খ্যাতি পৃথিবীজোড়া।

নাম কী?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মাহেতেই থাকেন তিনি। নাম Tom Bowers.

এখানের পাহাড়গুলো ফিল্ম-এ দেখা Guns of Navarone পাহাড়ের মতো। তাই না? এমন খাড়া যে, কেউই বোধহয় উঠতে পারে না।

ঋজুদা হেসে বলল, ঠিকই বলেছিস।

এইসব দ্বীপে কী কী গাছ আছে ঋজুদা?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

গাছ তো আছে অনেকরকম। আমি কি আর সর্বজ্ঞ? তবে যে কটি গাছ নিজের চোখে দেখেছি, তাদের কথাই বলতে পারি। যেমন ধর মাহগনি। এখানে Sangdragon নামের একরকমের বড় বড় গাছ হয়, তাদের নীচে নীচে চলে-যাওয়া ছায়াশীতল বনপথে চলতে ভারী আরাম। আরও কত গাছ আছে।

আর ফুল?

ফুলের কি শেষ আছে? লাল জবা। দারুণ দেখতে। কিন্তু জানিস তো, মাত্র একদিন থাকে গাছে, ফোটার পরে। হলুদ জবাও হয়, ডাবল। হাল্কা গোলাপিরঙাও হয়। আর সাদা সাদা ছোট-ছোট ফ্যাঙ্গিপ্যানি ফুল যখন ফোটে, তখন সারা দ্বীপকে সুগন্ধে ভরে দেয় ছোটাছুটি-করা হাওয়া।

আমি বললাম, জবা ফুলের ইংরেজি কী? জানিস?

অদম্য ভটকাই বলল, 'জাভাপ্যানি' তো!

আমি আর ঋজুদা হেসে উঠলাম ওর কথাতে।

ঋজুদা বলল, সত্যি! তোকে চিড়িয়াখানাতেই রাখা উচিত।

তা বলো। এখানে কি ডিকশনারি আছে সঙ্গে? আমার তো ইংলিশ-বেঙ্গলি নয়, বেঙ্গলি-ইংলিশ ডিকশনারি দরকার।

তাই কিনে নিয়ো একটা কলকাতা ফিরে।

বল না রুদ্র, জবা ফুলের ইংরেজি কী?

হাইবিসকাস।

শিখলাম।

এখানে এই নীল স্বচ্ছ জলের তলায় তলায় যে কতরঙা প্রবালের বাগান আছে, তা কী বলব। তোদের নিয়ে যাব গ্লাস-বটম বোটে করে অ্যান ম্যারিন ন্যাশনাল পার্ক দেখাতে। সেই বোটগুলোর একতলাটা থাকে জলের নীচে। দু'পাশে বিরাট বিরাট কাচের জানলা। কত রকমের মাছ, কত রকমের আর রঙের প্রবালের ফুল যে দেখতে পাবি। ওইখানেই থেকে যেতে ইচ্ছে করবে, সারাজীবন।

একটা প্রাসাদ আর রাজকন্যা থাকলে, থেকেই যেতাম।

খুঁজতে তো হবে। না খুঁজলে, পাবি কী করে? ওই জন্যই তো স্কুবা-ডাইভিং আর স্নরকেলিং শেখা দরকার, যাতে অক্সিজেন সিলিন্ডার পিঠে বেঁধে বহুক্ষণ জলের তলাতে পায়ে ব্যাঙের পায়ের মতো রাবারের-পা লাগিয়ে সাঁতরে বেড়িয়ে সমুদ্রের বুকে আঁতিপাতি করে খুঁজতে পারিস।

নাঃ। হত্যিই দেখতাছি শিখন লাগব। শিইখ্যা লমু অনে। কী কও মিস্টার রুদ্র?

তুমি শিখবানা? তুমি শিখলে আমিও শিখুম।

ভাল করে শিখলে Frogman হয়ে গিয়ে ব্যাঙের মতো জলের নীচে সাঁতরে গিয়ে শত্রুপক্ষের নোঙর করা জাহাজের তলপেটে ডিনামাইটের চার্জ বেঁধে দিয়ে এসে দূর থেকে ইলেকট্রনিক ডিভাইস-এ ফাটাতে পারিস। ফ্রগমেনদের কাজ খুবই দুঃসাহসিক কাজ এবং তাদের মাইনেপত্তরও খুবই ভাল।

ভটকাই বলল, তা হউক গা। মানুষ হইয়া জন্মাইয়া ব্যাঙ হইতে যামু কোন দুঃখে! হাঃ। ছাড়ান দাও। যত্ত বাজে কথা তোমার।

টাকামাকা পেরিয়ে এলাম, এবার দ্যাখ Anselazion বিচ। এই বিচকে শুধু আমিই নই, অনেকেই বো ভাঁলোর চেয়েও সুন্দর বলেন।

লাল লাল ওই ফুলগুলো কী বলো তো? পাহাড়ে ফুটেছে, মাঝারি সাইজের গাছে? কৃষ্ণচূড়া?

ভটকাই শুধোল।

কী গাছ রুদ্র?

ঋজুদা উল্টে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

কৃষ্ণচূড়া নয়, তবে কী গাছ বলতে পারব না। কৃষ্ণচূড়ার মতো নয়! অন্যরকম। এবং অনেক বেশি লাল।

এক্কেবারে হল্লা-গুল্লা লাল।

ভটকাই বলল।

নামটাও হল্লাগুল্লার। নাম শুনলে অজ্ঞান হয়ে যাবি।

কী? বলো না বাবা।

ফ্ল্যামবয়ান্ট।

অ্যাঁ? ফুলের নাম Flamboyant?

ইয়েস স্যার।

ওই যে দ্যাখ দ্যাখ রুদ্র, বোগেনভিলিয়া।

কই?

ওই যে রে।

হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। আমাদের বোগেনভিলিয়াই।

কই?

বোগেনভিলিয়া কি তোমার মাতুল কেঠো মিত্তিরের সম্পত্তি? আমাদের মানে কী?

ভটকাই বলল।

মানে, ভারতের। ইডিয়ট।

আমি বললাম।

বোগেনভিলিয়া ভারতের নয়, সারা পৃথিবীর। যতদূর জানি, এগুলো আমেরিকান ট্রপিকাল লতা। শুধু এই গাছই কেন, তোদের কলমি শাক, লাউ, কুমড়ো, বেগুনও এখানে পাবি। প্রত্যেক বাড়িতেই হয়তো একটা করে সজনে গাছও দেখতে পাবি কিন্তু সজনে ডাঁটা খেতে এরা জানে না। বাজারেও কিনতে পাবি না।

আহা! ইহারা কী হারাইতেছে, ইহারা জানে না। এখান থেকে সজনে-ডাঁটা এক্সপোর্ট করার একটা ব্যবসা ফাঁদলে মন্দ হত না!

ওরিজিনাল ভটকাই বলল।

এখানে জামরুলও হয়, কিন্তু তাদের রং লাল। এখানের চড়াই পাখি লক্ষ করেছিস? পিঠ লাল। যখন লাফালাফি করে তখন ভারী সুন্দর দেখায়।

আম হয়?

হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, কখনও কখনও দেখা যায় গাছের ডালে বড় আম ফলে রয়েছে আর তার পাশেই আমের নবমুকুল।

তাই? তবে তো কলকাতা ফিরেই কথাটা চালু করতে হবে।

কী কথা?

'এঁচড়ে পাকাই' হয় না শুধু 'মুকুলে পাকাও' হয়।

এক, আদি এবং অকৃত্রিম ভটকাই বলল।

আমরা হাসলাম।

কলাও পাওয়া যায়?

যায় বইকী। কাল তোদের বাজারে নিয়ে যাব। তবে এখানের মানুষেরা তো ভটকাইয়ের মতো বাঁদর নয়, তাই কলা চেনে না।

মানে?

চেনে, কিন্তু চাঁপা কলা, কাঁঠালি কলা, আর মর্তমান কলার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, তা জানে না। ছোট কলাগুলো এখানে লাল লাল হয়। মর্তমান কলারও যা দাম, কাঁঠালি আর চাঁপা কলারও তাই দাম।

বাবা। সবই দেখছি হড়েগড়ে এক।

জ্যাঠামশাই ভটকাই বলল।

আচ্ছা, প্রালেঁতে কি হোটেল নেই ভাল?

অনেকই আছে।

সমুদ্র থেকে তো দেখা যাচ্ছে না একটাও।

লুকিয়ে আছে নারকেল বনের মধ্যে।

মানে?

মানে, পুরো স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জের নিয়ম হল, কোনও বাড়িই নারকেল গাছের চেয়ে উঁচু হতে পারবে না, সে ফাইভ-স্টার হোটেলই হোক আর যাই হোক।

বাঃ! এমন আইন সব দেশেই করা উচিত। এখানের মানুষগুলোর বুদ্ধি তো আছেই, সৌন্দর্যবোধও আছে।

ভটকাই বলল।

কথাটা ঠিকই।

ঋজুদা বোট ঘুরোতে বলল। গল্পে গল্পে অনেকই দূরে এসে গেছি। আহা কী সুন্দর জলের রং। নীলের আর সবুজের যে কতরকম। আর জল একেবারে স্বচ্ছ। সাদা বালি, নীল স্বচ্ছ জল আর ঢেউয়ের সাদা ফেনা, পাড়ের ঝকঝকে সবুজ আর লাল মিলে চোখ ফেরানো যায় না।

জেটিতে ফিরতেই পাওয়া গেল সকালের সেই ট্যাক্সিকে। কথা রাখতে জানা ভদ্রলোকের মতোই অপেক্ষা করছিল সে। প্রাঁলে এয়ারস্ট্রিপে জেটি থেকে যাওয়ার সময়ে ঋজুদা মাদার ব্লঁশের হোটেলে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে বলল, ট্যাক্সিতে বোস, আমি এক সেকেন্ড আসছি।

কিছুক্ষণ পরেই মাদাম ব্লঁশ আর ঋজুদা বেরিয়ে এলেন। ঋজুদার হাতে একটা খাম ছিল। উনি হাত নাড়লেন। আমরাও। তারপর ঋজুদা উঠতেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

আমরা যখন প্রাঁলে এয়ারস্ট্রিপ থেকে আইল্যান্ডার প্লেনে করে এসে মাহে এয়ারপোর্টে নামলাম, তখন নীল সমুদ্রকে সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়ে সূর্যটা পশ্চিমে ডুবে যাচ্ছে।

গতকাল দুপুরে এখানে পৌঁছে এয়ারপোর্টের কাছেই যে বাড়িতে আমরা প্রথম নেমেছিলাম কার্লোস আসার আগে, সেই বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ঋজুদা ভিতরে ঢুকে গেল। একটু পরেই একজন মোটাসোটা, বয়স্কা মহিলার সঙ্গে ঋজুদা বেরিয়ে এল। আসতে আসতে যে-খামটা মাদাম ব্লঁশের কাছ থেকে এনেছিল, তার ওপরেই কী যেন লিখল ঋজুদা। ট্যাক্সিতে উঠে ঋজুদা বলল, থ্যাঙ্ক উ্য মিসেস মেক্যাঞ্জি।

মেক্যাঞ্জি নাম শুনেই বুঝলাম, স্কটল্যান্ডের মানুষ। কোন দেশের মানুষ যে এখানে এসে থিতু হয়নি! কালো, সাদা, হলুদ সব রকমের মানুষই আছে, এখানের পাখি আর ফুলেরই মতো।

'বো ভাঁলো বে' হোটেলে ঢোকার আগেই ঋজুদা পথে নেমে গেল। বলল, তোরা চলে যা। নিজেদের ঘরের চাবি নিয়ে ঘরে যা। আমার চাবি তোরা নিবি না। আমি পৌঁছে তোদের আমার ঘরে ডেকে নেব। কথা আছে।

আমরা রাতেও কি তোমার ঘরেই ডিনার খাব?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

ওঃ। সত্যি ভটকাই!

ঋজুদা বলল। তারপর বলল, না। আজ আমরা ইন্ডিপেন্ডন্স অ্যাভেনুতে ওপেন-এয়ার রেস্তোরাঁ 'পাইরেট আর্মস'-এ ডিনার খাব। তবে তার অনেক দেরি আছে। তোর পেটে কি দানো ঢুকেছে? এত ক্ষিদে আসে কী করে!

ঋজুদাকে নামিয়ে দিয়ে আমরা চলে গেলাম। রিসেপশন থেকে আমাদের ঘরের চাবি নেওয়ার সময়ে কাউন্টারে একটি মেয়ে বলল, তোমরা কি মিস্টার বোসের পার্টির?

আমি বললাম, না না, আমরা কারও পার্টির নই। কিন্তু কেন?

একটা মেসেজ আছে ওঁর নামে।

তা হবে। ওঁকেই দেবেন।

উনি কোথায়?

তা আমরা কী করে জানব?

ঘরে ঢুকে, ভটকাই বেশ কিছুক্ষণ চিৎপটাং হয়ে খাটের ওপর শুয়ে থাকল। তারপর বলল, ওঃ। সারাটা দিন যা ধকল গেল না শরীরের উপরে। ঋজু বোস ছেলেমানুষ, বুড়োর কষ্ট কী বুঝবে! যাই চানটা করেই নিই, নইলে 'পাইরেট আর্মস'-এ ডিনারটা জমবে না।

আমি বিরক্ত হয়েই ছিলাম ওর ওপরে। কিছু না বলে, জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। সমুদ্র আর তটভূমি তো দেখা যায়ই এখান থেকে, হোটেলের এনট্রান্সটাও দেখা যায়। ঋজুদা বলছিল, আগের বার যখন এসেছিল একবার আফ্রিকা ফেরত, তখন গাড়ি খুব কমই ছিল। কিন্তু এখন গাড়ি অনেক। এনট্রান্সটা দেখা যায় বটে কিন্তু গাড়ি থেকে যেখানে মানুষে বিরাট লবির সামনে নামে,

সেখানটা দেখা যায় না। প্রকাণ্ড গোল ছাতার মতো ছাদ আছে প্রবেশদ্বারের ওপরে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য, যে-কোনও ফাইভস্টার হোটেলেই যেমন থাকে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ির আসা-যাওয়া দেখতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, ঋজুদা হেঁটে হেঁটে আসছে। কিন্তু গেটে না ঢুকে গেট পেরিয়ে আরও সামনে চলে গেল। সমুদ্রতটের পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে পিচ-বাঁধানো। অনেক নারী পুরুষই তখন চান করছেন, অথবা তটে শুয়ে-বসে আছেন। তটের পাশাপাশি পথ ধরে ঋজুদা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল। একটু পরে তাকে আর দেখা গেল না।

ভটকাইয়ের স্নান হয়ে গেল। কিছুই করার নেই। তাই আমিও চলে গেলাম।

বাথরুমে ঢুকে, শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম ঋজুদার সেই কথাটার মানে। সেই যে বোটে বলল না? 'কিছুই কি বোঝা যাচ্ছে না? ঈশ্বর মাথা দিয়েছেন, মাথাটা খাটা।'

'কী যে বোঝা যাচ্ছে না' তা মাথা অনেকক্ষণ শাওয়ারের ঠাণ্ডা জলের নীচে স্থির রেখেও বোঝা গেল না। কে জানে! আমার হয়তো মাথাই নেই। অথবা ভটকাই-এর সঙ্গদোষে, থেকেও কাজ করছে না।

এমন সময় ভটকাই দুমদাম করে দরজাতে ধাক্কা দিতে লাগল।

ছেলেটাকে নিয়ে, কেতাদুরস্ত জায়গাতে ওঠাই মুশকিল। ওইরকম শব্দ শুনে এক্ষুনি হয়তো সিকিউরিটির লোকেরা ছুটে আসবে ঘরে।

দরজাটা একটু ফাঁক করে বললাম, হলটা কী?

ও বলল, বস ইজ কলিং।

তাড়াতাড়ি গা-মাথা মুছে জামাকাপড় পরে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। তারপর ঋজুদার ঘরে গেলাম নিজেদের ঘর লক করে। যার যার পিস্তল, রিভলবার কোমরের হেলিস্টারে ঠিকই ছিল আর একটা করে গুলিভরা একস্ট্রা-ম্যাগাজিন জিনসের প্যান্টের হিপ পকেটে ঢুকে গেল।

বেল দিতেই ঋজুদা দরজা খুলল এসে।

বলল, বোস।

ঋজুদা মাদাম ব্লঁশের কাছ থেকে নিয়ে-আসা খামটা খুলে আমাদের একটা ফোটো দেখাল। একজন লম্বা ছিপছিপে সাহেবের ফোটো, মাদমোয়াজেল ব্লঁশের হোটেলের সামনে একটি অল্পবয়সী স্যেশেলোয়া মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে, তার কাঁধে হাত দিয়ে। একটি লাল গেঞ্জি এবং নীল জিনস পরে আছে মেয়েটি আর ওই সাহেব হলুদ গেঞ্জি আর বহুরঙা স্টাইপসের 'বারমুডা' পরে। পায়ে রাবারের চটি।

ভাল করে চিনে রাখ চেহারাটা। এই হচ্ছে পিয়ের। যেদিন ছবিটা তোলা, সেদিনই মেয়েটা প্রালেঁতে জলে ডুবে মারা যায়।

অ্যাকসিডেন্ট না মার্ডার?

কী করে বলব!

ফোটোটাকে ও বাঁ হাতে নিয়ে নিজের চোখ থেকে দূরে প্রসারিত করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ভটকাই বলল, লোকটাকে আমি দেখেছি ঋজুদা।

আমি আর ঋজুদা অবাক হয়ে ভটকাইয়ের দিকে চেয়ে থাকলাম।

ঋজুদা জেরা করল। বলল, কোথায় দেখেছিস?

প্লেনে।

কোন প্লেনে?

আরে, প্রাঁলে থেকে আমরা যে প্লেনে ফিরে আসি, সেই প্লেনে। একটা ছাই-রঙা স্যুট পরেছিল, তার সঙ্গে ক্যাটক্যাটে লাল টাই। ওই বিচ্ছিরি টাইটার জন্যই আমার নজর পড়ে ওর দিকে। লোকটার বাঁদিকের কব্জিতে একটা কিম্ভূতকিমাকার ঘড়ি ছিল। সেই ঘড়িটা দেখতে গিয়েই দেখতে পেলাম যে, তার বাঁ-হাতের কব্জিতে নীল-রঙা টাটু করা। কী সব সাপ-ব্যাঙ আঁকা। আর এই দ্যাখো, এই ফোটেতেও বাঁ-কব্জির টাটু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

প্লেনের কোথায় বসেছিল লোকটা?

আমাদের পেছনে। তাই তোমরা দেখনি।

তা, তুই দেখলি কী করে?

আমার চোখ আছে তাই। ও যখন প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছিল, তখনই ওকে লক্ষ করেছি।

ও কি আমাদের দেখছিল?

ঋজুদা সামান্য উদ্বিগ্ন গলায় বলল।

তা লক্ষ করিনি। তবে আমরা যেমন ওর ফোটো দেখছি, তখন ও-ও কিন্তু নারকেল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একটা ফোটো বের করে একবার ফোটোটার দিকে আর একবার তোমার দিকে দেখছিল।

ঠিক দেখেছিস?

আমি ঠিকই দেখি ঋজুদা।

হুঁ।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, তা হলে পিয়ের প্রালেঁতেই ছিল। বোটে করে ফিরে যায়নি সকালে। যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই।

কী ব্যাপার! খুলেই বলো না আমাদের।

গতরাতে মঁসিয়ে পঁপাদুকে আমি মরিশাস-এ ফোন করেছিলাম। তখনই ও জানাল যে প্লুজেঁ 'বো ভাঁলো বে' হোটেলে পৌঁছে গেছে জিনিভা থেকে তিনদিন আগেই। পিয়ের তো আগেই পৌঁছেছে।

আর কী বলল মঁসিয়ে পঁপাদু?

জিজ্ঞেস করল আগামীকালের প্রোগ্রাম কী?

তুমি কী বলেছিলে?

বলেছিলাম, প্রালেঁ যাব সকাল সকাল। মাদাম ব্লঁশের কথাও বললাম। কারণ, তিনি আমার বহুদিনের পরিচিত। আমি আর ওঁর স্বামী জাক ব্লঁশ আফ্রিকার অনেক জায়গাতে শিকার করেছি একসময়ে একসঙ্গে। তখনও ও স্পোর্টসম্যান ছিল পেশাদার শিকারি হয়নি। এও বলেছিলাম যে, মহিলার কাছে যাব খবরাখবরের জন্যে। গুপ্তধন তো প্রালেঁতেও পোঁতা থাকতে পারে! আমার তো ধারণা, হয় প্রালেঁ নয়, লা ডিগ্ আইল্যান্ডেই পোঁতা আছে। মাহেতেই থাকাটা আশ্চর্য নয়। সেভেন সিস্টার্স-এর কোনও আইল্যান্ডেও থাকতে পারে।

মঁসিয়ে পঁপাদু কী বলল তাতে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কিছুই বলল না।

ঋজুদা বলল।

তুমি কটা নাগাদ ফোন করেছিলে?

ছটা নাগাদ হবে। 'দ্য ইগলস্ রুস্ট' থেকে ওই হোটেলে পৌঁছবার পরেই।

প্রালেঁতে মাদাম ব্লঁশের হোটেলে পিয়ের কখন পৌঁছেছিল?

তোরাও তো ছিলি। শুনলি না! উনি তো বললেন যে, রাত দশটা নাগাদ।

মাহে থেকে, ফেরি বোট নয়, প্রাইভেট বোটে প্রালেঁ যেতে কতক্ষণ লাগে?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

নির্ভর করে, কীরকম বোট তার উপর। আমরা যে ইঞ্জিন লাগানো বোটে প্রালেঁর চারপাশে ঘুরলাম, অমন বোটে করে রাতে কেউই যায় না। বড় ও শক্তিশালী স্পিডবোট করে এলে ঘণ্টা তিনেক লাগার কথা।

তাহলে তোমার সঙ্গে মঁসিয়ে পঁপাদু যখন কথা বলল, সেই সময়ে পিয়ের যদি বেরিয়ে পড়ে থাকে, তবে তার পক্ষে রাত দশটাতে প্রালেঁর এই হোটেলে পৌঁছনো অসম্ভব নয়। তুমি কী বলো?

আমি বললাম।

নয়।

ঋজুদা বলল!

আমি বললাম, ভটকাই, তুই গোড়াতেই একটা গলদ করছিস। বেসিক ফ্যাক্ট সব গোলমাল হয়ে গেছে তোর।

দ্যাখ রুদ্র, গোয়েন্দাগিরিতে 'বেসিক ফ্যাক্ট' বলে কিছু নেই। 'স্ট্যাটিক ফ্যাক্ট'-ও নয়। এখানে সবকিছুই বদলে যেতে পারে। ইকনমিক্সে একটা কথা আছে। 'আনস্টেবল ইকুলিব্রায়াম'। শুনেছিস কি? এই ক্ষেত্রেও সবই 'আনস্টেবল'।

ভটকাই বলল, ইকনমিক্স-এর প্রফেসার-এরই মতো।

ঋজুদা ভটকাইয়ের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছিল। বলল, পিয়ের,

মাদমোয়াজেল প্লুজের লোক, পঁপাদুর লোক নয়। এটাকেই রুদ্র বলছে বেসিক ফ্যাক্ট। তুই বলতে চাস, ব্যাপারটা আনস্টেবল। এই তো?

হ্যাঁ।

ভটকাই বলল।

পুরো ব্যাপারটাকেই মিছিমিছি কমপ্লিকেটেড করছিস তুই ভটকাই।

ভটকাই বলল, তুমি কি মঁসিয়ে পঁপাদুকে প্রথমবারেই পেয়েছিলে? ফোনে?

না। যে নাম্বার পঁপাদু দিয়েছিল সেই নাম্বারে করাতে একটি মেয়ে বলল, উনি বাইরে গেছেন, ফিরলেই মেসেজ দেবে।

তারপরে পঁপাদুই তোমাকে রিং-ব্যাক করেছিল?

হ্যাঁ।

ঋজুদা বলল।

তুমিই ভেঁসার হোটেলের নাম্বার দিয়েছিলে ওঁকে?

হ্যাঁ।

যখন মরিশাস থেকে পঁপাদুর কলটা এসেছিল তখন কি হোটেলের অপারেটর কি তোমাকে বলেছিল যে, কলটা ওভারসিজ কল?

ভটকাই বলল।

না। তা বলেনি।

তবে? তুমি জানলে কী করে যে মরিশাস থেকেই পঁপাদু তোমাকে ফোন করেছিল?

না, তা জানি না কিন্তু সেইরকমই কথা। তারপর বলল, তুই কী বলতে চাইছিস?

পঁপাদু মাহেতেই আছে। সে তোমাকে মিথ্যে বলেছিল।

ভটকাই বলল।

আমি বললাম, কী যা তা বলছিস ভটকাই। গোয়েন্দা তুই, না ঋজুদা? তুই দেখি সর্বজ্ঞ হয়ে গেছিস।

আমি ভটকাইকে চোখ দিয়ে ইশারা করে সংযত হতে বললাম।

ঋজুদা একটুও না রেগে বলল, আই থিঙ্ক ভটকাই হ্যাজ আ পয়েন্ট রুদ্র। হি ইজ শেপিং ইনটু আ ফাইন ডিটেকটিভ। এবার থেকে ভাবছি, বনে-জঙ্গলে তোকে নেব আর শহরে ওকে।

আমি একটু অভিমানের সঙ্গে বললাম, ভালই তো।

ভটকাই বলল, তাই কি হয় ঋজুদা? রুদ্র আমাকে হাত ধরে নিয়ে এল তোমার কাছে আর ওকে ছাড়া কি আমি এক পাও যেতে পারি? উঁহু, পাদমেকং ন গচ্ছামি। সবে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

বাঃ। ফাইন।

বলল, ঋজুদা?

পরক্ষণেই ভটকাই আরেকটা বোমা ফাটাল। হঠাৎ বলল, মঁসিয়ে পঁপাদুকে আমি এখানেও দেখেছি।

ঋজুদা মুখ থেকে তাড়াতাড়ি পাইপ নামিয়ে বলল, কোথায় দেখেছিস?

এই হোটেলেই।

কীরকম?

আমার চোখ কপালে উঠে গেল।

মানে, স্পষ্ট দেখিনি। ও লবিতে আমার হাত দশেক আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল, তারপর বাঁ দিকের করিডরে ঘুরে গেল। আমি ছুটে গিয়েও আর দেখতে পেলাম না। ওখানে অনেকগুলো লিফট। আবার একটা থাই রেস্টুরেন্টে ঢোকারও দরজা আছে।

তারপরই ভটকাই ঋজুদাকে বলল, তোমাকে আমি দেখাচ্ছি কী করে সে হাঁটছিল।

বলেই, ভটকাই উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড়টা বাঁ দিকে একটু কাত করে শরীরটাও বাঁ দিকে হেলিয়ে দুটো পা অসমানভাবে ফেলতে ফেলতে ঋজুদার স্যুইটের ড্রইং রুমের কার্পেটের ওপরে হেঁটে দেখাল।

ঋজুদা বলল, সন্দেহ নেই যে, মঁসিয়ে পঁপাদুর হাঁটার ঋতি ঠিক এরকমই।

ঋতি? ঋতি কী?

আমি বললাম।

ভটকাই বলল, 'সবিনয় নিবেদন' পত্রোপন্যাসের নায়িকা। জানিস না?

'সবিনয় নিবেদন' আমি পড়িনি।

ভটকাই বলল, অন্যায় করেছ। কলকাতাতে ফিরেই পড়ে ফেলো।

ঋজুদা বলল, GAIT! তোরা এমনই সাহেব হয়েছিস রুদ্র যে, ইংরেজি শব্দ দিয়ে তোদের বাংলা শব্দের মানে বোঝাতে হয়। সত্যি!

তারপরই বলল, তুই ওর গ্যেইট কোথায় লক্ষ করলি ভটকাই?

কেন? তোমার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে যখন এসেছিল।

মানে? ফ্ল্যাটের মধ্যে ও আর কতটুকু হেঁটেছিল?

ওই লিফট পর্যন্ত তো হেঁটেছিল। তাতেই দেখে নিয়েছি।

তারপরে বলল, ঋজুদা, রুদ্র আমাকে যতই আওয়াজ দিক না কেন, তোমার কাছে আসার আগে, আমি শার্লক হোমস আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গুলে খেয়ে এসেছি।

হুঁ। তাই তো দেখছি।

হেসে বলল, ঋজুদা।

তারপরে বলল, থ্যাঙ্ক উ্য ভটকাই। এখন 'পাইরেট আর্মস'-এ ডিনার খেতে যাওয়ার আগে আমার কতগুলো কাজ করার আছে। সেগুলো যতক্ষণ করছি একটাও কথা বলবি না।

ঠিক আছে।

ঋজুদা ফোনটা তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করল। করে, ফোনের অ্যামপ্লিফায়ারের সুইচটা দিয়ে দিল যাতে কথোপকথন আমরাও শুনতে পারি।

ওদিক থেকে রিসিভার ওঠাতেই ঋজুদা বলল, শুভ ইভনিং মাদাম ব্লঁশ। আমি বোস বলছি। আপনি আজকে তো অবশ্যই, এবং এরপরেও কয়েকদিন রাতে হোটেলে থাকবেন না। আমার অনুরোধ। অন্য কোথাও চলেও যেতে পারেন, যদি পারেন। আফ্রিকাতে, জাক-এর কাছে।

ওপাশ থেকে উনি বললেন, কেন?

আপনার বিপদ হতে পারে। আপনি রাতে একেবারেই একা থাকেন, সব লোকজনই তো চলে যায়, তাই না?

তা যায়। কিন্তু প্রালেঁ বড় শান্তির জায়গা। এখানে কীসের ভয়?

পিয়ের ওই ম্যাপগুলো লোক পাঠিয়ে কি আপনার কাছ থেকে নিয়ে গেছে?

না তো। এখনও কেউ আসেনি।

মাদমোয়াজেল ব্লঁশ, দয়া করে শুনুন যা বলছি। পিয়ের আজ সকালে বোটে করে মাহেতে ফিরে যায়নি। সে প্রালেঁতেই ছিল। আপনাকে সে মিথ্যা কথা বলেছে। তাতেই আমার চিন্তা হচ্ছে। পিয়ের আজ আমাদের সঙ্গেই শেষ প্লেনে ফিরেছে। পরে যখন দেখা হবে তখন সব আপনাকে বুঝিয়ে বলব। অনেক কথাই বলার আছে। কিন্তু আমার একটা দায়িত্ব আছে, তাই অনুরোধ করছি আপনাকে। প্লিজ, অন্য কোনও বন্ধুর বাড়িতে, জেটির কাছে, বা অন্য কোনও হোটেলে গিয়েই থাকুন রাতটা, কটা রাত। আপনার হোটেলটা বড় নির্জন। যদি জাক-এর কাছে তানজানিয়াতে চলে যেতে পারেন তবে তো ভালই! এখান থেকে ডার-এস-সালাম হয়ে আরুশার ফ্লাইট তো রোজই আছে।

তা তো জানিই। নির্জনতা ভালবাসি বলেই তো প্রালেঁর এই নির্জনে জায়গা কিনে হোটেলটা বানাই। আমি কোথাওই যাব না।

আমার কথাটা আরেকবার ভেবে দেখবেন মাদাম ব্লঁশ। প্লিজ।

ওও! উ মাস্ট হ্যাভ গন ক্রেজি মিস্টার হ্যান্ডসাম। হু অন আর্থ উইল হার্ম মি? আই হ্যাভন্ট হার্মড এনি বডি। নো, নেভার।

কথাটা এত জোরে জোরেই বললেন যে, আমাদের কানেও ধাক্কা লাগল।

শেষে বললেন, নেভারদিলেস, থ্যাঙ্ক উ্য ভেরি ভেরি মাচ ঋজু, ফর দ্য কনসার্ন উ্য হ্যাভ শোন ফর মি। নাউ, গুড নাইট মিস্টার হ্যান্ডসাম। মে গড ব্লেস উ্য।

ঋজুদার মুখটা কালো হয়ে গেল।

বলল, ‘মে গড ব্লেস উ্য ট্যু।’

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে থাকলাম।

আমি বললাম, ব্যাপারটা কী?

ঋজুদা বলল, পরে বলব। বলেছি না এখন কথা না বলতে।

আমি অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেলাম।

তারপর ঋজুদা আর একটা নাম্বার ডায়াল করল।

হাই কার্লোস।

বলল, ঋজুদা।

কার্লোস বলল, ইয়েস মঁসিয়ে বোস। প্লিজ অর্ডার।

কাউকে এখানে পাঠিয়ে তুমি আর্মসগুলো ফেরত নিয়ে নাও।

সেকী! কেন? ইওর মিশান ইজ ডেঞ্জারাস। ওরকম পাগলামি কোরো না।

ঋজুদা বলল, না, না। আমার মনে হয় না এ সবের কোনও প্রয়োজন আছে। না, না বলেছি তো। বিপদের কিছুই এতে আমি দেখছি না। মিছিমিছি বিদেশ-বিভুঁইয়ে আনলাইসেন্সড পিস্তল-রিভলভার সঙ্গে রেখে কি মারা পড়ব নাকি। পুলিশে ধরলে কত বছরের জন্যে জেলে পুরে দেবে? আর না, না। বলছিই তো। কখন পাঠাবে তোমার লোক? না না, আমরা ডিনার খেতে যাব বাইরে...না, কোথায় যাব তা এখনও ঠিক করিনি...

তারপর বলল, তোমার লোককে চিনব কী করে?

কী করবে? তোমার ওই গাড়িটা নিয়েই আসবে, যে আসবে? ও। সে দেখতে কেমন? স্যেশোলোয়া? বেঁটে? মোটা? টাক আছে? ও কে। না, না আমার ঘরেই পাঠাবে। সব আমার কাছেই আছে।

বাইই। গুডনাইট।

ভটকাই বলল, ওর সেই গাড়ি মানে, সেই ভ্যানটা?

হ্যাঁ।

আমি বললাম, কী যে করছ ঋজুদা বুঝতে পারছি না। খালি হাতে ওই দোর্দণ্ড ক্ষমতাবানদের সঙ্গে আমরা লড়ব কী করে?

সব বোঝার দরকার নেই। নাইলনের কালো দাড়িগুলো এনেছিস তো? ফাঁসগুলো ঠিক মতো লাগানো আছে?

সব ঠিকঠাক।

ক্লোরোফর্মের শিশিগুলো?

আমি বললাম, তাও ঠিকঠাক।

ঠি। আ।

ভটকাই বলল। মানে, ঠিক আছে।

উত্তেজিত হলে, ও কোনও শব্দেরই শেষ অক্ষর উচ্চারণ করে না।

আমাদের হাতিয়ার হারানোর দুঃখটা সামলে নিয়ে ভটকাই বলল, খালি হাতে আবার কী? 'এসেছ ন্যাংটো, যাইবে ন্যাংটো মাঝখানে কেন গণ্ডগোল?'

ঋজুদা বলল, তোদের ব্যাগগুলো আমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে তোরা তোদের ঘরে গিয়ে বোস। কার্লোসের লোক চলে গেলে তোদের ডেকে নেব।

ঠি। আ।

বলে, ভটকাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঋজুদা আমার দিকে চেয়ে হাসল। বলল, ডাকামাত্রই ফিরে আসবি। জরুরি কথা আছে।

একা আসব?

না রে। যা দেখছি, তাতে এখন তো আর তাকে বাদ দেওয়া যাবে না। সেই তো নেতা হয়ে গেছে। নারে রুদ্র, ভটকাই অনেকই উন্নতি করেছে। ওকে আমাদের দলে রিক্রুট করার কৃতিত্ব কিন্তু সবটাই তোর।

আমার কী কৃতিত্ব। তোমার ট্রেইনিং পেয়েই তো হয়েছে। তা ছাড়া সত্যিই ও খুব বুদ্ধিমান। ভাল ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়ার সুযোগ পেলে ও আরও...

হাঃ। একটা পূর্ণ বাঁদর হত। খুব সম্ভবত... ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, যার ভাল হওয়ার সে নিজের গুণেই ভাল হয়, পারিবারিক পটভূমির, পরিবেশের, প্রতিবেশের এবং ঐতিহ্যের গুণে। স্কুলের গুণেই যদি সকলেই ভাল হয়ে যেত তবে ঘুষখোর, ঘুষের দালাল, কাট-মানি মাস্টার, ওষুধে আর খাবারে ভেজাল-দেওয়া ব্যবসায়ীদের ছেলেরা আর সব রাজনীতিকদের ছেলেরাই সমাজের মাথা হত। তা তো হয় না। হয় কি?

না, তা অবশ্য সব সময়ে হয় না।

সব সময়ে কী রে? খুব কম সময়েই হয়। বড়লোক হওয়াই তো মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় রে রুদ্র। ভটকাইয়ের মতো বাংলা-মিডিয়াম স্কুলে পড়া ভারতীয় ছেলেরা যদি 'মানুষ' হয়ে উঠতে পারে, তা হলেই জীবন সার্থক হবে। এই হতভাগা দেশেরও প্রকৃত উন্নতি হবে।

একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঋজুদা বলল, মীর-সাহেবের সেই একটা শায়েরি আছে না? "ইহাঁ আদম নেহি হ্যায়, সুরত এ আদম বহত হ্যায়'।"

মানে?

মানে, এখানে মানুষ নেই। মানুষের মতো দেখতে অনেক প্রাণী আছে।

ঋজুদার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে আমি চলে এলাম।

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বো ভাঁলো সমুদ্রতট আলোতে আলোময় হয়ে রয়েছে। সমুদ্রের হাওয়ায় গাছপালা উথাল-পাথাল করছে। কালো ছায়ার প্রবালের সাদা বালির ওপরে এক্কা-দোক্কা খেলছে। তটের ও পাশে তুঁতে-নীল সমুদ্রকে এখন কালো দেখাচ্ছে। আলোর বৃত্তর বাইরে অন্ধকারকে সবসময়েই ঘোরা বলে মনেই হয়।

পনেরো মিনিট পরে ফোনটা বাজল। ঋজুদার ফোন। বলল, আমি যাচ্ছি তোদের ঘরে।

আমি উঠে দরজা খুললাম। ঋজুদার ঘর আমাদের ঘর থেকে চার-পাঁচটা ঘর পরে। ঋজুদা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পরে বলল, হঠাৎ মনে হল, আমার ঘর বাগডও হতে পারে। তাই তোদের ঘরেই এলাম।

‘বাগড’ মানে?

ভটকাই বলল।

মানে। কথাবার্তা টেপ করার জন্যে, ফোনের কথাও টেপ করার জন্যে যন্ত্রপাতি রাখা থাকতে পারে।

আমি বললাম।

এত বড় হোটেল অ্যালাও করবে?

টাকা রে ভটকাই, টাকা। আগেকার দিনে গুণে আর স্বভাবে জগৎ বশ হত, এখন হয় টাকাতে। শুধুই টাকাতে।

তারপর বলল, ইংরেজি শব্দ যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। এখানে বাংলা বলনেওয়ালা কেউ আছে বলে তো মনে হয় না।

আ মরি বাংলা ভাষা!

ভটকাই বলল।

তুমি মাদাম ব্লশকে সাবধান করলে কেন?

আমরা দুজনে একই সঙ্গে বললাম।

ভদ্রমহিলাকে খুন করতে পারে।

কে?

পিয়ের।

কেন?

অকারণেই। সম্পূর্ণ মিছিমিছি।

তারপর ভটকাইকে বলল, কিছু বুঝলি ভটকাই?

না।

অ্যাস্টভ আইল্যান্ডে গুপ্তধন আদৌ পোঁতা নেই। মাদাম ব্লঁশ যা বলেছেন সবই আদ্যিকালের গপ্পো, লোকের এরকম ধারণা আগে ছিল। পিয়েরই আগের দিন মাদামকে এ সব গল্প আরেকদফা শুনিয়ে গেছে। মহিলা সরল, কিছুই বুঝতে পারেননি। আসলে, আমাদের সেখানে পাঠাতে পারলে ওদের কাজ হাসিল করতে সুবিধে হবে। আমার দৃঢ় ধারণা, মাহের দক্ষিণ দিকের প্রায় পরিত্যক্ত নির্জন তটে অথবা লা-ডিগ আইল্যান্ডে এমনকী প্রালেঁতেও গুপ্তধন থাকতে পারে। প্রালেঁতে সবসুদ্ধ আঠারোটি তটভূমি আছে, যার অনেকগুলিই পরিত্যক্ত। পিয়ের, আমাদের ভাঁওতা দেওয়ার জন্যেই গেছিল মহিলার হোটেলে। ও ভেবেছিল, ও খুব চালাক। সত্যিই যদি অ্যাস্টভ আইল্যান্ডেই গুপ্তধন পোঁতা থাকত, তা হলে সেই ম্যাপ সে অমনভাবে কাছা-খোলার মতো ফেলে যেত না। সম্পত্তিও তার বাবার নয়। অন্য মানুষদের। বাবার হলেও কেউ অমন করত না। আমি যে মঁসিয়ে ব্লঁশকে চিনি এবং ওদের ওখানে গতবারে এসে সাতদিন কাটিয়েও ছিলাম, তা ও জানে। মাদাম ব্লঁশ ম্যাপের কথা ও তার নির্দেশও আমাকে দিয়েছেন এ কথাও সে জেনে গেছে। তোরা তো শুনলিই মহিলা বললেন, ফোনে। এখন ও ভদ্রমহিলাকে

খুন করলে, ও নিশ্চিত হতে পারে যে, আমি অবশ্যই ভাবব যে, ম্যাপটা সত্যি। এবং গুপ্তধনও অ্যাস্টভ আইল্যান্ডেই আছে।

তোমাকে সে কথা বিশ্বাস করবার চেষ্টাতে ভদ্রমহিলাকে খুন করবে পিয়ের? বলো কী?

আমি বললাম।

আমার মনে হচ্ছে করবে এবং এই নাটকের যবনিকা এখনই টানা যেতে পারে, যদি আমরা পিয়ের অথবা যারা নিয়োগ করেছে তাদের, হাতেনাতে ধরতে পারি। তাতে মাদাম ব্লঁশের প্রাণটাও বাঁচবে এবং আমাদের কাজও হাসিল হবে।

কী করে?

পিয়ের বা তার অনুচরকে পুলিশ জেরা করলেই ওদের পেছনে কারা আছে তা বেরিয়ে পড়বে। বেরিয়ে পড়বে গুপ্তধনেরও হদিস। হয়তো।

কিছুই বুঝলাম না। আমি বললাম। আমরা তো জানি যে পিয়েরের পিছনে আছে জাকলিন প্লুজেঁ। তাঁর হয়েই কাজ করছে পিয়ের।

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে বলল, না। ভটকাই ঠিকই সন্দেহ করেছিল। জলদস্যু ইঁদুলের পুতি মঁসিয়ে পঁপাদু, ডাবল-ক্রশ করেছে আরেক ডাকাত দেনির পুতি মঁসিয়ে ব্লঁদাকে এবং ভিলেন বানিয়েছে ম্যাপের তৃতীয় টুকরো যার কাছে ছিল, সেই ফ্রেদরিকের বংশধর মাদমোয়াজেল জাকলিন প্লুজেঁকে। পিয়ের, মাদমোয়াজেল প্লুজেঁর নয়, মঁসিয়ে পঁপাদুরই লোক। প্লুজেঁর সঙ্গে ভেঁয়সার পুরনো ঝগড়াকে কাজে লাগিয়ে দুজনের কাছেই মিথ্যে বলে ও নিজেই মঁসিয়ে ব্লঁদা ও মাদমোয়াজেল ভেঁয়সাকে মিছিমিছি জড়িয়েছে এতে। ওঁদের কাছ থেকে আমাদের নাম করে মোটা টাকাও নিশ্চয়ই নিয়েছে। ওদের দুজনকে খুনও করতে পারে ও। প্লুজেঁকেও করতে পারে খুন। যাদের নিজেদের অর্থোপার্জনের যোগ্যতা নেই, অথচ টাকার প্রয়োজন এবং লোভ আছে প্রচণ্ড, তারা টাকার জন্য সব কিছুই করতে পারে। তাদের অসাধ্য কিছু নেই। আসলে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে গতরাতে আমি অনেকই চিন্তা করেছি। আমার ধারণা, গুপ্তধনের আসল ম্যাপটির সবচেয়ে জরুরি টুকরোটি ইঁদুলের লকারেই ছিল, মানে যিনি মঁসিয়ে পঁপাদুর পূর্বপুরুষ। প্লুজেঁ এবং ব্লদাঁকে ঠকাবার জন্যেই সে আমাদের কাছে এই সব গল্প বানিয়ে বলেছে। যাই হোক, আজ রাতেই আমরা সত্যি-মিথ্যা সবই জেনে যাব। 'পাইরেট আর্মস'-এ ডিনার খাওয়ার জন্যে আমি ওঁকে নেমন্তন্ন করেছি।

কাকে? পিয়েরকে না মঁসিয়ে পঁপাদুকে?

না রে। মাদমোয়াজেল প্লুজেঁকে। মিসেস মেক্যাঞ্জিকেও নেমন্তন্নও করেছি। প্লুঁজে এই হোটেলে আদৌ ওঠেননি। তবে এখানে এসেছেন ঠিকই। উঠেছেন এখানকার আর এক দারুণ হোটেল 'প্ল্যান্টেশন ক্লাব'-এ।

সে হোটেলটা কোথায়?

বো ভাঁলো বিচ-এই।

মাদমোয়াজেল প্লুজেঁর মতো অতি-ধনী মহিলা ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাভিনিউতে ওই সাধারণ ওপেন-এয়ার রেস্তোরাঁ পাইরেট আর্মস-এ আসবেন?

ভটকাই সন্দেহ প্রকাশ করে বলল।

ঋজুদা বলল, বুদ্ধিমতী বলেই আসবেন। পঁপাদু বা ব্লঁদা কেউই সন্দেহই করবে না যে মাদমোয়াজেল প্লুজেঁর মতন বহু লক্ষ কোটিপতি তরুণী ভাড়ার ট্যাক্সি করে ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাভিনিউর ওপরে ওইরকম একটা জনগণের রেস্তোরাঁতে গিয়ে ডিনার খাবেন।

তা মিসেস মেক্যাঞ্জিকে ডাকলে কেন?

ভটকাই বলল।

আছে, কারণ আছে। প্লুজেঁর কেনিয়া এবং তানজানিয়াতে যে ট্যুর অ্যান্ড সাফারি কোম্পানি আছে, তারই ম্যানেজার ছিলেন মিসেস মেক্যাঞ্জির স্বামী ডনাল্ড। তিনি মারা গেছেন দু-বছর আগে। আর মাদাম ব্লঁশের স্বামী জাক এখন ম্যানেজার ওই কোম্পানিরই। মাদমোয়াজেল প্লুজেঁ তো আমাকে চেনেন না। মাদাম ব্লঁশ এবং মিসেস মেক্যাঞ্জি তাঁদের স্বামীদের সূত্রেই আমাকে ভাল করে চেনেন। আমি তো একাধিকবার ওঁদের দুজনের কাছে থেকেও গেছি এখানে। এবং প্রালেঁতেও। প্রয়োজনে, মাদমোয়াজেল প্লুজেঁ মিসেস ব্লঁশের সঙ্গেও কথা বলে নেবেন আমাকে বিশ্বাস করার আগে। তা ছাড়া, আমরা তো ওঁর বন্ধুই। শত্রু তো নই। তবুও ওঁর যাতে কোনও সন্দেহই না হয়, তাই ওঁকে ডেকেছি।

আমি আর ভটকাই চুপ করে রইলাম।

প্ল্যানটা বুঝতে কি খুবই অসুবিধে হচ্ছে তোদের?

না, তা নয়। তবে এই প্ল্যান কি তুমি কলকাতাতে বসেই করেছিলে?

আমি বললাম।

নিশ্চয়ই। নইলে এত দূরের বিদেশি শহরে কেউ একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে আসতে রাজি হয়? এ তো আর আদিগন্ত বিশ্বটাঁড় জঙ্গুলে আফ্রিকা নয়। জঙ্গল আমার নিজের জায়গা। সে, যে জঙ্গলই হোক। মেক্যাঞ্জি এবং ব্লঁশ দুজনেই যে জ্যাকলিন প্লুজেঁর বাবার আমল থেকেই ওঁদের সঙ্গে যুক্ত তা তো আমি আগেই জানতাম। এবং খুব সম্ভবত মঁসিয়ে পঁপাদু সে খবর রাখত না। তাই সাহস পেয়েছিলাম এই গুরুদায়িত্ব নিতে। তবে মঁসিয়ে পঁপাদু যে ওদের ডাবল-ক্রস করবে, সেটা ভাবতে পারিনি। আর পিয়েরটা যে একটা দাগি খুনি, তাও নয়। এখন দেখা যাক।

মনে হয় মাদমোয়াজেল প্লুজেঁ বন্ধু হিসেবে অত্যন্তই ক্ষমতাবান হবেন।

ভটকাই বলল।

ওঁর মাধ্যমে স্থানীয় পুলিশের সাহায্যও পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি আসলে জাকলিন প্লুজেঁর শত্রু হিসেবে আসিনি। ওঁকেও আমি একবার তানজানিয়াতে দেখেছিলাম। নিজস্ব ছোট্ট প্লেন থেকে নেমে সেরেঙ্গেটিতে 'সেরোনারা লজে'র

দিকে যাচ্ছিলেন। একটি সাদা ভোক্সওয়াগন কম্বি গাড়ি করে। জাক তখন ওঁকে দেখিয়ে আমাকে বলেছিল, দ্যাখ ঋজু! উনিই আমার মালকিন। ওই পঁচিশ বছর বয়সী মেয়েটিই পৃথিবীব্যাপী এতবড় সাম্রাজ্যের মালিক। অথচ খুবই বিনয়ী, ভদ্র এবং বুদ্ধিমতী। তখনই ওঁর প্রতি এক বিশেষ দুর্বলতা জন্মে গেছিল আমার। এখানে আসার মূল উদ্দেশ্যই ছিল যে, ব্যাপারটা আমি মিটমাট করে দিতে পারব। মানে, আর্বিট্রেটররা যেমন করেন। যাতে, খুনোখুনি পর্যন্ত না গড়ায়। প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা এনে দেব। কিন্তু এসে দেখছি ইঁদুলের পৃতি এই মঁসিয়ে পঁপাদুই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। এবং এখন তো আমার মনে হচ্ছে যে আমাকে যা কিছু সে বলেছে, এ পর্যন্ত তার সবই বানানো। মঁসিয়ে ব্লঁদারও চেহারা পর্যন্ত দেখলাম না এখনও। সেও কিছু জানে কি না আদৌ কে জানে!

এখন কী করতে বলো আমাদের তুমি?

ভটকাই বলল।

দেখি, ডিনার খেতে গিয়ে জাকলিন প্লুজেঁকে বলে যদি একটা দ্রুতগামী বোট জোগাড় করতে পারি, তবে আমরা রাতারাতিই প্রালেঁতে পৌঁছে গিয়ে মাদাম ব্লঁশের হোটেলের তিন পাশে পাহারা দিতে পারি।

পিস্তল, রিভলভারগুলো তো সব ফেরত দিয়ে দিলে কার্লোসকে। তা পাহারাটা দেবে কী দিয়ে? শুধু হাতে?

ভটকাই বিরক্ত গলায় বলল।

তোর বুদ্ধি তো একটু আগে বেশ ছিল, এখন কমে গেল কেন?

ঋজুদা বলল।

মানে?

আমরা নিরস্ত্রীকরণ কেন করলাম নিজেদের? যাতে, পিয়ের এবং পঁপাদুও নিজেদের সশস্ত্র রাখার প্রয়োজন না বোধ করে। তা ছাড়া, আমরা যে কোনওরকম এনকাউন্টারেরই আশঙ্কা করছি না, সে কথাও ওদের কাছে স্পষ্ট হবে আমাদের ব্যবহারে। তাই, যদি ওদের সঙ্গে কোনওরকম লড়াইয়ে যেতেই হয়, তা হবে খুবই সামান্য। বুদ্ধিই আমাদের অস্ত্র। বুঝেছ?

বুঝেছি।

তেমন মনে করলে, জাকলিনকে বলব অস্ত্র জোগাড় করে দিতে। পঁপাদু যদি ওই সব দিতে পারে, তবে জাকলিন ইচ্ছে করলে জাহাজসুদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র দিতে পারে। তার অতখানি ক্ষমতা।

তা ঠিক।

আমরা দুজনেই বললাম। তবু আমার মনে হতে লাগল ঋজুদা বড় বেশি কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছে। এতগুলো 'যদি'র উপরে ভরসা করা কি ঠিক? কতগুলো যদি যে নদীতে যাবে তা আগে থাকতে কে বলতে পারে!

ঋজুদা নাকি সকলকেই বলে দিয়েছিল ট্যাক্সি নিয়ে আসতে এবং দামি গয়নাগাটি না পরতে। জাকলিন প্লুজেঁকে এমনিতেই অনেকেই চেনেন। তাই তাঁকে বিশেষ করে বলেছিল সাদামাঠা হয়ে যেতে। তবে তাঁকে চেনেন বড় বড় হোটেলে যাতায়াতকারীরা, 'পাইরেট আর্মস'-এর মতো সাধারণ জায়গাতে কারওই তাঁকে চেনার কথা নয়।

মিসেস মেক্যাঞ্জি আগেই পৌঁছে গেছিলেন। টেবিলও ওঁর নামেই বুক করা ছিল। বয়স্কা এবং মোটা হলেও মুখের মধ্যে এক ভারী আলগা সৌন্দর্য ছিল। ঠাকুমা-ঠাকুমা ভাব। আমরা তিনজনে যেতেই দাঁড়িয়ে উঠে উনি আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

ওপেন-এয়ার এবং খোলামেলা রেস্তোরাঁর এই সুবিধে যে, এখানে কারও কথা গোপন থাকে না বলেই কেউ কারও কথাকে গোপন ভাবেই না। যে সব ইটিং-হাউসের নাম খুব বেশি, দামি, হোটেলের মধ্যে বা অন্যত্রও, সেখানে রীতিনীতি মানা, খুব আস্তে কথা বলা, এসব জরুরি। পথের ওপরের খোলা রেস্তোরাঁর আবহাওয়াই আলাদা। তা দেখে এবং জেনে, ভটকাই-এর খুবই ফুর্তি হল।

এমন সময় দেখা গেল, একটি ফেডেড-জিনস আর হালকা নীল রঙা একটা হাত-কাটা সিল্কের গেঞ্জি পরে, সুন্দরী ছিপছিপে একটি মেয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল। তার পায়ে ছিল নীল-রঙা গল্ফ শু। তাঁকে দেখেই মিসেস মেক্যাঞ্জি দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলেন। মেয়েটির চুল ছেলেদের মতো ছোট করে কাটা। হাতে একটা হালকা নীলরঙা চামড়ার ব্যাগ।

মিসেস মেক্যাঞ্জি, তাঁর ফার্স্ট নাম হচ্ছে জাঁ, ঋজুদার সঙ্গে জাকলিনের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, মিট মিস্টার ঋজু বোস, ফ্রম কালকুত্তা, ইন্ডিয়া। মাই হাব্বি কলস হিম 'মিস্টার হ্যান্ডসাম'।

সার্টেনলি হি ই—জ হ্যান্ডসাম।

'ইজ' শব্দটির ওপরে বেশি জোর দিলেন জাকলিন।

ঋজুদা দাঁড়িয়ে উঠে ওঁর হাত ধরে হ্যান্ডশেক করল।

ঋজুদা বলল, হোয়াটস ইওর ড্রিঙ্ক?

আই ডোন্ট ড্রিঙ্ক, থ্যাঙ্ক উ্য।

মিসেস মেক্যাঞ্জি বললেন, মিস্টার হ্যান্ডসাম ইজ নট সাজেস্টিং দ্যাট উ্য হ্যাভ আ হার্ড ড্রিঙ্ক। হি ডাজ নট ড্রিঙ্ক আইদার। বাট আই অ্যাম কোয়াইট শ্যুওর দ্যাট উই উড লাইক টু স্প্লিট আ বটল অফ গুড ফ্রেঞ্চ হোয়াইট-ওয়াইন উইথ মি। মিঃ হ্যান্ডসাম ইজ দ্য হোস্ট।

জাকলিন বললেন, না, না সে কী! আমি তো হোস্টেস।

ঋজুদা হেসে বলল, ওয়েল ম্যাম, আই মে বী আ পুওর ইন্ডিয়ান বাট আই অ্যাম নট দ্যাট পুওর নট টু আফর্ড আ মিল ফর উ্য টু।

জাকলিন দুটি হাতে একটি শব্দহীন তালি বাজিয়ে বলল, ওয়েল, আই ন্যু সিন্স মাই চাইল্ডহুড দ্যাট 'হ্যান্ডসাম ইজ হোয়াট হ্যান্ডসাম ডাজ'। বাট, ইটস ওনলি অন দিস ইভিনিং দ্যাট আই রিয়্যালাইজ হাউ ট্রু ইজ দ্যাট প্রভার্ব।

তারপর হেসে বললেন, ওকে ফাইন। আই উইল শেয়ার আ বটল অফ হোয়াইট ওয়াইন উইথ মিসেস মেক্যাঞ্জি। বাট হাউ বাউট ড্য, মিস্টার বোস?

আই অ্যাম আ টিটোটালার লাইক ড্য।

সার্টেনলি নট টু-নাইট। ড্য মাস্ট কিপ আস কোম্পানি।

ঋজুদা আবার হাসল।

ভটকাই গলা নামিয়ে আমার কানে কানে বলল, ঋজুদার এই হাসি দেইখ্যা আমরাই মনে মনে প্রেমে পড়তাছি তো এই সুন্দরী কন্যা! কী কসরে তুই রোদদুর?

আমি আর কী বলি, গলা আরও নামিয়ে বললাম, ঠিকই কইছস তুই।

ঋজুদা হাসি থামিয়ে বলল, ওকে। প্রেটি ইজ হোয়াট প্রেটি ডাজ।

আমি ভেবে দেখলাম, আমার আর ভটকাইয়ের এবারে কেটে পড়াই ভাল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভটকাই হঠাৎই ঘোষণা করল, ঋজুদা আমরা হোটেলে যাচ্ছি।

সে কী? কেন?

হোটেলের খাওয়া এরচেয়ে অনেক ভাল হবে। তা ছাড়া এখানে তোমরা যা ইংরেজির তুবড়ি ফুটোচ্ছে, আমরা মন খুলে পেট পুরে খেতে পারব না।

তারপরই বলল, কিন্তু আমরা সাইন করলে হোটেলে খেতে দেবে তো?

নিশ্চয়ই।

জাকলিন বলল, হু আর দিজ ইয়াংস্টারস?

দে আর নট স্টারস জাকলিন। দে আর প্ল্যানেটস। আই অ্যাম আ টুইঙ্কলিং স্টার। গ্রেট গাইজ। দে হ্যাভ বিন উইথ মি ইন আলমোস্ট অল পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, টু শুট ম্যান ইটিং টাইগারস, টু সলভ মিসট্রিজ অফ থেফট অ্যান্ড ডেথ অ্যান্ড অলসো ট্যু হেল্প ড্য গেট দ্য ট্রেজারস।

জাকলিন দুটি মৃণাল-ভুজ ওপরে ছুঁড়ে বলল, ওঃ দ্যাটস স্প্লেনডিড।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ড্য। কিন্তু এবার আমরা হোটেলেই ফিরে যেতে চাই। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে।

আমরা চেয়ার ছেড়ে উঠতেই ওঁরা সকলেই চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

ভটকাই বলল, দ্যাখ, ভদ্রতা কাকে বলে দ্যাখ।

তুই দ্যাখ। কিন্তু মেয়েদের ওঠার নিয়ম নয়।

তাই?

হ্যাঁ। তোকে স্পেশ্যাল খাতির দেখাল।

ঋজুদা বলল, 'জিঞ্জার এল' একরকমের লেমনেড, আদার রস দিয়ে তৈরি। লালচে দেখতে। হোটেলে গিয়ে খাওয়ার আগে অবশ্যই অর্ডার করিস। আমি

এখানে অর্ডার ক্যানসেল করে দিচ্ছি।

ঠিক আছে।

আমি বললাম।

ভটকাই বলল, ঋজুদা শোনো। বলেই বলল, আরে এঁদের বসতে বলো না। এ কী!

ঋজুদা হেসে, ওঁদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, দে ফিল এমবারাসড। প্লিজ বি সিটেড।

ঋজুদা টেবিল ছেড়ে এগিয়ে এসে বলল, কী হল?

ভটকাই বলল, আমার কথাটা মনে আছে তো?

কোন কথা? ঋজুদা চিন্তিতমুখে বলল।

আঃ। সেই কথাটা—

ভটকাই বলল।

এবার ঋজুদা বিরক্ত গলাতে বলল, কোন কথাটা বলবি তো?

সেই বিয়ের কথাটা। করবে তো বিয়ে?

কাকে?

আকাশ থেকে পড়ে, বলল, ঋজুদা।

তুমি বড্ডই ভুলে যাও। মিস্টার হ্যান্ডসামের সঙ্গে মিস প্রেটির বিয়ে না হলে কার সঙ্গে হবে?

ঋজুদার দু'কান লজ্জাতে লাল হয়ে গেল। জাকলিন হয়তো শুনে থাকবে কথাটা।

ঋজুদা বলল, আমি যাওয়া অবধি জেগে থাকবি। কথা থাকবে। কাজও থাকতে পারে।

ঠি। ছে।

ভটকাই বলল।

হোটেলের রিসেপশনে ঢুকতেই দেখি মঁসিয়ে পঁপাদু সামনের সোফাতে বসে আছেন।

আমরা দুজনেই ওঁকে দেখে অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, মরিশাস থেকে কবে এলেন। উনি মিথ্যা কথা বললেন। বললেন, একটু আগে। আমাদের সঙ্গে ঋজুদাকে না-দেখে বিরক্ত মুখে আমাদের কাছে ডাকলেন হাতের ইশারা করে।

বিরক্ত মুখে বললেন, মঁসিয়ে বোস কোথায়?

ভটকাই সঙ্গে সঙ্গে বলল, মিসেস মেক্যাঞ্জির কাছে।

সেখান থেকেই তো আমি আসছি। উনি তো একা বেরিয়ে গেছেন প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে।

কে বলল?

কে আবার! তাঁর মেইড।

তাই?

অবাক হওয়ার ভান করলাম আমি।

তোমরা কোথা থেকে আসছ?

আমরা গেছিলাম পাইরেট আর্মস-এ ডিনার খেতে।

কেন এত ভাল হোটেলে না খেয়ে সেখানে কেন?

আপনার পয়সা বাঁচাতে। মঁসিয়ে বোস বললেন, আপনি মানুষ ভাল বলেই আপনার দিকটাও আমাদের দেখা উচিত।

পিয়েরের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে?

না তো। তিনি দেখতে কেমন? কিন্তু দেখা না হলেও তাঁকে খুঁজতে চারজন লোক গাড়ি করে সেখানে গেছিল।

সেখানে মানে?

মানে, 'পাইরেট আর্মস'-এ। লোকগুলোর সঙ্গে পিস্তল ছিল প্রত্যেকেরই। তারাই তো মঁসিয়ে বোসকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। হোটেলের মালিক পুলিশেও ফোন করেছেন। আপনি যান না, খুঁজে দেখুন মঁসিয়ে বোসকে। এদিকে আমাদের সব পিস্তল, রিভলভারগুলো মঁসিয়ে বোস কার্লোসকে ফেরত দিয়ে দিতে বলেছেন। ওগুলো সঙ্গে থাকলে কি আমাদের সামনে থেকে মঁসিয়ে বোসকে তুলে নিয়ে যেতে পারে?

তোমাদের মোবাইল ফোন কোথায়?

আমাদের এবং মঁসিয়ে বোসের মোবাইল ফোনও তারা কেড়ে নিয়েছে। আপনি এখন ফোন করলে ওই লোকগুলোই ধরবে। করে দেখুন না একবার।

ভটকাই চিন্তিত মুখে বলল, কী যে করি আমরা!

পঁপাদু বলল, জেন্টস রুমে চলো। বলেই, লবির জেন্টস টয়েলেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমরাও গেলাম পেছন পেছন। ভিতরে কেউ ছিল না। উনি কোমর থেকে একটা গুলিভরা মাউজার পিস্তল দিলেন আমাকে। আর একটা গুলিভরা ম্যাগাজিন। তারপর ভটকাইকে বললেন, আমার ঘরে চলো, তোমাকে একটা দেব।

তারপর একটু চুপ করে কী ভেবে নিয়ে বললেন, কিন্তু সে লোকগুলো কার লোক বলে ধারণা তোমাদের?

ভটকাই ফট করে বলল, পিয়েরের।

পঁপাদু আকাশ থেকে পড়ে বললেন, পিয়েরের? মাই গুডনেস। রাসকেলটা প্লুজেঁর দলে ভিড়ে গেছে।

তারপরই বললেন, তোমাদের মনে হওয়ার কারণ?

কী মনে হওয়ার?

ওই যে! ওরা পিয়েরের লোক?

আমি বললাম, পিয়ের কেমন দেখতে বলুন তো? ওদের মধ্যেই তো একজন ছিল যার নাম পিয়ের। সেই তো অন্যদের অর্ডার দিচ্ছিল। সেই লোকটা খুব লম্বা, রোগা, বাঁ হাতের কব্জির কাছে টাটু করা আছে সাপ-ব্যাঙের।

তাই নাকি? তা তারা কোনদিকে গেল?

গেল তো উল্টোদিকে। কিন্তু বলছিল তো যে ঋজু বোসকে খতম করে বো ভাঁলো বে হোটেলেই আসবে। আপনি যে এখানে আছেন তা কি ওরা জানে?

মঁসিয়ে পঁপাদুর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বললেন, চলো, তোমরা আমার ঘরে। তোমাদের ঘরের চাবিটাও নিয়ে নাও।

ঘরের দিকে যেতে যেতে নিজের মনেই বললেন, এই জন্যেই খারাপ চরিত্রের মানুষদের কখনও বিশ্বাস করতে নেই। এরা টাকার জন্যে কখন যে কাকে ডাবল-ক্রস করবে তার কোনও ঠিক নেই।

ভটকাই বিশুদ্ধ বাংলায় বলল, ওরে ধোওয়া তুলসী পাতা, তুই নিজে কী?

মঁসিয়ে পঁপাদু চমকে উঠে বললেন, হোয়াট?

ও বলল, ঠিকই বলেছেন আপনি।

আই সি।

মঁসিয়ে পঁপাদুকে খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছিল। ওঁর ঘরে ঢুকেই উনি ড্রয়ার খুলে দুটো বড়ি খেলেন। বললেন, আমি হাইপার-টেনশনের রোগী। তারপর সেই ড্রয়ার থেকেই একটি রুপোর-বাটের ছোট পিস্তল বের করে দিলেন গুলিভরা। সম্ভবত পয়েন্ট টু টু বোরের। গুলিভরা একটা ম্যাগাজিনও দিলেন। ভটকাই সসম্মানে বাও করে সেটা নিল।

তারপরই উনি খাটের ওপরে জুতোসুদ্ধ শুয়ে পড়ে টাইটা একটানে খুলে ফেলে দিলেন খাটের একপাশে। পরক্ষণেই উঠে, জল খেলেন জাগ থেকে সোজা। ঢকঢকিয়ে। তারপরই ফ্রিজ খুলে একটা লাল রঙের পানীয়ভর্তি বোতল বের করলেন। করে, বললেন, চলো এবার তোমাদের ঘরে।

আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে দরজা খুললাম। উনি ঘরে ঢুকেই জানালার পাশে রাখা রকিং-চেয়ারটাতে বসে বোতলটা খুলে ঢকঢক করে কিছুটা খেলেন, তারপর জানলার পর্দা সরিয়ে রাস্তার দিকে দেখতে লাগলেন। ওঁর মুখ আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

আমি ভটকাইয়ের বুদ্ধির তারিফ করার ভাষা খুঁজে পেলাম না কোনও।

ভটকাই বলল, আপনার কাছে একটা অটোমেটিক রাইফেল ছিল না? ইসরায়েলি উজি অথবা চাইনিজ এ কে ফর্টিসেভেন?

না, না। শুধু দুটোই ছিল। তোমাদের দিলাম। তোমরাই আমার বডিগার্ড। পিস্তল চালাতে জান তো?

আমি বললাম, চালিয়ে দেখাব?

আপনার হাতের বোতলটার গলাটা উড়িয়ে দেব?

বলেই, ভটকাই তার পিস্তলটা সেদিকে তাক করল।

উনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন। আরে! কর কী? কর কী?

আমি বললাম, আপনাকে প্লুজেঁর লোক বা পিয়ের মারতে যাবে কেন? ঋজুদাকেও কি ওরা মেরে ফেলবে?

না না, মঁসিয়ে বোসকে মারতে যাবে কেন? তবে তাকে কোথাও আটকে রাখবে বোধহয়, যতক্ষণ না তাদের কার্যসিদ্ধি হয়।

কার্যটা কী?

আমি বললাম।

কার্যটা...

না। তোমাদের না বলেও উপায় নেই।

কী?

ভটকাই বলল।

উনি ওঁর কোটের বুকপেকেট থেকে পলিথিনে মোড়া একটি ছোট জিনিস বের করলেন। বললেন, আমি যদি মরেও যাই, তবু প্লুজেঁকে আমি দেব না এটা।

মাদমোয়াজেল মারিয়েল ভৈঁয়সাকেও দেবেন না?

না না, সে কে? নেপো। মেয়েরা ওরকম চুলোচুলি করেই। করে মরুকগে তারা। বলেই আবারও খেলেন বোতল থেকে ঢকঢক করে।

আমি বললাম, জিনিসটা কী?

একটা ম্যাপের মাইক্রোফিল্ম।

কোন দ্বীপের?

আরিন্ডের। এখন সেখানে বার্ড স্যাংচুয়ারি। পাখি সে দ্বীপে চিরদিনই ছিল। অনেক ভেবেচিন্তেই ইঁদুল, ফ্রেদরিক আর দেনি ওই দ্বীপে গুপ্তধন পুঁতে রেখেছিল।

আপনার কাছে ম্যাপ আছে, তো এতদিন বসে রইলেন কেন? আমাদেরই বা মিথ্যে বললেন কেন? বলে, এই হয়রানি করালেন মিছিমিছি। এখন মিঃ বোস মানে মানে প্রাণ নিয়ে ফিরলে হয়।

ওই বার্ড স্যাংচুয়ারিতে লক্ষ কোটি ডলারের ট্রেজার থাকলেও প্রেসিডেন্ট রেনে ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেবেন না। ওই স্যাংচুয়ারির পাখি দেখতে এসে প্রতি বছর সারা পৃথিবীর ট্যুরিস্ট আর অরনিথলজিস্টরা কোটি কোটি ডলার দিয়ে যায় সরকারকে।

রেনে কে?

আরে! এই স্যেশেলস সোস্যালিস্ট-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

অরনিথলজিস্টটা কী জিনিস রে?

ভটকাই আমাকে জিজ্ঞেস করল।

পক্ষীবিশারদ।

ও।

মঁসিয়ে ঋজু বোসের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ফান্ডের জানাশোনা আছে, তিনি একজন পৃথিবীবিখ্যাত ন্যাচারালিস্ট, তাই ভেবেছিলাম, ওঁকে এরমধ্যে টেনে এনে কোনওক্রমে যদি পারমিশনটা বের করা যায়।

ওঁর কী ইন্টারেস্ট?

ওঁকে অর্ধেক দিয়ে দিতাম।

ভটকাই আবার বাংলাতে বলল, অর্ধেক রাজত্ব দিতে বৎস, রাজকন্যা কি দিতে পারতে? সে তো এদিকে স্বয়ম্বর হয়ে বসে আছে। লেহ লট্‌কা।

মঁসিয়ে পঁপাদু চেয়ারে উঠে বসে রেগে বললেন ভটকাইয়ের দিকে চেয়ে, ছোকরা বলছে কী?

যা বলছে, সে আর বলবেন না। মঁসিয়ে ঋজু বোস এত বড়লোক হয়ে গেলে ও হার্টফেল করে মরে যাবে আনন্দে।

আমি বললাম।

তোমরা কি ভাবছ ঋজু বোস ট্রিলিয়নীয়র হলে তোমাদের কিছু দেবে? সে আশা দুরাশা। টাকার আঠা বড় আঠা। একবার পকেটে ঢুকলে আর বেরোতে চায় না। আরে আমার যত অসুখ সব তো সেই জন্যেই। সে কথা ভেবে ভেবেই।

ভটকাই বলল, হক কথা কইছেন কর্তা! বিষয়ই হইতেছে বিষ। এক্কেরে বিষ। আর বিষয়ের আশা হইতেছে বিষফোঁড়া। আঙুল বুলাইলে, সুড়সুড়ি লাগে।

মাইক্রোফিল্মটাকে দেখিয়ে আমি বললাম, এইটার জন্যেই আপনার প্রাণ বিপন্ন বলছেন আপনি?

তা ছাড়া কী? এইটা তোমাদের জিম্মায় রাখো। এইটা বাঁচাতে যদি দশজনকে গুলি করতে হয় কোরো। তারপর তোমার বাবা তো...

ভটকাই বলল, আমাদের একমাত্র বাবা ঋজু বোস। মরে গেলে আমরা অনাথ হয়ে যাব। আমরা দেড় বছরের ছোট-বড়।

তারপরে বলল, আপনার কাছেও একটা অন্তত অস্ত্র থাকা দরকার। আপনার ঘরে কি আর কিছুই নেই?

ভটকাইটা মহা ধূর্ত। এমনি ভাবে জেনে নিচ্ছে পঁপাদুর শক্তি আছে কি নেই, আমাদের প্রতিরোধ করবার।

নেই রে বাবা। পিস্তল-ফিস্তল ছোঁড়া আমার আসে না। ও দিয়ে...

বলেই আবারও খেলেন ঢকঢকিয়ে। বোতল প্রায় শেষ।

আমি বললাম, ওটা কী খাচ্ছেন? আরেকটা আনাই? ওটা তো শেষ হয়ে গেল।

আনাও। তবে, এ ঘর থেকে নয়। হোটেলের লোক জেনে যাবে আমি এখানে আছি। ওরাও হয়তো জেনে যাবে।

ওরা মানে?

মানে, পিয়ের এবং...

না না, ও ঘর থেকেই অর্ডার করছি। চাবিটা দিন। আর ওই মাইক্রোফিল্মটা আপনার কাছে না-রাখাই ভাল। ওটাই তো খুঁজবে ওরা। আর যতক্ষণ না পাবে, আপনাকে মারবে না। কারণ, আপনি মরেই যদি যাবেন তা হলে গুপ্তধনের হদিস কে দেবে? তাই ওটা আমার কাছেই থাক। ওরা স্বপ্নেও ভাববে না যে, ওই অমূল্যরতন আপনি আমার মতো একজন ছোঁড়ার কাছে সাহস করে এবং বিশ্বাস করে রেখেছেন।

সেটা ঠিক। ছোঁড়ারা। তোমরা খুবই বুদ্ধিমান। ছেলের মতো ছেলে হয়েছে ঋজু বোস-এর।

Like father like sons।

বোতল থেকে নামটা দেখে, লিখে নিল ভটকাই। তারপর মঁসিয়ে পঁপাদুর ঘরের দিকে চলে গেল।

একটু পরে, ফোনটা বাজল।

মঁসিয়ে পঁপাদু ধরতে যেতেই আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম। বললাম, ওরা জেনে যাবে আপনি এখানে আছেন।

উনি বললেন, ঠিক বলেছ। ঠিক।

তারপরই বললেন, ওঃ পিয়ের! পিয়ের। তার এতক্ষণে প্রালেঁতে পৌঁছে যাওয়ার কথা, আর সে কি না প্লুজেঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে...

প্রালেঁতে কী?

সে একটা কাজ আছে। রাতেই সেরে ফিরে আসার কথা। অবশ্য যা ঘটে গেল, তারপর সেই কাজটা নিরর্থকই হত। নাঃ, সবই গোলমাল হয়ে গেল।

সে গেছে কীসে করে?

প্রাইভেট বোটে। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত একটা হবে। তারপরই বলল, আরে সে গেল আর কোথায়? সে তো মঁসিয়ে বোসকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। এখন ভয় হচ্ছে মঁসিয়ে বোসকেও না মেরে দেয়। যা ট্রিগার-হ্যাপি ও।

ও পাপ্পা। মাই পাপ্পা। বলে, আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

অভিনয় আর এ সব ফিচলেমি আমার আসে না। এ সব পারে ভটকাই। রিয়্যাল গ্রেট গাই। তবুও নিজের প্রতিভাতে নিজেই চমকে গেলাম।

ভটকাই একটু পরেই ফিরে এল বোতলটা নিয়ে। বলল, আপনার নামই সই করে দিয়েছি।

বেশ করেছ। মে গড ব্লেস উ্য।

বোতলটা পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢকঢক।

ভটকাই আমাকে বলল, বাবা আর মাকে খবর দিয়েছি।

কী করে?

কেন মো-ফো-তে।

বুঝলাম, মোবাইল ফোনের কথা বলছে।

বললাম, বাঃ।

কী বলছ তোমরা?

নাঃ, ভাইয়ের খিদে পেয়েছে তাই বলছে।

তা খাওনা তোমরা। অক্টোপাস আর কাঁকড়া খাও। এ হোটেলের খুব নাম আছে ওই দুই ডিশে।

আর আপনি?

আমি বিষ খাব।

আমি বললাম, অত কড়া জিনিস খাচ্ছেন একটু জল মিশিয়ে খেলে হত না।

নো। নেভার। জল আমি কখনও মেশাইনি। না দুধে, না হুইস্কিতে, না জীবনে। আমি নিট বেঁচেছি জীবনে। মরবও নিট। কেন যে মরতে বেশি লোভ করতে গেলাম।

ভটকাই বলল, ওরে নরাধম! ওরই জন্যে তো আমাগো শাস্ত্রে কইছে, লুভে পাপ, আর পাপে মৃত্যু। হঃ।

আমরা এয়ারপোর্টের ভিতরে অপেক্ষা করছি। প্লেনটা মরিশাস থেকে আসবে। এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেন। ফেরার পথে আবারও মরিশাস হয়ে যাবে। যখন আসি, তখন মুম্বই থেকে সোজাই মাহেতে এসেছিল।

কোনও কারণে প্লেনটা আজ দেরি করছে। তাতে আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। ভালই হয়েছে। এয়ারপোর্ট ফুল আর মালাতে ছেয়ে গেছে। অপেক্ষারত অন্য প্যাসেঞ্জারেরা ভাবছে হয়তো যে, আমরা কোনও রাজনৈতিক নেতা-টেতা।

ঋজুদা ভটকাই-এর মো-ফো পাবার পরই জাকলিন প্লুজেঁকে মাদাম ব্লাঁশের প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কার কথা বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে জাকলিন স্যেশেলসের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশকে মোবাইল ফোনে বলে দিয়েছিলেন। জেটিতে প্রালেঁর পুলিশ থাকবে প্লেইন ড্রেসে একটা প্রাইভেট গাড়িতে এবং পিয়ের পৌঁছনোর পর থেকেই তার উপরে নজর রাখবে। মাদাম ব্লাঁশের হোটেলের চারপাশে প্লেইন ড্রেসে পুলিশ থাকবে নারকেল বনে লুকিয়ে। অত রাতে পিয়ের মাদামের কম্পাউন্ডে ঢোকামাত্র তাকে ট্রেসপাসিং-এর অপরাধে গ্রেপ্তার করে মাহেতে নিয়ে আসবে এবং চার্জ যা দেওয়ার তা তো দেবেই মঁসিয়ে পঁপাদুর জবানবন্দি অনুযায়ী। সে জবানবন্দি পুলিশ নিয়েও এসেছে। মঁসিয়ে পঁপাদু পুলিশের গাড়িতে ওঠার আগে ঋজুদার মুখে থুথু ছিটিয়ে গেছেন 'ডাবলক্রসার' বলে।

ঋজুদা খুবই অপ্রস্তুতে পড়ে ছিল। তারপর হেসে বলেছিল, ইউ আর রং মঁসিয়ে। ইউ আর আ ডাবলক্রসার অ্যান্ড আই অ্যাম এ কোয়াড্রুপল ক্রসার। মঁসিয়ে ব্লদাঁ, এখন মার্সেইতে আছেন। জাকলিনের কাছ থেকে খবর পেয়ে

কজুদাকে একটি দশ হাজার ডলারের চেক পাঠিয়েছেন আর অনেক গোলাপ। ফ্রেঞ্চ গোলাপ।

জাকলিনের কাছ থেকে টাকা নেয়নি গজুদা। জাকলিন আমাদের সকলকে পুজোর সময়ে পনেরদিনের জন্যে জিনিভাতে নেমন্তন্ন করেছেন। সেখান থেকে কসমস কোম্পানির সবচেয়ে ভাল ট্যুর বুক করে পুরো ইউরোপ দেখিয়ে দেবেন আমাকে আর ভটকাইকে। তারপর বেলজিয়ামের অস্টেন্ড থেকে জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ইংল্যান্ডের ডোভার (সেই হোয়াইট রকস অফ ডোভারের বিখ্যাত ডোভার) হয়ে লন্ডন। সেখানে তিনদিন কাটিয়ে সেখান থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট ধরে সোজা কলকাতা। ভাবলেও রোমাঞ্চ হচ্ছে।

আজ সকালে জাকলিন একটা সাদা সিল্কের ড্রেস পরে এয়ারপোর্টে এসেছেন। রুবির মালা, রুবির ইয়ারটপ, রুবির ব্রেসলেট। পায়ে একটা লাল জুতো। ইঁরাজির গুষ্টির কি? মাথাতে লাল স্কার্ফ। হাতে লাল গোলাপের গুচ্ছ। গোলাপের গন্ধই ভাল, না জাকলিনের সারা শরীর থেকে যে পারফিউমের গন্ধ উঠছে তার গন্ধ ভাল, তা বুঝে উঠতে পারিনি আমি।

মঁসিয়ে পঁপাদু এবং পিয়েরকে অনেকই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। চিটিং, মাদাম ফ্লঁশকে পিয়েরকে দিয়ে খুন করবার চক্রান্ত, বিনা লাইসেন্সে অতগুলো পিস্তল, গুলি, ইনফ্রা-রেড দূরবীন রাখা। ইনফ্রা-রেড দূরবীন শুধু গোয়েন্দা, পুলিশ আর আর্মি রাখতে পারে। ব্যান্ড আইটেন, এ কে কর্তিসেভেন রাইফেলেরই মতো। সঙ্গে থাকলে বম্বের ফিল্মস্টার সঞ্জয় দত্তর মতো জেলে পচতে হবে।

ভটকাই বলছিল যে, সঞ্জয় দত্তর না হয় সুনীল দত্ত বাবা ছিল, মঁসিয়ে পঁপাদুর তো বাবা নেই।

কার্লোসকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মারিয়েল ভেঁয়সা এবং শাঁতাল এই সব চক্রান্তর কিছুমাত্র জানত না। ভেঁয়সা অনেক টাকা দিয়ে সত্যি সত্যিই পার্টনারশিপে ব্যবসা করবে ও গুপ্তধন পাওয়া গেলে তার ভাগ পাবে, এ জন্যই পঁপাদুর সঙ্গে একটি বোঝাপড়াতে এসেছিল। জাকলিনের সঙ্গে ওর কোনও ঝগড়া নেই বরং মস্কোর একটি স্কুলে একসময় ওরা দুজনে একসঙ্গে ব্যালে শিখত, তাই দুজনে দুজনকে চেনে এবং পছন্দও করে। পঁপাদু ঋজুদাকে ও সব মিথ্যে করে লাগিয়েছিল।

মিসেস মেক্যাঞ্জি একটি লাইলাক-রঙা ড্রেস পরে এসেছেন আর হলুদরঙা ড্রেস পরে এসেছেন মাদাম ফ্লঁশ, প্রার্লে থেকে। হাতে তাঁর অতি সুন্দর করে সাজানো একটি তোড়া। আর্মাডা-কিস্টিন-আলবো অর্কিডের। পাতাগুলো সাদা। মধ্যে লাল ফুটকি। আর ফুলটা লাল। নিশ্চয়ই ভিক্টোরিয়ার কোনও নামী ফুলের দোকান থেকে কিনেছেন।

সকলেই খুব খুশি। আমরাও। ঋজুদার উচিত ছিল জাকলিনের কাছ থেকে

মোটা ফিজ নেওয়া। কিন্তু কিছুই নেয়নি। কেন কে জানে! টাকার চেয়েও দামি হয়তো কিছু আছে, তাই নিয়েছে বদলে। অথবা নেবে। যে কথা ঋজুদা বলতে চায় না, সেই কথা স্যেশেলসের অতিকায় কচ্ছপের মুখেরই মতো সে নিজে বের না করলে কারোরই সাধ্য নেই যে, টেনে বের করে।

জাকলিন এবং ওঁরা প্রত্যেকেই 'মিস্টার হ্যান্ডসাম' এবং তার দুই আসলি চেলা আর চামুণ্ডাকে ক'দিন মাহেতে থেকে যেতে বলেছিলেন, বেড়িয়ে-টেড়িয়ে যেতে।

আমরা তো খুশিই হতাম। কিন্তু গতকাল সকালেই ঋজুদার সেক্রেটারি ই-মেইলে খবর পাঠিয়েছে যে দিল্লি থেকে ডি. জি. টাইগার প্রোজেক্টস লম্বা ফ্যাক্স পাঠিয়েছেন। কলকাতা থেকে চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেনও তিনবার ফোন করেছেন। খুবই নাকি জরুরি দরকার।

ঋজুদা বলেছে, নিশ্চয়ই কোনও সিরিয়াস ব্যাপার। দেরি করা চলবে না।

অতএব......

এবারের আসল হিরো তো ভটকাই। সকলেই তাকে আদর করছে আর সে লজ্জাতে লাল হয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলো সুইস-চকোলেটের বাক্স এবং নানা বিস্কিটের টিন আমরা উপহার পেয়েছি। এতই উপহার পেয়েছি যে, একস্ট্রা লাগেজ হয়ে গেছে। তবে, সে সবের দায়িত্ব নিয়েছেন জাকলিনের প্রাইভেট সেক্রেটারি।

সবই ভাল, ভটকাই শুধু আজ সকালে একটু কেলো করেছিল।

বলেছিল, কী টেনশান! কী টেনশান! স্যেশেলসে এসেও একদিন সুইমিং করতে পারলাম না।

তুই কি সাঁতার শিখেছিস? তোকে বলেছিলাম না যে আমার সঙ্গে আসতে হলে সাঁতার ইজ আ মাস্ট।

হেদোতে সাতদিন শিখেছিলাম তো। যে সাইকেল চালাতে জানে সে সাঁতারও জানে।

তার মানে?

তারপরই বলেছিল, ওই তো! জলের মধ্যে স্টিয়ারিং ঘোরানো আর পা দুটো ছোঁড়া। চলো চলো আজ একটু বো ভাঁলো সি বিচে সাঁতার কেটে যাই। স্যেশেলস-এর বো ভাঁলো সমুদ্রতটে এলাম অথচ সাঁতার কাটলাম না তা লোকে জানলে কী বলবে! ফিরে গিয়ে রক-এ বসে মিন্টে আর গদাদের চোখ কপালে তুলে দেব। ব্রেকফাস্টের আগে খিদেটাও চনমনে হবে। প্লেন তো প্রায় দুপুরে। চলো ঋজুদা, প্লিজ।

ঋজুদার মুড খুবই ভাল ছিল কাল রাত থেকেই। বলল, স্যুইম-স্যুট এনেছিস?

আমার তো নেই। তাতে কী? তোমার একটা পাজামা পরে নেব।

পাজামা পরে পারবি সাঁতার কাটতে?

হুঃ। তোমার মঁসিয়ে পঁপাদুকে বিনাযুদ্ধে শুধু মুখের কথাতে কাত করে দিলাম

আর শান্ত নীল সমুদ্রে প্রবালের বালির ওপরে সাঁতার কাটতে পারব না। এ তো সমুদ্র বলেই মনে হয় না। এ সব সাহেব-মেমদের পুরীতে আসতে বলো না। ঢেউয়ের রদ্দা খেয়ে হাড়গোড় ভেঙে যাবে। কায়দা সব বোঝা যাবে। আমি পুরীর চ্যাম্পিয়ন।

প্রায়ই যাস বুঝি?

না। একবার গিয়েছিলাম দেড়দিনের জন্যে। শোনো ঋজুদা। বেশিদিন থাকার দরকার হয় না। আমি মাহেতেই বা কদিন ছিলাম। রহস্য তো ভেদ করলাম! কী করিনি?

ঋজুদা বলল, একশোবার। তা হলে চলো সাঁতার কেটেই আসি। কী বলিস, রুদ্র?

আমারও স্যুইম-স্যুট ছিল না। তবে ছোট শর্টস ছিল। ঋজুদার একটা ফিকে কমলা রঙের স্যুইম-স্যুট ছিল। চেঞ্জ করে যখন সাদা সমুদ্রতটে সে দাঁড়াল না, নীল সমুদ্রের পটভূমিকাতে, তখন তাকে ওই পোশাকে দেখে আমরাই প্রেমে পড়ে গেলাম।

ভটকাই গলা নামিয়ে আমাকে বলল, 'হায় হায়! মাইয়া! তুমে এহনে কোথায় গ্যেলা গিয়া? একবার আইস্য দেইখ্যা যাও। মণি! দেইখ্যা যাও।

আমি বললাম, কার কথা বলছিস?

ইডিয়ট! আর কার কথা কম্যু? জাকলিন, জাকলিন। আমার এহনে জাকলিনময় ভুবন। আমার নূতন-বৌদি।

ঋজুদা ছ'ফিট এক ইঞ্চি লম্বা। সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্যে অতটা লম্বা দেখায় না। রোগাপটকা হলে তালধিড়িঙ্গি হয়ে যেত। ঋজুদার চোস্ত পাজামাও ভটকাইয়ের প্যাংলা শরীরে মেয়েদের সায়ার মতো ঢলঢল করছিল।

পারে দাঁড়িয়ে আমি মিচকি হাসি হাসতেই ও ডানহাতের দেড়খানা আঙুল তুলে বলল, পার্কালাম। পার্কালাম! অর্থাৎ, Wait and see! তামিলনাড়ুর কামরাজ নাদার স্টাইলে। তারপর, অতি সযত্নে পাজামার পা গুটোতে লাগল। গুটোতে গুটোতে দুটি পা-ই এমন উচ্চতাতে এল যে, মনে হতে লাগল ওটা পাজামা নয়, আমাদের পাড়ার ধুতি-পরে অফিস-যাওয়া ভবতারণবাবুর সাদা লং-ক্লথের আন্ডারওয়্যার।

ভটকাই অত্যন্ত স্মার্টলি একটা গান গাইতে গাইতে 'এই কুমির তোর হলে নেমেছি'! বলে ছেলেবেলাতে আমরা যেমন 'কুমির কুমির' খেলতাম, তেমনি করে জলে নামল। যে গানটা ও গাইছিল, সেটা একটা রবীন্দ্রসংগীত।

'ওগো জলের রানী,
ঢেউ দিয়ো না, দিয়ো না ঢেউ, দিয়ো না গো—
আমি যে ভয় মানি
ওগো জলের রানী।'

জলের মধ্যে ঋজুদা অনেক দূর চলে গেছে। আমি মাঝামাঝি জায়গাতে সাঁতার

কাটছি। কী একটা হাঙরের নাম বলেছিল ঋজুদা যেন! সে প্ল্যাঙ্কটন খায়। তা ভাল কথা! কিন্তু মুখ বদলাবার জন্যে হঠাৎ যদি আমার একটা পা খেতে ইচ্ছে হয়? যাই হোক। দারুণ লাগছে কিন্তু। মাথার ওপরে স্যুটি-টার্নরা ডাকাডাকি করছে। দূরের জেটিতে কোনও স্টিম-বোট ভোঁ দিল। ঝকঝক করছে রোদ্দুর। ধীরে বইছে সকালের শান্ত হাওয়া। ভারী চমৎকার লাগছে।

একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখি, ভটকাই নেই। নেই তো নেই। পরক্ষণেই মনে হল, কেন নেই? আড়াআড়ি তীরের দিকে সাঁতরে যেতে যেতে দেখলাম, ভটকাই একবার উঠছে আর একবার ডুবছে। তবে ভয়ের কিছু নেই, কারণ সেখানে জল এক কোমরও নয়। আমি ওর কাছে যেতেই ও চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি ওর হাত ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বালিতে টেনে তুলে ওর অবস্থা দেখে কাঁদব কী হেসে কুটিপাটি হতে লাগলাম।

ভটকাই, রণক্লান্ত, বিধ্বস্ত সৈনিকের মতো বালির ওপরে শুয়েছিল। সামনে পা ছড়িয়ে। আর তার পায়ের দৈর্ঘ্যের দেড়গুণ লম্বা ভেজা পাজামাটা নেতিয়ে লেপ্টে ছিল বালিতে। আসলে প্রথম ঢেউ লাগামাত্রই ভবতারণবাবুর অ্যামবিশাস আন্ডারওয়্যার লম্বা হতে আরম্ভ করেছিল। ঢেউয়ের আঘাতে ঋজুদার পাজামাও লম্বা হতে হতে যেই ভটকাইয়ের পা ছাড়িয়ে গেল, তখনি ভটকাই ধাঁই ধাঁই করে আছাড় খেতে লাগল। জলে দাঁড়িয়ে যতই আবার গোটাতে যায়, ততই আরও নেমে যায়। তারপরে ভিজে যাওয়াতে ভারী হয়ে গেল। আর গোটাতে গেলেই সেই পাজির-পাঝাড়া পঁপাদুর মন্ত্র-পড়া পাজামা আপত্তি করে সোজা হয়ে পড়ে যায়। এমনি করতে করতে পুরোটাই গেল খুলে। আর 'ধাঁই-ধপাধপ! ধাঁই-ধপাধপ! ধাঁই-ধপাধপ'!

আমি কাছে যেতেই, ভটকাই বলল, তোরা কি স্পোর্টসম্যান নাকি? সেমসাইড গোল দিস, সাবোটাজ করিস, কুনোই টিম স্পিরিট নাই তগো। যা, গিয়া বল তোর ঋজুদাকে। হঃ।

একসময়ে প্লেন এল। আমরা উঠলাম। অনেক হ্যান্ডশেক, অনেক হাত নাড়া এবং...।

ঋজুদা জাকলিন প্লুজেঁর দু-চোখে দুটো চুমু খেল।

ঋজুদার সবই অদ্ভুত। চুমু খাওয়ার এত জায়গা থাকতে চোখে আবার কেউ চুমু খায় নাকি? ভটকাই বলল।

সিঁড়ি দিয়ে আমরা যখন প্লেনে উঠছি, আমি পেছনে আর ভটকাই আগে আগে, ঋজুদা আমার পেছনে পেছনে, ভটকাই নিচুস্বরে গাইতে লাগল—

"চোখ গেল।
চোখ গেল।
চোখ গেল পাখি রে,

চোখ গেল পাখি।"

প্লেনটা টেক-অফফ করার পরেই আসবার সময়ে যে অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম, তেমন দৃশ্যই আবার ফুটে উঠল। নীল, সবুজ, সাদা, লাল, কালো, কতরকমের ছায়া যে জলে, আর কত রঙের যে পাহাড় আর জঙ্গল। মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, তোদের নিয়ে এখানে একবার শুধুই বেড়াতে আসব। আরিস্ড আইল্যান্ড যাওয়া হল না, যেখানে বার্ড স্যাংচুয়ারি, 'ভ্যালি দ্য মেইতে'ও যাওয়া হল না, মাহেতে বো ভাঁলোর একটি জায়গাতে, যেখানে গুপ্তধন খোঁজাখুঁজি করছে একটি কোম্পানি, সেই সব গুহা তোদের দেখানো হল না। খুব ভাল ক্রেওল খাবার পাওয়া যায় একটি ছোট্ট ঘরোয়া রেঁস্তোরাতে, নাম, 'মারি আঁতোয়ানেতে', সেখানে তোদের নিয়ে গিয়ে খাওয়ানো হল না। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া শহরটা কী সুন্দর যে দেখায়! রেঁস্তোরাটা একটা পাহাড়ের ওপরে। ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাভিনিউতে মস্ত বড় স্যুভেনির মার্কেট আছে, সেখানে নানা রঙবেরঙা শাঁখ, প্রবাল, নারকোলের তৈরি জিনিস, জামাকাপড় ইত্যাদি পাওয়া যায়। তোরা তো স্যুভেনির বলতে কিছুই নিতে পারলি না।

ভটকাই বলল, ধাঁই ধাঁই করে আছড়ে পড়ে সারা শরীর ছড়ে গেছে, আমার এই একমাত্র স্যুভেনির। আর কী! আর তোমরা কে কী নিলে তা তোমরাই জানো।

আমরা হেসে উঠলাম।

আমি বললাম, আরিস্ড আইল্যান্ডে গিয়ে সামুদ্রিক পাখি দেখা হল না, এইটাই সবচেয়ে দুঃখের।

ভটকাই বলল, মাদমোয়াজেল প্লুজেঁকে বলো যে এখানে একটা দ্বীপ কিনে নিতে। শুনলাম তো যে কত দ্বীপ আনচার্টেড আছে। মাহেতে হেলিকপ্টার থাকবে। নিজের দ্বীপে হেলিকপ্টার করে গিয়ে নেমে নিজের বাংলোতে জম্পেশ করে অক্টোপাস আর কাঁকড়া খাবে, চিংড়ি মাছের মালাইকারি।

শুধু কি তাই? আরও কত্ত মাছ পাওয়া যায় এখানে। ম্যাকারেল তো খেলিই প্রালেঁতে, তা ছাড়া আছে স্যামন, জব, টুনা এবং হাঙর। বুরজুয়া মাছ আছে। তা এখানের লোকে খুব তৃপ্তি করে খায়। বুর্জোয়ারা জানলে দুঃখ পেতে পারে।

প্লেনটা স্যেশেলস আইল্যান্ডসের দ্বীপমালার ওপরে রোদ-ঝকঝক দুপুরে একটা মস্ত বড় পাক মেরে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরেই মেঘের ওপরে উঠে যাবে, তখন মেঘের গালচের ওপর দিয়ে চলবে প্লেন, নীচের সুন্দর পৃথিবীর কিছুই দেখা যাবে না। যা দেখা যাবে, তাও চেনা যাবে না পরিচিত নদী বা পাহাড় বলে।

ভটকাই বলল, আরিস্ড দ্বীপে কী কী পাখি দেখা যায় ঋজুদা?

অনেক পাখি। ব্রাউন নডি-টার্ন তো দেখলিই, লেসার-নডিও দেখলি। স্যুটি-টার্ন দেখলি, সাদা-কালো।

স্যুটি বানান কী?

Sooty! ফেয়ারি-টার্ন বলে একরকম সুন্দর দুধসাদা উজ্জ্বল কালো চোখের টার্ন দেখা যায় এখানে, তবে স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জের মাঝামাঝি যে সব দ্বীপ আছে, সেখানেই শুধু দেখা যায় ওদের। জানিস তো, সুটি টার্ন-এর ডিম আবার সেশোলোয়াদের প্রিয় খাদ্য। ডিমের মধ্যে লাল ছিট ছিট থাকে। ফল-খাওয়া বাদুড়ও এদের প্রিয় খাদ্য।

এ মা! বাদুর!

ভটকাই মুখ ভ্যাটকাল।

হ্যাঁ রে! বাদুর, মেঠো ইঁদুর, বুনো শুয়োর, খরগোশ এ সবেরই মাংস তো খুবই ভাল। কম্যান্ডোদের এসবের মাংস খেতে শেখানো হয়। তারা তো মাটন বা চিকেন পায় না।

তাই?

হ্যাঁ।

পাখির মধ্যে আরও আছে—হোয়াইট-টেইলড ট্রপিক বার্ড। তাদের অবশ্য দেখা যায় আরিন্ড ছাড়াও কাজিন আইল্যান্ডে। ম্যাগপাই রবিন দেখা যেত কমবেশি সব গ্রানাইট দ্বীপেই। কিন্তু আজকাল প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটা ভ্যারাইটি দেখা যায় ফ্রিগেট আইল্যান্ডে। স্যেশেলসের আরেক রকম পাখি হচ্ছে নীল-পায়রা। তাদের ঝুঁটিটা আবার লাল আর বুকের কাছে সাদা চিহ্ন। ঘাড়ের কাছটাও সাদা অবশ্য।

তারপরে ঋজুদা বলল, এখানের এক রহস্যময় পাখির কথা যে নাবিকেরা প্রথম দিকে এইসব দ্বীপে নেমেছিল, তারা উল্লেখ করে গেছে।

কী পাখি?

নীল-মুরগি।

তাই?

হ্যাঁ। হয়তো কায়মা বা আমাদের কাম পাখি, যার ইংরেজি নাম Moor hen দেখেছিল।

কিন্তু Moor hen তো জলা জায়গাতে, বিলে থাকে, সমুদ্র পারের পাখি তো তারা নয়।

কে জানে! পক্ষীবিশারদেরাই বলতে পারবেন।

তুমি পক্ষীবিশারদ নও?

আমি কিছুই নই। আমি মিস্টার গুলেড়উ।

ঋজুদা বলল।

মানে!

মানে আবার কী, যে গুল মারে।

তুমি কি গুল-বাঘ?

ভটকাই বলল, হাসতে হাসতে।

তারপর ঋজুদা বলল, এ সব কথা থাক, এখন বল তো দেখি এ যাত্রায় তোদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা কী হল?

কী?

ভেবে বল।

অনেক ভেবেছি এ ক'দিন। আর ভাবতে পারছি না। ভেবে ভেবে মাথা জ্যাম হয়ে গেছে। তুমিই বলো।

মদের মতো খারাপ জিনিস নেই। দেখলি তো! মঁসিয়ে পঁপাদুর মতো ধূর্ত মানুষ মদের নেশাতে কীভাবে নিজের সর্বনাশ করল। জীবনে কখনও ও সব ছুঁবি না। বুঝেছিস।

হুঁ।

আমরা দুজনে একসঙ্গে বললাম।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি উদাস হয়ে গেলাম। ঋজুদা টয়লেটে গেল সিট-বেল্ট সাইন অফফ হয়ে যাওয়ার পরে।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আমি উদাস হয়ে গেলাম। ভটকাই আমাকে লক্ষ করছিল।

বলল, কী রে! রোদ্দুর! মন খারাপ করছে এমন একটা স্বপ্নের দেশের মতো জায়গা ভাল করে না-দেখেই চলে যেতে হচ্ছে বলে!

না রে। সে জন্যে নয়।

তবে?

ঋজুদা যদি সত্যিই বিয়ে করে জাকলিনকে, তবে আমাদের দল ভেঙে যাবে।

তাই মনে হয় তোর?

মনে হবে না? নাটকের দল, যাত্রার দল, মাছ-ধরার দল, পর্বতারোহীর দল, শিকারির দল, সবই ভেঙে যায় দলের অধিকারী যদি বিয়ে করে।

কী করবি বল? আমাদের তো এ বিষয়ে কোনও হাত নেই। তবে হলে খারাপই বা কী? আরে ভাবী হো তো অ্যায়সা।

তোর কিন্তু ইংরেজিটা ভাল করে শিখতে হবে।

আরে রাইখ্যা দে তোর ছাতার ইংরাজি। আমি ফ্রেঞ্চও শিইখ্যা ফেলাইমু অমন একখান বৌদি যদি পাই।

এমন সময় ঋজুদাকে আসতে দেখা গেল।

কী আলোচনা হচ্ছিল রে?

হাসি হাসি মুখে ঋজুদা বলল।

ভটকাই বলল, এই বলছিলাম তুমি অধিকারী আর আমরা অনধিকারী।

তার মানে?

মানে কিছু নয়। আমাদের লাঞ্চ দেবে তো ঋজুদা এখন? সকাল থেকে

হোটেলে এত লোক, এত ফুল, এত মালা একটু নিরিবিলিতে বসে যে ব্রেকফাস্টটা জমিয়ে খাব তার সুযোগ হল কই?

দেবে দেবে। এয়ারক্র্যাফট্-এর পাইলট, কো-পাইলট এবং স্টুয়ার্ডরা কি দেখেনি যে আমরা কেমন ভি আই পি? অর্ধেক ফুল তো এয়ার হোস্টেসদেরই দিয়ে দিলাম। স্যেশেলস-এর ফুল আর অর্কিডের কদরই আলাদা। যারা রসিক, তাদের কাছে। দেখিসই না! আমাদের স্পেশাল খাতির করবে।

ভটকাই বলল, দেখাই যাক।

ঋজুদার সঙ্গে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে গেছিস কখনও?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল আমাদের।

প্রতি সপ্তাহান্তে শনিবার রাতে ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে আমাদের যে জমায়েত হয়, সেই জমায়েত জমে উঠতেই।

তিতির বলল, যাইনি, তবে জায়গাটা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানি।

ভটকাই বলল, 'ভ্রমণ' পত্রিকাতে পড়েছি আমিও কৌশিক লাহিড়ীর লেখাতে।

তা পড়ে থাকতে পারিস, তবে আমিও জেনেছি অনেক কিছু ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ সম্বন্ধে একটি বই পড়েই, যেটি পড়লে মনে হবে তুমি নিজেই যেন চলে গেছ ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে।

কী বই?

ভটকাই প্রশ্ন করল।

'একটু উষ্ণতার জন্যে'।

তিতির বলল।

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ জায়গাটার কথাই যদি বলিস তো সেখানেও আমি বহুবার গেছি। তোদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হবার আগে, রুদ্র, ঋজুদার বই লিখে লিখে আমাকে বিখ্যাত করে দেবার অনেকই আগে, সেখানে আমারই একটা ছোট্ট কটেজ ছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে। এক স্কটসম্যানের কাছ থেকে কিনেছিলাম। তোদের ওই বইটাই, মানে, 'একটু উষ্ণতার জন্যে'ই ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ জায়গাটার সর্বনাশ করে দিয়েছে। তখন জায়গাটা যত নির্জন, যত সুন্দর, বাইরের জগতের কাছে যত অজানা ছিল, এখন সেটাই হয়ে উঠেছে একটা ট্যুরিস্ট স্পট।

তোমার যে ওখানে বাংলো ছিল, কই, আমাদের তো বলোনি কোনওদিন!

বলার অবকাশ বা প্রয়োজন হয়নি। কিছুদিন আগেও এক বাসন্তী পূর্ণিমাতে গেছিলাম।

বললে যে, বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছ?

তা তো দিয়েছিই। আমার বাড়িতে তো যাইনি। সোমনাথ আর শর্মিলার সঙ্গে

গেছিলাম। ওদের বাড়িতেই উঠেছিলাম।

আমার কটেজের নাম দিয়েছিলাম 'THE TOPPING HOUSE'। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের স্টেটস-এর আইডাহোর কেচাম-এ গভীর জঙ্গলের মধ্যে Snake River-এর পাশে তাঁর যে কটেজ ছিল, যেখানে তিনি আত্মহত্যা করেন, সেই বাড়িরই নাম ছিল 'THE TOPPING HOUSE'।

বাঃ। সেখানেই আমাদের একবার নিয়ে গেলে না!

কী করে নিয়ে যাব। তখন তো তোরা হামাগুড়ি দিচ্ছিস, নয়তো প্র্যাম-এ চড়ে বিকেলবেলা বেড়াতে যাচ্ছিস। সে কী আজকের কথা! তবে যাই হোক এবারে চল, দেখে আসবি। তিতিরও নিজের চোখে দেখে আসবে তার প্রিয় উপন্যাসের পটভূমি।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু সেখানে তোমার এই হঠাৎ-যাওয়ার কারণটা কী? এখনও তো তা বোঝা গেল না কিন্তু।

ভটকাই বলল।

আমরা প্রত্যেকেই ঋজুদার দিকে নীরবে চেয়ে থাকলাম।

আমাদের শব্দহীন সম্মিলিত কেন-র উত্তরেই যেন ঋজুদা বলে উঠল, স্টিভ এডওয়ার্ডস এই নিয়ে গত রাত অবধি পাঁচবার ফোন করল মেলবোর্ন থেকে আমাকে।

স্টিভ এডওয়ার্ডস কে?

ওঃ।

একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল, ঋজুদা।

তারপর বলল, বন্ধুই বলতে পারিস। জঙ্গলের বন্ধু। জেঠুমণির খুব প্রিয়পাত্র ছিল। ওর বাবাকেও চিনতেন জেঠুমণি। নীলগিরি পাহাড়ের এক কফি প্ল্যান্টেশনের মালিক ছিলেন স্টিভ-এর বাবা টমাস এডওয়ার্ড। এক সময়ে অনেক শিকার করেছি মহীশূরের নীলগিরি পাহাড়ে একসঙ্গে। স্টিভ সত্তরের দশকে অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে সেটল করেছে। বিয়েও করেছে সেখানেই। ওর স্ত্রী জুলিকে নিয়ে একবার এসেওছিল এ দেশে। আমার কাছেও ছিল তিনদিন। জুলিদের পরিবার কানাডাতে থিতু ছিল। ওর মা, বাবা, এবং দাদা সব কানাডাতেই ছিলেন। অবিবাহিত দাদা, মা-বাবার সঙ্গেই থাকতেন। জুলি, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি করতে এসে স্টিভ-এর 'প্রেম'-এ পড়ে। তারপরে বিয়ে। তারও পরে, থোড়-বড়ি-খাড়া—খাড়া-বড়ি-থোড়।

এবারে তোমাকে কেন ফোন করছে সেটা বলো। তুমি বড় OFF THE POINT কথা বলো আজকাল ঋজুদা। ঋজু বোসও কি বুড়ো হয়ে গেল?

ঋজুদার ওয়ান অ্যান্ড ওনলি লোকাল গার্জেন মিস্টার ভটকাই বকে দিল ঋজুদাকে।

মনে মনে আমরা যে অখুশি হলাম তা নয়।

ঋজুদা বলল, জুলির অবিবাহিত এবং সমবয়সী মামাতো দাদা টেড গিলিগানকে গুলি করে মারে তারই বন্ধু ম্যাক টেইলর। ওরা নর্থ কানাডাতে 'মুজ' শিকারে গেছিল।

'মুজ'টা কী জিনিস? মাউস-এর জাতভাই নাকি?

ভটকাই বলল।

আমি বললাম, একটু পড়াশুনো কর। পরীক্ষার নোটবই মুখস্থ করা ছাড়াও পড়ার যে অনেক কিছুই আছে তাতো জানিস না।

জিনিসটা কী? সোজা বাংলাতে বলো না, মাস্টারি না করে।

MOOSE হচ্ছে উত্তর আমেরিকা এবং কানাডারও একরকম বড় বড় শিংওয়ালা হরিণ, আমাদের সম্বরের মতো। বরফাবৃত এলাকাতে পাওয়া যায় তাদের। এক সময়ে, যখন শিকার বে-আইনি হয়ে যায়নি, MOOSE বহু কষ্ট সহ্য করেও শিকার করত শিকারিরা।

তিতির বলল, অ্যালগারনন ব্ল্যাকউড-এর লেখা মুজ শিকারের একটা রোমহর্ষক গল্প আছে।

ঠিক বলেছিস।

ঋজুদা বলল। দারুণ গল্প। আধিভৌতিক।

খুনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ওরা দুজনেই নাকি একই মেয়ের জন্যে পাগল ছিল। ডাকসাইটে সুন্দরী। কানাডার এক নম্বর মডেল ছিল সে। অথচ সেই মেয়ে, 'জেসমিন স্পিক', তাদের দুজনের কারোকেই ভালবাসত না। বাসত অন্য আরেকটি ছেলেকে। সে ছেলেটি খুব ভাল পিয়ানো বাজাত। জাতে ফরাসি ছিল। এবং থাকতও কানাডার মনট্রিয়ালে। যাকে প্রায় সব দিক দিয়েই প্যারিসই বলা যায়। যেখানে রাতও দিন। প্যারিসের ছোট বোনটি যেন মনট্রিয়াল।

ঋজুদা আমাদের টেনশানে রেখে কিছুক্ষণ পাইপ খেয়ে বলল, ম্যাক টেইলর, জুলির দাদা টেডকে খুন করে ফেরারি হয়ে যায়। কানাডিয়ান পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজেও তাকে ধরতে পারেনি। তাদের দৃঢ় ধারণা ম্যাক টেইলর কানাডা ছেড়ে স্থলপথে বা জলপথে খুন করার পরে-পরেই অন্য কোনও দেশে চলে গেছিল।

সে কী? আটকাতে পারল না তাকে কানাডার মতো দেশের পুলিশও?

না। পারেনি।

তারপর বলল, জুলির এক কানাডিয়ান বান্ধবী ছিল। তার নাম জিন। টরন্টোরই। তারা জুলিদেরই মতো কানাডার টরন্টোতেই থাকত। মাত্র মাসখানেক আগে জিন ক্লুজনার ভারতে এসেছিল ছুটি কাটাতে। কুন্নুরে স্টিভ-এর বন্ধুর কাছে। সেই বন্ধুর কুন্নুরে কফি প্ল্যান্টেশন ছিল। যাকে জিন দেখেছিল, সে নাকি হুবহু ম্যাক টেইলর-এর মতো দেখতে।

কোথায় দেখেছিল?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

দমদম এয়ারপোর্টে। জুলির বান্ধবী দিল্লি থেকে কলকাতাতে এসেছিল ইনল্যান্ড ফ্লাইট-এ। কলকাতায় এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বন্ধুর সঙ্গে তিন দিন কাটিয়ে তারপর বাঙ্গালোর-এর ডাইরেক্ট ফ্লাইট নিয়ে তার যাবার কথা ছিল কুন্নুরে।

ম্যাক টেইলর-এর মতো দেখতে লোকটি কোথা থেকে এসে কোথায় যাচ্ছিল?

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এর একটি হপিং ফ্লাইট আছে—রাঁচি, পাটনা হয়ে বেনারস যায়, তাতে করে। তাই তার রাঁচি যাবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তুমি তো সব গুবলেট করে দিলে। আমাদেরই না রাঁচি যেতে হয় মাথার চিকিৎসার জন্যে। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলো।

ভটকাই বলল, ঋজুদাকে।

লোকটি যে রাঁচিই যাচ্ছিল তার কোনও স্থিরতা ছিল না। ইট ওজ আ ওয়াইল্ড গেসস! পুরোটা শোনই আগে।

বলো।

আমরা সমস্বরে বললাম।

রাঁচি যাবার হয়তো কোনও স্থিরতা ছিল না, এমনকী লোকটি হয়তো ম্যাক টেইলরও নয়। হয়তো পুরোটাই জিন-এর ভুল। যাকে জিন-এর 'ম্যাক টেইলর' বলে মনে হয়েছিল, তাকে একটি কালো ছিপছিপে ভারতীয় এয়ার-হোস্টেস নাকি জিন-এর সামনেই বলেছিল, তুমি কি সোজা 'THE GUNGE'-এ যাচ্ছ রাঁচি হয়ে?'

তাতে কী প্রমাণিত হয়? এখনও আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এবারে তিতির বলল, ফৌজদারি আদালতের উকিলের জেরার মতো।

প্রমাণিত কিছুই হয় না। তবে তাতে এ কথা জিন-এর মনে হয়েছিল যে, ওই এয়ার-হোস্টেস 'THE GUNGE'-এরই বাসিন্দা। নইলে, সে জানবে কী করে যে, ডরোথি নামক এক মহিলার (ওই টেইলর সম্ভবত যার সঙ্গে থাকে অথবা বিয়ে করেছে) জ্বর হয়েছে এবং ডাক্তারেরা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া বলে সন্দেহ করছেন?

তিতির বলল, তাও না হয় বোঝা গেল কিন্তু 'THE GUNGE' মানেই 'একটু উষ্ণতার জন্যে'র ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ সেটা জানা যাচ্ছে কী করে! রবার্টগঞ্জ, ফ্রেজারগঞ্জ, হ্যামিলটনগঞ্জ, হান্টারগঞ্জ, আরও কত গঞ্জই তো আছে।

তা আছে। তবু রাঁচির কথাটা যখন জিন নিজ কানেই শুনেছে তখন রাঁচির কাছের 'THE GUNGE' ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ হতেও-বা পারে। জিন নিজে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের নামও শোনেনি। জিন-এর কাছ থেকে হোস্টেস আর লোকটির

কথোপকথন শুনেই জুলি আমাকে লেখে। আমিই তাকে বলি যে, রাঁচির কাছে যখন এবং সাহেব-সুবো যখন সেখানে থাকে, তখন ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জও হতে পারে। তা ছাড়া সেখানে আমার কটেজ ছিল এক সময়ে, তাই আমি জানি যে, স্থানীয় মানুষেরা ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জকে বোঝাতে 'THE GUNGE'-ই বলেন। যেমন, পাহাড়ের বাসিন্দারা দার্জিলিংকে বোঝাতে বলেন: 'ডার্জ'।

তুমি নিজে কি কখনও ম্যাককে দেখেছ? তোমাদের সঙ্গেও শিকার করেছে সে কখনও?

মানে, ম্যাক টেইলর?

না। তবে জুলি একটি ফোটো পাঠাচ্ছে আমাকে ক্যুরিয়ার-এ। আজ-কাল-এর মধ্যেই এসে যাবে। ম্যাক আর তার দাদা টেড-এর ছবিকে দু'টুকরো করে কেটে নেগেটিভ করে নিয়ে ম্যাক-এর ছবি এনলার্জ করে পাঠাচ্ছে।

মোটে এক কপি?

তাই তো পাঠাচ্ছে। জুলি তো আর জানে না যে আমার সৈন্যদল-এর প্রত্যেকের জন্যেও পাঠাতে হবে? ফোটোটা আসুক, এলে না হয় আমরাই কপি করে নেব। আজকাল তো কালার জেরক্স করা যায়। অসুবিধার কী? তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, জুলি তোদের কথা জানবেই বা কী করে!

আমি বললাম, যদি মনে করো ম্যাকক্লাস্কিতে যাবার পরে ফোটোর সঙ্গে ওই লোকটির, মানে, ম্যাক টেইলর-এর মিল খুঁজে পেলে, তা হলেই বা কী করবে?

শুধু মিল খুঁজে পেলেই হবে না। আরও নানা ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে যদি আমরা নিশ্চিত হই তবেই কানাডিয়ান পুলিশকে, মানে টরন্টোতে ফ্যাক্স বা ফোন করে দিতে হবে। তারপর যা করবার টরন্টোর পুলিশই করবে। জুলি ও স্টিভকেও জানিয়ে দেব। ওরাই বিহার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে। অত ভাবনা আমাদের এখন ভেবে কী হবে! আগে যাওয়াই তো যাক।

আমরা সমস্বরে বললাম, তা ঠিক।

ঋজুদা বলল, তোমাদের জানিয়ে রাখলাম। অ্যাডভান্স নোটিস। তবে তোমাদের সেখানে করার কিছুই নেই। তোমরা বেড়াবে, ট্রেকিং করবে, খাবে-দাবে, জায়গাটা ভাল করে ঘুরে দেখবে। আমিই যা করার করব। যদি তোমাদের সাহায্য লাগে, তবে যখন যেমন তখন তেমন জানাব। তবে রুদ্র, তোর পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে নিস।

তিতির বলল, ম্যাককে জিন কি ব্যক্তিগতভাবে জানত? নইলে তাকে দেখে চিনল কী করে!

না, চিনত না। মানে, পরিচিতি ছিল না, তবে চেহারাটা ভালভাবেই চিনত।

কী করে?

ম্যাককে জিন চিনত শুধু ফোটোরই মাধ্যমে। জুলিদের বাড়িতে ওর দাদা ও তার বন্ধুদের ফোটো ও অনেক ভিডিও দেখেছিল। ম্যাকও নিজে কিন্তু জুলিকে

কখনও দেখেনি। তাই তাকে দমদম এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখে জুলির সন্দেহ হওয়াতেই জুলি ম্যাক-এর কাছে গিয়ে বলেছিল, এক্সকিউজ মি। মে আই হ্যাভ আ লাইটার? আই হ্যাভ লস্ট মাইন।

লোকটি, যাকে জিন ম্যাক টেইলর বলে ভাবছিল, বলেছিল, সরি, আই ডোন্ট স্মোক। উ্য শুড্‌ন্‌ট স্মোক ইদার।

তারপরই জুলির বন্ধু গায়ে পড়ে বলেছিল, আই অ্যাম জিন স্যুইভার ফ্রম টরন্টো, কানাডা। হোয়্যার আর উ্য ফ্রম?

সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, ইট ওজ ভেরি নাইস টু হ্যাভ মেট উ্য, বলেই হ্যান্ডশেক করে ম্যাক বলেছিল, হোয়াট ব্রিংস উ্য হিয়ার।

আই হ্যাভ কাম অন আ হলিডে টু সি ইন্ডিয়া। হাউ বাউট উ্য?

আই অ্যাম অন আ হলিডে অ্যাজ ওয়েল। আই অ্যাম গোয়িং টু দার্জিলিং।

পরে আমিও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস এবং জেট এয়ারওয়েজ-এর টাইম-টেবল দেখেছি। দার্জিলিং মানে, বাগডোগরার ফ্লাইটের সময় এবং রাঁচির ফ্লাইটের ফ্লাইট সময় চেক করে, সময়ের অনেকই তফাত ছিল। তবে সেদিন কুয়াশার জন্যে জিন-এর ফ্লাইট দেরি করে আসে কলকাতাতে। যে সময়ে ম্যাক বাগডোগরার ফ্লাইট ধরার কথা বলেছিল, কুয়াশার কারণে হয়তো রাঁচি-বেনারস-পাটনার ফ্লাইটও সেদিন দেরিতে ছেড়েছিল। ম্যাক-এর কথাটা তাই মিথ্যে আবার নাও হতে পারে। হতেও পারে।

তারপর বলল, জুলির বন্ধু জিন প্রায় নিশ্চিত যে ওই লোকটিই ম্যাক টেইলর এবং সে তাকে মিথ্যে কথা বলেছে।

আমি বললাম, যদি ম্যাক টেইলর সত্যিই ভারতেই পালিয়ে এসে থাকে তা হলেও তার সঙ্গে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ-এর কী সম্পর্ক?

সম্পর্ক নেই। তবে পুরোটা শোনই না। তোরা অত অধৈর্য কেন? আমিও কমপক্ষে তোদের সমান বুদ্ধি ধরি। নয় কি? জিন-এর সঙ্গে যখন লোকটি, মানে, যাকে জিন, ম্যাক বলে সন্দেহ করছে, কথা বলছিল, সেই স্টুয়ার্ডেস যুবতী, যার গায়ের রং কালো, যে ছিপছিপে এবং যার পরনে স্টুয়ার্ডেস-এর পোশাক, সে ম্যাককে, থুড়ি, সেই লোকটিকে বলেছিল, 'আর উ্য গোয়িং স্ট্রেইট টু দ্যা গঞ্জ? ফ্লাইং টু রানচি বাই দিস ফ্লাইট?'

লোকটি উত্তরে বলেছিল, নোপ! আই অ্যাম গোয়িং টু ডার্জ।

ডার্জ?

অবাক হয়ে বলেছিল সেই স্টুয়ার্ডেস মেয়েটি।

তারপরই বলেছিল, বাট উ্য ওয়্যার সাপোজড টু বি ব্যাক ফ্রম ডেলহি টুডে। আই মাস্ট টেল উ্য। ডরোথি ইজ এক্সপেক্টিং উ্য ভেরি মাচ। বিসাইডস, শি ইজ ডাউন উইথ ম্যালেরিয়া। ডক্টর ইজ সাসপেক্টিং ইট টু বি ম্যালিগন্যান্ট। ওন্ট উ্য গেট ব্যাক স্ট্রেইট টু দ্যা গঞ্জ?

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাক সেই এয়ার হোস্টেসটিকে হাত ধরে জিন-এর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছিল।

তাড়াতাড়িতে জিনকে হাত তুলে আবারও বলেছিল, বাঈই। নাইস মিটিং উ্য।

তারপরেই বলেছিল, মে বি, সামডে আই উইল বি ইন কানাডা ফর হলিডেইং।

উ্য আর ওয়েলকাম।

জিন বলেছিল।

তারপরেই ঋজুদা উঠে পড়ে বলল, চল এবারে। পরে আবার এ সব কথা হবে। 'THE WALDORF'-এ টেবল বুক করা আছে। চাইনিজই খাবি বলেছিলি তো তোরা। এখন ওখানে CRAB FESTIVAL হচ্ছে। চল গিয়ে কাঁকড়ার বংশ ধ্বংস করি আমরা।

গদাধরদা বাড়ি যাওয়াতে আমাদের লস তো কিছু নেই। কী বলিস রে রুদ্র?

ভটকাই বলল।

তারপর বলল, এমন বৃষ্টি হচ্ছে রোজ। গদাধরদাই নেই। ভুনি-খিচুড়ি খাওয়াই হচ্ছে না আমাদের। খুব মিস করছি। কী বল?

আমি বললাম, তাই তো। তা আর বলতে!

গদাধরদার ছুটিটা আরও দিন পনেরো বাড়ানো যায় না ঋজুদা?

কেন?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

তা হলে একদিন তাজ বেঙ্গল, একদিন ওবেরয় গ্রান্ড, তার পরদিন পার্ক বা হিন্দুস্থান ইন্টার কন্টিনেন্টাল...

তিতির বলল।

ভটকাই গেয়ে উঠল, 'আহা! যদি জোটে রোজ এমনি বিনি পয়সার ভোজ।'

ভোরবেলা হাওড়া-হাটিয়া এক্সেপ্রেস করে রাঁচি স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে বেরিয়েই কারপার্ক-এ গাড়িটা খুঁজে পেলাম। একটা সাদা টাটা-সুমো। খাকি পোশাক পরা একজন স্মার্ট ড্রাইভার ঋজুদাকে দেখেই স্যালুট করে এগিয়ে এল।

ঋজুদা আমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, এই হচ্ছে কিষুণ, মোহন বিশ্বাসের পার্সোনাল ড্রাইভার।

মোহন কেইসা হ্যায় কিষুণ?

মজেমে হ্যায়, হুজৌর। আপ ঠিক হ্যায় না?

চলতা হ্যায়।

ভটকাই আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, চলতি ক্যা নাম গাড্ডি।

ছেলেটা বড় চ্যাংড়া। কোনও ক্লাস নেই। অথচ কী করি। আমিই তো খাল কেটে কুমির এনেছি। তাই, চুপ করেই রইলাম।

কিষুণ আমাদের প্রথমে স্টেশনের লাগোয়া সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়েজের হোটেলে নিয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, এই দ্যাখ বিখ্যাত বি এন আর হোটেল।

লেখা আছে এস ই আর, আর তুমি বলছ বি এন আর। কেন?

আগে তো তাই নাম ছিল। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে লিমিটেড। ব্রিটিশ আমলে আলাদা কোম্পানি ছিল এই নামে। আজকের এই ঘিঞ্জি রাঁচি শহরই আগে হলিডে-রিসর্ট ছিল। শীতকালে এবং বর্ষাকালে কলকাতা থেকে কত মানুষে শুধু ছুটি কাটানোর জন্যেই এখানে এসে থাকতেন। মেম-সাহেবরা পুশ-পুশে করে উঁচু-নিচু পথে বেড়িয়ে বেড়াতেন। বড় বড় টানা-রিকশও ছিল এখানে। নির্জন জায়গা তখন। বুড়ো-বুড়িরা, যুবক-যুবতীরা এই হোটেলের মধ্যের পথেই সকাল-সন্ধ্যা হেঁটে বেড়াতেন। খাওয়া-দাওয়াও তেমন ছিল। পুরীতেও ছিল এদের আরেকটা হোটেল। সেটারও খুব নাম ছিল। এখনও আছে হোটেলটা।

এস ই আর হোটেলের দুটি ঘরে আমরা প্রাতঃকৃত্য সেরে চান করে নিলাম। নিয়ে, ডাইনিং রুমে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে মোহন বিশ্বাসের পাঠানো এয়ার কন্ডিশনড টাটা-সুমোতে গিয়ে উঠলাম।

ঋজুদা স্বগতোক্তি করল। আমাদের দেশে সরকার যাহাই স্পর্শ করে তাহারই এমনি নগ্ন আর ভগ্ন দশা হয়। সে রাজ্য-সরকারই হোক, কি কেন্দ্রীয়-সরকার। কেউই কাজ করে না, কারণ কাজ না-করলেও চাকরি যায় না কারোই, প্রমোশনও পাওয়া যায়। তার ওপরে সোনায়-সোহাগা চুরি!

'প্রতিভা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই...'

ভটকাই বলল।

আমরা হেসে উঠলাম।

আজকাল ভটকাই সঙ্গে থাকলে কথাবার্তা যা হওয়ার তা ওর আর ঋজুদার মধ্যেই হয়। আমি আর তিতির শুধু শুনিই। আমরা, যাকে বলে 'গুড লিসনারস', বাধ্য হয়ে তাই হয়ে গেছি। এই জন্যেই করুণাসাগর বিদ্যাসাগর মশাই সারাজীবন পরের উপকার করার পরেও শেষ জীবনে বলেছিলেন, 'ভুলেও পরের ভাল কোরো না'। শেষ জীবনে এই তথাকথিত 'সমাজ'-এর ওপরে বিরক্ত হয়েই না তিনি সাঁওতালদের এক গ্রামে গিয়েছিলেন! ভটকাইকে দেখেই 'সমাজ'-এর চেহারা কীরকম হতে পারে তা যেন আমরাও একটু একটু বুঝতে শিখছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা জায়গাতে এসে পড়লাম আমরা। ডানদিকে একটি প্রকাণ্ড আমবাগান। মানে আম্রকুঞ্জ। যাকে বলে, ছায়া-সুনিবিড়।

দেখে, তিতির বলল, কী সুন্দর!

হ্যাঁ। ওই দ্যাখ রাতুর রাজার লাল-রঙা বাড়ি তারই পেছনে।

আমি বললাম, শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ এখন টেকো হয়ে গেছে, এবার থেকে 'বসন্তোৎসব' এখানে করলে মন্দ হয় না।

তিতির হেসে বলল, যা বলেছ রুদ্র।

রাতুর রাজার বাড়ি পেরিয়ে যেতেই আরও ফাঁকা হয়ে গেল পথ। নীল আকাশ লাল মাটি, সবুজ ধানক্ষেত, কালো কালো স্যাটেরাইট পাথরের স্তূপ, গাঢ় সবুজ শালবন। আফ্রিকাতে যে কালো পাথরের স্তূপ দেখেছিলাম তানজানিয়ার সেরেঙ্গেটিতে, আমি আর ঋজুদা, সেগুলো সব ব্যাসাল্ট-এর। আফ্রিকাতে পাথরের এইরকম স্তূপকে বলে 'কোপি'। ইংরেজি বানান 'KOPJE'। সিংহরা সূর্যাস্তবেলায় তার ওপর উঠে আড়মোড়া ভাঙে। গদ্দাম-গদ্দাম করে ডাক ছাড়ে। সিংহদের কথা যতই ভাবি, ততই দৃঢ়মূল হয় আমার ধারণা যে, সিংহগুলো যাচ্ছেতাই, ভীরু, কাপুরুষ। দল বেঁধে পেছন পেছন দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে একটি প্রাণীর ওপরে হামলে পড়ে তাকে মারে। তারপর কামড়া-কামড়ি করে খায়। পুরুষগুলোও পুরুষ নয়, স্ত্রী এবং একাধিক স্ত্রীর রোজগারে বসে বসে খায়। বাঘের মতো এমন মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন, একা, দার্শনিক, প্রকৃত-শিকারি প্রাণী পৃথিবীতে বিরল। আমাদের দেশের জঙ্গলের মধ্যে, দিনে কি রাতে, আলোছায়া যেমন রহস্য বোনে, আমাদের বাঘও সেই রহস্যের বাঘবন্দির কোর্টে সন্তর্পণে নিঃশব্দ থাবা ফেলে ফেলে কত দীর্ঘ সময়ের প্রতীক্ষা, তিতিক্ষা, চরম ধৈর্য দেখানোর পরে অনেকই বুদ্ধি খাটিয়ে একটি শিকার ধরে। একা বাঁচে, একা ভাবে। সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর প্রাণী। স্বাবলম্বন বাঘের কাছ থেকেই শিখতে হয়।

কতক্ষণ লাগবে?

তিতির বলল।

রাঁচি থেকে ঘণ্টা দেড়েক। সোজা লোহারডাগা-নেতারহাটের পথে বিজুপাড়া অবধি গিয়ে ডানদিকে ঘুরে যাব আমরা। তারপর চামাতে পৌঁছে বাঁদিকে ঘুরব ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের দিকে।

সোজা রাস্তাটা বিজুপাড়া থেকে ডানদিকে ঘুরে কোথায় গেছে?

খিলাড়ি। এ সি সি-র সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে। অনেক লাইম-স্টোন কোয়ারি কোম্পানিও আছে। বড় হাট বসে খিলাড়িতে। তবে আমরা তো খিলাড়ি যাব না। চামা নামের একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে বাঁয়ে ঘুরে যাব।

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে ট্রেনে করে আসা যায় না?

যাবে না কেন? গোমো থেকে যে লাইন পালামৌর মধ্যে দিয়ে উত্তরপ্রদেশের চৌপান অবধি চলে গেছে, সেই লাইনের ওপরই ছবির মতো ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ স্টেশন। আসলে, এই লাইন দিয়েই বিহার কোলফিল্ডস-এর কয়লা উত্তরভারতে যায়। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের বিশেষ কদর ছিল না এখানে। চৌপান এক্সপ্রেস, গোমো থেকে বারকাকানা হয়ে আসে। সেখানেই ট্রেন বদল হয়। ব্রেকফাস্টেরও সময় পাওয়া যায়। তবে ম্যাকক্লাস্কিতে কখন পৌঁছবে ট্রেন, তার কোনওই স্থিরতা নেই।

পথে খাবার-দাবারও বারকাকানার পরে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এমনকী চা-ও নয়। তবে এখন হয়তো পত্রাতুতে পাওয়া যায়।

কেন? ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জেই তো মিসেস কার্নির চা-সিঙাড়ার স্টল আছে না?

তিতির বলল।

মিসেস কার্নি গত হয়েছেন অনেকদিন। ভারী ভাল মহিলা ছিলেন। সদাহাস্যময়ী। ওঁর তো একটা গেস্ট হাউসও ছিল। এখনকার মিঃ ক্যামেরনের গেস্ট হাউস তো সেই পুরনো গেস্ট হাউসেরই হাতাতে।

তারপরই ঋজুদা হেসে বলল, ওঃ সরি। আমি তো ভুলেই গেছিলাম। এখানে 'একটু উষ্ণতার জন্যে' পড়া ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ—স্পেশালিস্ট আছেন একজন। তবে এ কথা ওই বইয়ে আছে কি না জানি না যে, চামা থেকে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের পথটি ছিল রাঙা মাটির তখন।

তিতির বলল, আছে।

এখন পিচের হয়ে গেছে সেই পথ। আর এখন দ্রুতগামী ট্রেনও হয়েছে এখানে আসার। শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস। তবে গভীর রাতে থামে। তাও এক মিনিটের জন্যে। তবে শুনতে পাই আজকাল নাকি আগে বলে রাখলে এখানে ট্যাক্সি বা কুলিও পাওয়া যায়। আমার বাংলো যখন ছিল, তখন সত্যিই গণ্ডগ্রাম ছিল জায়গাটা। ছিল বলেই, ভাল লাগত অত।

আমরা কোথায় উঠব?

সোমনাথ অনেক করে বলেছিল ওর বাড়িতে উঠতে। তবে এই সময়ে ওর মা-বাবারও আসার কথা। আমাদের আসা-যাওয়ার, খাওয়া-দাওয়ার তো ঠিক থাকবে না। তাই মিস্টার ক্যামেরনের গেস্ট হাউসেই উঠব। যদিও জায়গাটা স্টেশনের কাছে এবং একেবারে ফাঁকা নয়, তবে আমরা বাড়িতে আর কতটুকুই বা থাকব। তা ছাড়া, হোটেল বলে, খাওয়া-দাওয়ারও কোনও অসুবিধে হবে না। সঙ্গে কিষুণ তো থাকবেই। আমাদের শনিবার রাতে ট্রেনে তুলে দিয়ে ও ফিরে যাবে ডালটনগঞ্জ। নইলে ভাবছি, একটা কাজ করতে পারি। গাড়ি এখানে রেখে দিয়ে, ও ট্রেনে করে ডালটনগঞ্জে চলে যাবে। চারদিন ছুটি কাটিয়ে শনিবার দুপুরের গাড়িতে ফিরে আসবে। ট্রেন ধরতে আমাদের বেরতে বেরতে তো ছ'টা হবে বিকেলে। গাড়ি তো ভটকাই ছাড়া আমরা সকলেই চালাতে পারি।

এবার ভটকাইও শিখে নাও। ড্রাইভিং না জানলে খুবই অসুবিধে। আমি বললাম।

তোরা কেউ যা জানিস না আমি সেটাই শিখছি আগে।

কী সেটা?

রাইডিং।

কোথায়?

আমরা সমস্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

উলুবেড়েতে।

উলুবেড়েতে রাইডিং কোথায় শেখায়? সেখানে এখন মাঠই বা কোথায়? এ কি সত্যযুগ না কি?

মামাবাড়ির পাশে গঙ্গার ধারে ফুটবল খেলার মাঠে জুগনু ধোপার গাধাকে ফিট করেছি। অন্ধকার হয়ে গেলেই মাঠ ফাঁকা। তখন আমি গাধার দু-কান পাকড়ে বসে রাইডিং-প্র্যাকটিস করি। বড়মামিই দুটি করে টাকা দিয়ে দেন জুগনুকে।

আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম।

আমি বললাম, তাই তোকে কোনও রবিবারেই পাই না আজকাল।

তিতির বলল দেখো, কোনওদিন না গাধার সওয়ার-হওয়া অবস্থাতেই গঙ্গাতে পড়ে যাও। সাবধানে যা করার কোরো।

আমি বললাম, জীবনানন্দ দাশের কবিতার সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি আছে না?

কোন পঙ্‌ক্তি?

'অবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে।'

তিতির আর ঋজুদা খুব জোরে হেসে উঠল।

ভটকাই গম্ভীর মুখে বলল, রাইডিং ইজ রাইডিং। ঘোড়া-গাধাতে তফাত কী? আসল হচ্ছে রিদ্‌ম। রিদ্‌মটা আয়ত্ত করতে পারলেই হয়ে গেল।

ইস্, তুই ক'দিন আগে যদি আসতিস এখানে।

ঋজুদা বলল।

কেন?

ভটকাই একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।

মিস্টার ক্যামেরনেরই তো ঘোড়ার স্টার্ড-ফার্ম ছিল ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে। কত ঘোড়া ছিল! দিব্যি এখানেই শিখতে পারতিস।

এখন নেই?

না। এখন বন্ধ করে দিয়েছেন। অথবা ঘোড়াগুলো তুই আসবি জেনেই ভাগলবা হয়েছে হয়তো আগেভাগেই।

আমি বললাম, আচ্ছা ঋজুদা, শনিবারেই যে ফিরে যাবে, তা আগে থেকেই ঠিক করলে কী করে? কী করে জানলে যে, শনিবারের মধ্যেই কাজ হয়ে যাবে।

কাজটা তো কঠিন কিছুই নয়। বিপজ্জনকও নয়। হলে, চারদিনেই হবে। নইলে কোনওদিনও হবে না। তাই রিটার্ন-টিকিট কেটেই এসেছি। এইবার সওয়াল-জবাব বন্ধ করে ছিন-ছিনারি দ্যাখ। বর্ষাতে ম্যাকক্লাস্কির সৌন্দর্যই আলাদা। বিজুপাড়া থেকে গাড়ি ডানদিকে মোড় নিলেই দেখতে পাবি। জঙ্গল, নদী, সবুজ ক্ষেত, ঝাঁটি-জঙ্গল। তারপর চামার মোড় থেকে বাঁদিকে ঢুকে গেলে তো কথাই নেই। শুনেছি যে, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ নাকি এখনও সবুজ এবং আনস্পয়েল্ট আছে। বড় গাছ কাটা গেছে অনেক। তবে নতুন গাছ গজিয়েছেও। এখানে আসতে হয় দোলের

আগে। তখন লালে লাল হয়ে থাকে দশদিক।

এখানে অনেক কমিউনিস্ট আছে বুঝি?

ভটকাই বলল।

আমরা হেসে উঠলাম।

পলাশ, শিমুল, অশোক। এই সব গাছেদের রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা তো বলতে পারব না।

ঋজুদা বলল।

ভটকাই এবার গাধার পিঠে রাইডিং-প্র্যাকটিস করার চেয়েও বেশি লজ্জা পেল।

চামার মোড়ে পৌঁছবার আগেই বাঁদিকে একটা পাহাড় দেখিয়ে ঋজুদা বলল, ওটা দেখে রাখ। দেখছিস, চুড়োতে একটা নাকের মতো আছে। এর নাম, ম্যাকক্লাস্কি'জ নোজ, অর্থাৎ ম্যাকক্লাস্কির নাক।

জঙ্গল, বিজুপাড়ার পর থেকেই আছে। কিন্তু গাড়িটা চামার মোড় থেকে বাঁদিকে ঘুরতেই সত্যি আশ্চর্য সুন্দর জঙ্গল দু'দিকে। দু'দিকেই এত সুন্দর জঙ্গল আর উপত্যকা যে, চোখ ফেরানো যায় না।

এই হল ছোটানাগপুর প্ল্যাটো বা মালভূমি। রাঁচি, হাজারিবাগ, পালাম্যু—এই তিন জেলা ছিল আগে। এখন টুকরো টুকরো হয়ে জেলা বেড়ে গেছে। কোডারমা, যেমন আলাদা জেলা এখন। বর্ষাকালে সমুদ্রতীর অথবা এই ছোটনাগপুর মালভূমির তুলনা নেই। ভোর হতেই ট্রেন থেকেই দেখলি না দু'পাশের দৃশ্য?

সত্যি! দারুণ সুন্দর।

আমরা একই সঙ্গে বললাম।

এখন আর কী দেখছিস। জঙ্গল তো শেষই করে ফেলা হল। যেমন রাজা তেমন প্রজা। বিরিসা মুণ্ডার দেশের মুণ্ডাদের একটা গান আছে:

'ছোটা-নাগাপুরা হো ছোটানাগাপুরা।

সোনারূপান রূপালেকান ছোটানাগাপুরা হো ছোটানাগাপুরা।'

তিতির বলল, এই গানটার এবং মুণ্ডাদের আরও অনেক গানের কথা পড়েছি 'সাসানডিরি' নামের একটা বইয়ে।

"সাসানডিরি" শব্দের মানে জানিস?

জানি বইকী। 'সাসানডিরি' মানে, মুণ্ডা ভাষাতে, কবরস্থান। উপন্যাসটির শেষে একটি দারুণ দাবানলের বর্ণনা আছে। গায়ে কাঁটা দেয়। জঙ্গলের মধ্যে স্বপ্নে-পাওয়া সোনা আনতে গেছিল চাটান মুণ্ডা তার প্রেমিকা মুঙ্গরীর সঙ্গে। দু'জনেই ছাই হয়ে গেল। সেই সোনা পাহারা দিত এক সোনার সাপ।

মুণ্ডাদের মিথোলজিতে এই সব আছে বটে।

বিরিসা মুণ্ডা, উলগুলান, তাদের নানা প্রথা, তাদের গান, কত কী জেনেছি 'সাসানডিরি' পড়ে।

তারপরেই তিতির বলল, রুদ্র, তুমিও তো ঋজুদার সঙ্গে কম জঙ্গলে ঘুরলে না। তোমারও কিন্তু পড়াশুনো করে লেখা উচিত। শিক্ষিত আর অশিক্ষিতর মধ্যের বিভাজক হচ্ছে ঔৎসুক্য। যার ঔৎসুক্য নেই সে অশিক্ষিত। তোমার মতো এত জায়গা ঘোরার সুযোগ তো সকলের হয় না। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত তোমার।

ঠিকই বলেছ।

আমি বললাম।

সত্যিই ঠিক বলেছে তিতির। তা ছাড়া, তুই যদি তিতিরের প্রিয় 'সাসানডিরি'র লেখককে লিখে হারাতে পারিস, তা হলে আমার বিশেষ ভাল লাগবে।

সব বিষয়েই প্রতিযোগিতা কি ভাল? তুলনা?

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, গাধার সঙ্গে ঘোড়ার তুলনার কথা না তুলেই আমি বলব যে, প্রতিযোগিতা অবশ্যই ভাল। তুই জীবনে যা-কিছুই করিস না কেন, সে জিনিস তোর চেয়ে ভাল করে আর কেউই করতে যেন না-পারে, এই জেদ-এর জন্ম দিতে হবে। শুধু তোরই নয়, তোদের প্রত্যেকেরই ভিতরে। এক নম্বর হয়েই যদি না বাঁচতে পারলি, তবে জীবনে বেঁচে থেকে কী লাভ? জীবনের যে ক্ষেত্রেই যাবি, সেইখানেই এক নম্বর হতে হবে। তোদের প্রত্যেককে মানুষ হতে হবে। মানুষের চেহারার ডামি হয়ে থাকলেই চলবে না।

এবার আমি সুযোগ পেয়ে ভটকাইকে বললাম, 'প্রতিভা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই...'

ঋজুদা হঠাৎ বাঁদিকে তাকিয়ে কিষুণকে গাড়ি থামাতে বলল।

কী হল?

তিতির বলল।

নাম, নেমে, এখান থেকে নীচের উপত্যকাটা দ্যাখ আর দ্যাখ ম্যাকক্লাস্কি'জ নোজ। কত উঁচু দেখেছিস পাহাড়টা! আর একেবারে মানুষের নাকেরই মতো চুড়োটা, তাই না?

ঠিক।

কেউ উঠেছে ওই উঁচু পাহাড়ের চুড়োয়?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

জানি না। তবে পর্বতারোহী ছাড়া ওখানে ওঠা সম্ভব নয়। খালি হাতে যাওয়াটাও বিপজ্জনক। বাঘ, ভাল্লুক, সাপের আড্ডা ওই পাহাড়। এখন তো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করলেই জেল।

যা বলেছ। পশু-পাখি মারলেই নির্ঘাত জেল। মানুষ মেরে বুক ফুলিয়ে ঘুরতে পার, অথবা লুকিয়ে, যেমন ম্যাক টেইলর লুকিয়ে বাঁচছে। কোথায় সুদূর কানাডা আর কোথায় রাঁচি-পালাম্যুর জেলার বর্ডারের এই ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, এই দ্যাখ, আমলকী বন। চৈত্রর শেষে থোকা-থোকা আমলকী ঝুলে থাকে এই সব গাছের ডাল থেকে। গাছ থেকে পেড়ে খাবি, খেয়ে, এক গ্লাস জল খাবি, মনে হবে শরবত খাচ্ছিস। এমন মিষ্টি।

তারপর বলল, মন ভরেছে তো! এবার চল। চলো কিষুণ।

চালিয়ে হুজৌর।

'হুজৌর' শব্দটা দারুণ উচ্চারণ করে কিষুণ। কথাটা হুজুর নয়, হুজৌরই। বাঙালিরা খেজুড়ের মতো উচ্চারণ করে হুজৌরকে হুজুর বলে।

ভাবছিলাম, আমি।

হাতঘড়ি দেখে ঋজুদা বলল, আর পনেরো মিনিট। এসে গেলাম ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে।

'দ্য গঞ্জ' বলো। ভটকাই বলল।

আগেকার দিনে যখন নানা দেশি সাহেব আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ানে ভর্তি ছিল জায়গাটা, তারা গর্ব করে নবাগন্তুকদের বলত, 'ড্য নো, উই হ্যাভ দ্যা ওয়াটার অ্যান্ড দ্যা এয়ার ইন দ্যা গঞ্জ। উই ডোন্ট নিড এনিথিং এলস। ড্য ক্যান ওয়াক উইথ ইওর ব্যাক স্ট্রেইট, ইভিন হোয়েন ড্য আর নাইনটি এইট, ইফ ড্য লিভ হিয়ার। দিস ইজ দ্য ট্রেইট অফ দ্যা গঞ্জ।'

আমরা চুপ করে থাকলাম।

মিস্টার ক্যামেরনের গেস্ট হাউসটা স্টেশনের কাছেই। ট্রেনে যাঁরা আসবেন ম্যাকক্লাস্কি স্টেশনে তাঁদের খুব বেশিদূর আসতে হবে না। সামনে দিয়ে একটি পাহাড়ি নদী বয়ে গেছে। নদীটা ছোট্টই। তার পাশে উঁচু ডাঙার ওপরে গেস্ট হাউস।

টাটা সুমোটা গেট দিয়ে বাঁদিকে ঢুকল। দুটো মস্ত কৃষ্ণচূড়া গাছ। এক সারি ঘর। ডানলোপিলো আছে, গিজার আছে। সামনে টানা বারান্দা রাস্তার দিকে। সেই বারান্দাতে বসে থাকলেও বেশ সময় কেটে যায়। পথের একপাশে গেস্ট হাউস আর অন্য পাশে জঙ্গল। তার পরেই রেল লাইন। বাঁদিকে একটু গেলেই ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ স্টেশন।

মালপত্র নামিয়ে দিয়ে আমরা স্টেশনটি দেখতে গেলাম। স্টেশন দেখাও হবে, গাড়ির খোঁজও করা যাবে। কিষুণকে ছেড়ে দেওয়াই মনস্থ করেছে ঋজুদা। কিষুণ শনিবারই চলে আসবে দুপুরে। কোনও কারণে যদি আমরা যাওয়াটা পিছোই তবে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ স্টেশনের মাস্টারমশাইকে দিয়ে ডালটনগঞ্জে স্টেশনমাস্টারকে টক্কা-টরে টক্কা-টরে করে খবর দিয়ে দিলে উনি মোহন বিশ্বাসকে ফোন করে দেবেন কিষুণকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। ফোন পেয়েই মোহনবাবু কিষুণকে

পাঠিয়ে দেবেন।

রাঁচিতে এস ই আর হোটেলে ফোন করে টিকিটেরও বন্দোবস্ত করে দেবেন। নইলে ডালটনগঞ্জ থেকে শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস-এর টিকিটও করতে পারেন। অথবা রাঁচি থেকে প্লেনের টিকিট।

মানে? যদি ফিরে যাওয়ার দিন এগনো-পেছনো হয়। রিটার্ন টিকিট তো তুমি কেটেই এসেছ।

তিতির বলল।

ইয়েস।

ঋজুদা বলল।

মোহন বিশ্বাসকে সকলে 'দ্য প্রিন্স অফ পালামৌ' বলেন। পালামৌ জেলা তো বটেই, রাঁচি থেকে নিয়ে একদিকে নেতারহাট, অন্যদিকে চাইবাসা, আর একদিকে ডালটনগঞ্জ হয়ে ঔরঙ্গা রোড, রাংকা আর আরও অন্যদিকে চান্দোয়াটোড়ি হয়ে চাতরা অথবা বাঘরা মোড় হয়ে সীমারিয়া টুটিলাওয়া হয়ে হাজারিবাগ পর্যন্ত "প্রিন্স অফ পালামৌ"র রাজত্ব বিস্তৃত। এই পুরো এলাকাতেই His wish is a command to all.

প্লাটফর্মটি উঁচু নয়, মাটিরই সমতলে। রেল লাইনের ওদিকেও জঙ্গল। তারই ফাঁকফোকর দিয়ে দু-একটি বাড়ি চোখে পড়ছে।

তিতির বলল, এইরকম প্লাটফর্ম আমি জীবনে দেখিনি।

তোমার জীবনটা তো বেশি লম্বা হয়নি এখনও মা!

ভটকাই বলল তিতিরকে।

মিসেস কার্নির দোকানের সিঙাড়া খাবি তোরা?

ব্রেকফাস্ট তো খেয়েছি দু'ঘণ্টাও হয়নি।

তা হোক। মিসেস কার্নি তো মারা গেছেন আজ বহুদিন হল। ভারী ভাল ছিলেন মহিলা, শেষ জীবনে গরিব হয়ে গেছিলেন খুব কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞান একটু টলেনি। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সাহেবদের ভাল গুণ-এর অনেকই দেখেছি আমি, দোষেরই সঙ্গে। কিন্তু মিসেস কার্নি একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তোদের দুর্ভাগ্য যে, তোদের দেখাতে পারলাম না তাঁকে। এক একটা জায়গার সঙ্গে একেকজন মানুষের স্মৃতি এমন করে মিশে যায় যে, যাঁরাই তাঁকে চিনতেন, তাঁদেরই চোখে জায়গাটার চরিত্রই পাল্টে যায়, যদিও পথঘাট, পাহাড়-জঙ্গল বাড়ি-বাংলো সব একইরকম থাকে।

এই সিঙাড়া আমি খাব না, এ নির্ঘাত ট্রাকের পোড়া-মবিলে ভাজা।

এই সিঙাড়াই সকলে চাঁদমুখ করে খাচ্ছে দেখছিস না! এ সব খাস না বলেই তো তোদের ইম্যুনিটি কমে যায়। তোরা কি সব আমেরিকান হয়ে গেলি না কি? বাতিকগ্রস্ত! এটা খাব না ওটা খাব না, মিনারাল ওয়াটার ছাড়া খাব না। যত্ত সব!

বলল ঋজুদা।

তারপর বলল, তোরা ওই গাছতলার সিমেন্টের বেঞ্চটাতে বোস। আমি গিয়ে দেখি, একটু কথা-বার্তা বলি। ওইটাই তো এখন ম্যাকক্লাস্কির ক্লাব। গল্প-গাছা শুনেও আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

একটি মুসলমান লোক, মাঝবয়সী, দোকানের মালিক, মিসেস কার্নি নাকি তাকেই দিয়ে গেছেন দোকানটা। তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, মিসেস কার্নির ডানহাত। রুটির ফ্যাক্টরি ছিল। রুটি বানাতেন, কেক বানাতেন। ভারী মিষ্টি হাসি ছিল বুড়ির।

আমি বললাম, আমিও তোমার সঙ্গে যাই ঋজুদা ভিতরে?

চল। বলেই ভটকাইদের দিকে ফিরে বলল, তোরা ছিনছিনারি দ্যাখ। গরমাগরম ভেজে পাঠাচ্ছি সিঙাড়া। চা খাবি তো?

তিতির বলল, না।

ভটকাই বলল, ইয়েস।

ঋজুদার চেহারা গত পঁচিশ বছরে অনেকই পাল্টে গেছে যদিও তবুও মালিক তাঁকে চিনতে পেরে সেলাম করল।

ম্যায় তো বিলকুল বুঢ্ঢা বন চুকে হ্যায়, তুম পহচানে কেইসে হানে?...

ম্যায়ভি তো খুদই বুঢ্ঢা বন গ্যায়ে সাহাব। আপকী ক্যা কসুর?

ইয়ে বাত তো সাহি হ্যায়।

তারপর ঋজুদা আমার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, এ মাজিদ। আর এ হল রুদ্র রায়, রাইটার।

তারপর বলল, ম্যাকক্লাস্কির চেহারা তো অনেকই পাল্টে গেছে। পুরনোদের মধ্যে কারা কারা আছেন আর নতুন এলেন কারা কারা?

পুরনো সাহেবদের মধ্যে অর্ধেক মরে গেছে আর অর্ধেক অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। হলাণ্ডুয়া সাহেবকে মনে আছে? আপনার বাড়ির উল্টোদিকে, নালার পাশে ঝুপড়ি মতো জায়গাতে যে বাড়ি...

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে থাকবে না! অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন বলতেন। তখনই তাঁর আশি বছর বয়স ছিল। বুড়ি ছিল পোলিশ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হলাণ্ডুয়া, সাহেবের নাম ছিল?

ঋজুদা হেসে বলল, নারে। নাম ছিল হল্যান্ড। এরা ডাকত হল্যাণ্ডুয়া বলে। প্যাট গ্লাসকিনকে ডাকত, স্যাংড়া সাসকিন। ব্রিগেডিয়ার স্টিভেন্সকে ডাকত, বিগাড়িও সাহাব বলে।

আমি হেসে বললাম, তাই?

ঋজুদা জিজ্ঞাসা করল মাজিদকে, কী ভাল হবে এখন?

আলুর চপ খান সাহাব। একেবারে গরম গরম ভেজেছি।

বেশ তাই দাও। আর বাইরে দু প্লেট পাঠাও। একজন চা খাবে। দুধ চিনির ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে নিও।

ঠিক আছে।

তারপর মি. হল্যান্ডের সম্বন্ধে কী যেন বলছিলে তুমি? হল্যান্ডুয়া আর বুড়ি দু'জনেই মরে গেল ছ'মাসের মধ্যে। তাদেরই এক ভাতিজা এসেছেন দেশ থেকে। বেশ পয়সাওয়ালা লোক। বুর্থস ফার্ম-এর দিকে একটা ছোট বাড়ি কিনে থাকে। খেতি-জমি করে। কিংসসাহেবের ছোট শালী, যিনি হান্টারগঞ্জে থাকতেন, তাঁকে বিয়ে করছেন। নিজেদের ছেলেমেয়ে নেই।

পোষা মুরগিরা ডিম পাড়ে প্রচুর। আমি তো ওঁর কাছ থেকেই ডিম কিনি।

কী মুরগি?

রোড আইল্যান্ড, লেগ-হর্ন। বড়কা বড়কা ডিম হয়। সাহেবদের কাছে মুরগিও বিক্রি করেন। এখন যাঁরা থাকেন এখানে তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাড়ির বাগানে মুরগির বার-বি-কিউ করেন। এখন এই ফ্যাশান হয়েছে। আগে সাহেবরা করত সাকলিং-পিগ-এর।

সেটা কী জিনিস?

আমি ঋজুদাকে বললাম।

ঋজুদা বলল, সাকলিং-পিগ।

ওঃ। আমি হেসে ফেললাম। দুগ্ধ-পোষ্য শুয়োর-ছানা। মনে ছিল না।

এখানে নাকি আজকাল ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হচ্ছে খুব?

তা হচ্ছে। আগে ওসব ছিল না। সাহেবরা খুব সাফ-সুতরো থাকত। এখন তো বেশিই আমাদেরই মতো রাঁচি জেলার লোক। বস্তিও হয়ে গেছে দু-তিনটে।

তারা কারা?

বাংলাদেশ-এর যুদ্ধের পরে পশ্চিম বাঙ্গাল দিয়ে বর্ডার পেরিয়ে আসা অনেক বিহারি মুসলমানরা। আমরা তো ছিলামই এখানে। কী করবে। তারাও মুরগি পুষছে, যা পারছে তাই করছে, খিলাড়ির খাদানে কাজ নিয়েছে। জবরদখল জমিতে আন্ডাবাচ্চা নিয়ে ঘিঞ্জি হয়ে থাকে। ক্রিশ্চানরা অনেক পরিষ্কার। আমরা তো সাহাব তা নয়। এই তো সেদিন ডরোথি মেমসাব প্রায় মরো মরো হয়েছিল। মান্দারের মিশনের হাসপাতালে গিয়ে কোনওক্রমে জান বাঁচে।

ডরোথি মেমসাব কে?

ওই যে বললাম না কিং সাহেবের ছোট শালী। তাকে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা লিন্ডাল সাহাব বিয়ে করেছে।

লিন্ডাল সাহেবের বয়স কত হবে?

এই হবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। সাহাব-মেমসাহাবদের বয়স তো ঠিক ঠাহর করতে পারি না আমরা!

তারপরই বলল, লিন্ডাল সাহেব খুব ভাল শিকারি। নিজের বন্দুক রাইফেল নেই যদিও, মুংগতুরামের বেপাশি বন্দুক দিয়ে প্রায়ই শুয়োর ধড়কে দেয়।

তোমরা তো মুসলমান। শুয়োর খাওয়া তো তোমাদের হারাম।

ঋজুদা বলল।

তওবা, তওবা সাব। আমরা খাব কোন দুঃখে। কিন্তু আমরা না খেলে কী হয়? এখানের আদিবাসী কুলিনকামিন, ঠিকাদারবাবুরা বাঙালি আর বিহারিবাবুরা সবাই 'ভিন্ডিলি' না কী বলে, তাই বানিয়ে খায়।

আমি বললাম, ভিন্ডিলিটা কী ব্যাপার?

ঋজুদা বলল, ভিন্ডালুই হবে। সবই কি আর জিজ্ঞেস করতে হয়? ও তো আর তোর মতো লেখাপড়া-না জানা ইংরেজিনবিশ নয়! লিন্ডওয়ালকে লিন্ডাল বলে ওরা, ভিন্ডালুকে ভিন্ডিলি। তাতে কীই-বা এল গেল।

লিন্ডওয়াল সাহেব বুঝি অস্ট্রেলিয়াতে শিকার করতেন?

বলেন তো তাই। ওখানে ঘোড়ার মতো বড় একরকমের হরিণ আছে—আমাদের সম্বরের মতো। তাই মেরেছেন ওখানে অনেক।

তারপরই বলল, আমি দিয়ে আসি ওঁদের আলু-চপগুলো বাইরে। স্যালাড দেব কি?

ঋজুদা একটা অ্যালুমিনিয়ামের গামলাতে কেটে-রাখা শশা পেঁয়াজ টম্যাটো ইত্যাদির দিকে এক ঝলক তাকাল। আমি দেখলাম জল ছাড়ছে সেগুলো থেকে।

ঋজুদা বলল, লাগবে না।

চলে গেলে বলল, জানিস তো কাঁচা-পেঁয়াজের মতো ভাল জিনিস খুব কমই আছে। নিয়মিত পেঁয়াজ খেলে যক্ষ্মা হয় না, সর্দি-কাশি হয় না, প্রচুর স্ফূর্তি ও কাজের ক্ষমতা পাওয়া যায়।

তাই ট্রাক-ড্রাইভারেরা অত খায়!

আমি বললাম।

শুধু তারাই কেন, যে-কোনও বন্দরের মুসলমান অবাঙালি কুলিরা দেখবি কত কাঁচা পেঁয়াজ খায়। তাদের গায়ে কত জোর। কত পরিশ্রম করতে পারে তারা! রসুনও ভাল।

তারপর বলল, তোর জানার কথা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বার্মাতে, এখনকার, মায়ানমারে যখন বেধড়ক মার খাচ্ছে ব্রিটিশরা, তখন জেনারেল উইংগেট বলে এক ইংরেজ জেনারেল বার্মার জঙ্গলে মারাত্মক সব কাণ্ড-মাণ্ড করেছিলেন। তাঁর সৈন্যদলকে বলা হত 'উইংগেস্টস সার্কাস'। সেই উইংগেট নাকি শুধু কাঁচা পেঁয়াজ খেয়েই থাকতেন এমনই জনশ্রুতি আছে পৃথিবীর তাবৎ সৈন্যমহলে।

তাই?

আমি বললাম, অবাক হয়ে।

ঋজুদা বলল, ঠিক তাই।

তা যেমন ঠিক তেমন এও সকলেরই জানা উচিত যে পেঁয়াজ খাবার সময়েই ছাড়িয়ে নিয়ে খেতে হয়। আগে ছাড়িয়ে রাখলে রাজ্যের যত রোগের বীজাণুর

বাসা হয়ে যায় তারা। অনেক আগে ছাড়িয়ে বা কেটে-রাখা পেঁয়াজ খেলে উপকারের চেয়ে অপকার অনেকই বেশি হয়।

তাই?

তাই তো। কিন্তু যে-কর্মে এখানে আসা তার কিছু সূত্র কি পাওয়া গেল?

ঋজুদা বলল।

কীসের সূত্র?

আমি বললাম।

বুঝলি না?

না তো।

নাঃ। ভটকাইকেই দেখছি ডাবল-প্রমোশন দিয়ে তোর জায়গাতে আনতে হবে। ও আমার সঙ্গে থাকলে ঠিকই বুঝতে পারত কী বলতে চাইছি।

লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে গেল।

বললাম, কী? ডরোথির স্বামী লিন্ডওয়ালই আসলে ম্যাক টেইলর?

আসলে কি না বুঝতে পারছি না এখনও, তবে গড়বড় একটা আছে।

কেন একথা বলছ?

বলছি, কারণ অস্ট্রেলিয়াতে তো সম্বার অথবা সম্বরের মতো বড় কোনও জানোয়ার নেই, ক্যাঙারু ছাড়া।

ক্যাঙারুর বর্ণনাই বোধহয় ও দিল।

আমি বললাম, ও মানে?

মানে, মাজিদ।

ও কি আর মুজ-এর নাম শোনেনি?

মুজ-এর নাম ও কোথা থেকে শুনবে? উত্তর আমেরিকা আর কানাডার বরফাবৃত অঞ্চলের মুজ-এর কথা আর ক'জন জানে? অ্যালগারনন ব্ল্যাকউড-এর কথাই বা ক'জনে শুনেছে?

ইতিমধ্যে মাজিদ ফিরে এল তিতির আর ভটকাইকে গরম গরম আলুর চপ আর চা দিয়ে।

ঋজুদা বলল, বুঝলে, এবারে আমাদেরও দাও।

জি সাহাব।

ও আমাদের খাবারটা ঠিকঠাক করতে লাগল।

এখানের সংস্কৃতি ছিল পথেঘাটে যেখানেই অচেনা মানুষজন এবং শিশুদের সঙ্গেও দেখা হত, প্রত্যেকেই হাত তুলে বলত 'সেলাম সাহাব'। আমি যখন এখানে নিয়মিত আসতাম জায়গাটা অন্যরকম ছিল। এই যাকেতাকে সেলাম করার মধ্যে যেমন একটা গোলামি গোলামি গন্ধ আছে, তেমন একটা নিয়মানুবর্তিতা এবং মান্যতাও তার সঙ্গে মিশে ছিল। যা নইলে, শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হয় না। নীরদ সি চৌধুরী যে ইংরেজদের এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসা করতেন তা এমনি এমনি

নয়। উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন, ভারতীয়রা হচ্ছে Men of Straw, তাদের স্বাধীনতা দিলেও তারা তা রাখতে পারবে না। ভারত বিরাট রাষ্ট্র। তার বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতি। তাই হয়তো এখানে মিলিটারি Coup হয়নি কিন্তু ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান, বেলজিয়ানরা, যেসব ছোট-ছোট উপনিবেশকে স্বাধীনতা দিয়েছে সেইসব দেশ, সেইসব দেশের অবস্থা তো পড়িসই কাগজে। স্বাধীনতার যোগ্য নিজেদের পুরোপুরি না করতে পারলে সেই স্বাধীনতা খায় না মাথায় মাখে, তাই বুঝে উঠতে পারে না সেই দেশ। উগান্ডার মতো, আফগানিস্তানের মতো, জায়রের মতো। আমাদের দেশ কিন্তু মস্ত বড়। কিন্তু ভৌগোলিক বিরাটত্বই তো বিরাটত্বর একমাত্র মাপ নয়।

মাজিদ আমাদের এনে দিল আলুর চপ প্লেটে করে।

ঋজুদা বলল, আজ আপ-ট্রেন টাইমে আছে?

জি সাহাব। এখন পর্যন্ত তো আছে, পরে কত লেট করবে কে বলতে পারে।

ঋজুদা আমাকে বলল, তা হলে কিষুণকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে নিয়ে তুই টাটা সুমোটা নিয়ে কিষুণকে স্টেশনে ছেড়ে যাস এসে। ও কী করবে এখানে বসে থেকে।

তারপর মাজিদকে বলল, আপাতত তুমি ড্রাইভারকেও এক প্লেট আলুর চপ আর গরম এক গ্লাস চা পাঠিয়ে দাও তো গাড়িতে কারোকে দিয়ে।

জি সাহাব।

আমি বললাম, তুমি যা ভাল মনে করবে কিষুণের ব্যাপারে তাই হবে।

কতদিন শিকার করি না। একদিন লিন্ডওয়াল সাহেবের সঙ্গে গেলে মন্দ হয় না।

মাজিদের দিকে ফিরে বলল, ঋজুদা।

আপ কভ্‌ভি শিকার খেলথে থে সাহাব? ম্যায় তো কভ্‌ভি দিখা নেহি ম্যাকক্লাস্কিমে আপকো শিকার খেলথে হুয়ে।

ঋজুদা হাসল।

আমার ভয় হল থলে থেকে বেড়াল এই বেরিয়ে পড়ল বুঝি।

আমি ভাবলাম বলি যে, তুমি আর কতটুকু জেনেছ বাবা! ঋজু বোস-এর 'খাল-খরিয়াৎ', 'রাহান-সাহান'-এর কথা আমাদের মতো তুমি জানবেই বা কোত্থেকে!

ঋজুদা আবার বলল, কী হে? মোটে দিন তিনেক তো থাকব। আজ সন্ধের পরে তো আর কোনও গাড়িও নেই।

কেন? শক্তিপুঞ্জ?

আমি বললাম।

শক্তিপুঞ্জের প্যাসেঞ্জার তো নামতে পারে না। মানে, চা খেতে নামতে পারে না। এক মিনিট তো স্টপেজ তাও আবার মাঝ রাতে।

আমরা ক্যামেরনের গেস্ট হাউসেই উঠেছি। বুঝেছ মাজিদ, চলে এসো। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার লিন্ডাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে আসব। তারপর যদি একটু শিকার-টিকার হয়।

একটু চুপ করে থেকে বলল, এখন এখানে কিছু জানোয়ার আর আছে কি? দাশগুপ্ত সাহেব, রাণা সাহেবরা মিলে তো সবই শেষ করে দিয়েছেন।

সাহাব। গলা নামিয়ে বলল মাজিদ একটু আস্তে কথা বলুন। দেওয়ালেরও কান আছে।

তারপর বলল, না সাহাব। আছে। বড় বাঘ এপাশে নেই, তবে চামার রাস্তাতে আছে, ম্যাকক্লাস্কির নোজ-এর গুহাতে থাকে। তা ছাড়া বাঘ মেরে হজম করাও তো সহজ নয়। এপাশে লেপার্ড আছে, ভাল্লুক, শুয়োর, কুটরা, জানোয়ারদের মধ্যে। আর পাখির মধ্যে তিত্বর, বটের আর মোরগা। কালিতিত্বরও আছে।

ঠিক আছে। এসো তো তুমি আজ। সন্ধের মুখে মুখে।

এখন সময়ে একজন মোটাসোটা ইংরেজ তরুণী প্লাটফর্মে এসে ঢুকলেন। ঋজুদাকে দেখেই বললেন, হ্যালো!

ঋজুদা বলল, হ্যালো।

তারপর বলল, গোয়িং-ব্যাক টু ডে?

ইয়া!

বলেই মেমসাহেব একটি দেহাতি ছেলের সঙ্গে লাইনের ওপারে চলে গেলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঋজুদাকে, কে উনি?

মিস এলিসন ব্লান্ট। উনি ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের উপরে একটা থিসিস-এর জন্যে।

তুমি চিনলে কী করে?

কলকাতাতে সেদিন আমাকেও ইন্টারভ্যু করলেন যে।

কেন?

যেহেতু আমার একসময়ে যাতায়াত ছিল ওখানে।

তারপরে বলল মাজিদ মিঞাকে, একটা খবর পাঠিয়ে দিয়ো তোমার লিন্ডিল সাহেবের কাছে যে, আমরা যাব। এখানের সব বাসিন্দাই তো সন্ধে সাতটাতে 'সাপার' খেয়ে শুয়ে পড়ে। আগে না জানিয়ে গেলে...।

তা ঠিক। মাজিদ বলল।

ঋজুদা বলল, তারপরে দোকান থেকে বেরিয়ে গাছতলার বেঞ্চে বসে-থাকা ভটকাই আর তিতিরের দিকে যেতে যেতে বলল, বারকাকানা থেকে ডালটনগঞ্জ-এর ট্রেন আসতে আসতে তো দুপুর গড়িয়ে যাবে। চল, চা, আলুর-চপ খাওয়া তো হল, চাট্টি নদী দেখিয়ে নিয়ে আসি তোদের।

সেটা কোথায়?

সেটা ম্যাকক্লাস্কির একেবারে অন্য প্রান্তে। সেদিকে বাড়িঘর লোকজন খুবই কম। তবে জাগৃতি-বিহার আর ব্রিগেডিয়ার রামদাস-এর নতুন বাড়িতে ওদিকের ভোলই পাল্টে গেছে। তবে চাট্টি নদীতে যেতে আরও দূরে যেতে হবে ডানদিকে। শেষকালে কিছুটা হাঁটতেও হতে পারে।

ভটকাই বলল, মহাপ্রস্থানের পথে বা অমরনাথে যেতে কিছুটা হাঁটতে তো হবেই। কষ্ট না করলে কি আর কেষ্ট মেলে? তবে একটা জিনিসেরই অভাব পড়ল।

কীসের?

একটা কুকুরের। যুধিষ্ঠিরের পায়ে পায়ে একটা কুকুর গেছিল না? তা ঋজুদা, তুমি কি সারমেয়হীন যাবে?

তিতির ফিক করে হেসে উঠল।

হাসলে যে বড়।

হাসব না? তুমি এমন এমন বাংলা শব্দ বলছ যে, মানেই বুঝি না।

তিতির বলল, বাংলা হলেও না হয় বোঝা যেত। এ যে সংস্কৃত শব্দ।

ইয়েস। এই সংস্কৃত আরবি, ফারসি ছেড়ে শুধু ইংরেজিনবিশ হওয়াতেই তো আজ আমাদের এই অবস্থা!

এনাফ ইজ এনাফ।

ঋজুদা ভটকাইকে থামিয়ে দিল।

তারপর স্টেশনের গেট পেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলল, আজকে কিষুণকে পাঠানো যাবে না।

কেন?

চল, আমরা চাট্টি নদী থেকে ঘুরে আসি। তারপর দুপুরের খাওয়ার পরে রুদ্র তোর একবার রাঁচি যেতে হবে। দেড় ঘণ্টা লাগবে। একটা কাজ দেব।

ভটকাই বলতে গেছিল, আমি যাব না?

কিন্তু সামান্য আগেই ঋজুদার বকুনি খেয়ে চেপে গেল।

তিতির বলল, ওই মেম সাহেবটি কে ঋজুদা?

মিস এলিসন ব্লান্ট এসেছেন ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ-এর অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের ওপরে কাজ করবার জন্যে লন্ডন থেকে।

ভটকাই বলল, আজকাল তরুণী অথ মোটা মেমসাহেব দেখাই যায় না?

আমরা হেসে ফেললাম ওর কথায়।

পি এইচ ডি করছেন কি?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

পি এইচ ডি করছেন এই বিষয়ে। তবে তিনি তো অলরেডি ডক্টর ব্লান্ট। বেশ রলি-পলি গাবলু-গুবলু মহিলা। বয়স বেশি নয়। ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন ইউনিভার্সিটির জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে আছেন।

চল এবারে গাড়িতে ওঠ।

ঋজুদা সামনে, আমরা তিনজনে পেছনে।

দারুণ লাগছে জায়গাটা। মনে হয়, গোয়া বা পুরনো চন্দননগরে চলে এসেছি। ছোট কটেজ, প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বাংলো লাল-মাটি পথের দু'পাশে। এক একটি বাংলোর হাতাই হবে দশ-পনেরো বিঘা করে। কত যে গাছ, কতরকমের, তা বলার নয়। ভারী শান্ত, সুন্দর ছবির মতো জায়গাটা। আমরা ডানদিকে মস্ত প্রায় একশো বিঘা এলাকার বুথ'স ফার্ম ছাড়িয়ে ডানদিকে জাগৃতি-বিহারের সুন্দর বাংলোটি ছাড়িয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল রামদাস-এর দারুণ বাড়িটাকে বাঁদিকে রেখে চাট্টি নদীর দিকে এগোলাম ডানদিক দিয়ে। বেশ অনেকখানি পথ গিয়ে দাঁড়াবার কথা বলল, ঋজুদা।

না থেমে, কিষুণ বলল, তকলিফ হোগা হুজৌর। সুমো ইতমিনানসে পৌঁছ যায়েগা নদ্দীতক। আপলোগ মজেমে বৈঠিয়ে।

আরও কিছুক্ষণ এবড়ো-খেবড়ো পথ বেয়ে গিয়ে যেখানে পৌঁছলাম সে জায়গাটা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বিরাট বিরাট পাথরের চাঙর, নীচ দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। সাদা বালির চর। দুপারেই জঙ্গল। চডুইভাতি করার আদর্শ জায়গা।

বাঃ। কালকে এখানেই পিকনিক করলে হয়।

করলেই হয়। লিন্ডওয়াল এবং মিসেস লিন্ডওয়ালকেও নেমন্তন্ন করা যায়। মেনুটা তোরা ঠিক করে ফেল। কিন্তু রান্না করবে কে? তোরা তো সব ওয়ার্থলেস।

ওয়ার্থ যাচাই না করেই যদি আমাদের বাতিল কর, তা হলে আর কী বলি!

ভটকাই বলল।

তুই রাঁধবি?

পরীক্ষা করেই দেখ।

তবে তাই হোক। তুই কি চুলও কাটতে পারিস?

আমি বললাম।

মানে?

না। গাধার সঙ্গে তোর যখন অমন নিবিড় সম্পর্ক, তুই আমাদের লন্ড্রিম্যান হতেই পারিস। তদুপরি কুক। বাকি থাকল হাজামৎগিরি। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

হাজামৎ মানে কী?

তিতির প্রশ্ন করল।

নাপিত।

ঋজুদা বলল।

তাই?

হ্যাঁ। তা হলে তোর ভূমিকাটা আমাদের দলে একেবারে স্থায়ী হতে পারে আর

কী। কোনও সময়েই তোকে দল থেকে বাদ দেওয়ার উপায়ই আর থাকবে না।

তিতির বলল, সবই ভাল ভটকাই কিন্তু তুমি গাধার পিঠে রাইডিং প্র্যাকটিসটা করে কাজটা ভাল করনি।

কেন?

আমার বারবারই জীবনানন্দর সেই পঙ্‌ক্তিটিই মনে পড়ে যাচ্ছে।

কোন পঙ্‌ক্তি?

'আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে।'

আমি আর ঋজুদা হেসে উঠলাম তিতিরের কথাতে।

ভটকাই অন্যদিকে মুখ করে, মুখটাকে উটের মতো উঁচু করে, শূন্যে চেয়ে রইল।

এখানে তো সিনেমার শুটিং হওয়া উচিত।

হয়ই তো। এই তো কিছুদিন আগেই 'বনফুল' বলে একটা ছবির শুটিং করলেন শমিত ভঞ্জ। পল্লবী, ইন্দ্রাণী, রবি রায়, চিন্ময়বাবু কমেডিয়ান সব এসে তো সোমনাথের বাড়িতেই ডেরা করেছিলেন।

তাই?

তা তুমি একটা স্ক্রিপ্ট যদি লিখে দাও তো আমরাও ম্যাকক্লাস্কির পটভূমিতে একটা ছবি করতে পারি।

ওসব আমার কর্ম নয়। লেখক মিস্টার রুদ্র রায় তো আছেনই।

ভটকাই বলল, একটা সুন্দর জায়গাতে এসেছি। একটু আনন্দ করব তা নয়। কী যে ভ্যাজর-ভ্যাজর শুরু করলে তোমরা। তার চেয়ে আমি বরং ওইদিকটাতে একটু ঘুরে আসি।

যাচ্ছিস যা। তবে সাবধানে যাস। ওইদিকেই ভরদুপুরে একটা ভালুকে থ্রপ সাহেবের পশ্চাৎদেশের দেড় কিলো মাংস খাবলে নিয়েছিল।

ঋজুদা বলল।

দেড় কিলো?

হ্যাঁ। সবুজ টেরিলিনের ট্রাউজারের কাপড়সুদ্ধ।

টেরিলিনও খেল ভালুক? পেট খারাপ হয়নি?

তিতির ভালুকের জন্যে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ভালুক মানে Sloth Bear, তো মাংস খায় না।

তবে মাংস খাবলে নিলই বা কেন?

আমি বললাম।

মাংসের জন্যে খাবলায়নি। হয়তো কাপড়ের কোনও দোকানি অথবা ভটকাই-এর মতো কোনও দর্জি তাকে একটা সবুজ টেরিলিনের ট্রাউজার বানিয়ে দিতে গররাজি হয়েছিল। কে কী করে, কেন করে, কখন করে, তা কে বলতে পারে!

তবে কাল এখানে চড়ুইভাতি হচ্ছে তো?

তিতির বলল।

তোমরা করলেই হবে। তা হলে কিষুণকে রেখেই দেওয়া যাক।

ও খুব ভাল লিট্টি বানায়। এক রাতে খাওয়া যাবে। তা ছাড়া ও থাকলে আমাদের নানা উপকারে আসবে। এদিকারই মানুষ তো!

লিট্টিটা কী জিনিস ঋজুকাকা?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

সে এক জিনিস। ছাতু দিয়ে বানায়। গোল গোল। কচুরির মতো। কিন্তু ক্রিকেট বলের মতো সলিড। বানাতে বহতই মেহনত লাগে। পার লিট্টি এক পো করে বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি লাগে। খেতে কিন্তু অমৃত। ঝাল-লঙ্কার আচার এবং রাবড়ি বা রসমালাই দিয়ে খেতে হয়। খাওয়ার সময়ে সুখে মরে যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু পরদিন খাওয়ার সময়েও দুখে...

তিতির বলল, মানে কী হল?

ভটকাই বলল, খুকি। সব কথার মানে হয় না। কিছু কিছু খুকি চিরদিন খুকিই থাকে।

তা হলে চল এবারে ফেরা যাক।

গাড়িতে বসে ঋজুদা কিষুণকে বলল, আমাদের গেস্ট হাউসে না গিয়ে কিষুণ তুমি একবার স্টেশনে গিয়ে মাজিদ মিঞাকে জিজ্ঞেস করে আসবে তার লিন্ডিল সাহেব মদ খায় কি না? গেলে, রাঁচিতে যখন রুদ্র অন্য কাজে যাবেই, তখন আনিয়ে নেব ওকে দিয়ে সাহেবের জন্যে। আরও জিজ্ঞেস কোরো সাহেব কী খান?

মতলব নেহি সমঝা হুজৌর।

মতলব ক্যা? বহত কিসিমকি দারু হোতা না হ্যায়। পুছনা, উন কি পসন্দ ক্যা হ্যায়, সমঝা না?

জি হুজৌর। ম্যায় আভভি পুছকর আতা হুঁ।

গেস্ট-হাউসে পৌঁছে আমরা নেমে যাবার পরে কিষুণ চলে গেল স্টেশনে। কিষুণের খাওয়ার কথাও বলে দিল ঋজুদা ক্যামেরনের লোককে। তারপর বারান্দাতে চেয়ারে বসে ভটকাইকে বলল, আমার চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটা আন তো ঘর থেকে ভটু।

আমি আর তিতির মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। ভটকাই এতই প্রিয় হয়ে গেল ঋজুদার যে, ভটকাই থেকে আদরে একেবারে 'ভটু' হয়ে গেছে!

ভটকাই গদগদ মুখে ঋজুদার ঘরে গিয়ে ঋজুদার কালো ক্রোকোডাইল-লেদারের ব্রিফকেসটা নিয়ে এল ঘর থেকে। এই ব্যাগটা নামনি আসামের গারো পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া জিজিরাম নদীর একটি বুড়ো 'ঘড়িয়াল' কুমিরের চামড়া দিয়ে বানানো। কলকাতার গভর্নমেন্ট প্লেস

ইস্ট-এর আর্মেনিয়ান ট্যাক্সিডারমিস্ট মিস্টার ফ্লেভিয়ান-এর দোকান, কার্থবাটসন অ্যান্ড হারপার-এর ম্যানেজার হালদারবাবু যত্ন করে বানিয়ে দিয়েছিলেন। ভটকাই আজকে 'ভটু' হতে পারে কিন্তু এসব খবর সে জানবে কোত্থেকে! ও তো দুদিনের বৈরাগী, তাই ভাতকে বলে 'অন্ন'। এসব জানে একমাত্র রুদ্র রায়ই।

ভাবছিলাম, আমি।

ব্যাগটা খুলে, ডিজিটাল ডাইরিটা বের করে, আমার হাতে দিয়ে বলল, 'H' বার কর তো।

বার করলাম।

এবার বের কর Ronald Harper।

বের করে বললাম, করেছি।

পুরো ঠিকানা ও ফ্যাক্স নাম্বার বের করে ফেল।

করলাম।

ভাল করে রেখে দে তোর কাছে।

এ কোথাকার ফ্যাক্স নাম্বার?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সিডনির ফ্যাক্স নাম্বার। অস্ট্রেলিয়ার। ঠিকানাটা বুঝি দেখলি না?

পাওয়ার অফ অবসার্ভেশান বেটার কর আরও।

তাই। রোনাল্ডও আমার এক বন্ধু। রোনাল্ড, স্টিভ-এরও বন্ধু।

স্টিভ ওয়া?

এবার তিতির বলল।

আজ্ঞে না। স্টিভ হলেই কি ওয়া হতে হবে? তোকেও দেখি ভটুর রোগে ধরল! শচীন হলেই কি তেণ্ডুলকার হতেই হবে? শচীন শাসমল, শচীন আঢ্য, বা শচীন তলাপাত্ররা কি কেঁদে মরবে তা হলে? স্টিভ এডওয়ার্ড। স্টিভ নিউজিল্যান্ডে তার দিদির কাছে গেছে। তিনদিনের জন্যে। তাই এই নোটটা লিখে দিচ্ছি তুই রোনাল্ডকে একটা ফ্যাক্স করে দিয়ে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করবি। উত্তর না পেলে, আই এস ডি বুথ-এ বলে আসবি যে, কাল ভোরেই তুই আবার যাবি উত্তরটা নিয়ে আসতে। উত্তর অবশ্যই আসবে। বলেই, ঋজুদা স্ক্রিবলিং প্যাড বের করে তার পকেটের ক্রস বল পয়েন্ট পেনটা তুলে নিয়ে লিখল, DEAR RON,

PLEASE CONTACT STEVE AT NEWZEALAND RIGHT NOW AND PLEASE ASK HIM ABOUT THE WEAPONS MAC TAILOR USED MOST. PLEASE ALSO ASK HIM WHETHER ANY PARTICULAR WEAPON WAS USED BY MAC FOR SHOOTING MOOSES.

PLEASE TREAT THIS AS VERY IMPORTANT AND REQUEST HIM TO FAX BACK THE INFORMATION IMMEDIATELY AT THE FAX NUMBER QUOTED ABOVE. PLEASE CONVEY TO HIM

THAT I HAVE REACHED THE GUNJE THIS MORNING, AND AM TRYING TO GET IN TOUCH WITH HIS SHOOTING PAL.

REGARDS TO YOU AND STEVE.

YOURS WRIJU BOSE

C/O. MR. CAMERON'S GUEST HOUSE

McCLUSKIEGUNGE. DT. RANCHI.

Message-টা লিখে কাগজটা আমার হাতে দিল ঋজুদা।

এই কাগজ ফ্যাক্স মেশিনে নেবে তো?

তিতির সন্দেহের গলাতে বলল।

আমার এই প্যাডটা ফ্যাক্স-এর কাগজ দিয়েই তৈরি।

এতগুলো please লিখলে কত টাকা বেশি লেগে যাবে। please গুলো বাদ দিলে হয় না?

ভটকাই বলল।

Text থেকে please বাদ দেওয়া ধড় থেকে মুণ্ডু বাদ দেওয়ারই মতো অপরাধ। ভদ্রতার বালাই তো স্বাধীন হয়ে যাবার পরে আর রাখিনি আমরা!

তিতির বলল, আমার বাবা প্রায়ই বলেন এ কথা।

সেটা ঠিক যেমন, তেমন অন্য কথাও ভাবার আছে। তুই ইংল্যান্ডের যে কোনও কাউন্টিতে এখনও যদি পথ পেরুবার জন্যে পথের ধারে এসে দাঁড়াস, দ্রুত-ছুটে-যাওয়া গাড়ির সারি ভ্যাকুয়াম ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়বে নিজেদের থেকেই, কোনও পুলিশ বা ট্রাফিক সিগন্যাল ছাড়াই। তুই জেব্রা-ক্রসিং দিয়ে পথ পেরিয়ে গেলে তারপরেই আবার চলতে শুরু করবে সব গাড়ি। যে-কোনও প্রকৃত স্বাধীন ও সভ্য দেশে ব্যক্তির দাম আছে। প্রত্যেকটি পথচারী মানুষকেও 'মানুষ' বলে মান্য করা হয় সেখানে। ভদ্রতা সভ্যতা Please! Thank you! Excuse Me! এসব ওখানকার জীবনযাত্রার অঙ্গ। কিন্তু তোরা মনে কর চৌরঙ্গি বা ডালহৌসি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিস তখন তোরা Excuse me please বলতে থাকলে বা কারও সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেলে sorry বলবার জন্যে দাঁড়ালে লোকে তোদের পাগল তো ভাববেই, পা মাড়িয়ে দিয়ে ধাক্কা মেরে চলেও যাবে, তা ছাড়া তোরও এক পাও এগুনো হবে না।

'যস্মিন দেশে যদাচারঃ' বুঝলি না! আমাদের জনসংখ্যার বুজরুকিতেই সব ধান খেয়ে গেল, একটা সমস্যার সমাধান করলেই তো আরেকটা সমস্যা এসে ঘাড়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, তোর হবে ভটু। আজকের দিনের সবচেয়ে লাভজনক যে পেশা, বিনা-লগ্নির পেশা, যা শুধু বক্তৃতাবাজিরই পেশা, সেই রাজনীতিতেই নেমে যা।

এমন সময় কিষুণ ফিরে এল।

ঋজুদা বলল, কেয়া বোলা মাজিদনে?

বোলিন কি, যো লিন্ডিল সাব পিতে হ্যায়।

ক্যা পিতে হ্যায়। পুছাতা?

নেহি তো হুজৌর।

ঠিক হ্যায়। তুম যা কর আরাম করো ওর কিচেনমে যা কর বোল দো ক্যায়া খায়েগা তুমনে। যো দিল চাহতা হ্যায় ওহি খাও।

বহুত আচ্ছা হুজৌর।

কিষুণ চলে গেলে তিতির ঋজুদাকে বলল, এতবার হুজৌর হুজৌর করে কেন? অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ।

এটা ঠিক বললি না। এটা সহবৎ-এর ব্যাপার। ও যে আমাকে বা তোদের সম্মান দিয়ে কথা বলছে তাতে তো ও নিজেও সম্মানিত হচ্ছে। 'রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান' ওটা শুধু রাজার বেলাই প্রযোজ্য নয়, সকলের বেলাতেই প্রযোজ্য। ওড়িশাতে সাধারণ মানুষ কথায় কথায় বলে 'আইজ্ঞাঁ', 'আইজ্ঞাঁ', যারা একটু লেখাপড়া শিখেছে তারা বলে 'স্যার', 'স্যার'। আবার অন্যত্র বলে, জি! জি! তুই যদি খুব বেশি সম্মানের যোগ্য হোস তবে বলবে স্যার! স্যার! স্যার! স্যার! জি! জি! জি! জি! চারবার।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম ঋজুদার কথা শুনে।

এতগুলো স্যার বা জি যারা বলে তারা নির্ঘাত চোর।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, সেটা মন্দ বলিসনি।

ঋজুদা প্যাড থেকে আরেকটা স্লিপ ছিঁড়ে নিয়ে কী দু-তিনটে নাম লিখল। তারপর আমাকে বলল, এটা রেখে দে। যখন রাঁচি যাবি তখন মেইন রোড-এর ওপরে যে বড় দোকানটা আছে সেখান থেকে এগুলো কিনবি। কিষুণকেও বলে দেব। সে চেনে। মোহনের অ্যাকাউন্ট আছে ওই দোকানে। দোকানি আমাকেও চেনে। তবে টাকা না দিতে চাইলেও জোর করে দিবি।

পয়সা লাগবে না?

লাগবে না। মোহন যদি জানে যে, আমি ওর রাজত্বে এসেও কোনও জিনিসের দাম দিয়েছি, তাহলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

ঠিক আছে।

ভটকাই বলল, ভাই হো তো অ্যায়সা।

এমনিতে দুপুরে কখনওই ঘুমোই না কিন্তু আজ গভীর ঘুমে ছিলাম।

রাতে ট্রেনে ভাল ঘুম হয় না। সে থার্ড ক্লাস স্লিপারেই হোক কি ফার্স্ট ক্লাস এ-সি-তে। দুপুরে খাওয়াটাও বেশি হয়ে গেছিল। অড়হর ডালটা বিহারিরা বড়

ভাল বানায়। খুশবুদার চাল। বড় বড় টুকরো করে বেগুন ভাজা, বড় লঙ্কা ভাজা, ডিমের কারি এবং পুদিনার চাটনি। শেষে দই।

ভটকাই আর আমি এক ঘরে। এক পাশের ঘরে তিতির আর অন্য পাশের ঘরে ঋজুদা। ভটকাই ঘুমন্ত আমাকে এমনই এক ঠেলা দিল যে খাট থেকে পড়েই যাচ্ছিলাম। সে বলল, তিনটে বেজে গেছে। ঋজুদা দুবার দেখে গেছে যে, তুই কুম্ভকর্ণর মতো ঘুমোচ্ছিস। এত ঘুমকাতুরে হলে তোকে পরের বার আর আনবে না বলেছে।

কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে আমি বাথরুমে গিয়ে চোখমুখে জল দিয়েই বললাম, যাচ্ছি। কিষুণ কোথায়?

সে তো গাড়ি নিয়ে দুয়ারে প্রস্তুত। কিন্তু তোকে তো একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। তুই যা দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়েছিস আজকাল। তাই আমাকেও যেতে বলেছে তোর সঙ্গে।

তাহলে তিতির কী দোষ করল?

সে তো নেচেই আছে।

আমরা যখন বারান্দা পেরিয়ে গাড়ির দিকে যাচ্ছি দেখি ঋজুদা তার ঘরের সামনের ইজিচেয়ারে বসে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে পাইপ খাচ্ছে বারান্দার থামে পা তুলে দিয়ে।

আমাকে দেখে বলল, ওদেরও নিয়ে যাচ্ছিস নাকি? তা যা। তবে রাঁচিতে কাজ সেরেই চলে আসবি। যেতে আসতে তিন ঘণ্টা লাগবে। তোদের ফিরতে ফিরতে কম করে সাড়ে ছ'টা তো হবেই। তবে চিন্তার কিছু নেই। মিসেস কার্নির মাজিদ এসে খবর দিয়ে গেল একটু আগে যে মিঃ লিন্ডওয়াল আমাদের সকলকে রাতে ডিনারে ডেকেছেন। সাড়ে সাতটার সময় পৌঁছতে হবে। তার আগে তোরা ফিরলেই হবে। ফিরেও চানটান করে সাজুগুজু করে নিতে পারবি। যা, আর দেরি করিস না।

বুঝলাম যে ঋজুদা ভটকাইকে কিছুই বলেনি। ঋজুদার হাজারিবাগী বন্ধু গোপালদার ভাষাতে যাকে 'তিড়ি' মারা বলে তাই মেরেছে ভটকাই আমাকে। মহা খতরনাক হয়ে উঠছে ছেলেটা দিনে দিনে।

গাড়ি ছেড়ে দিল কিষুণ।

বললাম, খানা ঠিক থা? ঠিকসে খায়া তো?

জি মালিক। ডাটকে খায়া। জারা জলদি নিকালনেসে ঠিক থা। আতে আতে সাম হো যায়েগা। আজকাল সব্বে জংলি জাগেমে সামকো বাদ ডাকেইতি হোতা হ্যায়।

ভটকাই বলল, ঘেবড়িও না ভাইয়া, এই বাবুর কাছে কড়াক-পিং হ্যায়। হামলোক পুরি দুনিয়ামে ডাকাত শায়েস্তা করতা হ্যায়। উ সব ভয় হামলোগকো নেহি হ্যায়।

কিষুণ হাঁ করে ভটকাই-এর হিন্দি শুনছিল আর তিতির মুখ টিপে হাসছিল।

পকেট থেকে ঋজুদার দেওয়া ফ্যাক্স করবার চিঠিটা আরেকবার পড়লাম আমি। নাম্বারটাও দেখলাম। (613) 93282219 Ronald 13/110 Arden St. North Melbourn, 3051 Victoria/ Australia.

আর অন্য স্লিপে লেখা আছে One Bacardi Rum, One Black dog Whisky, One Gilby's Gin.

সময় সবচেয়ে বেশি লাগল রাঁচি শহরের দশ কিমি আগে থেকে শহরে ঢুকতে। কিষুণ বলল, টাউন বাড়তে বাড়তে কোই রোজ বিজুপাড়াতক হি পোঁছ যায়েগা।

বিজুপাড়া হচ্ছে সেই মোড়, যেখান থেকে আমরা রাঁচি থেকে ডানদিকে ঢুকেছিলাম। কিষুণই বলল, বিজুপাড়া রানচি সে বিশ মিল ওর ম্যাকলাসকি বিজুপাড়া সে পন্দরা মিল।

বিজুপাড়ার পরেই মান্দার। এখানে মিশনারিদের হাসপাতাল আছে, চার্চ আছে। এই হাসপাতালেই তাহলে ডরোথি মেমসাহেবের ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া চিকিৎসা হয়েছিল।

বড় হাট বসে এখানে। না?

তিতির জিজ্ঞেস করল কিষুণকে।

জী হাঁ। মালকিন।

তুমি জানলে কী করে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম তিতিরকে।

'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসটি শেষ হয়েছে এই মান্দারেই এসে। বাস দাঁড়িয়ে আছে হাটের পাশে। লাতেহার থেকে বাসে চড়েছিল লাল সাহেব। অরণ্যর স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে কলকাতার নরকে। একটা ওঁরাও ছেলে একটা ওঁরাও মেয়েকে একটি কবিতা বলছে ফিসফিস করে।

"হালফিল-এর মেয়েরা প্রজাপতির মতো নরম!
ঈসস। হাত ছুঁইয়ে দেখ, প্রজাপতির মতো নরম!"

ভটকাই হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বলল, উঃ। আর পারা যায় না, আর পারা যায় না। হালফিল-এর মেয়েরা সব কাঁকড়া বিছে! প্রজাপতির মতো নরম না আরও কিছু!

ঋজুদা বলেছিল ঠিকই। ফিরতে ফিরতে আমাদের সোয়া ছ'টা হল। সবে অন্ধকার নেমেছে। তবে চাসা থেকে ম্যাকক্লাস্কির পথে কিষুণের টাটা-সুমো ঢোকামাত্র আমি কোমরের সঙ্গে বাঁধা হোলস্টারের বোতাম খুলে পিস্তলটাকে বের করে ম্যাগাজিনটা আর চেম্বারটা দেখে নিয়ে আবার ম্যাগাজিনটাকে ঠেলে ঢুকিয়ে

দিয়ে পিস্তলটাকে হোলস্টারে ঠেলে দিলাম। তবে বোতামটা আর বন্ধ করলাম না। যাতে প্রয়োজনে, এক লহমাতে হোলস্টার থেকে টেনে বের করা যায়। আমাদের দেশে এখন জান বাঁচানোর জন্যে পিস্তল রিভলভার বা অন্য কোনও আগ্নেয়াস্ত্রই রাখা যায় না। তা ব্যবহার করা, ব্যবহার না-করার চেয়েও বিপজ্জনক। বিপদে পড়ে, লাইসেন্স যাদের আছে তারাই। চোরাই পিস্তল দিয়ে দিনে দুজন মানুষকে খুন করে বেড়ালেও তার কোনও দায়িত্ব নেই। ধরা আর কজন খুনি পড়ে এখানে! আইন যারা মানে, সব আইনই, তাদেরই সমূহ বিপদ!

ক্যামেরনের গেস্ট হাউসে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন ঋজুদা বলল, ফ্যাক্স-এর উত্তর পেলি?

হ্যাঁ।

কী লিখেছে স্টিভ।

স্টিভকে ধরতে পারেনি তোমার বন্ধু রণ। এই দেখ।

FOR WRIJU BOSE, RANCHI/BIHAR/INDIA

DEAR WRIJU

SORRY! STEVE IS OUT FISHING. SPOKE TO HIS SISTER AND MOTHER. HE WILL SEND YOU A REPLY TOMORROW AT THE NUMBER GIVEN

LOVE!

TAKE CARE.

RON

নোটটা পড়ে ঋজুদা বলল, আই এস ডি-র বুথ-এ বলে এসেছিস?

হ্যাঁ। বলেছি, কিষুণকে পাঠাব আটটার মধ্যে। বাজার থেকে মাছ কিনে ফ্যাক্স মেসেজটা নিয়ে দশটার মধ্যে ফিরে আসতে পারবে, যাতে চাট্টি নদীতে পিকনিকে যেতে পারি আমরা।

পিকনিকে কেউ মাছ খায় শুনিনি তো!

ছোট মাছ ভাজা খাব। বড় মাছ যা পাবে তা ফ্রিজ-এ রাখতে বলব। মিস্টার লিন্ডওয়ালরা আমাদের খাওয়ালে আমাদেরও তো ওঁদের খাওয়াতে হবে একদিন। কিষুণকে মিষ্টিও নিয়ে আসতে বলেছি। এখানে তো ভাল মিষ্টি পাওয়া যায় না।

বাবাঃ। বুদ্ধি দেখি বেড়ে গেছে ম্যাকক্লাস্কিতে এসে।

ঋজুদা বলল, আমাকে।

আমি উঁচু বল পেয়েই স্ম্যাশ করলাম।

বললাম, বুদ্ধি বলে আমার কি আর কিছু আছে!

থাকবে না কেন? বুদ্ধি সকলেরই থাকে। তোর সুবুদ্ধি আর ভটকাই-এর

কুবুদ্ধি।

আর তিতিরের?

তিতির তোদের দুজনের বুদ্ধির খটাখটি দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

তবে আমরা সকলেই বুদ্ধিজীবী তো!

তা তো নিশ্চয়ই! লেখাপড়া শিখলেই বুদ্ধিজীবী! তা সে মানুষ গাঁটকাটাই হোক কি মিথ্যাচারী, কি পরান্নপ্রত্যাশী। বুদ্ধিজীবীরাই আজ সবচেয়ে অসৎ, ধান্দাবাজ, নীচ, নীতিহীন। বুদ্ধিজীবী শব্দটার মানেই বদলে গেছে আমার কাছে।

তারপরই বলল, যা, তোরা চান-টান করে তৈরি হয়ে নে। আমরা ঠিক সাতটা কুড়িতে বেরোব। বোতলগুলো গাড়িতেই থাক কিষুণের জিম্মাতে।

তাই আছে।

ঠিক আছে। আমি চান করতে গেলাম।

হ্যাঁ। আমরাও যাচ্ছি।

লেভেল ক্রসিং-এর গেট বন্ধ ছিল। একটা প্রায় আধ কিমি লম্বা মালগাড়ি এল। সম্ভবত কয়লা নিয়ে আসছে। ধানবাদ বা রানীগঞ্জ-এর খাদান থেকে। ওয়াগন যাচ্ছে তো যাচ্ছেই ঘটরঘটর করে। শেষ নেই।

ভটকাই বলে উঠল, এ যে দেখছি সগর রাজা রে!

আমি আর ঋজুদা হেসে উঠলাম।

তিতির বলল, সে কে?

অ্যাই তো মেমসাহেব! ইংরেজিতে তুবড়ি ফোটাও। ফ্রেঞ্চ, জার্মান, অনর্গল বলতে পার, আর সগর রাজা যে কে, তাই জানো না। সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে ছিল। এই ট্রেনটারও মনে হচ্ছে ষাট হাজার ওয়াগন।

আমরা গিয়ে পৌঁছলাম লিন্ডওয়ালদের 'The Ucalypta' বাংলোতে সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশে।

গেট পেরিয়ে দুপাশের গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে অনেকখানি গিয়ে বাংলোটা। চোদ্দ-পনেরো বিঘা জমি আছে মনে হয়। এখনও ফায়ার-প্লেস জ্বলে বেশি শীত পড়লে। রান্নাঘরের আর বসার ঘরের মাথার ওপরে ধুঁয়ো বেরবার জন্যে চারকোনা আকৃতির ইঁট-সিমেন্টের গম্বুজ মতো। ছবিতে ইংল্যান্ড বা স্কটল্যান্ডের বাড়িতে যেমন দেখা যায়। বারান্দাটা বেশ চওড়া। বড় বড় চেয়ার পাতা আছে। ঝুলছে পোড়ামাটির ছোট ছোট টবও, বারান্দার কাঠের কাঠামো থেকে। তিন-চার ধাপ সিঁড়ি বেয়ে বারান্দাতে উঠতে হয়। সাহেব আর মেমসাহেব আমাদের অভ্যর্থনা করলেন বারান্দাতে দাঁড়িয়ে। তারপর নিয়ে গিয়ে বিরাট লিভিংরুমে বসালেন।

ঋজুদা আমাকে বলল, কী রে রুদ্র। পোঁটলাটা আন।

আমি বললাম, পোঁটলা মানে?

আঃ মানে, প্রেজেন্ট-টা।

ও।

বলে গাড়িতে গিয়ে, রাঁচি থেকে কেনা জিনিসগুলো-ভরা প্লাস্টিকের ব্যাগটা নিয়ে এলাম।

ঋজুদা বলল, কিষুণকে বল, মাজিদকে নামিয়ে দিয়ে, ফিরে যাবে। খেয়েদেয়ে সাড়ে ন'টা নাগাদ যেন এখানে আবার আসে।

আমরা হেঁটে যেতে পারি না ফেরার সময়ে? সারাদিন তো বসাই বলতে গেলে।

তিতির বলল।

তাই ভাল। তাই বলে দে কিষুণকে। টর্চ এনেছিস কেউ?

টর্চ কী হবে? দ্যাখো না কেমন চাঁদ উঠেছে।

তিতিরই বলল।

ঋজুদা বলল, বাংলাতে কিন্তু আর কোনও কথাবার্তা নয়। সেটা অভদ্রতা হবে। কোনও ভাষা কেউ না জানলে সেই মানুষের সামনে সেই ভাষাতে কথা বলাটা চরম অভদ্রতা। আর ভটকাই, তুই যে বোবা ও কালা আমি ওদের জানিয়ে দেব। তুই বেঁচে গেলি। ইংরেজি বলতে হবে না। তুই হিন্দিটা বলতে পারলেও হত।

হিন্দি তো দারুণ শিখে গেছি। তুমি শোনোনি, তাই বলছ।

তিতির হেসে বলল, আমরা শুনেছি।

কখন?

যখন কিষুণের সঙ্গে বলছিলে।

কেমন? ভাল নয়।

আমি বললাম, গাধার পিঠে রাইডিং-এর মতো।

ভটকাই গুম মেরে গেল। তা দেখে বড় আহ্লাদ হল আমার।

বোবারা কিন্তু কালাও হয়।

ভটকাই ঋজুদাকে মনে করিয়ে দিল।

সেটা তুই মনে রাখিস, তাহলেই হবে।

বিরাট বসবার ঘরের দেওয়ালে একটা মস্ত বড় বাঘের চামড়া টাঙানো আছে। ভাল্লুকের মাথা। শম্বরের শিং। চিতল হরিণের মাথা। মাউন্ট করা। বহু পুরনো। নিশ্চয়ই মিসেস লিন্ডওয়ালের পৈতৃক সম্পত্তি হবে। ১৯৭২ থেকে শিকার বে-আইনি হয়ে গেছে। বে-আইনি শিকারের ট্রফি কেউ টাঙিয়ে রাখে না।

মিস্টার লিন্ডওয়ালের বয়স চল্লিশ মতো হবে। বেশ শক্ত সমর্থ সুপুরুষ। লম্বা। প্রায় ছ'ফিটেরও বেশি। ফ্ল্যানেলের কালো একটা ট্রাউজার-এর ওপরে বিস্কিট-রঙা টুইডের কোট। আর মিসেস লিন্ডওয়াল তো পরমা সুন্দরী। তাঁর বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

ঋজুদা, আমাদের সকলের সঙ্গে একে একে তাঁকে আলাপ করিয়ে দিলেন।

ভটকাই-এর নাম শুনে, মিঃ লিন্ডওয়াল বুঝতে না পেরে বললেন, ভোডকা।

তিতির বলল, নো, নো। ভটকাই।

ঋজুদা ওঁকে তারপর বলল, গঞ্জে এসে সেটল করেন সাধারণত রিটায়ার্ড মানুষেরাই। সেই তুলনায় আপনি তো একেবারে ছেলেমানুষ। দ্বিতীয়ত এখানের আশিভাগ মানুষ যখন অস্ট্রেলিয়াতে চলে গেলেন এ দেশ ছেড়ে তখন আপনি অস্ট্রেলিয়া থেকেই এদেশে এলেন এইটা জেনেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে খুব ইচ্ছা হল। তা ছাড়া শিকারের কমন-ইন্টারেস্টও আরেকটা কারণ।

মিঃ লিন্ডওয়ালের ফার্স্ট নেম কেনেথ আর মিসেস-এর ডরোথি।

কেনেথ হেসে বললেন উই আর অনারড। আপনার কথা আর একজন লেখকের কথা, এখানে আসার পর থেকে অনেকই শুনেছি বড়লোক-গরিবলোক অনেকেরই মুখে। তবে সেই লেখকই এই জায়গাটাকে ট্যুরিস্ট-স্পট বানিয়ে ফেলে এর সর্বনাশ করেছেন।

এখনও সর্বনাশ হয়নি কিন্তু। আশ্চর্য! আমিও তো বহুদিন পরে এলাম। ভিতরে ভিতরে জঙ্গল কাটা হয়েছে অবশ্যই, সেই আগের মতো নিবিড় বনাঞ্চলে মোড়া পাহাড়-উপত্যকা আর নেই। তবু এখনও সবুজ আছে, শান্তি আছে। এই বা কম কী?

তা ঠিক।

ঋজুদা মিসেস লিন্ডওয়ালের দিকে তাকাল। সিল্কের একটা সাদা ব্লাউজ আর কালো সিল্কের মধ্যে কাঁথার কাজের লাল ফুল তোলা একটা স্কার্টে তাঁকে পরীর মতো দেখাচ্ছিল।

তারপর বলল, আপনাকে আমি বলতে পারি যে, আপনার দিদিই বেশি সুন্দরী ছিলেন না আপনিই, তা বিচার করতে বসলে কাকে যে বেশি নম্বর দিতে হবে তা নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে।

ডরোথি খুশি হয়ে বললেন, আপনি আমার দিদিকে চিনতেন?

বিলক্ষণ চিনতাম। মিসেস কিংকে কে না চিনত এখানে? ওরকম ডিগনিফায়েড সুন্দরী খুব কমই দেখেছি। আর কী ভাল কেক বানাতেন। একবার মনে আছে, আমার জন্মদিনে এখানে ছিলাম। আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব এসেছিলেন। তাঁরাই গিয়ে মিসেস কিং-এর কাছে বার্থডে কেক-এর অর্ডার করে এল গিয়ে। অত সুন্দর ব্ল্যাক-ফরেস্ট কেক কলকাতার স্কাইরুম বা তাজবেঙ্গলের পেস্ট্রিশপও করতে পারবে না। মনে আছে প্রতিদিন, প্রবল বর্ষার সময়টুকু ছাড়া, মিসেস কিং হেঁটে যেতেন আমার বাংলোর সামনে দিয়ে বিকেলে। কোথায় যেতেন তা বলতে পারব না। আমি আমার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে তাঁকে 'উইশ' করতাম। উনি 'উইশ-ব্যাক' করতেন। মিস্টার কিংকেই বরং দেখিনি কোনওদিন। কারণ উনি বিশেষ বেরতেনই না এবং আমিও কারও বাড়িতেই যেতাম না। মিসেস কিং-এর সঙ্গে

হাঁটতে বেরিয়েও দেখা হত। এখানের বাংলো বিক্রি করে দেওয়ার অনেকদিন পরে কলকাতাতে বসেই একদিন প্যাট গ্লাসকিন-এর চিঠিতে যখন জানলাম যে উনি মারা গেছেন, ভীষণই দুঃখ পেয়েছিলাম।

ডরোথি বললেন, আমার জামাইবাবু তো মারা গেলেন তার পরপরই।

সে খবরও পেয়েছিলাম। কিন্তু ততদিনে গঞ্জ-এর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছিল।

এই প্যাকেটে কী আছে?

কেনেথ জিজ্ঞেস করলেন।

Some Booze, ঋজুদা বলল।

দিস ইজ নট ডান।

কেনেথ বললেন।

ইউ হার্ডলি নো আস।

কিন্তু আমাদেরও তো না-চিনেই নেমন্তন্ন করলেন ডিনারে। তা ছাড়া আমি আপনার বেটার-হাফকে তো চিনিই!

আপনার কথা আলাদা।

কেন?

ইউ আর আ সেলিব্রিটি।

কীসের জন্যে?

ফর ইওর ভার্সেটাইলিটি।

সো ইজ ইওর ওয়াইফ।

ফর হোয়াট?

ফর হার বিউটি।

সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম ও উঠলেন। কিন্তু হাসতে আরম্ভ করেই ভটকাই-এর মনে পড়ে গেল যে, ও কথাও বলতে পারে না, শুনতেও পায় না। তাই মাঝপথেই হাসি থামিয়ে ও একখানা মুখ যা করল, তা দেখে মনে হল ঢাকা আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়ের সারিবাদি-সালসাই বুঝি আধ গেলাস গিলেছে এক চুমুকে।

কেনেথ বললেন ঋজুদাকে, হোয়াটস ইওর ড্রিঙ্ক?

আপনি যা খাবেন তাই খাব। আমার নিয়মিত খাবার অভ্যেস নেই।

আমাদের তিনজনের চোখ কপালে উঠে গেল। ঋজুদা কখনই এসব খায় না। কেউ খেলে, অবশ্য বাধাও দেয় না। দু-একবার জঙ্গলে বিপদে-আপদে কনিয়াক খেতে দেখেছি আর বাঘমুন্ডার বাঘিনীটি যখন ঋজুদাকে আহত করে নন্দিনী নালার পাশে, তখন অংগুলের বিমলবাবুর দেওয়া স্কচ-হুইস্কি খেয়েছিল, স্ট্রেইট ফ্রম দ্যা বটল, ওষুধ হিসেবে, শক কাটাবার জন্যে, যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে সে জন্যে।

কেনেথ বললেন, আমি কনটেসা রাম খাই। ডরোথিও তাই খায়। এখানে তো সবকিছু পাওয়া যায় না। রাঁচির এক আর্মি অফিসার আছেন তিনিই মিলিটারি কোটা থেকে তুলে রাখেন সস্তাতে, মাসে একবার রাঁচি গেলে নিয়ে আসি।

ঋজুদা বলল, আমি আপনারা কী খান তা না জেনে আন্দাজেই বাকার্ডি হোয়াইট রাম, গিলবীর্জ জিন আর ব্ল্যাকডগ হুইস্কি নিয়ে এসেছি। ব্ল্যাকডগ তো আজকাল এখানেই হচ্ছে।

বাঃ বাঃ করেছেন কী? এসব তো খুবই দামি জিনিস। এমন অপাত্রে দান। হাতে করে এনেছেনই যখন তাহলে আপনি হুইস্কিই খান।

না, না। এ সবই আপনাদেরই জন্যে। আমি, আপনারা যা খাবেন তাই খাব।

কেনেথ উঠে গেলেন লিভিং রুমের এক কোনাতে। সেখানেই তাঁর সেলার এবং ছোট্ট বার। ডরোথি ভিতরের খাবার ঘর থেকে বরফ নিয়ে এলেন। আর লেবুর স্লাইস। ডালমুট-এর একটি প্যাকেট খুলে বড় প্লেটে রাখলেন, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, নাউ টেল মি ইয়াং ওয়ানস, হোয়াট আর ইওর ড্রিঙ্কস?

এনিথিং সফট।

তিতির বলল।

এখানে তো থাম্পসআপ বা কোক ভাল পাওয়া যায় না। ওসব আজকাল জালও হয় শুনি। তোমাদের অরেঞ্জ স্কোয়াশ বা লেমন স্কোয়াশ-এর সঙ্গে ঠাণ্ডা জল আর বরফ দিয়ে শরবত করে দিই?

ফাইন।

তিতির বলল।

তোমাদের বরফ দেব তো? না কি গান গাও কেউ?

হ্যাঁ, বরফ দিতে পারেন সকলকেই।

আমি বললাম।

ভটকাই সেই যে ইংরেজি বলতে হবে, সেই ভয়ে হাঁ হয়ে রয়েছে তো রয়েছেই। এমন করেই হাঁ করে আছে যে মুখে মশা ঢুকে যায়।

আইস ফর য়্যু? মিঃ বোস?

ইয়েস প্লিজ! প্লেন্টি।

সকলের পানীয় যখন দেওয়া শেষ হল তখন ডরোথি বললেন, আমি একবার কিচেনে গিয়ে অবস্থাটা দেখে আসি। তোমরা গল্প করো। আমি এই এলাম বলে।

তিতির দাঁড়িয়ে উঠে বলল, ডু ইউ নিড এনি হেল্প মিসেস লিন্ডওয়াল?

থ্যাঙ্কস আ লট। কোনও দরকার নেই। আমার একজন মেইড আছে সাহায্য করার জন্যে। তোমরা গল্প করো।

মাজিদ বলছিল আপনার শিকারের খুব শখ আছে।

ছিল। একসময়ে।

তারপরেই বলল, আমাদের নেবার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রামদাস-এর বাড়িটা এখন দেখলে তার আগের রূপ ভাবতেও পারবেন না। একেবারেই অন্যরকম ছিল। খামারবাড়ি যেমন হওয়া উচিত আর কী। এটা ছিল দাশগুপ্তর বাড়ি। ওঁরও শিকারের শখ ছিল। বাড়িটার সঙ্গে পেছনের জঙ্গলের সীমানার তো কোনও ঝগড়া ছিল না। শুয়োর, লেপার্ড, ভালুক সবই আসত।

আমার বাংলো থেকেও তো একদিন মালীর কুকুর নিয়ে গেল লেপার্ডে। পেছনের নালাতে ছিল ধেড়ে ধেড়ে শেয়ালের আড্ডা। রাতের বেলা বাংলোর হাতাতে ঢুকে এসে কামড়াকামড়ি করে পেয়ারা খেত।

ঋজুদা বলল।

সত্যি। এখানের গোরুরা, কুকুরেরা, শেয়ালেরা সকলেই পেয়ারা খায়। পরিবেশের সঙ্গে মানুষ এবং প্রাণী কী দারুণ মানিয়ে নেয় ভাবলেও ভাল লাগে।

এবারে বলুন শুনি শিকারের কথা। কী কী শিকার করেছেন আপনি অস্ট্রেলিয়াতে? এখানেই বা কী মারলেন? শুনেছি, আপনার নিজের ওয়েপন নেই?

না। এখানে নেই। তবে ওখানে ছিলই। অনেকই ওয়েপন ছিল আমার। যেমন সব স্পোর্টসম্যানেরই থাকে।

অস্ট্রেলিয়াতে কি শিকার-প্রাণী তেমন কিছু আছে?

আমি পূর্ব আফ্রিকাতেও সাফারি করেছি। উত্তর আমেরিকাতেও পারমিট নিয়ে মুজ মেরেছি।

তাই? উত্তর আমেরিকাতেও? তা অস্ট্রেলিয়া তো শুনেছি ভীষণই সুন্দর জায়গা। দ্যা গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ—আরও কত কী আছে দেখবার। না?

হ্যাঁ। তাই ভাবি মাঝে মাঝে। কার ভাগ্য কার জীবন যে কবে কোথায় টেনে আনে কে বলতে পারে! ডরোথির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াতেই। এখানের মানে গঞ্জ-এর মিস্টার অ্যান্ড মিসেস কাব্রাল সিডনিতে সেটল করেছেন।

আরে! চেনেন না কি তাঁদের। আমি তো মিস্টার কাব্রাল-এর মেয়ের কাছ থেকেই গঞ্জ-এর বাংলোটা কিনি। আমাকে বিক্রি করার পরই তো ওঁরা অস্ট্রেলিয়াতে চলে গেলেন। তাঁর স্বামী মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। নামটা মনে করতে পারছি না।

ওর নাম জোসেফ।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। মনে পড়েছে।

তারপর?

তারপর আর কী? আমি তো অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা নই, আমিও গেছিলাম সেখানে বেড়াতেই। ডরোথির সঙ্গে কাব্রোলদের বাড়িরই এক পার্টিতে দেখা হল। তারপরই আমার জীবনের এই নতুন অধ্যায়।

তারপর একটু চুপ করে রইলেন তিনি। এমন সময়ে ডরোথি এসে ঘরে

ঢুকলেন।

কেনেথ বললেন, ডরোথির সঙ্গে প্রেমে পড়লাম প্রথম দর্শনেই। যাকে বলে, হেড ওভার হিলস। কিন্তু ডরোথি ফেলল আমাকে বিপদে। সে বলল, দিদি-জামাইবাবুর কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না আমার বাবা-মায়েরও আর কোনও সন্তানই ছিল না। সকলেরই যা-কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছিল তা আমাকেই তাঁরা দিয়ে গেছিলেন। তার মূল্য টাকাতে বেশি নয়। কিন্তু সেন্টিমেন্টে অনেকই। আমি বললাম, আমি একজন ভাস্কর। পশ্চিমী দেশে বা নিদেনপক্ষে অস্ট্রেলিয়াতে থাকলেও আমি যা উপার্জন করতে পারব তা যথেষ্ট আমাদের দুজনের পক্ষে। তোমাকে রানির মতো রাখতে পারব। কিন্তু...

কিন্তু কী?

কিন্তু ডরোথি বলল আমেরিকার বা অস্ট্রেলিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে আমার খাপ খায় না। তোমরা সবসময়ই ওপরের দিকে চেয়ে আছ। আমার দেশ ভারতবর্ষ। ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে যাও তো দেখবে নির্জনে অমন কাজের পরিবেশ কোথাওই নেই। তোমাকেও আমি ভারতীয় দর্শনে প্রভাবিত করব।

বাঃ।

ঋজুদা বলল, একটা টাক শব্দ করে গ্লাসটা শেষ করে, সাইড টেবল-এ নামিয়ে রেখে।

আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ঋজুদার দিকে। কেনেথ ও ডরোথিও একটু অবাক হলেন, কারণ তাঁদের গ্লাস-এর এক-তৃতীয়াংশও খালি হয়নি তখনও।

কেনেথ উঠে বললেন, লেট মি ফিল উওর গ্লাস।

ঋজুদা বলল, নো নট নাউ। একসঙ্গেই নেব। তোমরাও বটমস আপ করো তাড়াতাড়ি। তারপরে।

আমি বুঝলাম পেট থেকে কথা বের করার জন্যে ঋজুদা ওঁদের বেশি মদ্যপান করাতে চায়। ওঁরাই যদি মাতাল হয়ে যান, মানে, যাঁরা রোজ এসব ছাইভস্ম খান, তাহলে তো ঋজুদাকে কাঁধে করে বয়ে ক্যামেরনের গেস্ট হাউসে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।

আমরা তিনজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

কেনেথ ও ডরোথি ঋজুদাকে কোম্পানি দেবার জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁদের গ্লাস শেষ করলেন। ডরোথি বললেন, ওয়েল, ইফ আই গেট ড্রাঙ্ক, উ্য ওন্ট হ্যাভ এনি ডিনার। মাইন্ড উ্য।

ডাজনট ম্যাটার।

ঋজুদা বলল।

হঠাৎ ডরোথি তিতিরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সকলেই পর্ক খাও তো?

ঋজুদা কথা কেড়ে বলল, শুয়োর তো রামচন্দ্রও খেতেন। শুয়োর কে না খায়।

ভাবলাম, এক গ্লাস খেয়েই কথা কাড়তে শুরু করল, এর পরে আর কী কাড়বে

কে জানে।

বোবা ও কালা ভটকাই আপত্তি জানাতে চাইল খাওয়ার ব্যাপারে কিন্তু কী করে আপত্তি করবে ভেবে পেল না।

আমি ওর অবস্থাটা খুবই উপভোগ করছিলাম। তিতিরই ওকে শেষমেশ বাঁচাল। বলল, ভটকাই-এর জন্যে ডিমের যদি কিছু একটা করে দিতে বলেন মেইডকে...

নিশ্চয়ই! বাই অল মীনস। তা ছাড়া, চিকেন বাটার-মশালাও আছে। পর্ক-এর ভিণ্ডালু করেছি।

ঋজুদা বলল, বাঃ।

ওরে রুদ্র। জমে যাবে আজ।

আমার লজ্জা করতে লাগল। আমরাই বুঝে গেলাম যে ঋজুদার নেশা হয়ে গেছে, তাহলে ওঁরা কী মনে করছেন!

'ধূর্ত' শব্দটা খারাপ অর্থেই ব্যবহৃত হয় কিন্তু আজ রাতে ঋজুদা যেভাবে কেনেথকে ফাঁসাবার জন্যে ধাপে ধাপে এগোচ্ছে তা দেখে ঋজুদা সম্বন্ধে আর কোন শব্দ ব্যবহার করব তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মনে হল, কেনেথ বড় সরল আর ভাল মানুষ। সে যদি সত্যিই খুন করে থাকে স্টিভ এডওয়ার্ড-এর বন্ধুকে, কী করে করল সেই জানে। সত্যি সত্যি খুন তো নাও করে থাকতে পারে। স্টিভের কথাই যে ধ্রুব সত্যি তা ঋজুদা জানল কী করে! স্টিভেরও অন্য কোনও কারণে কেনেথের বা ম্যাক-এর ওপরে যে কোনও বিদ্বেষ নেই তাই বা জানল কী করে।

নানা কথা বলতে বলতে কেনেথ অনেকগুলো রাম খেয়ে ফেললেন। ঋজুদাও সমানে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল।

তিতির আমাকে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে বলল, রুদ্র তুমি কি হেঁটে গিয়ে কিষুণকে গাড়িটা নিয়ে আসতে বলবে? এরপরে কী হবে জানি না। রাতও সাড়ে নটা বাজতে চলল। বাইরে তো নিশুতি রাত।

আমি বললাম, পার্কালাম। তামিলনাড়ুর কামরাজ নাদার-এর মতো। পার্কালাম একটি তামিল শব্দ। মানে হল, wait and see! এই শব্দটি প্রয়োজনে আমি আর তিতির দুজনেই ব্যবহার করি।

নানা কথার তোড়ে, হাসির বানে, শিকারের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে কেনেথ যে কখন ঋজুদার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেললেন তা তিনি বুঝলেন না। গল্প করলেন উত্তর কানাডাতে মুজ মারার। বললেন, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রাইফেল ছিল হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ডের তৈরি পয়েন্ট থ্রি সেভেন্টি ফাইভ ম্যাগনাম। ডাবল ব্যারেল। কিন্তু মুজ-এর মতো বড় জানোয়ার, আফ্রিকাতে সিংহ, আমেরিকাতে জাগুয়ার বা বাইসন মারতে উনি ব্যবহার করতেন পয়েন্ট ফোর ফিফটি ফোর হান্ড্রেড ডি বি বি এল জেফরি নাম্বার টু।

ঋজুদা বলল, আমারও একটা করে আছে। জেফরির এ রাইফেলটা দিয়েই সুন্দরবনে এবং অন্যত্রও মানুষখেকো মেরেছি।

আমি হেসে বললাম, গত শীতে বাঘমুন্ডার বাঘিনী ম্যানইটারটা কী দিয়ে মেরেছিলে তাও বলো।

ঋজুদা হেসে উঠল।

কেনেথ আর ডরোথি হাসির কারণ না বুঝে বোকার মতো চেয়ে থাকলেন। মাতাল হলে মানুষকে বেশি বোকা লাগে।

গত বছর মেরেছেন?

হ্যাঁ। ম্যানইটার ডিক্লেয়ার্ড হয়েছিল তো। ওড়িশাতে।

আবারও কখনও গেলে আমাকে খবর দিয়ো কিন্তু।

ঋজুদা বলল, শ্যুওর। ইটস আ ডিল।

ঋজুদার চোখ-মুখের ভাব যেন কেমন হয়ে গেছে। চোখদুটো লাল। কীরকম চোখে যেন তাকাচ্ছে ডরোথির দিকে। ডরোথি নিজেও অনেক মদ খেয়েছেন বলেই বোধহয় তা বুঝতে পারছেন না।

ভটকাই প্রায় আমার কানে কানে বলল, যতই সুন্দরী হোক আমার সেশ্যেলস-এর বউদির মতো নয়।

আমি হেসে ফেললাম।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হতে প্রায় সাড়ে দশটা বাজল। দারুণ ভাল ক্যারামেল কাস্টার্ড বানিয়েছিলেন ডরোথি।

ঋজুদা জিভে দিয়ে বলল, নো ওয়ান্ডার। কার বোন তা দেখতে হবে তো।

আপনারা কদিন আছেন?

আমরা কালই চলে যাচ্ছি।

ঘরের মধ্যে বোমা ফাটিয়ে বলল, ঋজুদা।

আমি ভাবছিলাম, এই জন্যেই বাবা বলেন, মদ খাওয়া খুবই খারাপ।

ইসস। কালকেই? এক-দুদিন থাকলে এদের জন্যে একটু কেক করে পাঠাতাম।

পরের বার হবে। আমাদের একটু ডালটনগঞ্জে যেতে হবে। সেখানে আমার ছোট ভাইয়ের মতো, মোহন বিশ্বাসের শরীর খুবই খারাপ। ব্লাড সুগার ভীষণ হাই হয়ে গেছে। এদিকে এলামই যখন, তখন দেখেই যাই একটু।

ভটকাই-এর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বোবা এবারে কথা বলবেই। পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাকে আটকাতে পারবে না।

আমি আর তিতির বুঝলাম ওর মাথাতে চাট্টি নদীর পিকনিক ঘুরছে। কিন্তু ঋজুদা কী করে, কেন করে, কখন করে, অন্য আনপ্রেডিকটেবল মানুষদেরই মতো তা শুধু সে-ই জানে!

ডাইনিং রুম থেকে লিভিং রুম-এ এসে ঋজুদা বলল, এরপরে একটু ড্রাম্বুই অথবা কনিয়াক অথবা কোয়াস্ত্রু হলে একেবারে জমে যেত।

ওসব কী জিনিস, খায় না মাথায় মাখে, আমাদের কারোরই জানা ছিল না।

কেনেথ আর ডরোথি খুবই লজ্জিত হলেন। বললেন সরি। আমার কাছে যে কিছুই নেই। দাঁড়াও! টাকাপয়সা সব আনাই। ইন্ডিয়ান সিটিজেন হয়ে নিই, তারপর তোমাদের আলাদা করে ডাকব তখন কলকাতা থেকে।

এই যে আমার কার্ড।

ঋজুদা পার্স খুলে কার্ড বের করে দিল।

অথচ কারোকেই সচরাচর দেয় না।

কেনেথ ডরোথিকে দেখিয়ে বলল, এখানে ওই আমার কার্ড।

তারপর বলল, পরের বার বন্দুক নিয়ে এসো শীতে। তখন কুলথি আর অড়হর ডাল খেতে আসে শম্বর, আর এখন থাকলে কালই শুয়োর মারতে পারতে মকাই-এর ক্ষেতে।

ডরোথি বলল, তুমি কার কাছে কী বলছ। মায়ের কাছে মাসির গল্প। ঋজু বোস জানেন না এমন কোনও খবর নেই ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের।

হঠাৎই ঋজুদা উঠে পড়ে একে একে দুজনের হাত ধরে বলল, ওয়েল ইট ওজ, ভেরি ভেরি নাইস মিটিং উ্য ট্যু। কাম অ্যান্ড ভিজিট মি অ্যাট ক্যাল। আই হ্যাভ আ স্পেশাস ফ্ল্যাট ইন আ নাইস লোকালিটি। উ্য মে পুট আপ উইথ মি, ইফ উ্য উইশ। আই উইল ফিল অনার্ড।

'পুট আপ' মানে, ওঠা বুঝলাম। কোথায় উঠেছেন? ইংরেজি হবে 'হোয়ার হ্যাভ উ্য পুট আপ' বুঝলাম। ভাল করে কান খুলে শুনলে যাঁরা ইংরেজি ভাল জানেন, শুধু ইংরেজিটাই কেন, যে-কোনও ভাষাই, শিখে নেওয়া যায় একটু একটু করে। তবে শেখার ইচ্ছেটা থাকা চাই।

ওঁরা বড় রাস্তা অবধি আমাদের পৌঁছে দিলেন দুজনে। তারপরে 'গুডনাইট'! 'গুডনাইট'! করে আমরা রওনা হলাম। ঋজুদা ডরোথির ধবধবে নরম ডান হাতটা নিজের হাতে নিয়ে সামনে ঝুঁকে তাঁর হাতের পাতাতে একটা আলতো চুমু খেল। ইংরেজি সিনেমাতে যেমন দেখা যায় আর কী! আজ একেবারে সাহেব হয়ে গেছে ঋজুদা।

একই অঙ্গে কত রূপ।

ভাবছিলাম, ঋজুদার সত্যিই অনেকই রূপ। যেখানে যেমন মানায়।

তিতির বলল, এত রাত হয়ে গেল, ডাকাতি করবে না তো কেউ?

কেনেথ কথাটা শুনে বললেন, এখানের মানুষেরা খুবই ভাল। কৃতজ্ঞও। গরিব, তাই ছিনতাই-টিনতাই করে মাঝে মাঝে। মানে মাগিং আর কী।

শিখলাম, ছিনতাই-এর ইংরেজি "মাগিং"।

তারপর বললেন, ঋজু বোসকে ওরা কিছু বলবে না। ঋজু বোস আর সেই লেখকই তো এই অজ-পাড়াগাঁকে মান দিয়েছেন।

শেষবার 'গুডনাইট' বলে আমরা পথে পা বাড়ালাম।

নিশুতি রাত। শিশিরে পথের ধুলো ভিজে গেছে। রাত পাখিরাও আজ ঘুমোতে চলে গেছে মনে হয়। দুপাশের গাছ-গাছালি থেকে সুন্দর এক মিশ্র গন্ধ বেরোচ্ছে।

ঋজুদা সোজা পা ফেলে হেঁটে যেতে লাগল। আমাদের আগে আগে। পা একটুও টলল না।

কী লোকরে বাবা!

তিতির বলল, ফিসফিস করে।

একটিও কথা বলল না আমাদের সঙ্গে ঋজুদা।

তার মুড দেখে আমরাও কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেললাম। বেশ ঠাণ্ডা। কে যেন বরফের সাঁড়াশি দিয়ে কান দুটো ছিঁড়ে নিচ্ছে।

কুয়াশার জন্যে চাঁদের আলো উপভোগ করা যাচ্ছে না।

একটু পরেই ঋজুদা কী একটা গান গাইতে লাগল। বারে বারে। প্রথমে গুনগুন করে। তারপর আস্তে আস্তে গানটা জোর হতে লাগল। এবারে বোঝা যেতে লাগল কথাগুলো। সেই নিঝুম শীতের রাতে গাছগাছালির মধ্যের জঙ্গলে লাল মাটির পথে আর শিশির ঝরানো আকাশে গানটার অনুরণন উঠতে লাগল। ঋজুদা আমাদের অনেক সময় গাইতে বলেছে কিন্তু নিজে কখনও এমন করে গান গায়নি একা একা। আমরা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে চলতে লাগলাম ঋজুদার একটু পেছন পেছন। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে।

Show me the way to go home
I am tired,
And I want to go to bed:
Show me
I had a little drink about an hour ago
Which has gone right to my head
Show me the way to go home
I want to go to bed."

তিতির আমাকে হাত ধরে কাছে টেনে বলল, অ্যাই রুদ্র! এই গানটাই তো আছে Pat Glaskin-এর গলাতে "একটু উষ্ণতার জন্যে" উপন্যাসের শেষে।

তার মানে?

তার মানে, ঋজুদা বইটা পড়েছে।

আমি বললাম, তোমার নেশা হয়ে গেছে এতজন মাতালের সঙ্গে থেকে। খেয়েদেয়ে কাজ নেই ঋজুদার! তোমার ওই ন্যাকা-বোকা বুদ্ধদেব গুহকে দু চোখে দেখতে পারে না ঋজুদা।

পরদিন উঠতে উঠতে একটু দেরিই হল। ঋজুদা এখনও ওঠেনি। আমি তিতির আর ভটকাইকে বললাম, তোরা থাক। কাল রাতে কী ব্যাপার হল কিছুই বোঝা গেল না। আমি ফ্যাক্স মেসেজটা নিয়ে আসতে একাই যাচ্ছি। কিষুণ অবশ্য থাকবেই সঙ্গে। এখন তো সাড়ে ছটা বাজে। আটটার মধ্যেই রাঁচি পৌঁছে যাব। ঋজুদার বন্ধু স্টিভ যদি ফ্যাক্সটা পাঠিয়ে থাকে তবে আমি আটটাতে পৌঁছেই সেটা পাব। না পেলেও কিছু করার নেই। ফিরে আসব।

চা খেতে খেতে তিতির দুঃখ করছিল যে, এত সুন্দর জায়গা ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ অথচ ভাল করে ঘুরে দেখার আগেই চলে যেতে হবে।

আমি বললাম, ঋজুদা আস্তে আস্তে অনেকই বদলে যাচ্ছে, গেছে, দেখছি। আগের মতো আর নেই।

ভটকাই আরেক কাপ চা ঢেলে দু চামচ চিনি আর তিন চামচ দুধ দিয়ে গুলে শরবত করে চা-টা তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে বলল, আমাদের দিকে না তাকিয়ে, নীচের নদীর দিকে তাকিয়ে, বৎস বদলেরই আরেক নাম হচ্ছে জীবন। চলতে চলতে বদলে যাওয়াই মানুষের ধর্ম, বাঁক-নেওয়া, চর-ফেলা, পাড়-ভাঙা। নদী আর জীবন একই।

বাবাঃ।

তিতির বলল।

ও রুদ্র! এসব কী শুনছি। ভটকাই কলম ধরলে তো তোমার ঋজুদাকে ভাঙিয়ে লেখালেখি সব শেষ।

আমি আমার ঠাকুমা যেমন করে বলতেন, তেমন করে বললাম, 'হায়। হায়। সক্কালবেলায়।'

ভটকাই বলল, রাঁচি যখন যাচ্ছিসই একটু রাবড়ি নিয়ে আসিস তো। আনতে বলতাম জিলিপিই কিন্তু রাঁচি থেকে আসতে আসতে তারা তো ফ্রিজে রাখা চষি-পিঠে হয়ে যাবে।

যথা আজ্ঞা।

আমি বললাম।

তারপর বেরিয়ে পড়লাম এ কথা বলে যে, ঋজুদাকে তুলিস না। হ্যাঙ্গওভার হয়েছে বোধহয়। অভ্যেস তো নেই।

পথে যে পড়ে মাথা ফাটেনি এই তো যথেষ্ট। কী যেন গানটা! আই হ্যাড আ ড্রিঙ্ক অ্যাবাউট অ্যান আওয়ার এগো হুইচ হ্যাজ গান টু মাই হেড/শো মি দ্য ওয়ে টু গো হোম / আই ওয়ান্ট টু গো টু বেড।

ভটকাই বলল।

আমি চলে যেতে যেতে শুনলাম তিতির বলছে, বাবা মুখস্থ করে ফেলেছে যে! গান 'রাইট' টু মাই হেড।

আমার স্মৃতিশক্তি কখনও কখনও বেগ-চিরা হয়ে যায়।

মানে বেগে মগজে প্রবেশ করে এবং যা করে, তা চিরদিন থেকে যায়।

কিষুণ গাড়ি চালাচ্ছিল। সঙ্গে তিতিরও এল। সকালের হৈমন্তী প্রকৃতি। তখনও রাতের শিশির পুরোপুরি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়নি। ঝকমক করছে রোদ ক্লোরোফিল-উজ্জ্বল জঙ্গলে। যেখান থেকে ঋজুদা গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাদের 'ম্যাকলাস্কি'জ নোজ' দেখিয়েছিল তার অনেকখানি নীচে একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গলময় উপত্যকা। তার মধ্যিখানে ছোট্ট একটি গ্রাম। তিতির ফিসফিস করে বলেছিল 'বাসারিয়া'।

কী করে জানলে?

'একটু উষ্ণতার জন্যে' পড়ে।

ভাবছিলাম, কলকাতাতে ফিরে পড়ে ফেলব বইটা। যদিও লেখক আমার সঙ্গে শত্রুতা করছেন। তবে জানেন তো না যে আমিও ঋজু বোস-এর চেলা, আমার নাম রুদ্র রায়—'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'।

তারপরই মনে হল যে, আজই তো আমাদের ম্যাকক্লাস্কি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। অথচ তেমন কথা তো ছিল না। পুরো ব্যাপারটিরই কোনও মাথা-মুণ্ডুই বুঝতে পারছি না। এখন দেখা যাক ঋজুদার বন্ধু স্টিভ এডওয়ার্ড নিউজিল্যান্ডে সিডনির বন্ধু রোনাল্ডোর পাঠানো ফ্যাক্স আদৌ পেল কি না এবং পেলেও উত্তর দিল কি না!

রাঁচিতে যখন ঢুকছে কিষুণের টাটা-সুমো, ও বলল, রাবড়িটা আগে নিয়ে নিই। তারপরে ফিরে আই এস ডি বুথ হয়ে একেবারে টিকিয়া-উড়ান চালিয়ে ফিরে যাব।

বেশ।

রাবড়ি এক কেজি নিলাম। যদিও ভটকাই বলবে, এ তো আমি একাই সাবড়ে দেব। তুই এত হাড়কিপটে যে পরের টাকা খরচ করতেও তোর বুক ফেটে যায়। নিজের টাকা হলে যে কী করতিস!

রাবড়ি নিয়ে বড় রাস্তাতেই রাতু বাসস্ট্যান্ডের কাছে আই এস ডি-র বুথে নামতেই সাতসকালেই মুখে-পান-ভরা আতরের খুশবু-ছড়ানো সবুজ-খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা যুবকটি বললেন, আ গ্যয়া। লিজিয়ে।

কিতনা দেনা পড়ে গা?

আরে সাব কুছো নেহি। কাল তো বহত রুপেয়া লেহি লিয়া।

ইয়ে গাড়ি ডাল্টনগঞ্জকি মোহনবাবুকি হ্যায় উ মেরি পতা নেহি থা। আপলোগ লওট যানেকি বাদ বগলওয়ালা পানকি দুকানিনে মুঝে বাতায়া। ঔর স্রিফ দোহি

তো লাইন হ্যায়। ছোড়িয়ে।

ভাবছিলাম, ঋজুদার এই অদেখা ছোট ভাই 'মোহনবাবু'টিকে একবার দেখা দরকার। তিনি যে দেড়শ কিমি পথ দিয়ে যাওয়া আসা করেন তার দু পাশের সবাই এক নামে তাঁকে চেনে এবং খাতির করে। এমন তো আজকালকার দিনে দেখা যায় না।

দেখলাম সত্যি দু লাইনের ফ্যাক্স মেসেজ।

DEAR WRIJU,

THANK'S A LOT. HE HAD MANY WEAPONS BUT USED .375 MAGNUM DBBL HOLLAND & HOLLAND AND .450-400 JEFFRY NO. 2. FOR BIG GAMES. JEFFRY WAS HIS FAVOURITE!

TAKE CARE

STEVE.

সুক্রিয়া! বহুত সুক্রিয়া। বলে, আমি উত্তেজিত হয়ে গাড়িতে ওঠার আগে ভাবলাম, নিজেই একটা Fax করে দি Steve-কে এ কথা জানিয়ে যে, আপনার MAC TAILOR ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে Kenneth Lindwal সেজে বহাল তবিয়তে বাস করছে।

তারপরে ভাবলাম, সেটা হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে করাটা, ঋজুদাকে জিজ্ঞেস না করে! ঋজুদা যদি বলে, তবে আবারও ফিরে আসব। মিঃ ক্যামেরনের ফোনটা খারাপ। তবু কিষুণকে বলে, ফিরে গিয়ে আরেকবার চেষ্টা করে দেখব ভাবলাম। টেলিফোনে আর সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে তফাত তো খুব নেই। এঁদের যখন-তখন ইচ্ছামৃত্যু, তেমন যখন-তখন আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। পকেট থেকে টেলিফোনের বইটা বের করে সি-তে খুঁজতেই বেরিয়ে পড়ল Cameron D. R. P.O. Macluskigung, Ranchi, Bihar, Pin: 829208 Phone: 06531-6340.

সবুজ-পাঞ্জাবি ভদ্রলোককে বললাম, একবার লাগান তো। ফোনটা খারাপ ছিল, ভাল হল কি না! সংখ্যা শুনে বলে বলে উনি বোতাম টিপলেন। বললেন, লিজিয়ে! রিং তো হো রাহ্যা হ্যায়।

হো রাহা হ্যায়?

বলে আনন্দে নেচে আমি এগিয়ে গেলাম। ফোনটা বাজছিল।

'হাল্লো' বলে কান-ফাটানো চিৎকার করে কেউ একজন ধরল। বলল, গেস্ট হাউস। ঋজুদাকে চাইলাম। ঋজুদা এসে ধরতেই Fax-টা পড়ে শোনালাম ঋজুদাকে।

ঋজুদা বলল, সে তো জানাই ছিল।

কী করব? তোমার বন্ধু স্টিভ এডওয়ার্ডসকে কি ফ্যাক্স পাঠিয়ে দেব কেনেথ লিন্ডওয়াল-এর কথা জানিয়ে দিয়ে?

কী বললি?

ঋজুদা রীতিমত ধমকে বলল আমাকে।

কে জানে কী হল? এখনও কি কালকের নেশা কাটেনি? এমন করে তো কখনও বকেনি ঋজুদা আমাকে।

বলছিলাম, খবরটা কি পাঠিয়ে দেব?

তোমার কিছু করতে হবে না রুদ্রদা। তুমি দয়া করে ফিরে এসো। তুমি মস্ত গোয়েন্দা হয়ে গেছ।

তারপরই তিক্ততার সঙ্গে বলল, তোরা নিজেরাই একটা ডিটেকটিভ ফার্ম খুলে ফেল। তোরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ হয়ে গেছিস। আমার সঙ্গে তোদের আর কোথাওই যাওয়ার দরকার নেই। এবার থেকে আমি সব জায়গাতে একাই যাব। প্রয়োজনে তিতিরকে নেব শুধু।

ঠিক আছে। ছাড়ছি। আসছি আমি।

তাই এসো।

ঋজুদা বলল।

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে আমার প্রায় দশটা হল। গিয়ে দেখি, ঋজুদারা দুজনে চানটান করে তৈরি হয়ে বারান্দাতে বসে আছে। যেরকম চেয়ারের ভাঁজ করা 'হাতল' লম্বা করে দিলে 'পাতোল' হয়ে যায় পা তুলে বসার জন্যে, সেইরকম একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়ে বসে ঋজুদা পাইপ খাচ্ছে। দেখে মনে হল সকলের ব্রেকফাস্টও হয়ে গেছে। গত রাতে শুধু ভটকাই বোবা ছিল। আজ মনে হচ্ছে ঋজুদাও বোবা।

রাবড়িটা কিষুণকে খাওয়ার ঘরের ফ্রিজ-এ তোলার বন্দোবস্ত করতে বলে বললাম, তুম নাস্তা কর লেও কিষুণ। ইতিমধ্যে গেস্ট হাউসের বাবুর্চি দৌড়ে এসে বলল, ছোটা-হাজরি লাগা দু' সাব?

'ছোটা-হাজরি' শব্দ দুটো শুনে ব্রিটিশরাজ-এর কথা মনে পড়ে গেল। এখনও গঞ্জের পুরনো মানুষেরা ওই সব শব্দ ব্যবহার করে দেখছি। মিস্টার ক্যামেরন এখানে ঘোড়ার প্রজনন-এর জন্যে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। সে ব্যবসা চলল না কিন্তু জায়গাটির প্রেমে পড়াতে বাঁধা পড়ে গেছেন নাকি। তাঁর সঙ্গেও এ যাত্রা দেখা হল না। শুনেছি কালো অ্যাংলো।

আমি বললাম, আমি কিছু জানি না। তুমি বড়াসাবকে জিজ্ঞেস করে এসো।

কেন? ওঁরা নাস্তা করেননি এখনও।

না তো। আপনার ইন্তেজারিতেই তো আছেন।

তাই?

জি হুজৌর।

আমি বারান্দাতে গিয়ে পৌঁছাতেই তিতির বলল, ব্রেকফাস্ট দিতে বলি ঋজুদা?

বল। রুদ্র তো এসেই গেছে।

আমি কোনও কথা না বলে ফ্যাক্স মেসেজটা ঋজুদার হাতে তুলে দিলাম।

ঋজুদা বলল, ব্রেকফাস্ট করে আমরা স্টেশনে যাব। তাড়াতাড়ি চান করে নে তুই। স্টেশনে আমাদের ছেড়ে দিয়ে কিষুণ গাড়ি নিয়ে, বাই রোড এগিয়ে যাবে। ওপথে বিজুপাড়া থেকে সমান রাস্তা ক্ষেতি-জমিন-টাঁড়-বেহড়-এর মধ্যে মধ্যে গেছে। কুরু থেকে রাস্তা ডানদিকে ঘুরেছে চান্দোয়া-টোড়ির দিকে। সে পথে জঙ্গল ও ঘাট আছে। আমঝারীয়ার বাংলো আছে দেখার মতো। যাকগে, যেতে যেতে এসব বলব এখন। আমরা এগোচ্ছি। তুই কাক-চান করে আয়। রাতে ভাল করে চান করিস মোহনের ওখানে। পরশু তোদের বেতলা ন্যাশনাল পার্ক-এ নিয়ে যাব। কোয়েলের কাছে। তারপর বেতলা হয়ে, কেঁড় হয়ে গাড়ুর কাছের পাকা ব্রিজ দিয়ে কোয়েল পেরিয়ে, মীরচাইয়া ফলস-এর পাশ দিয়ে নিয়ে যাব 'মারুমার'-এ।

তিতির চেয়ারটা ঠেলে উঠতে উঠতে বলল, 'কোজাগর'-এর 'ভালুমার'-এর কাছে?

ভালুমার বলে কোনও জায়গা নেই। যেমন রুমান্ডি বলেও কোনও জায়গা নেই। ওসব তোর ফেভারিট লেখকের লোক-ঠকানোর ধান্দা। তবে মারুমার-এর সঙ্গে ভালুমার-এর মিল যেমন আছে অনেকই, তেমন রুমান্ডির সঙ্গে কুমান্ডির।

তুমি পড়েছ? 'কোয়েলের কাছে' বা 'কোজাগর'?

ওসব ট্রাশ লেখকের বাজে লেখা পড়ার সময় আমার নেই।

ওরা ডাইনিং-রুমের দিকে হেঁটে যেতে যেতে তিতির বলল, আমি শুনলাম আমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে, কাল রাতে তুমি একটি গান গাইছিলে সেই গানটি, প্যাট গ্লাসকিন-এর মুখে আছে 'একটু উষ্ণতার জন্যে'র শেষে।

তাতে কী? সেই গানটা কি তোর লেখকের পার্সোনাল প্রপার্টি? প্যাট গ্লাসকিনকে আমিও চিনতাম। আমারও কি বাংলো ছিল না এখানে? প্যাটের মুখে ওই গানটি আমি বহুবার শুনেছি।

তিতির চুপ করে গেল।

ওরা খাওয়া শুরু করতে করতে আমি গিয়ে বসলাম। ঋজুদা বলল, তোদের ট্রেনে করে নিয়ে যাচ্ছি ডালটনগঞ্জ কারণ এই পথটা দেখার মতো। ফেরার সময় তো কিষুণের সঙ্গেই গাড়িতে রাঁচি এসে ট্রেন ধরব, তখন গাড়ির পথ দেখতে পাবি। এইসব জায়গাতে দিনের বেলা ঘুরে বেড়াতে হয় পায়ে হেঁটে, কি গাড়িতে, কি ট্রেনে, বসন্তকালে। আহা কী রূপ তখন। ভারতের বসন্তবনের যা রূপ তেমন রূপ পৃথিবীর আর কোনও জঙ্গলেরই নেই।

কোন কোন স্টেশন পড়বে পথে?

কত স্টেশন। এই লাইনের, মানে গোমো—বারকাকানা—বারকাকানা-চৌপান

রুটের স্টেশনগুলির নাম এত সুন্দর, সব আদিবাসী নাম, যে তা বলার নয়।

যেমন?

যেমন মহুয়া-মিলন, চান্দোয়া, টোড়ি, খিলাড়ি, রিচুঘুটা, হেহেগাড়া, হেন্দেগির, চিপাদোহর, লাতেহার, আরও কত বলব!

বাঃ।

ভটকাই উত্তেজিত হয়ে বলল।

কেচকী জায়গাটা কোথায় ঋজুদা?

কাল দেখাব। সেখানে কোয়েল আর ঔরঙ্গা এসে মিলেছে। ছোট্ট বাংলো আছে একটা। তিতিরের ফেভারিট লেখকের কল্যাণে বন থেকেও শান্তি চলে গেছে। কেচকী থেকেও। সবসময়ে কলকাতার কিচির-মিচির-পার্টিরা এসে পিকনিক করছে।

রাবড়ি আনিসনি? পরোটার সঙ্গে কেমন জমত বলত?

ভটকাই বলল!

এনেছি।

এনেছিস। কোথায়?

ফ্রিজে আছে।

বের করতে বল, বের করতে বল। কিষুণকেও দিতে বলিস।

ঋজুদা বলল।

পাতলা পাতলা পরোটা, মুচমুচে করে ভাজা, বেগুন ভাজা, মেটে চচ্চড়ি, লেবু আর বড়কা বড়কা লঙ্কার আচার আর রাবড়ি—একেবারে জমে যাবে।

হ্যাঁ। ভাল করে খেয়ে নে। নো লাঞ্চ আজকে। রাতে মোহনের কাছে ডিনার। কী খাবি? মিষ্টি পোলাউ আর মুরগির মাংস, না বিরিয়ানি, না লিট্টি? ফোন তো ঠিকই হয়ে গেছে। মোহনকে ফোন করে দিচ্ছি।

লিট্টিটা আবার কেন? কাল রাতে তো শুয়োরের ভিণ্ডালু না গিন্ডালু খেলে। লিট্টি আবার কীসের মাংসে তৈরি হয়? সজারু না শেয়াল?

না, না লিট্টি ছাতু দিয়ে তৈরি হয়। তবে ডেলিকেসি। খেয়ে দেখতে পারিস। গাওয়া ঘিতে চুবিয়ে চুবিয়ে খেতে হয়, সঙ্গে আলুর ঝাল-তরকারি, লেবুর আচার আর ডালটনগঞ্জের জেলহাতার ঝুমরুর দোকানের রাবড়ি।

আঃ, আঃ, আঃ: আর বোলো না। আনন্দে আমি মরেই যাব। মহুয়া-মিলনে, রিচুঘুটা, হেহেগাড়া তারপর আবার রাবড়ি।

তারপরই ভটকাই বলল, চল রুদ্র। আমি আর তুই একটা মিষ্টি আর নোন্তার দোকান খুলি। ঋজুদা তো আজকাল খুনি ধরে ধরে ছেড়ে দিচ্ছে। আমার মেজমামা যেমন মিরগেল মাছ ধরে আর ছাড়ে। বলে, আহা কেষ্টর জীব। তাই আমাদের গোয়েন্দাগিরি আর অ্যাডভেঞ্চারের ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ।

ভাবলাম, এখুনি দেবে ঋজুদা ভটকাইকে।

কিন্তু ঋজুদা ঠাণ্ডা গলাতে টোস্ট-এ মাখন লাগাবারই মতো স্নেহ মাখিয়ে বলল, জানি যে, তোরা খুবই অবাক হয়েছিস। তবে ওসব নিয়ে এখানে আর কোনও আলোচনা নয়। ট্রেনে ডালটনগঞ্জ যেতে যেতে সব বলব।

তারপর বলল, তোরা কী খাবি ভেবে বল। মানে, রাতে। সেই মতো ফোন করে দেব মোহনকে। আর ব্রেকফাস্ট সেরে মালপত্রগুলো গাড়িতে তোল কিষুণের সঙ্গে। কিষুণকে রাবড়ি পাঠালি? না, নিজেই সব মেরে দিলি। কীরে ভটকাই?

এই তো পাঠাচ্ছি। খায় সবাই, বদনাম হয় শুধু আমার। মকবুল মিঞা জলদি আও। ড্রাইভারবাবুর জন্যে রাবড়ি লে যাও।

কী খাবি বলবি তো তিতির।

লিট্টি। লিট্টি। লিট্টি। ভটকাই বলল, আগে কখনও খাইনি।

ঋজুদা ফোন করতে গেল অফিস ঘরে। তারপরই ঋজুদার গলা শুনতে পেলাম।

হ্যাঁ। কে? মোহন? নেই? কোথায় গেল? রাংকাতে? সে কী, এই তো শুনলাম শরীর খুব খারাপ। ব্লাড-সুগার খুব বেড়েছে? কথা না শুনলে জোর করো। তোমরা আছ কী করতে। আচ্ছা নিমাই, একটু রমেনদাকে দাও তো।

বলো, রমেনদা কেমন আছ? না, না কলকাতা থেকে নয়, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ থেকে বলছি। হ্যাঁ। একটু কাজে এসেছিলাম। বাবলু কেমন আছ? শোনো, আমরা ট্রেনে ডালটনগঞ্জ পৌঁছচ্ছি। আজই। চারজন। আপ চৌপান এক্সপ্রেস-এ। সেটা এগারোটা নাগাদ আসবে এখানে। স্টেশনে একটা গাড়ি পাঠিয়ো।

কে? হ্যাঁ আছে তো। কিষুণ গাড়ি নিয়েই যাচ্ছে। আমরা ট্রেনে যাব। ও যদি ট্রেনের আগে পৌঁছয় তো ওকেই পাঠাতে পার। নইলে অন্য কোনও ড্রাইভারকে পাঠিয়ো।

আর শোনো, রাতে আমার সৈন্যদল লিট্টি খেতে চায়। জুম্মান আছে তো?

নেই? কাল আসবে?

তো লালটু পাণ্ডে আর গিরধারীদেরই বোলো। কাল জুম্মান এসে না হয় পোলাও-মাংসই খাওয়াবে। ঠিক আছে। মোহন রাতেই তো ফিরবে? তবে আর কী? ভাগ্যকে খবর দিয়ো একটা। আরে! ভাগ্য কটা আছে ওখানে? অধিকাংশই তো হতভাগ্য। পেট্রল পাম্পের মালিক ভাগ্যধর দাস।

ঠিক আছে। ছাড়ছি।

আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে কিষুণ গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

ট্রেনটা প্রায় আধঘণ্টা লেট ছিল। আমাদের দেখেই মাজিদ দৌড়ে এল। চা খাব নাকি জিজ্ঞেস করল। টোড়ির স্টেশন মাস্টার কোনও কাজে এসেছিলেন এখানে।

তিনি ঋজুদাকে চিনতেন। তিনি এসে অনেক গল্প-টল্প করলেন। পুরনো দিনের কথা। উনি নাকি আগে চিপাদোহরের এ এস এম ছিলেন।

ট্রেনে যারা এল বারকাকানা বা খিলাড়ি থেকে, তাদের কেউই টিকিট কেটেছে বলে মনে হল না। তবে দু-একজন দয়াপরবশ হয়ে গেট-এ দাঁড়ানো চেকারকে কলাটা, মুলোটা, এক জোড়া ডিম এসব হাতে গুঁজে দিয়ে যাচ্ছে দেখলাম।

ঋজুদা বলল, কথাতেই বলে না, 'Charity begins at home। এই যে আইন না-মানার অভ্যেস, জীবনের সবক্ষেত্রেই একদিন অজান্তেই ছড়িয়ে যাবে। ওদের মধ্যে যারা বড়লোকও হবে, তারাও সেলসট্যাক্স দেবে না, ইনকামট্যাক্স দেবে না, রাস্তাতে ট্রাফিক সিগন্যাল মানবে না। অনিয়মানুবর্তিতাতে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে, তা মজ্জায় মজ্জায় সেঁধিয়ে যাবে।

তুমি শুধু এদের দোষ দিচ্ছ কেন ঋজুদা? হাওড়া-শিয়ালদাতে লোকাল ট্রেনে করে যত লক্ষ লক্ষ যাত্রী যাওয়া-আসা করে প্রতিদিনই তাদের মধ্যে কতজন টিকিট কাটে? এরা তো খুবই গরিব, অশিক্ষিত।

আমি তো শহুরেদের সমর্থন করছি না। নীরদ সি চৌধুরি কি এমনি এমনি ব্রিটিশরাজের প্রশস্তি করেছেন। ইংরেজ আমলে কিন্তু আইনশৃঙ্খলার এমন অবস্থা ছিল না। শুনেছি, কারও নাকি সাহসই ছিল না টিকিট না-কেটে যাওয়ার। কলকাতার বা মফস্বলের পথেও কী রিকশ আর কী ঠেলাগাড়ি বা সাইকেল কারোরই উপায় ছিল না আলো ছাড়া সন্ধের পরে পথে বেরবার। গত সপ্তাহে শান্তিনিকেতনে গেছিলাম একটা কাজে। পূর্বপল্লী থেকে অ্যান্ড্রুজপল্লীতে মোহরদির বাড়ি যাব বলে বেরিয়ে কত বার যে সাইকেল রিকশ আর সাইকেলে চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি তা কী বলব। না আছে পথে কোনও আলো, না আছে যানবাহনে। দেখবার কেউই নেই। অথচ সেটা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটা জায়গা। রতনপল্লীর দিকে তো আরও ভয়াবহ অবস্থা।

তারপরে বলল, আসলে স্বাধীনতার মধ্যে যে, কিছু কিছু স্বেচ্ছারোপিত পরাধীনতাও মেশানো থাকে, এইটে আমাদের রাজারা এবং প্রজারাও না-জানাতে আমাদের দেশের সঙ্গে স্বাধীন আফগানিস্তান বা জায়রে বা কঙ্গোর আজও যে খুব একটা তফাত হয়েছে তা বলতে পারি না। এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কী হতে পারে।

আমরা একটা ফার্স্ট-ক্লাস কামরাতে উঠেছি টিকিট কেটে কিন্তু পয়সাই নষ্ট হয়েছে তাতে। সেই কামরাতে ছাগল-মুরগি, লাউ কি কুমড়োর সঙ্গে করে হাটুরেও উঠেছে, ভিখারি, ধানের বস্তা নিয়ে ব্যাপারি। ছাগল ডাকছে ব্যাঁ-এ-এ, মুরগি ডাকছে, কঁক, সর্দি হওয়া শিশু কাশছে খক্-খক্। আর অন্য সকলেই অবিরত বকবক করছে। কেউ কেউ হাতে খৈনি মারছে। কেউ বিড়ি খাচ্ছে।

তিতির নাক কোঁচকাচ্ছিল। মুখে বলল, কী বিচ্ছিরি গন্ধ। এদের নামিয়ে দাও গাড়ি থেকে।

ঋজুদা একটু হাসল। বলল, এই একটা কামরা থেকে নামালেই তো সমস্যার সমাধান হবে না। এদের তো চিরদিন আমরা মাটিতেই নামিয়ে রেখেছি, মানুষ বলে তো গণ্য করিনি। সাহেবরা বলেছে 'ডার্টি নিগার', আর আমাদের হেলিকপ্টার থেকে-নামা দুগ্ধ-ফেননিভ পোশাক পরা সব দলেরি নেতারা এদের বড় দরদভরা গলাতে ডেকেছে: 'ভাইয়ো ঔর ব্যহেনো' বলে। কিন্তু তোরই মতো এদের পাশে বসতে নাক সিঁটকেছে। বসেছে যে, তা নয়, বসেছে। খেয়েছেও পাশে বসে। কিন্তু শুধু নির্বাচনেরই আগে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের প্রতি বিদেশি ইংরেজদের যে ঘৃণা ছিল তাতে কোনও ভেজাল ছিল না। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের নেতাদের দেশের সাধারণ মানুষদের প্রতি যে দরদ তার সবটাই ভেজাল। এরা সব ভোটেরই কাঙাল, গদির ভিখারি।

শেষের দিকে ঋজুদার গলাটা ভারী হয়ে এল। মুখটা ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

আমরাও সবাই চুপ করে গেলাম।

ঋজুদা তারপর বলল, বুঝলি তিতির, এই হচ্ছে আসল ভারতবর্ষ। এদের ঘৃণা না করে ভালবাসতে শেখ। এদের নামিয়ে দিয়েছি বলেই আমরাও নেমে এসেছি এত নীচে। পল রোবসন-এর গাওয়া সেই বিখ্যাত গানটা শুনেছিস কি তোরা!

কোন গান?

আমি বললাম।

'We are in the same boat brother,

If you tip the one end

You are going to rock the other

We are in the same boat brother.

আমরা আবার চুপ করে গেলাম। যতবারই ঋজুদার সঙ্গে বেরই, সাধারণ গরিব মানুষদের প্রতি ঋজুদার যে গভীর ভালবাসা ও মমত্ববোধ তা যেন নতুন করে প্রতিবারই জানতে পারি। জেনে, ঋজুদার জন্যে গর্বে বুক ফুলে ওঠে। গদাধরদার প্রতি, কিষুণের প্রতি, মাজিদ-এর প্রতি তার যে ভালবাসা, সেটা লোক-দেখানো আদৌ নয়।

ট্রেনে ওঠার সময়ে মাজিদের হাতে একটা একশো টাকার নোট দিয়েছিল ঋজুদা।

মাজিদ অবাক হয়ে বলল, ঈ ক্যা? ঈ ক্যা হ্যায় সাহাব! আপ তো হামকো চায়েভি পিলানে নেহি দিয়া ইককাপ। উস রোজভি জাদা পয়সা দেকর গ্যায়া। কার্নি মেমসাবকি লিয়ে আপ কেয়া কিয়েথে আর কেয়া নেহি কিয়েথে, উ সবহি তো হামলোগোকি ইয়াদ হ্যায়।

ঋজুদা কপট ধমক দিয়ে বলেছিল, বকোয়াস মত করো। বদমাশ। আজ জুম্মাবার হ্যায়। রাতমে মোর্গা বানাও ঘরমে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে বাঁশি বাজিয়ে। মাজিদ আর টোড়ির মাস্টারবাবু যতক্ষণ আমাদের দেখা যায়, ততক্ষণ হাত নেড়েছে ও নেড়েছেন সমানে। তারপর ট্রেনটা একটা বাঁক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যেতেই আর দেখা যায়নি ওঁদের।

এখন ট্রেনের গতিটা কমে এসেছে।

ঋজুদা বলল, মহুয়া-মিলন-এ পৌঁছে গেলাম। কী সুন্দর নাম, না?

তারপর তিতিরকে বলল, তুই তো তোর ফেভারিট লেখকের ওপর অথরিটি—এই মহুয়া-মিলনের পটভূমিতে লেখা তাঁর একটা উপন্যাস আছে। নাম 'বাসনাকুসুম'। পড়েছিস কি?

তিতির হেসে বলল, কার যে বেশি ফেভারিট তা তো বুঝতে পারছি না। তুমি তো আমার চেয়েও অনেকই বেশি পড়েছ তাঁর বই দেখছি।

ঋজুদা পাইপ ভরা শেষ হলে রনসন-এর লাইটার দিয়ে আগুন দিয়ে বলল, শত্রুর সমস্ত গুণাগুণ সম্বন্ধে আপ-টু-ডেট জ্ঞান না থাকলে তাকে বধ করব কী করে! তার দোষের খবর না রাখলেও চলে কিন্তু গুণের খবর রাখতে হয় বইকী! পারলে, পড়িস বইটা। ইন্টারেস্টিং রিডিং। কিন্তু গভীরতা আছে।

নামটা ভারী সুন্দর কিন্তু, না? 'বাসনাকুসুম'।

হ্যাঁ।

ঋজুদা বলল।

ভটকাই অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। আর থাকতে না পেরে বলেই ফেলল, লিন্ডওয়ালের কী করবে ঋজুদা?

কী করব?

স্টিভ ওয়ার ফ্যাক্স যা বলছে... তাতে তো কোনও সন্দেহই থাকছে না যে—

স্টিভ এডওয়ার্ড, ওয়া নয়।

ওই হল, যা বলছে, তাতে তো কোনও সন্দেহই থাকছে না আর যে, কেনেথ লিন্ডওয়ালই ম্যাক টেইলর।

তা ঠিক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বোকাও তা বুঝবে। তা ছাড়া স্টিভ-এর ফ্যাক্স আসার আগে কাল রাতেই আমি ম্যাকের উল্টোপাল্টা কথা শুনেই বুঝেছিলাম।

তা সত্ত্বেও তুমি তোমার বন্ধু স্টিভকে জানাবে না?

জানাব বইকী!

জানাবে?

অবাক হয়ে বলল, ভটকাই।

আমি আর তিতিরও একটু অবাক হয়েই চুপ করে রইলাম।

ঋজুদা বলল, জানাব যে, ম্যাক টেইলর ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ-এ যে থাকে না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কবে জানাবে?

আজই। ডালটনগঞ্জ থেকেই জানাব। মোহনের ফ্যাক্স থেকে।

কিন্তু এমন করা কি ঠিক হবে?

ঠিক জানি না। হয়তো হবে। হয়তো হবে না। আমার কাছে যা ঠিক তা অন্যের কাছে ঠিক না হতেও পারে।

তারপরই আমাদের সকলকে উদ্দেশ করেই বলল, তোরা অরুন্ধতী রায়ের নাম শুনেছিস?

ভটকাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

তিতির বলল 'গড অফ স্মল থিংগস'।

আমি বললাম, বুকার প্রাইজ পেয়েছে যে বইটি?

বইটা পড়েছিস?

নাঃ। বড্ড দাম। আমার ভারী একটা দোষ আছে। দাগ না দিয়ে বই পড়তে পারি না। সেই জন্যে লাইব্রেরি থেকেও আনতে পারি না বই।

তিতির বলল, আমি পড়েছি।

অরুন্ধতী এখন মেধা পাটকর-এর সঙ্গে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে নেমেছেন। কাগজে দেখে থাকবি হয়তো।

দেখেছি।

ইংরেজিটা একেবারে ওর নিজস্ব। দেখার চোখ, বলার ভাষা, সবই নিজস্ব। নর্মদা বাঁচাও প্রসঙ্গে ও একটা বই লিখেছে, বইটির নাম: 'The Greater Common Good'।

তার সঙ্গে ম্যাক টেইলর-এর কী সম্পর্ক?

ভটকাই ফুট কাটল।

ঋজুদা বলল, ম্যাককে ধরিয়ে দিলে, যদি সে খুন নাও করে থাকত তবেও তার জন্যে ইলেকট্রিক চেয়ার বরাদ্দ হত হয়তো। নয়তো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। কিন্তু টেড গিলিগান মানুষটা কেমন ছিল? ম্যাক সত্যিই তাকে খুন করেছিল কি না? খুন করলে, কেন খুন করেছিল? এসব তো আমরা জানি না। অন্য কোনও কুচক্রী মানুষ নিজে খুন করে খুনের দায়টা ম্যাক-এর ওপরে চাপিয়েও দিতে পারে। তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও খুন করেনি। যে খুনি সে সারাজীবন সন্দেহের জীবন কাটাবে। সে কখনও অচেনা, অজানা, কলকাতা থেকে-আসা আমাদের শিকারের কথা আলোচনা করার জন্যে কার্নি মেমসাহেবের বেয়ারা মাজিদ-এর কথাতেই আমাদের নেমন্তন্ন করত না। যদি শিকারে গিয়েই ও টেডকে খুন করে থাকত তবে সমস্ত বাকি জীবন ও শিকারের প্রসঙ্গই এড়িয়ে চলত। তবে মানুষ হিসেবে ও খুবই অসাবধানী। খুনিরা গুনে গুনে ড্রিঙ্ক করে, কখনও বেসামাল হয় না, নিজের চারধারে একটা দুর্ভেদ্য দেওয়াল তুলে বাস করে সারাজীবন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, এই গঞ্জেই আমার কটেজ যখন ছিল, তখন এক বাঙালি ভদ্রলোক তাঁর বেলজিয়ান স্ত্রীকে নিয়ে এখানে থাকতেন। তাঁর

বাড়ির ঘরটরও ভাড়া দিতেন ট্যুরিস্টদের। তাঁর আচরণ, কথাবার্তা আমার কাছে খুবই রহস্যময় মনে হত। কিছুদিন পরেই যেমন ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনই ধূমকেতুরই মতন উধাও হয়ে গেলেন। তিনি যে খুনিই বা অন্য কোনও অপরাধী এমন সন্দেহই দৃঢ় হয়েছিল।

তিতির বলল, ঋজুকা, তোমার কথা মানলাম কিন্তু অন্য দিক দিয়েও ভেবে দেখো। ভুল তো তুমিও করতে পার।

পারি বইকী। হয়তো কেন? মনে করো ভুল করেছি। ইচ্ছে করেই করেছি। কিন্তু করেছি, For a Greater Common Good.

মানে বুঝলাম না।

কালকে কেনেথকে বা ম্যাককে দেখে আমার এত সুখী মনে হল ওদের দম্পতি হিসেবে যে, ওদের এই নীড় এখন ভেঙে দিলে অরেঞ্জ মিনিভেট পাখির নীড় ভাঙার মতোই পাপ হতো আমার। টেড গিলিগানকে আমি চিনি না। স্টিভকেও এক-দুবার কানাডাতে শিকারে গিয়েই দেখেছি। শিকারিরা একে অন্যকে বলেন, 'হি ইজ মাই শুটিং প্যাল'। কেউ তোর শুটিং প্যাল হলেই যে তুই তার নাড়িনক্ষত্র জানবি এমন কোনও কথা নেই। আমার তো কেনেথকে অনেক বেশি শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন, ভদ্র এবং যাকে বলে, আঃ, কী যেন বলে রে, বাংলাটা বল না রুদ্র...

কীসের বাংলা?

Refined-এর।

পরিশীলিত।

ঠিক। পরিশীলিত বলে মনে হল। তা ছাড়া ও একজন ভাস্করও। সে কথা তো স্টিভ আমাকে বলেইনি। সেই তুলনাতে টেড গিলিগান, মানে যে খুন হয়েছিল, সে অত্যন্তই রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ। এমন ধরনের শিকারি, যারা রক্ত আর মাংস লোলুপ, যারা মদ্যপ, যাদের কোনও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নেই, যাদের জীবনের একমাত্র কৃতিত্ব, একমাত্র প্রার্থনা, ট্রফির মাপ—। কে কত বড় শিং-এর Moose মেরেছে, কে কত বড় সিংহ মেরেছে, বা কত বড় দাঁতি হাতি... এই তাদের একমাত্র 'অর্জন' জীবনের। কেনেথ সে ধরনের মানুষই নয়। তা ছাড়া আরও একটা কথা, এই ভাস্কর এখন এমন এক মূর্তি গড়তে শুরু করেছে, যে মূর্তি কথা বলবে, হাসবে, গাইবে, খেলবে। এই সৃষ্টির তন্ময়তার মধ্যে কোনও শিল্পীকে বিরক্ত করা কি উচিত?

মানে?

ভটকাই বলল।

মানে,... তিতির তুই কিছু বুঝেছিস?

তিতির মুখ নিচু করে বলল, আমার মনে হচ্ছিল। এখন তোমার কথাতে বুঝছি যে ঠিকই মনে হয়েছিল।

কী বলছ কী তোমরা? কিছুই তো বুঝছি না।

ভটকাই মহাবিরক্ত হয়ে বলল।

সব কথা সকলের না বুঝলেও চলবে।

তিতির বলল, ডরোথি মা হবে।

সে কী? তুমি কী করে জানলে ঋজুদা? পুরুষ হয়ে?

এমনভাবেই বলল কথাটা ভটকাই যে, আমরা সকলেই হেসে উঠলাম। মনে হল, ও যেন বলতে চাইছে যে, ঋজুদা নিজেই যদি সেই অনাগত সন্তানের বাবা না হয়, তবে এই সত্য তার জানারই কথা নয়।

ঋজুদা হাসতে হাসতেই বলল, ভটকু, ভাল গোয়েন্দা হতে হলে সবচেয়ে আগে যা দরকার তা একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ এবং the most uncommon of all qualities...

সেটা কী?

তিতির বলল, Common sense, বুঝেছ। সাধারণ বুদ্ধি। ঋজুদা বলল, ওদের সুখের সংসার, ওদের দুজনের দুজনের প্রতি ভালবাসা গভীর, আমার মন ভরে দিয়েছে। তা ছাড়া দুজনেই কী সুন্দর। যেন, মেড ফর ইচ আদার।

উইলস-এর কমপিটিশানে নাম দেয় না কেন? দিলে গাড়িটা ওরা নির্ঘাত পেতে পারত।

ভটকাই বলল। তারপর না হয় আমাকে দিয়ে দিত।

ঋজুদা বলল, একজন অত্যন্ত সজ্জন মানুষও কোনও ক্ষণিক উত্তেজনায়, কোনও অন্যায় দেখে, নিজেকে বা অন্যকে সাঙ্ঘাতিক বিপদ থেকে বাঁচাতে খুন করতে পারে। পৃথিবীর ফৌজদারি আইনে ঘুণ ধরে গেছে। আইন-কানুন সব আমূল বদলে দেওয়া উচিত। পয়সা থাকলেই নব্বইভাগ ক্ষেত্রে অপরাধী পার পেয়ে যায়।

আমি বললাম, এত জায়গাতে আমরা গেছি, মানুষখেকো বাঘ, কি গুণ্ডা হাতি মারতে, কত খুনের কিনারা করতে, কিন্তু এইরকম সমাপ্তি আর কখনওই হয়নি, না ঋজুদা?

ঠিকই বলেছিস রুদ্র।

মারা বা ধরা যত না কঠিন, ছাড়া তার চেয়ে অনেকই বেশি কঠিন।

তিতির বলল।

বাঃ। চমৎকার বলেছিস।

ভটকাই বলল, ইসস্। কোনও মানে হয়। একটা দিন থেকে গেলে মিসেস লিন্ডওয়াল কত কেক-টেক খাওয়াতেন আমাদের।

আমি বললাম, দুঃখ কীসের মিস্টার ভটকু? কেক তো অনেকই খেয়েছিস, লিট্টি কখনও খেয়েছিস? ছাতুর লিট্টি, খাঁটি গাওয়া ঘিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে? আজ রাতেই খাবি।

তিতির বলল, জিনেট্যাক বা র‍্যানট্যাক আছে তো?

ঋজুদা বলল, সব আছে। প্রিন্স অফ পালামৌ মোহন বিশ্বাসের কাছে বাঘের দুধ চাইলে তাই পাবি।

ফাইন।

ঋজুদা বলল, আমি জানি যে, তোদের সকলের মনেই অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল। কোনওই চিন্তা নেই। হাতে অনেকই সময় আছে। তিনদিন। তোদের সব প্রশ্নেরই উত্তর দেব। এখন যে জন্যে ট্রেনে করে আসা তাই কর। দু ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে চল, কথা না বলে।

ট্রেনের গতি আবার আস্তে হয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, টোড়ি সামনে। আজ বড় হাট লাগে এখানে। আমাদের সহযাত্রীদের অনেকেই নেমে যাবে এখানে। এবারে হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পারবি তোরা।

গাড়ি গতি আরও আস্তে হয়ে এল।

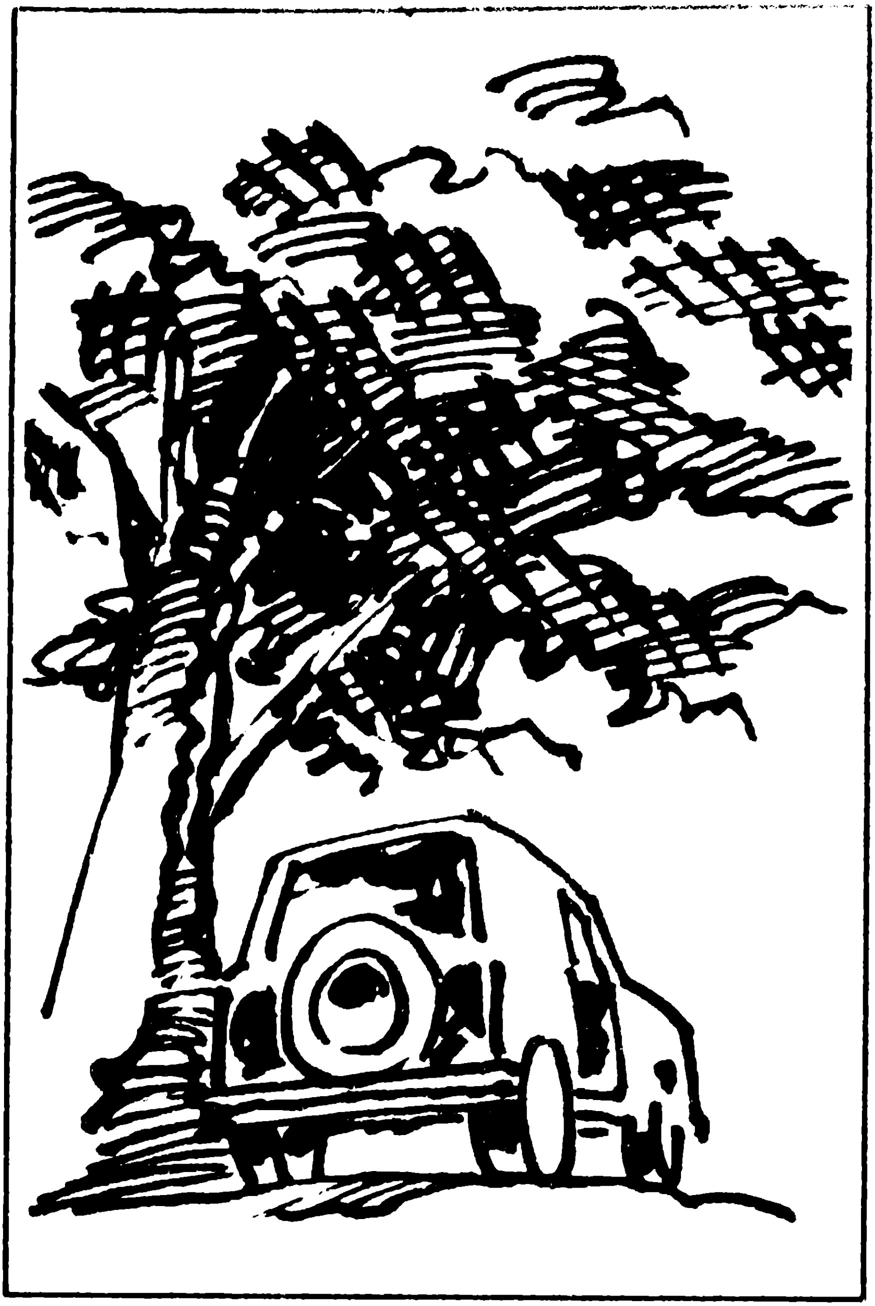

ঋজুদার সঙ্গে পুরুণাকোটে

এক

আমরা ওড়িশার অঙ্গুল ফরেস্ট ডিভিশনের পুরুণাকোটের বন-বাংলোর বারান্দাতে বসেছিলাম। আমরা মানে, ঋজুদা, তিতির আর আমি। ডিসেম্বরের শেষ। হাড়কাঁপানো শীত। রোদটা তেরছাভাবে এসে পড়েছে মাটি থেকে অনেকই উঁচু বারান্দায়। হাতির ভয়ে বড় বড় শালের খুঁটির উপরে মস্ত পাটাতন করে নিয়ে তার উপরে বাংলো বানানো। ঋজুদা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একটা মোড়ার উপরে পা দুটি তুলে দিয়ে পরপর তিন কাপ চা খাওয়ার পর গায়ে একটা ফিকে-খয়েরি রঙা পশমিনা শাল জড়িয়ে জম্পেশ করে পাইপ ধরিয়েছে।

তিতির বলল, বাঃ ঋজুকাকা, ফিকে-খয়েরি জমিতে গাঢ় খয়েরি রঙা পাড়টা দারুণ খুলেছে তোমার শালের।

ঋজুদা বলল, শালটা কে দিয়েছিল জানিস?

কী করে জানব? তিতির বলল।

শোনপুরের এই ওড়িশারই এক করদ রাজ্যের মহারাজা সিং দেও সাহেব। এক সময়ে উনি তাঁর রাজ্যের রাজধানী বলাঙ্গীরের একটা মার্ডার-কেস নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। সেই থেকে খুবই বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমাকে বহুবার বলাঙ্গীরে শিকারে যেতেও নেমন্তন্ন করেছিলেন কিন্তু তখন আমার প্রিয় শিকারভূমি ছিল কালাহান্ডি।

কালাহান্ডি! কী অদ্ভুত নাম রে বাবা। কালোহাঁড়ি?

ইয়েস। ওড়িশার কালাহান্ডি এক আশ্চর্য সুন্দর করদ রাজ্য ছিল। সুন্দর কিন্তু ভয়াবহ। অমন নৈসর্গিক দৃশ্য ভারতের কম জায়গাতেই আছে। মানে, বলতে চাইছি আলাদা রকম। বড় বড় কাছিমপেঠা, ন্যাড়া, বাদামি-রঙা পাহাড়গুলো, মনে হয়, অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুরই মতো শুয়ে আছে।

যখন পুব-আফ্রিকাতে প্রথমবার যাই তখন সেখানকার কোনও কোনও জায়গা দেখে কালাহান্ডির কথা আমার বারবারই মনে পড়েছিল।

কী শিকার করতে যেতে কালাহান্ডিতে?

আমি বললাম।

বাঘ। আবার কী! যদিও অন্য শিকার, বিশেষ করে বড় বড় ভালুক, বুকে সাদা 'V' চিহ্ন আঁকা, অনেকই ছিল। SLOTH BEAR ছাড়াও। সুন্দরবনের সব বাঘই যেমন মানুষখেকো (পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগ যাই বলুন না কেন), কালাহান্ডির সব বাঘও মানুষখেকো ছিল। অন্তত আমি যে সময়ের কথা বলছি, আজ থেকে বছর পঁয়ত্রিশ আগের কথা, সেই সময়ে ছিল।

তিতির বলল, তুমি তো তখন ছেলেমানুষ ছিলে।

আমি এখনও ছেলেমানুষ। তোর মা অন্তত তাই বলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে এমনই বেড়েছে ও বাড়ছে যে, গিনিপিগ বা শুয়োরেরাও লজ্জা পাবে। এখন মানুষই সর্ব-খেকো হয়ে গিয়ে অন্য সব প্রাণীদের হয় বংশ নাশ করছে নয়তো তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের পুরনো বাসভুমি থেকে সেসব জায়গাতে, যেখানে এখনও কিছু গভীর জঙ্গল বেঁচে আছে।

তিতির কী একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে একটা কালো অস্টিন গাড়ি এসে দাঁড়াল পুরুণাকোট বন-বাংলোরই সামনে। গাড়িটা জঙ্গলের দিক থেকে এল।

ঋজুদা বলল, অস্টিন। এই গাড়িগুলোই লন্ডন শহরের ট্যাক্সি। লন্ডন-এর ট্যাক্সি হিসেবে অন্য কোনও গাড়ি দেখাই যায় না। ট্যাক্সি বলতে শুধু ইংলিশ গাড়ি। অস্টিন, কালো-রঙা।

ঋজুদার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে গাড়ির পিছনের দরজা খুলে এক ছোট্টখাট্ট ভদ্রলোক নামলেন। ধুতি ও শিয়ালে-রঙা সার্জ-এর গরম পাঞ্জাবি পরা তার উপরে কালো রঙা জওহর কোট। ফ্লানেলের। গাড়ি থেকে নেমেই উপরের দিকে মুখ করে ঋজুদাকে জোড়হাতে নমস্কার করে বললেন, প্রণাম আইজ্ঞাঁ।

ঋজুদা সম্ভবত গাড়ি থেকে নামার সময়ে ভদ্রলোককে চিনতে পারেনি কিন্তু গলার স্বর শুনে চিনতে পেরেই রেলিং-ঘেরা বারান্দার রেলিং-এর সামনে এসে করজোড়ে নমস্কার করে বলল, হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! নমস্কার পট্টনায়েকবাবু। আপনি কেমিতি জানিলানি যে, মু এটি আসিচি? আসন্তু আসন্তু।

পট্টনায়েকবাবু হেসে বললেন, আইজ্ঞা আপনংকুতো আগমন নাহি, সে তো আবির্ভাব হেল্বা। সব্বেমানে জানিচি।

ঋজুদা জোরে হেসে উঠল।

পট্টনায়েকবাবু ছোট ছোট পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে খুটখুট করে দোতলাতে উঠে এসে বললেন, এই সাত সকালেই কেন এলাম তা নিশ্চয়ই ভাবছেন আপনি।

তা তো ভাবছিই! কিন্তু কোথা থেকে এলেন এখন?

ঢেনকানল থেকে, অঙ্গুল হয়ে। অঙ্গুলেও থাকতে হয়। ঢেনকানলেও কাজ হচ্ছে আমার। তাই অন্ধকার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়লাম, আপনি কোথাও

বেরোবার আগেই যাতে আপনাকে ধরতে পারি।

তিতির ভিতর থেকে একটা কাপ নিয়ে এসে চা ঢেলে দিল পট্টনায়েকবাবুকে। বিস্কিটের প্লেট এগিয়ে দিল। তারপর বলল, চিনি ক' চামচ?

না না, চিনি দেবেন না, দুধও নয়। আমি ডায়াবেটিক। আর দুধ খেলেও অম্বল হয়, বয়স তো হল।

পরিষ্কার বাংলাতে বললেন তিনি।

আমাদের অবাক হতে দেখে ঋজুদা বলল, অধিকাংশ শিক্ষিত ওড়িয়াই বাংলা শুধু বলতেই পারেন না, পড়তেও পারেন। অথচ শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে সম্ভবত হাজারে একজন ওড়িয়া বলতে পারেন বা পড়তে পারেন। এমনি কি আর আমি বাঙালিকে কূপমণ্ডুক বলি! পশ্চিমবঙ্গের নেতা থেকে সেক্রেটারি, সেক্রেটারি থেকে কেরানি সকলেই কূপমণ্ডুক।

পট্টানায়েকবাবু একটা মুচকি হেসে বললেন, তা ছাড়াও একটা ব্যাপার আছে।

কী ব্যাপার?

বাঙালিরা প্রায় সকলেই এক দুরারোগ্য সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স-এ ভোগেন, সুপিরিয়রিটির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করেই।

কথাটা শুনে আমাদের কারুরই ভাল লাগল না। কারণ, আমরা বাঙালি।

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে বলল, কথাটা আমাদের শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা হয়তো সত্যিই। ওতে বাঙালির ভালর চেয়ে খারাপই হয়েছে অনেক বেশি।

তারপর বলল, এবারে বলুন, ভোর-রাতে এই শীতের মধ্যে বেরিয়ে এখানে আসা হল কেন?

গরজ বড় বালাই ঋজুবাবু। আপনি তো বাঘ্‌ঘমুণ্ডাতে বহুবার গিয়ে থেকেছেন।

তা থেকেছি। বাঘ্‌ঘমুণ্ডা খুবই প্রিয় জায়গা ছিল আমার। যখন এদিকে আসতাম নিয়মিত বছর পঁচিশ-তিরিশ আগেও। এবারে এসেছি আমার এই দুই সাগরেদ, রুদ্র আর তিতিরকে 'সাতকোশীয়া গন্ড' ঘুরিয়ে দেখাব বলে। শুনতে পাচ্ছি নাকি দু-এক বছরের মধ্যেই এই অঞ্চল অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষিত হবে।

হুঁঃ। অভয়ারণ্য! মানুষের জন্যও অভয় দিতে বলুন। মানুষও বড় ভয়ে ভয়ে আছে।

তারপর বললেন, আপনার কি একছেলে এক মেয়ে? এরাই? আর নেই?

ওঁর কথাতে ঋজুদাতো বটেই, আমরাও হো হো করে হেসে উঠলাম।

পট্টনায়েকবাবু অপ্রতিভ হলেন।

হাসির দমক কমলে, ঋজুদা বলল, কোনও মেয়ে আমাকে বিয়েই করল না মশাই তার ছেলে-মেয়ে আসবে কোথা থেকে?

তবে? এরা?

এরা আমার কমরেডস। এদের দেখে ভাববেন না এরা সাধারণ বাঙালি এবং

খোকা-খুকু। এরা আমার সঙ্গে আফ্রিকাতে, সেশ্যেলস-এ এবং ভারতের বহু জায়গায় গেছে এবং বন্দুক-রাইফেল চালাতে এবং বুদ্ধিতেও এরা আমাকেও সহজেই হার মানায়।

তিতির বলল, আমি তো সেশ্যেলস-এ যাইনি। তা ছাড়া এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে ঋজুকাকা। বিনয় ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত বিনয় নয়। সেটা বরং লক্ষণ হিসাবে খারাপই।

পট্টনায়েকবাবু বললেন, তবে তো চমৎকার। আমি যে কাজে এসেছি সে কাজ আরও সহজ হবে।

এখন বলুন কাজটা কী?

বাঘ্‌ঘমুণ্ডাতেও আমার কাজ চলেছে। অঙ্গুলের নিলামে এবারে ঢেনকানলের অনেকগুলো ব্লক এবং বাঘ্‌ঘমুণ্ডার ব্লকও ডেকেছিলাম। ভাল কাঠ আছে বাঘ্‌ঘমুণ্ডাতে সে কথা তো আপনি জানেনেই। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে সিজন খোলার পরে মার্কা মারা শেষ হতে না হতে এক আপদ এসে উপস্থিত হল। বাঘ্‌ঘমুণ্ডাতে হাতিরই যা বিপদ ছিল। তাও দিনে তত নয়। কিন্তু এবারে সিজন খোলার পর অক্টোবর থেকে নভেম্বর অবধি আমার ন'জন কাবাড়িকে খেয়ে ফেলল এক মানুষখেকো বাঘে। তারা সবাই আবার করতপটা গ্রামের মানুষ। অঙ্গুল থেকে দিনমানে আমার এখানে আসার উপায়ই নেই। কারণ, আপনি তো জানেনেই, আসতে গেলে করতপটার উপর দিয়েই আসতে হয়। তাইতো অন্ধকারে এলাম। ফিরতেও হবে অন্ধকারেই।

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ডিসেম্বরের গোড়াতে সব কাবাড়িরাই কাজ বন্ধ করে ফিরে গেল। প্রত্যেক পরিবারকে মোটা ক্ষতিপূরণও দিলাম। কিন্তু জীবনের ঘাটতির ক্ষতি কি পয়সা দিয়ে কোনওদিনও পূরণ করা যায়? বিবেকেও লাগে। আমি ঠিকাদার, পয়সা রোজগারের জন্য ঠিকাদারি করি আর আমার হয়ে কাজ করতে এসে এই ন'জন গরিব মানুষ প্রাণ দিল মানুষখেকোর মুখে। তাই অঙ্গুলের ফরেস্ট অফিস থেকে আপনি আসছেন খবর পাওয়া মাত্রই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, যেদিন এসে পৌঁছোবেন বিকেলে বা রাতে, তার পরদিনই ভোরে আপনাকে এসে ধরব।

ডিসেম্বরে বাঘটা কোনও মানুষ ধরেনি?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

আমার সব লোক এবং করতপাটার সব কাবাডিরা সদলে চলে গেল নভেম্বরের ত্রিশ তারিখের মধ্যেই। তার ধরবে কাকে?

তারপরেই বললেন, তবে ধরেনি, তা নয়। ধরেছে, পুরুণাকোটেরই এক ভিখারিনী বাইয়ানীকে আর টুম্বকা আর পুরুণাকোটেরই মাঝে যে ছোট্ট গ্রামটা আছে, নাম ভুলে যাচ্ছি, সেই গ্রামের একটা ছেলেকে।

তিতির বলে উঠল, বাইয়ানী মানে কী?

ঋজুদা বলল, ওড়িয়াতে পাগলিনীকে বাইয়ানী বলে।

অন্য জায়গাতেও তো মানুষ ধরেছে। তা হলে বাঘটার নাম বাঘ্‌ঘমুণ্ডার বাঘ হল কেন?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, পট্টনায়েকবাবুকে।

উনি বললেন, অন্য জায়গাতে বিশেষ যায় না, বাঘ্‌ঘমুণ্ডা গ্রামের কাছাকাছিই ঘোরে-ফেরে। বাঘটার হেডকোয়ার্টার্স হচ্ছে বাঘ্‌ঘমুণ্ডার হাতিগির্জা পাহাড়ে।

হাতিগির্জা পাহাড়!

তিতির বেশ জোরেই চেঁচিয়ে উঠল। বলল, 'পর্ণমোচী' পত্রোপন্যাসে পড়েছি হাতিগির্জা পাহাড়ের কথা।

আমি বললাম, এখানের হাতিরা বুঝি খ্রিস্টান? গির্জাতে গিয়ে উপাসনা করে?

সকলেই হেসে উঠল আমার কথাতে।

তিতির বলল, বাঘ্‌ঘমুণ্ডার কথাও পড়েছি আমি 'নগ্ন নির্জন' উপন্যাসে।

পট্টনায়েকবাবু চায়ের কাপটা সশব্দে ডিশ-এর উপরে নামিয়ে রেখে একটু অধৈর্য গলায় বললেন, তা হলে কী হল আমার আর্জির ঋজুবাবু? আমাকে কি ফেরাবেন আপনি?

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে বলল, এদের নিয়ে একটু ঘুরতে এসেছি। তবে, মানুষখেকো বাঘটা আমরা থাকতে থাকতে যদি কোনও মানুষ মারে তা হলে একটা চেষ্টা করা যেতেই পারে অবশ্য। আপনি যখন এমনভাবে দৌড়ে এসেছেন।

মানুষ না মেরে যদি গোরু-টোরু মারে?

গোরু-টোরুও মারে নাকি? তবে তো বাঘটা বেশ বহাল তবিয়তেই আছে বলতে হবে। যে সব বাঘ বুড়ো, বা যে-কোনও কারণেই হোক অশক্ত হয়ে যায়, তারাই সাধারণত মানুষ ধরে। মানুষ তো বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য নয়। গোরুও অবশ্য নয়।

তা জানি না, কিন্তু এই বাঘটার তো দেখি বাছ-বিচার নেই। চেহারাতেও সে দশাসই। বাঘ্‌ঘমুণ্ডার বন-বাংলোর পিছনের মাঠ থেকে একটা নধর গোরু ধরে সেটাকে হাতিগির্জা পাহাড় অবধি কিছুটা পিঠে তুলে, কিছুটা টেনে, কিছুটা হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে খেয়েছিল। তা হলে কতখানি শক্তি ধরে বুঝতেই পারছেন।

তাই? তা হলে যদি কোনও kill হয়, আমাকে খবর দেবেন। চেষ্টা করে দেখব। আমরা কিন্তু এই অঞ্চলে ঠিক সাতদিনই আছি। ফেরার রিজার্ভেশনও করা আছে কটক থেকে। ফিরতেই হবে। তারই মধ্যে এদের দু'জনকে মহানদীর এপার-ওপারের সব জঙ্গল দেখাতে হবে, অতএব বুঝতেই পারছেন! তবে যেখানেই যাই, রাতে ফিরে এসে পুরুণাকোটেই থাকব। এখানেই খবর পাঠাতে বলবেন। রাতে kill হলে যেন ভোরেই এসে খবর দেয়। এবং এমন লোককেই খবর দিতে পাঠাবেন যে, সে-ই যেন আমাদের kill-এর জায়গাতে নিয়ে যেতে পারে।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাতো বটেই।

কিন্তু মানুষখেকো বাঘ শিকার তো আর তা বলে তুড়ি মেরে করতে পারব না। মানুষ-মারা পিস্তল ছাড়া তো সঙ্গে কিছুই আনিনি এবারে। মানে, অন্য কোনও আগ্নেয়াস্ত্র।

ঋজুদা বলল, পট্টনায়েকবাবুকে।

আরে সেজন্য চিন্তা নেই। ঢেনকানল-এর ছোট রাজকুমার, মানে, নিনি কুমারের বাড়ি থেকে নিয়ে আসব।

ও। নিনি কুমারের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। তিনি তো আমার চেয়ে অনেকই ভাল শিকারি। তাঁকে এই বাঘ মারতে বলেননি কেন?

আরে তিনি থাকলে তো এখানে! চার মাসের জন্য ইউরোপে গেছেন। ফিরবেন জানুয়ারির শেষে।

তা তিনি না থাকলে বন্দুক-রাইফেলই বা পাবেন কী করে?

সে আমার দায়িত্ব। তা ছাড়া ঢেনকানল-এর রাজবাড়ি ছাড়াও আমার অন্য অনেক বন্ধু আছে।

পরের ওয়েপন দিয়ে এররকম বিপজ্জনক শিকার কখনও করিনি! করা বিপজ্জনকও বটে।

ঋজুদা চিন্তিত মুখে বলল।

একবার না হয় আমাকে ধনে-প্রাণে বাঁচাতে একটু বিপদের ঝুঁকি নিলেনই ঋজুবাবু। তা ছাড়া, আপনার কোনও বিপদ হবে না। আপনি ঋদ্ধিমান পুরুষ।

বিপদের কথা কি কেউ বলতে পারে পট্টনায়েকবাবু? কার যম যে পিছনে কখন এসে দাঁড়ায়, সে কথা মানুষ যদি জানত!

তারপর কী একটু ভেবে ঋজুদা বলল, ঠিক আছে। কথা দিলাম আপনাকে for old times sake!

পট্টনায়েক বাবু চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় বললেন, বাবাঃ। সাতটা বেজে গেল। কত জায়গাতে যেতে হবে। কত কাজ! কিন্তু নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছি। এবারে একটা সুরাহা হলেও হতে পারে।

অনেক গল্প-টল্পর পর এক এক করে চান সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে অঙ্গুলের বিমলবাবু, শ্রীবিমলকৃষ্ণ ঘোষ, যে জিপটা আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম টিকরপাড়ার দিকে। আমিই জিপ চালাচ্ছিলাম। মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার জিপ। এখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে।

ঋজুদা বাঁদিকের সিটে বসে পাইপ ধরাতে ধরাতে বলল, জিপে বসে পাইপ খাওয়ার এই অসুবিধা। চারদিক থেকে হাওয়া ঢুকতে থাকে। পইপ ধরানোতে মহা হাঙ্গামা। যদিও বা ধরল, তো নিভে যায় পরক্ষণেই। ধৈর্যের পরীক্ষা!

আমি একটু আস্তে করলাম গতি। তিতির পিছন থেকে ফুট কাটল, পাইপ খাওয়াটা তো ছেড়ে দিলেই পার। পাইপ খেলে জিভে ক্যানসার হয় তা বুঝি তুমি জানো না?

জানব না কেন? তবে পাইপ তো তিরিশ বছর ধরে খাচ্ছি। ভাত না খেলেও চলে, পাইপ না খেলে চলে না। আমাদের বাড়ির উলটো দিকের বাড়ির যোগেনবাবু পান-তামাক-মদ কিছুই খেতেন না। একেবারে সদাচারী, সদালাপী, অজাতশত্রু মানুষ। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে জিভের ক্যানসারে মারা গেলেন। কীসে যে কী হয়, তা আল্লাই জানেন!

পথটা গেছে সোজা আর তার ডানদিক দিয়ে একটা উপল-বিছানো পাহাড়ি নদী চলেছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘন বনের ছেঁড়া-ছেঁড়া চন্দ্রাতপের নীচে নীচে রোদ আর ছায়ার সঙ্গে খেলা করতে করতে। নদীর মাঝে মাঝে অনেকগুলো ছোট ছোট প্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। চলকে-যাওয়া নুপূর-পরা জল ঝিলমিল করে উঠছে শীত সকালের রোদ গায়ে পড়াতে। একটা বাদামি-কালো কুম্ভাটুয়া পাখি ডাকছে নদীর ওপার থেকে, গুব-গুব-গুব-গুব করে। শীতের হাওয়াতে নলি আর কণ্টা বাঁশের বনে কটকটি আওয়াজ উঠছে। বাঁশের গায়ের হালকা পাতলা হলুদ আর পেঁয়াজখসি-রঙা খোলস উড়ে উড়ে পড়ছে পথের উপর আলতো হয়ে।

নদীতে কত্ত রকমের যে পাথর! এরকম নদী দেখলেই আমার ইচ্ছে করে চড়ুইভাতি করতে বসে যাই।

তিতির বলল।

যা বলেছ!

আমি বললাম।

এই নদীর, নদী নয়, একে স্থানীয় মানুষরা নালা বলে, নাম বোষ্টম নালা। পুরুণাকোটের আগে বাঁক নিয়ে চলে গেছে বাঁয়ে বাঘ্‌মুণ্ডার দিকে। সেখানে আবার এর নাম নন্দিনী।

বাঃ। ভারী সুন্দর নাম তো। এই নালাদের কথাও পড়েছি 'জঙ্গলের জার্নাল'-এ।

তারপরে একটু চুপ করে, থেমে ঋজুদা বলল, আমরা মহানদী পেরোব ফেরি-নৌকোতে। গাড়ি, বাস, ট্রাক, সবই ফেরি করেই পেরোয়। যে মহানদী দেখবি, তাই ওড়িশার মুখ্য নদী। আমাদের যেমন গঙ্গা। আসামের যেমন ব্রহ্মপুত্র।

'সাতকোশীয়া গন্ড' শব্দ দুটির মানে কী ঋজুকাকা?

তিতির বলল।

'গন্ড' মানে ওড়িয়াতে গিরিখাত বা Gorge। আর 'কোশ' মানে হচ্ছে ক্রোশ। 'সাতকোশীয়া' মানে হল সাত ক্রোশ অর্থাৎ চোদ্দো মাইল। কিলোমিটারের হিসাব তো এই সেদিন হল।

মহানদীর উৎস যদিও অনেক দূরে, এখানে মহানদী দুপাশের ঘন জঙ্গলাবৃত

উঁচু পাহাড়ের মধ্যের গিরিখাত দিয়ে বয়ে গেছে চোদ্দো মাইল। গন্ড শেষ হয়েছে বড়োমূল-এ গিয়ে। বিনকেই থেকে বড়োমূল। তারপর মহানদী চওড়া হয়ে ছড়িয়ে গেছে। এই নদী বেয়েই লক্ষ লক্ষ বাঁশ বেঁধে এক একটি ভেলা বানানো হত। তারই উপর ভেলার জিম্মাদারদের রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, লণ্ঠন জ্বেলে রাতে তাস খেলা । গোরু-বাছুরও উঠত তাতে কখনও সখনও। পেট্রল লাগত না, দাঁড় লাগত না, কোনও তাড়াই ছিল না। নদী যখন যেমন গতিতে ভাসিয়ে নিয়ে যেত, কখনও ধীরে, কখনও জোরে, তেমনই যেত তারা। চোদ্দো মাইল যেতেই দু থেকে তিন দিন লাগত।

লাগত কেন? এখন লাগে না?

এখন কাগজ তো আর কাঠের মণ্ড বা বাঁশ থেকে তৈরি হয় না। পরিবেশ বাঁচাতে এখন রি-সাইক্লিং করেই কাগজ তৈরি হয়। আরও নানা উপায়ে বানানো হয়ও এবং হবে ভবিষ্যতে।

তবে তো জঙ্গল অনেক বাড়বে।

আমি বললাম।

বাড়ছে আর কোথায় বল? সরষের মধ্যেই যে ভূত ঢুকে গেছে। আমরা মানুষরাই রাহুগ্রস্ত হয়ে গেছি, আমাদের লোভেই চুরি করে বন নষ্ট করছি। এত মানুষ যদি কোনও দেশে থাকে এবং তাদের সংখ্যা যদি রোজই বাড়তে থাকে, জন্মহার যদি কমানো না যায় তবে পরিবেশ কেন, বন্যপ্রাণী কেন, কোনওকিছুই বাঁচবে না । সবই বুভুক্ষু আর লোভীদের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে। অবধারিতভাবে নষ্ট হবে। আমাদের কেতাবি অর্থনীতিবিদরা যাই বলুন না কেন, তাঁরা যেহেতু নিজের দেশকে তেমন করে চেনেন না, জানেন না, তাঁদের বই-পড়া বিদ্যেতে এ দেশের প্রকৃত কোনও উন্নতিই হবে না।

আমরা চুপ করেই রইলাম। বারেবারেই আমরা বুঝতে পারি ঋজুদা আমাদের দেশকে কতখানি ভালবাসে। অথচ সে ইচ্ছা করলে মহাসাহেব হতে পারত। পৃথিবীর কোন দেশে যে যায়নি! আমাদেরও তো সঙ্গে করে নিয়ে গেছে কত দেশে। আর স্বদেশের কথা তো ছেড়েই দিলাম। এ দেশকে এত ভালভাবে কম মানুষই জেনেছেন।

বিদেশে গেলেই দেশে ফিরে লোকে আমাদের দেশকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে, ঠোঁট বেঁকায়। একমাত্র ঋজুদাকেই দেখলাম, সারা পৃথিবী বহুবার ঘুরেও যে বলে 'আমার দেশের মতো দেশ হয় না, এ দেশের গ্রামীণ মানুষদের মতো মানুষ হয় না।' তিতির, আমার আর ভটকাই-এর মধ্যে অজানিতেই এক গভীর দেশাত্ববোধ জন্মেছে ঋজুদার সংস্পর্শে এসেই।

তিতির হঠাৎ বলল, ভটকাইটা এবারে খুব মিস করবে। সাতকোশীয়া গন্ড ওর দেখা হল না।

মায়ের অসুখে যদি সেবাই না করল, তা হলে সে ছেলের সব গুণ জলে গেল।

এখন তো ওর বেড়াতে আসার কথা নয়। ছেলেটার অনেক গুণ কিন্তু এইসব শিক্ষা তাকে দেওয়া হয়নি সম্ভবত। স্কুলে বা কলেজে ভাল রেজাল্ট করা, বড় চাকরি করা বা ব্যবসা করা, এসবের কোনওই দাম নেই আমার কাছে, যদি কোনও মানুষের কর্তব্যজ্ঞান না থাকে, বিবেক না থাকে। ও কী করে যে মায়ের এমন অসুখ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে আসতে চাইছিল তাই ভেবে পাইনা।

আর কতক্ষণ লাগবে ঋজুদা? টিকরপাড়া পৌঁছোতে?

আমি বললাম।

ধর, আর মিনিট পনেরো। খুব বেশি হলে। দেখছিস না জঙ্গল কেমন ফিকে হয়ে এল, আগে পথের পাশে দু-একটা তৈলা দেখা যাচ্ছিল। আর এখন তো দুধারেই চষা মাঠ।

তৈলা মানে কী?

তৈলা একটা ওড়িয়া শব্দ। ঘন জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করে যেখানে চাষাবাদ করা হয়, তাকে বলে তৈলা। মানে, সেই জায়গাটাকে। জঙ্গলের খামার আর কী!

এমন সময়ে রিয়ার-ভিউ মিরারে দেখলাম পিছন থেকে একটা মোটর সাইকেল ঝড়ের মতো আসছে ধুলো উড়িয়ে, বিপজ্জনক এবং অবিশ্বাস্য গতিতে। মোটর সাইকেল তো না, যেন মনো-এঞ্জিন প্লেন নিয়ে ট্যাক্সিইং করছে। আমি জিপ বাঁয়ে করলাম যাতে তার অসুবিধে না হয় আমাদের পেরিয়ে যেতে। ততক্ষণে সে এসে পৌঁছোলো আমাদের পাশে। কিন্তু ওভারটেক না করে বাঁ হাত দিয়ে আমাকে জিপ থামাতে ইশারা করল, করেই জিপের সামনে উঠে এল পথে—।

কীরে! আমাদের পাইলটিং করে নিয়ে যেতে পাঠাল না কি কেউ একে? ব্যাপারটা কী?

ঋজুদা বলল।

তিতির বলল, ডাকাত-টাকাত নয় তো?

ঋজুদা বলল, সুন্দরী তুই ছাড়া আমাদের কাছে নিয়ে পালাবার মতো তো আর কিছুই নেই। তোকেই বোধহয় নিতে এসেছে।

ততক্ষণে মোটর সাইকেলের গতি কমে এসেছে। সে যেহেতু রাস্তার মাঝখানে আছে আমারও গতি কমাতে হল জিপের। গতি একেবারেই কমে এল মোটর সাইকেলের। দেখলাম, ঋজুদা কোমরের বেল্ট-এর সঙ্গে বাঁধা পিস্তলের হোলস্টারের বোতামটা পুটুস করে খুলল।

লোকটা মোটর সাইকেলটাকে দাঁড় করিয়ে জিপের বাঁদিকে ঋজুদার কাছে এসে বলল, 'কাম্ব সারিলা স্যর'।

হেব্বা কেন?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

সেই বাঘঘটা পট্টনায়েকবাবুর ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল।

সে কী? কোথায় ছিল সে? মরে গেছে?

মরবে না? বড় বাঘে যাকে ধরে, সে কি আর বাঁচে স্যার!

তাকে মেরে বনের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে।

কোথায় ধরল?

বোস্টম নালার পাশে একটা বড়ো কুচিলা গাছ আছে না? সেই গাছের তলাতে ধরেছে। এখন আর কথা বলে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না স্যার। তাড়াতাড়ি আসুন আপনি। সেই পট্টনায়েক বুড়োটা হার্টফেল করে এতক্ষণে মরেই গেল না কি, কে জানে!

বলেই, মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, মু পলাইলি। আপনি দয়া করিকি চঞ্চল আসন্ত।

ঋজুদা আমাকে বলল, ঘোরা জিপ। সবই তোদের কপাল। কথায় বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। মনে আছে রুদ্র, হাজারিবাগের মুলিমালোঁয়ায় খুনের পরে খুন, না ভেনেও বা উপায় ছিল কী?

মনে আবার নেই!

আমি বললাম।

'অ্যালবিনো' বইটা কিন্তু তুমি দারুণ লিখেছিলে রুদ্র। আমার বড়মামা পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত। যিনি বলেন, বাংলা ভাষায় সব ম্যাদামারা সাহিত্য হয়। বাংলা বই ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেন না । সেই তিনিই স্বয়ং প্রশংসার ঝড় বইয়ে দিলেন। আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই, না?

তিতির বলল।

হ্যাঁ। 'ঋজুদা সমগ্র'তে আছে।

আমি বললাম, জিপ ঘোরাতে ঘোরাতে।

পুরুণাকোটে পৌঁছে দেখলাম, বন-বাংলোর সামনেটাতে একটা ছোটখাটো জটলা মতো হয়েছে। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে পট্টনায়েকবাবু বিভ্রান্ত হয়ে বসে আছেন। দুটো শট-গান নিয়ে দুজন লোক সেই জটলার মধ্যে আছে। আরও একজন আসছে দেখলাম একটা একনলা গাদা বন্দুক নিয়ে।

আমরা যেতেই সকলে একসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল, বিভিন্ন স্বরগ্রামে। তখন মোটর-সাইকেল চালিয়ে-আসা লোকটা তাদের ধমক দিয়ে বলল পট্টি করুনান্তি। সবে চুপ যাউ।

ঘটনাটা জানা গেল। পট্টনায়েকবাবু যখন আমাদের কাছে এসেছিলেন বাংলোয়, তখন তার বড় ছেলে যুধিষ্ঠির ড্রাইভিং-সিটেই বসেছিল। সে-ই নাকি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছিল ঢেনকানল থেকে। যদিও ড্রাইভারও ছিল। আমরা তাকেই ভেবেছিলাম ড্রাইভার। যুধিষ্ঠির খুবই লাজুক প্রকৃতির ছেলে ছিল। পট্টনায়েকবাবু বলা সত্ত্বেও সে নামতে চায়নি গাড়ি থেকে। তার বিয়েও নাকি ঠিক করে ফেলেছিলেন পট্টনায়েকবাবু।

বাংলো থেকে নেমেই ওঁরা গাড়ি করে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। জঙ্গলে বিপুল পরিমাণ গাছ, কাটা অবস্থায় পড়ে ছিল, যা মোষ দিয়ে জঙ্গল থেকে ঢোলাই করে এনে পথপাশের কোনও উঁচু জায়গাতে সাজিয়ে রেখে ট্রাক-এ লোড করার কথা ছিল। কাবাড়িরা তো পালিয়েইছে, অতজন মানুষকে বাঘে নেওয়ার পর থেকে কোনও লোক মোষ নিয়ে ঢোলাই করতেও যেতে চায়নি। ট্রাক ড্রাইভার এবং খালাসিরাও না। দামি, কাটা গাছের বল্লাগুলো কেউ চুরি-টুরি করছে কি না তাই সরেজমিনে তদন্ত করতেই গাড়ি করে পট্টনায়েকবাবু, তাঁর ছেলে যুধিষ্ঠির এবং তাঁদের মুহুরি মহান্তিবাবু জঙ্গলে গিয়েছিলেন। তাঁরা গাড়ি থেকে নামবেন নাই ঠিক করেছিলেন। আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে তাঁরা পুরো জঙ্গলটা ঘুরে রাস্তা থেকেই যতটা দেখা এবং অনুমান করা যায় তা দেখে এবং করে ফিরে আসছিলেন।

মহান্তিবাবুর তত্ত্বাবধানেই গাছ সব কাটা হয়েছিল। জঙ্গলের গভীরে নন্দিনী নালার পাশে তাঁদের বাঘ্ঘমুণ্ডার ক্যাম্প ছিল। নামেই ক্যাম্প কিন্তু তাঁবু নেই। বাঁশ বেড়ার গায়ে মাটি লেপা এবং উপরে ঘাসের ছাউনি দেওয়া তিনখানি ঘর। একখানি ছিল মহান্তিবাবুর। তাতে একটা কাঠের পাটাতনের খাট আর হিসাবপত্র করার কাগজ-টাগজ থাকত। অন্য দুটো ঘরে কাবাড়িরা খড় পেতে মাটিতে শুত ঘরের মধ্যে আগুন করে। বাইরে মাটির হাঁড়িতে রান্না করত। এখন সে সব ঘর হাট করে খোলা পড়ে আছে। জঙ্গল দেখে এসে ওঁরা যখন ক্যাম্পের কাছে পৌঁছোন তখন মহান্তিবাবু বলেন, বাঘ্ঘমুণ্ডা ছেড়ে তড়িঘড়ি পালিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁর গড়গড়াটা ঘরে ফেলে এসেছেন। এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে সেটা নিয়ে আসবেন। কাগজপত্র সব আগেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

ঝকঝক করছে রোদ্দুর জঙ্গলময়। ডিসেম্বরের সুনীল আকাশ। এই দিনমানে কোনওরকম ভয়কে প্রশ্রয় দিতেও লজ্জা করে। তা ছাড়া, বাঘ তো আর ওঁদের ক্যাম্পের ঘরে ঢুকে মহান্তিবাবুর খাটে শুয়ে থাকবে না।

ক্যাম্পের সামনে ও পিছনে এবং পাশেও আগাছা পরিষ্কার করা ছিল। হরজাই ও জ্বালানি কাঠের গাছও কেটে ফেলায় ফাঁকা ছিল এলাকাটুকু। ওখানেই মুহুরি আর কাবাড়িদের, ঢোলাইওয়ালাদেরও ওঠা-বসা রাতে আগুন করে আগুন পোয়ানো, সকালে ও রাতে রান্নাবান্না। পাশ দিয়েই বয়ে গেছে নন্দিনী নালা। জলের সুবিধে দেখেই ওখানে ক্যাম্প করা হয়েছিল।

মহান্তিবাবু বললেন, আপনারা গাড়িতেই বসুন, আমি যাব আর আসব। রাস্তা থেকে ক্যাম্পটি দেখাও যাচ্ছিল।

মহান্তিবাবু নেমে গেলে যুধিষ্ঠির বলল, বড় হিসি পেয়েছে, বাবা, মহান্তিবাবু ফিরে আসতে আসতে আমি নেমে হিসি করে নিই।

ক্যাম্পটা, হাতিগির্জা পাহাড়ের দিক থেকে এলে পথের ডানদিকে পড়ে। ওঁরা হাতিগির্জা পাহাড়ের দিক থেকেই আসছিলেন জঙ্গল দেখে-টেখে। যুধিষ্ঠির,

ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে, ঘুরে গাড়ির পিছন দিকে দুপা সামনে গিয়ে, বাঁদিকে মুখ করে উবু হয়ে হিসে করতে বসল। গ্রামের মানুষেরা শহুরেদের মতো দাঁড়িয়ে হিসি করে না। পুরুষরাও বসেই হিসি করে। এমন সময়ে হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের চোখ পড়ল পথের ধুলোর উপরে। বাঘের পায়ের দাগ। একেবারে টাটকা। হিসি করতে করতেই সে চেঁচিয়ে মহান্তিবাবুকে ডেকে বলল, চঞ্চল আসন্তি মহান্তিবাবু, বাঘ্‌ঘটা এইঠি অছি।

সে কথা শুনে পট্টনায়েকবাবু গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছেলে এবং মহান্তিবাবু দুজনেরই উদ্দেশে হাঁক পেড়ে চললেন, চাল যুধিষ্ঠির! চালন্তু মহান্তিবাবু। চঞ্চল পলাইবি। আউ এঠি রহি হেব্বনি।

যুধিষ্ঠির যখন হিসি করা সেরে বাঁদিক থেকে এসে গাড়ির পিছন ঘুরে গাড়ির ডান দিকের ড্রাইভিং সিটে উঠতে যাবে, ঠিক তখুনি বাঁদিকের জঙ্গল থেকে বাঘ অতর্কিতে এক লাফ দিয়ে যুধিষ্ঠিরের ঘাড়ে পড়ে, তাকে এক ঝটকাতে মাটিতে ফেলে, তার ঘাড় ভেঙে, টুঁটি কামড়ে ধরে টানতে টানতে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে জঙ্গলের গভীরে চলে গেল পট্টনায়েকবাবু কিছু বোঝার আগেই। বাঘকে দেখে হনুমানেরা হুপ-হুপ-হুপ করে উঠল। ময়ূর ডেকে উঠল কেঁয়া-কেঁয়া করে। মহান্তিবাবু ধপ করে কিছু একটা মাটিতে পড়ার শব্দ শুনে গড়গড়াটা হাতে নিয়ে উর্ধশ্বাসে দৌড়ে এলেন গাড়ির দিকে। এবং ওই বীভৎস দৃশ্য দেখলেন।

ঋজুদা বলল, তিতির তোকে কিন্তু বাংলোতে রেখেই যাব।

কেন?

গোয়েন্দাগিরিতে তুই রুদ্রর চেয়ে অনেক দড়, কিন্তু এইরকম সাংঘাতিক মানুষখেকো বাঘকে পায়ে হেঁটে গিয়ে মারা সত্যিই বড় বিপজ্জনক। ভটকাই এবারে এলে ওকেও নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠত না। তা ছাড়া, বন্দুক তো মাত্র দুটো। তাও গুলিগুলোর যা চেহারা দেখলাম, সময়-বিশেষে ফুটলে হয়। অন্য একটা ভাল বন্দুক থাকলেও না হয় কথা ছিল। রাগ করিস না। ভুলও বুঝিস না আমাদের। প্লিজ। তুই বাংলোতে বসে বই পড় বা পাখির ডাক শোন। আজ রাতেই দেখতে পাবি সামনের বিস্তীর্ণ ধানখেতে হাতির পাল নামবে এসে বাঘ্‌ঘমুণ্ডা আর হাতিগির্জা পাহাড়ের দিক থেকে। ততক্ষণে, আশাকরি আমরাও অক্ষত অবস্থাতে ফিরে এসে তোর পাশে বসে হাতি দেখব।

কখন ফিরবে তোমরা?

তা কী করে বলব?

টর্চ নিয়ে যাও। আর জলের বোতল।

নিয়েছি। তবে দিনে দিনেই ফিরে আসার চেষ্টা করব। অন্ধকারে মানুষখেকো বাঘের সঙ্গে পায়ে হেঁটে মোকাবিলা করার মতো বাহাদুর আমি নই। জিম করবেট

তো সকলে নয়।

বলেই বলল, চললাম রে তিতির।

আমি হাত তুললাম তিতিরের দিকে।

তিতির বলল, গুড লাক। গুড হান্টিং।

পট্টনায়েকবাবু একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। তিনি পুরুণাকোটের বড় চায়ের দোকানটার সামনের বেঞ্চিতে আধশোওয়া হয়ে বসেছিলেন আর তার সামনে পুরুণাকোটের অনেকেই দাঁড়িয়ে বসে ছিল। ওঁকে সকলেই চিনত এবং ওদের মধ্যে কেউ কেউ ওঁর কাছে কাজও করেছে বিভিন্ন সময়ে। উনি কেবলই বিলাপ করছিলেন: আমি যুধিষ্ঠিরের মাকে গিয়ে কী বলব! এই পোড়া মুখ দেখাব কি করে। মহান্তিবাবু পাশে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সান্ত্বনা কি দেওয়া যায় সদ্য পুত্রহারা বাবাকে? তা ছাড়া যে ছেলের মৃত্যু এমন বীভৎসভাবে হয়েছে, এমন মর্মান্তিকভাবে। বাবারই চোখের সামনে।

পট্টনায়েকবাবুর ড্রাইভারের সঙ্গে স্থানীয় দুজন সাহসী লোক সামনের সিটে বসল। আমি, ঋজুদা আর একনলা গাদা বন্দুকধারী শিকারি, মাঝবয়সি, ফরসা, বেঁটে, যার নাম হট, সেও। ঋজুদা ড্রাইভারকে বলল, তোমরা কেউ গাড়ি থেকে নামবে না।

তাদের কারুরই মুখের ভাব এবং নিঃসাড় অবস্থা দেখে অবশ্য আদৌ মনে হল না যে তারা একজনও গাড়ি থেকে নামবার জন্য ছটফট করছে। বিশেষ করে ড্রাইভার তো নয়ই, গাড়ির পিছনের সিটে বসে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গযাত্রা সেও তো চাক্ষুষ করেছিল। যুধিষ্ঠিরের পতনের পর সেই তো গাড়ি চালিয়ে, বিহারে যাকে বলে "টিকিয়া উড়ান" চালিয়ে রুদ্ধশ্বাসে পুরুণাকোটে এসে পৌঁছেছিল। আধঘণ্টার পথ দশ মিনিটে।

এই 'টিকিয়া উড়ান' কথাটা ঋজুদার কাছ থেকেই শেখা। হিন্দি কথা। চালক যখন এত জোরে গাড়ি চালায়, বিশেষ করে জিপ যে, তখন তার টিকিটা মাথার পিছনে হাওয়ার তোড়ে পতাকার মতো খাড়া হয়ে বুনো শুয়োরের লেজের মতো উড়তে থাকে। গাড়ি বা জিপের সেই উদ্দাম গতিকেই বলে 'টিকিয়া উড়ান'।

একটুক্ষণ পরেই ড্রাইভার ক্যাম্পের সামনে আমাদের নামিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। গাড়িটার সাইলেন্সার পাইপে ফুটো আছে একটা, ফাস্ট রেসিং-এর ফরমূলা কার-এর মতো কান-ফাটানো আওয়াজ করে চলবার সময়ে। গ্রামাঞ্চলে অনেক গাড়ির মালিকের ধারণা আছে, এত টাকা দিয়ে গাড়িই যখন কিনেছি তখন তা নিঃশব্দেই যদি চলল তা হলে জানান দেওয়া যাবে কী করে যে তিনি গাড়ি চড়ছেন! কিন্তু জঙ্গলের কিছু জানোয়ার, বিশেষ করে হাতি এই ভটভট আওয়াজকে এবং মোটর সাইকেলের আওয়াজকেও বিশেষ অপছন্দ করে এবং অনেক সময়ে রে-রে-রে করে তেড়ে আসে, যেমন আসে শহরের পথের কুকুরও। এই ছিদ্রিত শব্দ তাদের irritate করে, চুলকানির মতো।

পথপাশের একটা বড় কালো পাথরে বসে আমরা যার যার বন্দুক এবং গুলি দেখে নিলাম। ব্রিচ ভেঙে বন্দুকটা লোডও করে নিলাম। ঋজুদার শিক্ষা মতো ডান ব্যারেলে এল জি এবং বাঁ ব্যারেলে বুলেট পুরি শটগানে যদি বন্দুকের ব্যারেলে 'ডাবল চোক' থাকে। এই বন্দুক বেলজিয়ান । .১২ বোরের আর ঋজুদারটা অঙ্গুলের ঠিকাদার বিমলবাবুর। ইংলিশ টলি বন্দুক। বন্দুকটার চেহারা ছবি ভাল। যত্নে রাখেন মনে হয়। আমার বন্দুকটার দু ব্যারেলেই ময়লা আছে। শেষবার গুলি ছুঁড়ে আর পরিষ্কার করা হয়নি। ভাল শিকারি ও যত্নবান মানুষে নিজের নিজের বন্দুককে নিজের বউ-এর চেয়েও আদরে রাখেন। এই বন্দুকের মালিক বন্দুকেরই যদি এত অযত্ন করেন তবে বউ-এর কী অযত্নই না করেন! ভেবে শিহরিত হলাম, নিজের বউ না-থাকা সত্ত্বেও।

বুলেট বলতে আমার স্টক-এ একটামাত্র লেথাল বল। ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স কোম্পানির। আমাদের দেশে বন্দুক ভালই তৈরি হয়, কিন্তু গুলি, বিশেষ করে ছররা গুলির এমনই জারিজুরি যে বুনো হাঁস পর্যন্ত গায়ে লাগলে ডানা ঝেড়ে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ঝুরঝুর করে ফেলে দেয়। এক দানা ছররাও ডানা ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করে না। জানি না, এখন হয়তো ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্সের গুলির মান উন্নত হয়েছে। গুলিগুলোতে শ্যাওলা জমে গেছে, ফাঙ্গাস। কে জানে, কত বসন্ত এবং বর্ষার সাক্ষী এরা! পিতলের ঝকঝকে ক্যাপ নীল হয়ে গেছে দীর্ঘদিনের অবহেলায়।

আমি মাঝেমধ্যে দায়ে পড়লে মিথ্যা কথা বলি না এমন নয়। তাই এই না-ফোটা গুলির বন্দুক হাতে করে হতভাগা বাঘের ভোগে লেগে আমারও সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হবার কোনও বাসনা আদৌ ছিল না। কিন্তু কী করা যাবে। এই হাতিয়ার হাতেই যথাসাধ্য করতে হবে। একটা মানুষকে শব বানিয়ে সেই রাক্ষস এখন তাকে খাচ্ছে।

ঋজুদার মুখ দেখে মনে হল সেও এমনই ভাবছিল গুলি লোড করতে করতে। কিন্তু কী আর করা যাবে! নিজেদের হাতের বন্দুক রাইফেল ছাড়া মানুষখেকো বাঘের মোকাবিলা করা সত্যিই বড় অস্বস্তিকর।

আমাদের সঙ্গী মিস্টার হট অথবা হটবাবুর পরনে একটা গেরুয়া খেটো ধুতি। গায়ে একটা ঘোর লাল রঙের গেঞ্জি। তার উপরে ঘোরতর বেগুনে রঙের বিনুনি করা র‍্যাপার। ঋজুদার নিম্নাঙ্গে হালকা ছাইরঙা ফ্লানেলের ট্রাউজার এবং উপরে বিস্কিট রঙের জমির উপরে অতি হালকা সবুজ স্ট্রাইপের ব্লেজার। আমি পরেছি একটা ফিকে নীল জিনস তার উপরে বড় মামিমার বুনে দেওয়া লেমন ইয়ালো রঙা ফুলহাতা পোলো-নেক সোয়েটার, টেনিস খেলার সাদা ফ্রেড-পেরি গেঞ্জির উপরে। শিকারিদের সাজ-পোশাক দেখলে বাঘ এমনিতেই ভিরমি খাবে। গুলি আর করতে হবে না। তা কী আর করা যাবে। এখানে এসে যে মানুষখেকো বাঘের মোকাবিলা করতে হবে তা কে জানত আগে।

হটবাবু লোকটার ভয়ডর একটু কমই আছে। বটুয়া থেকে বের করে সেজে দুটো অখয়েরি গুণ্ডি মোহিনী পান মুখে দিয়ে অনেকখানি গুণ্ডি ফেলে বলল, চালস্তু, জীবা।

অকুস্থলে পৌঁছে হটবাবু পাথরে বসে মনোযোগ সহকারে তার গাদা বন্দুক গাদছিল। তিন আঙুল মতো বারুদ গেদে তারপর সামনে সিসের একটা রেকটাঙ্গুলার তাল (আদৌ গোল নয়) গেদে দিয়ে সে বাঘের 'বাপের নাম খগেন' করবে বলে দৃঢ়প্রত্যয় হয়ে রওয়ানা হবে বলে তৈরি যখন হচ্ছে তখন ঋজুদা তার টগবগে উত্তেজনাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে বলল, হটবাবু, আপনি এখানেই থাকুন। এই বড় আমগাছটার উপরের ডালে চড়ে দেখুনতো কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি না! আপনি এখানে উচ্চাসনে বসে আমাদের বলতে পারবেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি না এবং যা দেখতে পাচ্ছেন তা কোথায়?

হটবাবু হতাশ গলাতে বললেন, আমি সঙ্গে যাব না?

ঋজুদা মাথা নেড়ে বলল, না। আপনি এখান থেকে আমাদের ডিরেকশন দিলে ভারী সুবিধা হবে। আপনিই তো হলেন গিয়ে আমাদের ডিরেক্টর। যেমন ডিরেকশন আপনি দেবেন আমরা তেমন তেমন কাজ করব।

আবারও বুঝলাম, মানুষটা সাহসী। বাঘটার টাটকা ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে সব জেনেও আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য উন্মুখ।

এই ডিরেক্টর শব্দটা হটবাবুর খুব মনে ধরল।

তিনি বললেন, ঠিক আছে। আপনি যেমন বলবেন, তেমনই হবে। বলেই, তিনি বড় আমগাছটাতে ওঠার তোড়জোড় শুরু করলেন। ঋজুদা বলল, আপনি উঠে গেলে তবেই আমরা এগোব।

আচ্ছা। উনি বললেন।

ঋজুদা বলল, আমরা এই গাছের নীচে এসে আপনাকে আওয়াজ দিলে তখনই তাড়াতাড়ি নেমে আসবেন। আর আমরা না-আসা পর্যন্ত এই গাছ থেকে একেবারেই নামবেন না। বুঝেছেন? একেবারেই নয়। এই বাঘটা কিন্তু মহাধূর্ত।

আইজ্ঞাঁ।

মনমরা হয়ে বললেন, হটবাবু।

আমরা দুজনে আগে পরে সিংগল ফরমেশানে এগিয়ে যেতে যেতে যেখানে বাঘটা যুধিষ্ঠিরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার টুঁটি কামড়ে তাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে সেখানে মনোযোগ দিয়ে পথের লাল ধুলোর উপরে বাঘের থাবার দাগ ভাল করে লক্ষ করলাম।

আমি বললাম, ঋজুদা, এ তো বাঘিনী!

হুঁ। তাতে কী হয়েছে! বাঘ হলেও মানুষখেকো, বাঘিনী হলেও তাই।

ঋজুদা পাইপটার ছাই ঝেড়ে বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল।

তারপরে নিচু গলায় বলল, আরও একটু গিয়ে আমরা ব্রাঞ্চ-আউট করে যাব।

বুঝেছিস। তুই যদি আগে দেখতে পাস তা হলে আমার জন্য এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবি। আমি যদি কাছাকাছি থাকি তবে হাতের ইশারাতে বলবি বাঘ কোনদিকে গেল, মানে, যদি এক গুলিতে না পড়ে। তবে একদমই হড়বড় করবি না। বড় বাঘিনী, তার উপর ধূর্ত মানুষখেকো। ভাইটাল জায়গাতে গুলি করবি। রেঞ্জ-এর বাইরে গুলি মোটেই করবি না। যত কাছ থেকে করতে পারিস ততই ভাল। বন্দুক ও গুলি কোনওটার উপরেই তো ভরসা নেই। দুই-ই তো পরস্মৈপদী। আমি যদি আগে দেখতে পাই তো আমিও গুলি করব। এই সুযোগ নষ্ট হলে সাত দিনের মধ্যে আর হয়তো সুযোগ পাওয়াই যাবে না। বুঝেছিস। তোদের তো ঘুরিয়ে সব জায়গা দেখাতেও হবে, যেজন্য এবারে আসা!

হুঁ। আমি বললাম।

তারপর যতদূর ড্র্যাগ-মার্ক আছে, রক্তের দাগ আছে ততদূর আমরা আগে-পিছে করে এগোতে থাকলাম। ড্র্যাগ-মার্ক দেখে বোঝা গেল যে, বাঘটা যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে পথের ডানদিক থেকে পথ পেরিয়ে বাঁদিকের জঙ্গলে গেছে। প্রায় সমকোণে। তার মানে নন্দিনী নালার দিকেই নিয়ে গেছে লাশ। সেই পথে খাওয়া সেরে, জল খেয়ে বনের গভীরে কোথাও রোদের মধ্যে আরামে ঘুমোবে।

এখন নালার এপাশেই আছে না, নালা পেরিয়ে ওপাশে গেছে, তা দেখতে হবে। যা শীত! দশটা বাজে কিন্তু এখনও জমির উপরের শিশির-ভেজা ঘাস ও ঝোপঝাড়ের পাতা পুরোপুরি শুকোয়নি। বড় গাছের পাতাগুলো অনেক বেশি রোদ পায়। তারা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। একটা মস্ত কুচিলা গাছে বসে অনেকগুলো বড়কি ধনেশ হ্যাঁক-হ্যাঁক, হক্ক-হক্ক করছে। ভারী কর্কশ ডাক এই পাখিগুলোর।

পথের লাল ধুলোতে লাশ হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ এবং রক্ত পড়েছিল। তখনও রক্ত শুকোয়নি। তখনও দুজনে এক সঙ্গেই এবং কাছাকাছিও ছিলাম। যখন বাঘের বা লাশের চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না তখনই আমরা আলাদা হয়ে যাব দুদিকে। এমনই ঠিক ছিল।

বনের গভীর থেকে ময়ূর ডাকছে। দুটো কুম্ভাটুয়া পাখি, ইংরেজিতে যাদের নাম Crow Pheasant, বাদামি আর কালো, বড় লেজ-এর গুব-গুব-গুব-গুব করে ডেকে বনের আলোছায়ার রহস্যময়তা আরও যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাতের বেলা এদের ডাক শুনলে বুক দুরদুর করে। কেন কে জানে! কপারস্মিথ পাখি ডাকছে টাকু-টাকু-টাকু-টাকু করে। আর তার দোসর সাড়া দিচ্ছে নন্দিনী নালার ওপার থেকে। শীতের সকালের মন্থর হাওয়াতে বাঁশবনে নিচুগ্রামে স্বগতোক্তির মতো কটকটি আওয়াজ উঠছে। বাঁশের গায়ের হলুদ আর পেঁয়াজখসি রঙের হালকা, মসৃণ ফিনফিনে খোলস উড়ছে ঝিরিঝিরি করে বয়ে-যাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়ায়। চারিদিকে সবুজের সে কী সমারোহ! সবুজ যে কত রকমের হতে পারে তা জানতে হলে আমাদের দেশে নয়তো পশ্চিম আফ্রিকাতে যেতে হয়। পরতের পর

পরত, গাঢ় থেকে ফিকে, ফিকে থেকে গাঢ়, কত বিভিন্ন ছায়ার সবুজ যে আছে এখানে।

আমরা নালার পারে এসে দাঁড়ালাম। বাঘিনী লাশটাকে নিয়ে প্রস্তরময় এবং বালুময় নন্দিনী নালা পেরিয়ে ওপারে চলে গেছে। নানা পাথরের উপরে এবং বালিতে রক্তের দাগের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ আর বাঘিনীর থাবার দাগ। বালির উপরে যুধিষ্ঠিরের রক্তমাখা ধুতি, পাঞ্জাবি, আন্ডারওয়্যার এবং আলোয়ান বিভিন্ন জায়গাতে, আগে-পরে ফালা-ফালা হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। চটি-জোড়া অবশ্য যেখানে বাঘ তার ঘাড়ে পড়েছিল সেখানেই উল্টে পড়েছিল। নদীর ওপারের কোনও নিভৃত জায়গাতে নিয়ে গিয়ে সে খাচ্ছে যুধিষ্ঠিরকে অথবা খেয়েছে অথবা ফেলে চলে গেছে জঙ্গলের গভীরে কোথাও গাছ-গাছালির চন্দ্রাতপের নীচে লাশটাকে, শকুনের চোখের থেকে আড়াল করে, পরে এসে খাবে বলে।

এমন সময়ে, হঠাৎ ঋজুদা একটা শিস দিল। বুলবুলির শিস-এর মতো।

ঋজুদার চোখকে অনুসরণ করে দেখলাম যে বাঘিনীর থাবার দাগ। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে কিছুটা বাঁদিকেই নদীর বালির উপরে।

বাঘিনী কি নদী পেরিয়ে বাঁদিক দিয়ে উঠে এপারে এসেছে লাশ ফেলে রেখে? বালির উপরে দাগগুলো ধেবড়ে রয়েছে। তার মানে, খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে এসেছে সে।

কতক্ষণ আগে নদীটা পেরিয়ে এদিকে এসেছে তা কে জানে। আমাদের গাড়ির শব্দ শুনে বা আমাদের কথাবার্তা শুনেই কি সে 'কী ব্যাপার' তা দেখতে এসেছে? নাকি, তাকে আমরা অনুসরণ করে এখানে এসে পৌঁছবার একটু আগেই নদী পেরিয়ে এদিকে এসেছে। গাড়ির আওয়াজ এবং আমাদের এখানে আসার শব্দ পেয়ে অন্য বাঘ হলে তার বনের আরও গভীরের নিরাপত্তাতে চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল লাশ নিয়ে অথবা না-নিয়েই, কিন্তু সে না পালিয়ে, আবারও এপারেই এসেছে। আমাদের বেয়াদবির উচিত শিক্ষা দেবার জন্যেই কি? না, নিছক ঔৎসুক্যরই কারণে?

সুন্দরবনের মানুষখেকোরাও নাকি এরকম। মানুষের ভয় তাদের চলে গেছে। পারে নৌকো ভিড়লে, এমনকী বনবিভাগের দেওয়া আছাড়ি পটকার শব্দ শুনলেও, তারা পালিয়ে না গিয়ে, সেই শব্দর কাছে আসে, সুযোগ খোঁজে, মানুষ ধরার। বাঘের মতো তীব্র ঔৎসুক্য খুব কম প্রাণীরই আছে। ঋজুদা বলে 'inquisitivness'-ই হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের লক্ষণ। এই জন্যই বাঘকে ঋজুদা খুবই জ্ঞানী বিবেচনা করে। পৃথিবীর সব চাইতে সাহসী প্রাণী হিসাবে তো করেই।

খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে "কিংকর্তব্যবিমূঢ়", তাই হয়ে আমরা দুজনে যখন সিচুয়েশনটা সাইজ-আপ করছি ঠিক সেই সময়েই পট্টনায়েকবাবুর পুরনো ক্যাম্পের দিক থেকে গদ্দাম করে একটা গুলির আওয়াজ হল। বন্দুকের

গুলি তো ফুটল না, যেন গাঠিয়া ফুটল। সে আওয়াজে মেদিনী কম্পমান হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে হটবাবুর গলা-ফাটানো চিৎকার শোনা গেল, "স্যর। স্যর। সে বাঘ সে পাখ্খের গন্ধা। সাবধান! সাবধান!"

গুলির আওয়াজ এবং হটবাবুর চিৎকার শুনে আমরা দুজনে দুপাশে সরে গিয়ে পজিশন নিলাম বসে পড়ে। ঋজুদা আমাদের পিছনের রাস্তা এবং পাশের জঙ্গলে চোখ রাখল আর আমি নদীর দিকে।

পট্টনায়েকবাবুর পুরনো ক্যাম্পটা থেকে আমরা বড়জোর পাঁচশো গজ এসেছি। হটবাবুর গুলি খেয়ে অথবা না-খেয়ে বাঘের আমাদের কাছে পৌঁছতে অতি সামান্য সময়ই লাগার কথা। অথচ বনে অথবা নদীতে কোনওই শব্দ নেই।

গুলির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে অগণ্য হনুমান হুপ-হুপ-হুপ করে উঠেছিল। অসংখ্য অদৃশ্য পাখি উত্তেজিত হয়ে ডালে ডালে নাচানাচি করতে করতে ডাকছিল। কিন্তু তাদের কলরবও এখন থেমে গেছে পুরোপুরি। এখন মৃত্যুর নৈঃশব্দ্য চারদিকে। নন্দিনী নালার জলের চলার শব্দই শুধুই ছিদ্রিত করছে দিনমানের সেই ভৌতিক গা-ছমছম নিস্তব্ধতাকে।

এমন সময়ে হঠাৎই জলে একটা ছপছপ শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা এল ঋজুদা যেদিকে ছিল, সেই বাঁদিক থেকেই। নন্দিনী নালা সেখানে একটা ঠিক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাঁক নিয়েছিল।

আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে নদীর ওপাশটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। ছপছপ শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ঋজুদা দ্রুত নদীর দিকে এগিয়ে গিয়ে Prone Position-এ আগাছা-টাগাছার উপরেই শুয়ে পড়ল। তাতে যে শব্দ হল তা নিশ্চয়ই বাঘের অতি-সজাগ কান এড়াল না। তারপর...

বন্দুকটাকে সোজা করে ঋজুদা চকিতে নিশানা নিয়ে গুলি করল।

কী হল বোঝা গেল না। ততক্ষণে আমিও ঋজুদার দিকে দৌড়ে গেছি। কিন্তু ঋজুদা, আমি পৌঁছবার আগেই স্লিপ খাবার মতো করে নদীর বুকে নেমে পড়েছে। তাকিয়ে দেখি, বাঘিনী, দুটো পাথরের মাঝে নদীর জলে পড়ে রয়েছে এবং তার শরীরের রক্ত নদীর বহমান জলকে ধীরে ধীরে গোলাপি করে দিয়ে বইছে।

ভাবলাম, তাহলে হটবাবুর কামানের গুলি কি ফসকে গেল? ঋজুদার গুলিই লাগল এখন? ঋজুদা, জল, বালি ও পাথর এক এক লাফে টপকে-টপকে বাঘিনীর দিকে এগোচ্ছিল। উদ্দেশ্য, বাঘের খুব কাছে গিয়ে তাকে আবার গুলি করা। আমিও ঋজুদার পিছন পিছন ছুট লাগালাম। বাঘিনী থেকে যখন হাত কুড়ি দূরে তখন ঋজুদা দাঁড়িয়ে পড়ে বাঁদিকের ব্যারেল ফায়ার করল। কিন্তু গুলি ফুটল না। যে বাঘিনী মরে গিয়েছিল ভেবেছিলাম, সে-ই মুহূর্তের মধ্যে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠে, উড়ে এল ঋজুদার উপরে। আমি ঋজুদার হাত দুয়েক ডানদিকে ছিলাম এবং হাত পাঁচেক পিছনে। বন্দুক তুলে বাঘিনীর লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ডানদিকের ব্যারেল ফায়ার করলাম উড়ন্ত বাঘের গলা লক্ষ্য করে।

ডানদিকের ব্যারেলে ভাগ্যিস এল জি. পুরেছিলাম। এল জি এর বড় বড় দানাগুলো তার গলাতে ও ঘাড়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল।

শর্ট-রেঞ্জে শটগানের মতো কার্যকরী আর কিছুই নয়। হাই ভেলোসিটি রাইফেলের গুলি বাঘের শরীর এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে চলে যায় বটে, কিন্তু তার আগে বাঘও সহজে মেরে দিয়ে যেতে পারে শিকারিকে। শর্ট-ডিসট্যান্সে, রাইফেলের গুলি কিন্তু ধাক্কা দিয়ে আহত বিপজ্জনক জানোয়ারকে উলটে ফেলে দিতে পারে না। বন্দুকের গুলি পারে।

এত করেও ঋজুদাকে বাঘিনীর হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না। দু'হাত আর দু'পা প্রসারিত করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নখ ছড়িয়ে বাঘিনীটা ঋজুদার উপরে এসে পড়ল। বন্দুকের গুলির স্টপিং-পাওয়ার short-range-এ সত্যিই মারাত্মক। তাই বাঘিনী তার শরীরের কয়েকমণ ওজন নিয়ে ঋজুদার বুকে পড়ে তাকে আহত করল বটে কিন্তু তার দম ফুরিয়ে এসেছিল তখন। শুধু গতিজাড্যতেই তার শরীরটা এসে পড়েছিল ঋজুদার উপরে, তার আক্রমণে জোর ছিল না একটুও। বাঘিনী, ঋজুদাকে বালি আর জলের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে নিজেও বালির মধ্যেই পড়ে গেল। ঋজুদার গা ঘেঁষে।

আমি কোনও ঝুঁকি না নিয়ে দৌড়ে গিয়ে তার বাঁ কানের ফুটোর কাছে ব্যারেল ঠেকিয়ে বাঁদিকের ব্যারেল ফায়ার করলাম। খট করে একটা শব্দ হল। কিন্তু গুলি ফুটল না।

কিন্তু বাঘিনী তখন স্বর্গলাভের জন্য ব্যাকুল। কানের কাছে সেই খট শব্দেই সে চোখ দুটো বন্ধ করে মাথাটা এলিয়ে দিল। এমনই ভাবে এলাল। যেন ঋজুদাকে কোল বালিশ করেই শুতে চায়।

ইতিমধ্যে ক্যাম্পের দিক থেকে গদ্দাম করে আরেকটা আওয়াজ হল হটবাবুর গাদা বন্দুকের। সে আওয়াজ পুরুণাকোট অবধি পৌঁছবার দরকার ছিল না। তার আগেই আগেপিছে পরপর তিনটা গুলির আওয়াজে পট্টনায়েকবাবু এবং মহান্তিবাবু নিজেরাই গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে এবং অন্য একজনকে নিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্পের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন। পৌঁছেই হটবাবুর কাছে ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট নিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পুরুণাকোট থেকে সকলকে আসার জন্য খবর দিতে।

ঋজুদার সমস্ত শরীর রক্তে ভিজে যাচ্ছিল। তবু উঠে বসে ডান হাত দিয়ে ডান কানে হাত দিয়ে বলল, এই কান ধরলাম, আর কোনওদিন অচেনা বন্দুক আর অচেনা গুলিতে এ জীবনে শিকার করব না। ভাগ্যিস তোর গুলিটা ফুটেছিল নইলে আমাকে বাঘিনী ছিঁড়ে খুঁড়ে দিত।

তোমার কিন্তু আসলে হয়নি কিছুই। নখও তেমন ঢোকেনি ভিতরে। তোমার মোটা টুইডের কোটটা খুব কাজে দিয়েছে।

তা ঠিক। আঘাত গুরুতর নয় অবশ্যই। কিন্তু তবু কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে

আঠারো ঘা।

তুমি নিজে হেঁটে যেতে পারবে?

আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম।

তারপর স্বগতোক্তি করলাম, রক্ত যাতে বন্ধ হয় তার জন্য কিছু করতে হবে।

মনে হয় তো পারব। তবে একটা shock তো হয়েছেই। দাঁড়া। পাথরে হেলান দিয়ে বসে পাইপটা ধরাই।

ইতিমধ্যে হটবাবুর সঙ্গে পট্টনায়েকবাবু, মহান্তিবাবু আর পট্টনায়েক বাবুর ড্রাইভার লাফাতে লাফাতে নদীর মধ্যে নেমে এলেন।

পট্টনায়েকবাবু বললেন, আমার ছেলের খুনের বদলা নিতে গিয়ে আপনি নিজের প্রাণটাই দিয়ে বসেছিলেন ঋজুবাবু। কী করে যে কৃতজ্ঞতা জানাব। বলেই কেঁদে ফেললেন ঝরঝর করে।

মহান্তিবাবু নদীর পারে ফোটা জংলি গ্যাঁদার পাতা কোঁচড় ভরে ছিঁড়ে এনে দুহাতে কচলে কচলে তার রস নিংড়ে ফেলতে লাগলেন ঋজুদার ক্ষতগুলির উপরে।

ঋজুদা রাগের গলাতে পট্টনায়েকবাবুকে বললেন, এই গুলিগুলো কার কাছ থেকে এনে দিয়েছিলেন। তাকে আমি গুলি করে মারব। খুনের দায় বাঘিনীর নয়, সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেরই।

আমি হটবাবুকে বললাম, কোথায় গুলি করেছিলেন আপনি বাঘের শরীরের? বাঘটা এল কোন দিক থেকে?

তা কী আমি জানি! আপনারা চলে যেতেই দেখি বাঘটা ক্যাম্পে মহান্তিবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে পথে পড়ে আপনাদের দিকে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে। গাছের ওপরে যে তার যম বসে আছে তা তো সে দেখেনি।

হটবাবু তারপরে বললেন, তার মানে, আমরা যখন এখানে কথাবার্তা বলছিলাম বাঘ তখনি নদী পেরিয়ে এসে মহান্তিবাবুর ঘরে চোখের আড়ালে ঢুকে পড়েছিল। কে জানে! হয়তো মহান্তিবাবুর গড়গড়া টানতে এসেছিল।

আমি বললাম, বাঘ নয়, বাঘিনী।

উনি বললেন, ওই হল। ডোরাকাটা তো!

তারপর?

তারপর কী? আমি দেখলাম হারামজাদি তো এবারে আপনাদের একজনকে ধরবার তালে আছে। তাই আর কালবিলম্ব না করে দেগে দিলাম আমার একনলি গাদা বন্দুক তার শিরদাঁড়া লক্ষ করে।

গুলিটা সম্ভবত শিরদাঁড়াতে না লেগে পাশে লেগেছিল।

শিরদাঁড়াতে লাগলে ওইখানেই চিৎপটাং হত। দেখো, একশো গ্রামেরও বেশি সিসে দিয়ে তালের বড়ার সাইজের বল বানিয়ে ছিলাম। আমার বন্দুকের নল সেই প্রায় চারকোনা বল-এর বলে ফেটে যায়নি এই বাঁচোয়া। কিন্তু বাঘিনী বিলক্ষণ

বুঝেছে হটকুমার দাস-এর মার কী জিনিস। তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কেউ কখনও আমার সামনে এ জীবনে আসবে না। মাটিতে বসে পড়েছিল গুলি খেয়েই। তারপর হাঁচোড়-পাঁচোড় করে কোনওক্রমে উঠেই নদী বলে ভোঁ দৌড়। দো-নলা বন্দুক আমার কাছে থাকলে পথেই ওকে থাকতে হত।

দো-নলা বন্দুক থাকলে কী হত? গুলিই তো ফোটে না! তা ছাড়া এতই যদি আপনার আত্মবিশ্বাস তো এতদিনে বাঘিনীকে মারলেন না কেন? ন'নটা, ন'টা কেন যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে দশজন মানুষ খেল!

হটবাবু কথা ঘুরিয়ে বলেন, ওই বটকেষ্ট দাস অমনই। মহা কেপ্পন। তা ছাড়া ও তো মারে চুরি করে হরিণ কুটরাই। বাঘের সামনে গেছে কখনও? ধুতি হলুদ হয়ে যাবে না!

তারপর বললেন, আমি এমনি চিতা বা বড় বাঘও মেরেছি কিন্তু এই মানুষখেকোর হরকৎ দেখে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আপনারা এসে বল দিলেন। তাই বল পেয়ে বন্দুকে বল দেগে সঙ্গে এলাম। একা আমার সাহসে কুলোত না। আমিও ফাইটার কিন্তু আমার একজন ক্যাপটেন লাগে। ক্যাপটেন ছাড়া আমি অচল।

একটু পরে পট্টনায়েকবাবুর গাড়ির পিছনে পিছনে জিপ চালিয়ে তিতিরও এসে গেল।

ঋজুদা তিতিরকে দেখে উঠতে গিয়েই পড়ে গেল। কে জানে! কী ধরনের আঘাত হয়েছে। হার্ট কী লাংস-এ বাঘিনীর নখ ঢুকে গেল না তো? বাঁ কাঁধ আর বাহুর সংযোগস্থলে বেশ ভালই জখম হয়েছে বোঝা গেল। বাঁ হাত তুলতে বা নাড়াতে পারছিল না।

মহান্তিবাবুর নেতৃত্বে একদল নদী পেরিয়ে গেল যুধিষ্ঠিরের লাশের যা অবশিষ্ট আছে, তা খুঁজে আনতে। আরেক দল বাঘকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাঠ কেটে দোলার মতো বানাতে লাগল বুনো লতা বেঁধে বেঁধে। আর অন্য একদল তাড়াতাড়ি একটা বাঁশের চালি বানাল। যেমন চালিতে করে মৃত মানুষকে ইলেকট্রিক চুল্লিতে ঢোকানো হয়। সেই চালিতে করে ঋজুদাকে জিপ অবধি বয়ে নিয়ে যাবে তারা। মানুষটা তো আর রোগা পটকা নয়। আমাদের ঋজুদাও তো বাঘই।

বাঁশের চালিটা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। তিতির আমার চোখের দিকে তাকাল। আমি ওর চোখের দিকে।

তিতির এসে ঋজুদাকে ধরল, আমি অন্য দিকে। তিতির তার লালরঙা সিল্কের স্কার্ফটা, যেটা ও মাথায় বেঁধে বসে থাকে জিপে যাওয়া-আসার সময়ে এবং যার উপরে হলুদ আর লাল ফুল ফুল প্রিন্টের কাপড়ের টুপিটা পরে উড়ন্ত চুলকে বশ করার জন্য, সেটা ঋজুদার বাঁ কাঁধে জড়িয়ে দিল। রক্তের লাল আর স্কার্ফের লাল মিশে গেল।

হঠাৎ ঋজুদা থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। বলল, শীত করছে কেন রে আমার?

আমার ভীষণই ভয় করতে লাগল।

ঋজুদাকে তুলে নদী ধরে ওরা ক্যাম্প বরাবর চলতে লাগল যাতে পথে উঠতে সুবিধা হয়। ক্যাম্পের কাছে ঘাট মতো করা ছিল। যত কাবাড়ি চান করত, খাবার জল রান্নার জল সব নিত তো ওই ঘাট দিয়ে নেমে নদী থেকেই।

এমন সময়ে পট্টনায়েকবাবু দৌড়ে চলে গেলেন তাঁর গাড়ির দিকে। ঋজুদাকে আমরা সকলে মিলে ক্যাম্পের সামনের ফাঁকা জায়গাতে যখন উঠিয়ে আনলাম তখন পট্টনায়েকবাবু একটা বোতল নিয়ে দৌড়ে এলেন। দেখলাম গায়ে লেখা আছে Doctor's Brandy। ঋজুদার ক্ষতস্থানগুলোতে একটু একটু করে ঢেলে দিলেন পট্টনায়েকবাবু। তারপর বোতলটা ঋজুদার হাতে দিয়ে বললেন, ওষুধ। একটু একটু করে খান ঋজুবাবু।

তারপরই হটবাবু অবিশ্বাস্য কাজ করলেন। হাঁক পাড়লেন, হাড়িবন্ধু। হাড়িবন্ধু কুয়ারে গল্বে?

হাঁ আইজ্ঞাঁ। বলেই এক বিকটদর্শন সাড়ে ছ'ফিট লম্বা দৈত্যপ্রমাণ মানুষ—তার নাক নেই, যেখানে নাক থাকার কথা সেখানে বিরাট দুটি ফুটো—এসে দাঁড়াল। বুঝলাম, ভালুকে তার নাক খুবলে নিয়েছে। নীচের ঠোঁটেরও কিছুটা। হটবাবু আমাদের সকলকে সরে যেতে বললেন দূরে, তারপর হাড়িবন্ধুকে বললেন, ভালো করি কি বাবুকি সব্ব ক্ষতেরে মুত্বি পকা।

আমরা সরে যেতেই হতভম্ব ঋজুদাকে আরও হতভম্ব করে সেই বিশালাকৃতি হাড়িবন্ধু তার বিশালাকৃতি প্রত্যঙ্গটি বের করে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ঋজুদার সর্বাঙ্গে হিসি করতে লাগল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। যেন বাগানে জল দিচ্ছে। তিতির দূরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমরা যখন ঋজুদাকে জিপের পিছনের সিটে শুইয়ে নিয়ে পুরুণাকোটের বাংলোতে এলাম তখন বাংলোর সামনেটা লোকে লোকারণ্য। খুশির জোয়ার বইছে চারদিকে। এতদিন বাঘিনী বাঘ্‌ঘমুণ্ডার জঙ্গলে যারা কাঠ কাটতে যেত এবং হাতিগির্জা পাহাড়ের দিকে যেত, তাদেরই ধরেছিল। এই প্রথম পুরুণাকোটের এত কাছে নন্দিনী নালার পাশে পট্টনায়েকবাবুর ক্যাম্পের সামনে থেকে দিনমানে এবং মোটর গাড়ির একেবারে পাশ থেকে অন্য মানুষদের সামনেই যুধিষ্ঠিরকে নেওয়াতে পুরুণাকোটে আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছিল। রাতের বেলা তো অলিখিত কার্ফু ছিলই, ইদানীং দিনের বেলাতেও মানুষজন বাড়ির বাইরে যেতে সাহস করত না আর। তাই বাঘিনীর মৃত্যুর সংবাদে স্বাভাবিকভাবে আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল।

টিকরপাড়া থেকে কটকগামী বাস থামিয়ে মানুষে করতপটা গ্রামে এই সুসংবাদটি দিতে অনুরোধ করল ড্রাইভার আর কনডাক্টরকে। 'করতপটা' শব্দটির মানে হচ্ছে করাত দিয়ে চেরা। করাতি বা কাবাড়িদের গ্রাম বলেই গ্রামের নাম করতপটা। লবঙ্গী যাবার পথ ছাড়িয়ে আরও কিছুদূর পরে একটা ছোট নদীর পারে সেই গ্রাম। পথটা নদীর উপর দিয়েই গেছে।

ঋজুদার একটা আচ্ছন্ন ভাব এসেছে। সেটা মোটেই ভাল নয়। পুরুণাকোট বাজারের মধ্যেই অঙ্গুল ও কটক যাবার পথের বাঁদিকে একটা ছোট হাসপাতাল আছে রাজ্য সরকারের। সেখানে ভালুকে নাক-কান ছিঁড়ে নেওয়া, সাপের কামড় খাওয়া এবং বাঘ বা চিতার আক্রমণে আহত বা নিহত হওয়া, হাতির লাথি খেয়ে পিলে ফাটা মাথা থ্যাঁৎলানো অথবা বাইসনের বা গাউরের শিঙের গুঁতোতে বিপজ্জনকভাবে আহত মানুষদের প্রায়ই চিকিৎসার জন্য অথবা ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য আনা হয়। কখনও বা যাদের নেহাতই মন্দভাগ্য সেইসব মানুষের লাশ চটে-মোড়া অবস্থাতে মাছি ভন ভন করতে করতে গোরুর গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় অঙ্গুল বা কটকে। ঈশ্বরের ভরসায় ক্রন্দনাকুল আত্মীয়স্বজনেরা সেই দুর্গন্ধ ফুলে-ঢোল লাশ নিয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে কখন লাশকাটা ঘরের ডাক্তারবাবু আর ডোমেদের দয়া হবে শবব্যবচ্ছেদ করে, যে ঘোরতর মৃত, তাকেই দিন কয় পরে মৃত বলে ঘোষণা করে, একটা সার্টিফিকেট দেবার।

পৃথিবীর খুব কম দেশেই সম্ভবত আমাদের দেশের মতো সাধারণ, সংযোগহীন, গরিব মানুষ মরে গেলেও তার নিস্তার নেই। কী লাশকাটা ঘরে, কী শ্মশানে, ডোমদের এবং অন্যান্যদের হৃদয়বিদারক অত্যাচার চোখে দেখা যায় না।

পুরুণাকোটের হাসপাতালে বেনজিন ডেটল এবং কিছু পেইন-কিলার ট্যাবলেট এবং টেডভ্যাক ইনজেকশন ছাড়া ঋজুদার আর কোনও চিকিৎসাই হল না। আমি আর তিতির ঠিক করলাম যে, অঙ্গুলে গিয়ে, অঙ্গুল তো কটকের পথেই পড়বে, বিমলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সোজা ভুবনেশ্বরে চলে যাব। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে সন্ধের প্লেন ধরে, যে-প্লেনটা হায়দ্রাবাদ হয়ে আসে, নয়তো ভুবনেশ্বর-পাটনা-রাঁচি হয়ে কলকাতায় যায়, সেই প্লেনে কলকাতা ফিরে যাব।

ভুবনেশ্বর, ওড়িশার রাজধানী। সেখানে অত্যন্ত দক্ষ সব ডাক্তার এবং ভাল ভাল হাসপাতালও আছে কিন্তু আমরা ঋজুদার ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলাম না। ঋজুদাতো শুধুমাত্র আমার আর তিতির আর ভটকাই-এর ঋজুদা নয়, ঋজুদা জাতীয় সম্পত্তি। তাঁর কিছু একটা হয়ে গেলে, অন্যদের কথা ছেড়েই দিলাম, শ্রীমান ভটকাইচন্দ্র এবং গদাধরদাই আমাদের পিঠের চামড়া খুলে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের মালপত্র জিপের সামনের সিটে উঠিয়ে নিয়ে তিতির ঋজুদাকে কোলে শুইয়ে বসল পিছনে। সঙ্গে সামনে মহান্তিবাবুও উঠলেন

পট্টনায়েকবাবুর প্রতিভূ হিসাবে। ওঁরা কৃতজ্ঞ যেমন ছিলেন, লজ্জিতও কম ছিলেন না। তারপর স্টিয়ারিং-এ বসে আমি টিকিয়া উড়ান চালালাম জিপ অঙ্গুলের দিকে।

বিমলবাবুর বাড়িতে সিমলিপদাতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে বিমলবাবুকে খবরটা দিয়ে যেতে হবে, যাতে উনি বড় হাসপাতালে ওঁর ড্রাইভার এবং অন্য একটা গাড়ি নিয়ে আসেন এক্ষুনি। জিপ তো কারও চালিয়ে ফিরতে হবে ভুবনেশ্বর থেকে!

করতপটার কাছাকাছি এসেই ঋজুদা বলল, আমার শীত করছে রে। আমাদের সঙ্গে একটা করে কম্বল ছিল। তিতির তাই চাপিয়ে দিল ঋজুদার গায়ে। উর্ধ্বাঙ্গের সমস্ত ক্ষত থেকে তখনও রক্ত চোঁয়াচ্ছিল। রক্তক্ষয় হয়েও কিছু না হয়ে যায়। ভাবছিলাম আমি। তা ছাড়া বাঘের নখে ও মুখে তীব্র বিষ থাকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষতগুলোতে 'গ্যাংগ্রিন' সেট করে যাবে। তখন বাঁচানো মুশকিল। হাত পা হলে তা কেটে বাদ দিয়ে রোগীকে বাঁচানো যায় কিন্তু এ তো বুক, পেট, কাঁধ ও বাহুর সংযোগস্থলের ক্ষত। বাম উরু থেকেও এক খাবলা মাংস উড়িয়ে নিয়েছে নিজে মরতে-বসা বাঘিনী।

করতপটার মানুষরা পথের উপরে জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। তারা মহান্তিবাবুকে দেখেই হই হই করে জিপ থামিয়ে ঋজুদাকে মালা পরাল, প্রণাম করল। ছাড়তেই চায় না। মহান্তিবাবু ধমক-ধামক দিয়ে এবং আগামীকাল থেকে তাদের কাজে যোগ দিতে বলে আমাকে বললেন, এবারে জিপ এগোন।

আমি আবার জোরে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম।

ঋজুদার আচ্ছন্নভাব কাটাবার জন্য মহান্তিবাবু বললেন, বুঝলেন কিনা ঋজুবাবু, আপনার ক্ষত পচে যাবার কোনও দুর্ভাবনাই আর নেই। ভাগ্যিস হাড়িবন্ধু ওখানে এসেছিল। ব্যাটা করে না এমন নেশা নেই। ওকে একবার একটা গোখরো সাপ কামড়ে দিয়েছিল।

তারপর?

তিতির বলল।

তারপর আর কী। সাপটাই হাড়িবন্ধুর শরীরের বিষে ঢলে পড়ল।

ওই টেনশনের মধ্যেও আমি হেসে উঠলাম, বললাম, বলেন কী?

তবে আর কী বলছি। বাঘ বা চিতা যদি কামড়ায় তবে সঙ্গে সঙ্গে যদি সেখানে মুতে দেন তবে অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে। অমন অ্যান্টিসেপটিক খুব কমই আছে।

তিতির হেসে উঠল মহান্তিবাবুর কথায়।

আমার চোখের সামনে বাগানে পাইপে করে জল দেওয়ার মতো ডান হাতে প্রত্যঙ্গটি যত্নভাবে ধরে হাড়িবন্ধুর ঋজুদার সর্বাঙ্গে সেই দুর্গন্ধ জল দেওয়ার ছবিটা ফুটে উঠল। আর জলও কী জল! যেন পি সি সরকারের 'ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া'। না আছে আদি, না অন্ত, পড়ছে তো পড়ছেই।

হঠাৎ জড়ানো গলাতে ঋজুদা বলে উঠল, মহান্তিবাবু ঠিকই বলেছেন। এতে কত শিকারি বেঁচে গেছে। হটবাবু খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন।

তারপর আমাকে বলল, তুই আফ্রিকান হোয়াইট হান্টার Pondoro-র লেখা পড়িসনি রুদ্র? সেই যে একটা লেপার্ড গুলি খেয়ে গাছের উপর থেকে ওঁর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে সাংঘাতিকভাবে আহত করল আর তখন তাঁর আফ্রিকান Gun-bearer তাঁর গায়ে ওই কর্ম করে দিয়ে তাঁকে ডিসইনফেক্ট করল!

আমি বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ভুলেই গিয়েছিলাম।

হুঁ। মনে রাখবি। যেখানে সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল অ্যাটেনশান পাওয়ার সম্ভাবনা কম সেখানে প্রিভেন্টিভ হিসাবে এই প্রক্রিয়ায় ভিজতে পারলে ভালই।

তিতির হেসে বলল, উঃ ম্যাগো। আমি মরে গেলেও যাব কিন্তু তোমার এই প্রেসক্রিপশনের ওষুধ আমি খাব না।

খাবে কেন? লাগাবেই তো শুধু। আমি বললাম।

খেলেই বা দোষ কী?

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, মোরারজি দেশাই তো নিয়মিত খেতেন। আমি তাঁর পঁচাশি বছর বয়সে তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি। কী রং, কী গড়ন, যেন সাহেবের বাচ্চা।

আমি আর ওই মূত্র-তত্ত্বে সামিল হলাম না। মনটা খারাপ লাগছিল। বাঘিনীটার চামড়া ছাড়ানোর সময়ে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে হত, কেন সে মানুষ ধরা আরম্ভ করল, কোন দুঃখে?

কোনও দুঃখ বা অসীম অসুবিধা ছাড়া কোনও বাঘই মানুষখেকো হয় না। সুন্দরবনের বাঘের কথা ছাড়া। তারা বংশপরম্পরায় আনন্দের সঙ্গেই মানুষ মেরে আসছে বহু যুগ থেকে। বাঘ বা বাঘিনী যে দুঃখে বা শারীরিক যন্ত্রণার কারণে মানুষখেকো হয়, সেই দুঃখ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষেরই দেওয়া। এটা আমাদের লজ্জা। নইলে বাঘের মতো মহান, পুরুষ-মানুষের সংজ্ঞা, অকুতোভয়, ভদ্রলোক, জ্ঞানী, পৃথিবীতে নেই। মানুষের অনেকই শেখার ছিল তাদের কাছ থেকে। মানুষ মূর্খ বলে, আত্মম্ভরিতার শিকার বলেই বাঘের কাছ থেকে শিখল না কিছুই।

তিতির বলল, ওরা বোধহয় এখন বাঘকে নিয়ে করতপটাতে আসবে। চামড়া ছাড়াতে দেরি হয়ে গেলে চামড়াটা নষ্ট হয়ে যাবে।

কিছু হবে না। হাড়িবন্ধু আছে, ভীষ্ম আছে। ওরা সব বাঘের চামড়া ছাড়াতে ওস্তাদ। পেটের চর্বি, বাঘের নখ, বাঘের গোঁফ এসব তো ওরাই নেবে কিনা! কোনও চিন্তা করবেন না, চামড়া ছাড়িয়ে, নুন আর ফটকিরি দিয়ে ফট্‌কিনা কলকাতাতে আপনাদের ঠিকানাতে প্যাক করে পাঠিয়ে দেব।

আমি বললাম, না না, আমাদের কারও ঠিকানাতেই নয়, কলকাতার কার্থবাটসন অ্যান্ড হার্পার অথবা ম্যাড্রাসের ভ্যান ইনজেন অ্যান্ড ভ্যান ইনজেন-এ পাঠাতে

হবে। দু'জনের ঠিকানাই আমি আপনাকে দিয়ে যাব।

ঋজুদা ঘোরের মধ্যেই বলল, কবে থেকে চোর হলি তুই রুদ্র?

ম ন?

মানে, বাঘটা কি তোর? না আমার?

মহান্তিবাবু বললেন, এ কী কথা। বাঘটাতো আপনারাই মারলেন। আপনাদের নাতো বাঘিনী কার?

ঋজুদা কষ্ট করে হলেও হেসে বলল, বাঘিনী মিস্টার হটবাবুর।

সে কী। সে ব্যাটাই তো তার গাদা বন্দুক হাঁকড়ে বাঘটাকে খণ্ডিয়া করে দিল। খণ্ডিয়া না হলে কি আর সে আপনাকে আক্রমণ করত?

খণ্ডিয়া মানে কী?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

খণ্ডিয়া মানে আহত। ইনজিওরড।

ও।

ঋজুদা বলল, সে যাই হোক, বাঘ শিকারের নিয়ম হল, যে বাঘের শরীর থেকে প্রথম রক্তপাত ঘটাবে বাঘ তারই।

এ আবার কী নিয়ম? কোনও আনাড়ি যদি বাঘের ল্যাজে বা পায়ের থাবাতে গুলি করে তবেও সে বাঘ তার?

হ্যাঁ, তার। যে-শিকারি নিজের জীবন বিপন্ন করে সেই সামান্য আহত কিন্তু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বাঘকে খুঁজে পেতে মারবেন বাঘ তাঁর নয়। যে আনাড়ি প্রথম রক্তপাত ঘটিয়েছে বাঘ তারই।

ভারী অদ্ভুত নিয়ম তো।

সে ষড়া সেই বাঘকু চম লইকি কন করিবে? কুয়ারে রাখিবে? তাংকু ড্রয়িংরুম অছি না আউ কিছি। আমিই ওটা নিয়ে নেব।

ঋজুদা বলল, আপনার ক'জন শালি মহান্তিবাবু।

তা ভগবানের দয়াতে কম নয়। ছ'জন শালি আমার।

তবে আর কী? ছয় শালিকে রোমহর্ষক মানুষখেকো বাঘ শিকারের গল্পও শোনাতে পারবেন এবং ওই কল্পিত ভয়াবহ কাহিনী শুনে শালিরা আপনার বীরত্বে গা ঘেঁষে বসে বলবে, 'বাপ্পালো বাপ্পা। জুঁইবাবু আপনংকু এত্বে সাহস!'

চাইকি কোনও শালী চুমুও খেয়ে দিতে পারে।

আমরা এবং মহান্তিবাবু নিজেও হেসে উঠলেন ঋজুদার কথাতে। তারপর উনি সখেদে বললেন, দুঃখের কথা কী বলব আমার স্ত্রীই সবচেয়ে ছোট বোন। সবচেয়ে বড় শালির বয়স সাতাশি আর আমার স্ত্রীর উপরে যিনি তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি। সিনিয়র সিটিজেন। অর্ধেক ভাড়াতে ট্রেনে যাতায়াত করেন। সকলেই কি আর শালিবাহন হয় ঋজুবাবু? সে সব কপালের ব্যাপার!

ঋজুদা হেসে ফেলল রসিক মহান্তিবাবুর কথা শুনে।

অঙ্গুলে পৌঁছে কোনও দোকানে হুইস্কি পাওয়া যায় কি না দেখিস তো রুদ্র।

তুমি তো ওসব খাওনা।

খাইতো নাই। সেই জন্যই এখন খেলে ওষুধের কাজ দেবে। এখানে তো স্কচ পাবি না, রয়্যাল চ্যালেঞ্জ অথবা পিটার স্কট বা ওকেন-গ্লো যাই পাস তাই নিবি। Shock কেটে যাবে। মৃত্যুর হাত থেকেই তো বেঁচে এলাম।

মহান্তিবাবু দার্শনিকের মতো বললেন, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে তফাত তো এক চুলের। জন্মের পর থেকেই তো মৃত্যুর হাতে হাত রেখেই আমাদের চলা। আপনি তো তাও বাঘিনীকে গুলি করে জখম হলেন, যুধিষ্ঠির যে হিসি করতে গিয়ে অতর্কিতে অক্কা পেল। আর মৃত্যু কী রকম! ভয়াবহ! ওর আত্মা কি আর মুক্ত হবে? সে নিশ্চয়ই বাঘডুম্বা হয়ে যাবে।

বাঘডুম্বা আবার কী জিনিস?

বাঘডুম্বার নাম শোনেননি?

নাতো। সে কি বাঘমুণ্ডার কোনও জানোয়ার?

মহান্তিবাবু বললেন, বাঘ্‌ঘডুম্বার সঙ্গে বাঘ্‌ঘমুন্ডার কোনও সম্পর্ক নেই। যেসব মানুষে বাঘের হাতে মরে, তারা এক রকমের স্পেশ্যাল ভূত হয়ে যায়। পাখির রূপ ধরে তারা রাতের বেলা ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে কিরি-কিরি-কিরি-কিরি, ধ্বুপ-ধ্বুপ-ধ্বুপ-ধ্বুপ। ওড়িশার কালাহান্ডিতে অনেক বাঘ্‌ঘডুম্বা আছে। কারণ, সেখানে প্রায় সব বাঘই মানুষখেকো। বাঘ্‌ঘমুন্ডার জঙ্গলেও আছে।

কী করে জানলেন?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

আমি একবার বিকেল-বিকেল ট্রাক ড্রাইভারের মুখে আমার স্ত্রীর ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছে খবর পেয়ে পট্টনায়েকবাবুর জিপ নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে রাতের বেলা ঢেনকানলে যাচ্ছিলাম। এইট্টি সেভেনের এপ্রিল মাসে। বাঘ্‌ঘমুন্ডার জঙ্গলে রাতে ট্রাক ড্রাইভাররাও হাতির ভয়ে ট্রাক চালায় না। দিনের আলো থাকতে থাকতে আসে আবার দিনের আলো ফুটলেই রওনা দেয় কটকের দিকে। বাঘ্‌ঘমুন্ডা বন-বাংলোর কাছেই আমাদের ক্যাম্প পড়েছিল সেবারে। বাংলোর হাতাতে যে কুয়ো আছে, সেখান থেকেই খাবার জল আসত আমাদের, চান, কাপড় কাচা সবই ওই কুয়োতেই হত। ক্যাম্প থেকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জিপ চলছে, গরমের দিন, জঙ্গল ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে, আগাছা একেবারেই নেই। একটা বাঁক নিয়েছিল রাস্তাটা। প্রায় সমকৌণিক বাঁক। এবং সেই বাঁকের মুখেই হাতির দলের সঙ্গে মোলাকাত হয় বলে ড্রাইভার অমরিক সিং খুব সাবধানে বাঁকটা ঘুরল গতি কমিয়ে যাতে হাতির পেটে গিয়ে গুঁতো না মারে। কিন্তু বাঁক নিতেই দেখি হাতি-টাতি নেই। পথের উপরে নাইটজার পাখির একজোড়া চোখ লাল আগুনের গোলার মতো দপ করে জ্বলে উঠল। ওই পাখিগুলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওড়ে না, জিপ যখন তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে তখন সোজা উপরে উঠে যায়,

এমনভাবে যায়, যেন মনে হয় বনেট ফুঁড়েই উঠল। পাখিটা উড়ে ওঠামাত্রই বাঁপাশের একটি মিটকুনিয়া গাছের ঝাঁকড়া ডালের আড়াল থেকে বাঘ্‌ঘডুম্বা ডেকে উঠল কিরি-কিরি-কিরি-কিরি, ধ্বুপ-ধ্বুপ-ধ্বুপ-ধ্বুপ! সেই ডাক শুনে তো আমাদের পিলে চমকে গেল। এর চেয়ে হাতির দলের গায়ে ধাক্কা মারাও কম বিপজ্জনক ছিল।

অমরিক সিং-এর এমনিতে দুর্জয় সাহস। একবার জ্বলন্ত চেলা কাঠ নিয়ে সে একটা বড় বাঘকে তাড়া করে গিয়েছিল। বাঘটা কাঠ ঢোলাইওয়ালাদের মোষ ধরবার জন্য ক্যাম্পের কাছে ঘুর ঘুর করছিল যখন সন্ধে রাত্তিরে। কিন্তু দুঃসাহসী অমরিক সিং-এর সবরকম ভূতের ভয় ছিল। রাজ্যের কুসংস্কার ছিল। শিয়াল জিপের সামনে দিয়ে পথের বাঁদিক থেকে ডানদিকে গেলে, খরগোশ ডানদিক থেকে বাঁদিকে গেলে সে জিপ থামিয়ে গ্রন্থসাহেব থেকে মন্ত্র আওড়াত ভক্তিভরে বেশ কিছুক্ষণ। পরেই আবার মন্ত্রপড়া শেষ হলে তারপরই জিপের অ্যাকসিলারেটরে কষে চাপ দিত। ভূত বলে ভূত। বাঘ্‌ঘডুম্বা ভূত। অমরিক সিং যে কী জোরে জিপ ছুটিয়েছিল সে রাতে তা কী বলব! গিয়ার বদলাতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল ভয়ের চোটে। পুরো পথটাই সেকেন্ড গিয়ারে এল জিপ গাঁক গাঁক করতে করতে। বনেটের নীচ থেকে ধোঁয়া বেরোতে লাগল। আমি ভাবলাম বুঝি আগুনই লেগে যাবে জিপে। তারপর বড় রাস্তাতে পড়ে এক চাষার বাড়ির পুকুর থেকে অনেক বালতি জল জিপের গায়ে মাথায় এবং রেডিয়েটরে ঢেলে তবেই জিপকে ঠাণ্ডা করা হয়—আর একটু গেলে সত্যি সত্যিই আগুন লেগে যেত। রেডিয়েটরে জল ছিল না এক ফোঁটাও। তাই বলছিলাম, বাঘ্‌ঘডুম্বা নিয়ে স্যার ঠাট্টা করবেন না। অমন সাংঘাতিক ভূত ইন্ডিয়ার আর কোথাও নেই।

তিতির টিপ্পনী কেটে বলল, অমরিক সিং-এর কথা তো বললেন, আপনি ভয় পেয়েছিলেন কি না তা তো বললেন না?

মহান্তিবাবু হাসলেন। বললেন, ভয় কি আর পাইনি ম্যাডাম। ভয়ের চোটে দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল কিন্তু আমি যে মুহুরি, ম্যানেজার। আমিও যদি ভয় পাই তাহলে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লাটে উঠবে। এই বাঘ্‌ঘডুম্বা ভূতের কথা ছেড়ে দিন, বাঘ্‌ঘডুম্বার বাঘের ভয়ও কি পাইনি! দু রাতে বাঘটা ক্যাম্পে আমার ঘরের সামনে এসেছিল।

সে তো আপনার গড়গড়া থেকে তামাক খেতে।

আমি বললাম, গিয়ার চেঞ্জ করতে করতে।

মহান্তিবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, তা হতেও বা পারে। কিন্তু সাতসকালে উঠে তার পায়ের দাগ আমার ঘরের সামনে দেখে আমি নিজেই পা দিয়ে মুছে দিয়েছিলাম, যাতে কেউ টের না পায়। যা বলার, তা আমি শুধু বাবুকেই রিপোর্ট করতাম। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো কি সোজা কথা! টাটা কোম্পানিও কোম্পানি,

আমাদের পট্টনায়েক অ্যান্ড কোম্পানিও কোম্পানি। তফাত বিশেষ নেই। রুসি মোদিও যা, আমিও তাই।

দেখতে দেখতে আমরা অঙ্গুলে পৌঁছে সিমলিপদাতে বিমলকান্তি ঘোষের বাড়ি পৌঁছে গেলাম। উনি আগেই খবর পেয়েছিলেন। পুরুণাকোট পুলিশ চৌকি থেকে অঙ্গুলের বড় থানাতে ওয়্যারলেস করে দিয়েছিল। থানা থেকে বিমলবাবুকে ফোনে খবর দিয়ে রেখেছিল। বিমলবাবু বাদাম দেওয়া, ধনেপাতা দেওয়া, চিঁড়ে ভাজা, আর বড় বড় পিস-এর রুই মাছ ভাজা খাওয়ালেন পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই আদর করে। বিমলবাবুর স্ত্রীর রান্নার হাতই আলাদা।

ঋজুদা বলল, কত যে অত্যাচার করেছি বউদির উপরে একসময়ে আমরা। আমরা চাও খেলাম। উনি ঋজুদার জন্য এক বোতল হোয়াইট লেবেল স্কচ হুইস্কি দিয়ে দিলেন। বললেন, খেতে খেতে ভুবনেশ্বরে চলে যান। চাঙ্গা লাগবে। বহু বছর আগে গুহসাহেব শিকারে এসে দিয়ে গেছিলেন। রাখা ছিল। আমি তো জন্মে জল, চা, সরবৎ আর ঢাকার আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়ের 'সারিবাদি সালসা' ছাড়া অন্য কোনও তরল পদার্থই খাইনি। তবে প্রায় চল্লিশ বছর আগে টিটাগড় পেপার মিলের উইলিস সাহেব টুল্বকার জঙ্গলে বাঘের মুখে পড়ে সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়ার পর তাঁকে দেখেছিলাম স্কচ-এর বোতল খুলে নীট-হুইস্কি বোতল থেকে খেতে। কটক অবধি যেতে যেতে মরে যে যাননি তা'ও ওই হুইস্কির জন্য, ডা. প্রধান আমাকে বলেছিলেন কটকে। সেই দিনই বুঝেছিলাম এ জিনিস মৃতসঞ্জীবনী। তবে নিজের কখনও খাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তাই গুহ সাহেবের প্রেজেন্ট করা ভালবাসার দান রেখে দিয়েছিলাম যত্ন করে। এমন সৎকাজে লাগবে আগে জানিনি। ঋজুবাবু আমার খুবই ভালবাসার জন। তাঁকে আমি একাধিক কারণে শ্রদ্ধাও করি।

ওই। শুরু করলেন। বোতলটা দিন তো বক্তৃতা থামিয়ে।

জিপটাকে আমি বিমলবাবুর বাড়ির সামনের মস্ত তেঁতুল গাছটার ছায়াতে রেখেছিলাম। ঋজুদার জিপ থেকে নামার মতো অবস্থা ছিল না।

জিপে বসেই চিঁড়ে ভাজা আর মাছ ভাজা খেল। ঋজুদার মুখের হাসি কিন্তু নেভেনি। অনির্বাণ। ঋজুদা চা না খেয়ে হুইস্কি খেল বোতল থেকে স্ট্রেট দু' চুমুক। স্বীকার করছে না বটে কিন্তু বেশ ঘোরে আছে। তিতির কপালে হাত দিয়ে দেখল, জ্বরও এসেছে।

বিমলবাবু বললেন, এবারে খুব জোরে চালিয়ে চলে যাও রুদ্র। আর দেরি কোরো না। ডা. পানিগ্রাহীকে বলে দিয়েছি। উনি আজ বাড়িতে খেতে যাবেন না। চেম্বারেই থাকবেন। চেম্বার ভুবনেশ্বরে ঢোকার মুখেই পড়বে। সঙ্গে নার্সিং হোমও আছে। সব বন্দোবস্ত করা আছে। হাইওয়ের উপরেই পড়বে। প্লেনের টিকিটও উনি কিনে রেখেছেন। আমি একটু পরেই রওনা হচ্ছি খেয়ে-দেয়ে, আমার ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে। বড় গাড়ি থাকলে ঋজুবাবুকে তাতেই ট্রানসফার করে

দিতাম। মারুতি এইট হান্ড্রেড তো! আমি সোজা এয়ারপোর্টে যাব। ড্রাইভার জিপ চালিয়ে ফিরে আসবে ফ্লাইট টেক-অফ করার পরে। আর আমি গাড়ি নিয়ে ফিরব মহান্তিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে। ফেরার পথে ঢেনকানল-এ তাঁকে নামিয়েও দিয়ে যাব।

আপনারা নার্সিং হোমের থেকে ফ্লাইটের সময় বুঝে রওনা হবেন এয়ারপোর্টের দিকে। হুইল চেয়ারের বন্দোবস্ত আমি করে রাখব আগেই। এয়ারপোর্ট ম্যানেজারকেও বলে রাখব।

বাড়িতে না নামিয়ে পট্টনায়েকবাবুর বাড়িতেই নামাবেন বরং।

যুধিষ্ঠিরটা চলে গেল।

মহান্তিবাবু বললেন।

ওঃ তাই তো। আমরাও তো একবার যাওয়া উচিত। বিমলবাবু বললেন। এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল ভদ্রলোকের। যুধিষ্ঠির ছেলেটা বড়ই ভাল ছিল। বিনয়ী, ভদ্র। বড়লোক বলে কোনও চাল-চালিয়াতি ছিল না। অন্য অনেক বড়লোকের ছেলেদের মতো। পান-সিগারেট পর্যন্ত খেত না। সুন্দর স্বভাব।

মহান্তিবাবু বললেন, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন বিমলবাবু। আপনার গড়গড়াটা আনতে বলুন তো জগবন্ধুকে, তাম্বুরি তামাক সেজে। বড় বড় দুটান লাগিয়েই 'জয় মা কটকচণ্ডী: বলে ভুবনেশ্বর রওনা দিই।

তারপর বললেন, শুনেছেন নাকি সে কথা? হটবাবু বলছিলেন বাঘিনীটা নাকি ক্যাম্পে ঢুকেছিলই আমার সুগন্ধি তামাক সাজা গড়গড়াতে দু' টান লাগাবে বলে।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

মহান্তিবাবু গড়গড়াতে গুড়ুক গুড়ুক করে কয়েক টান লাগানোর পরে, বিমলবাবু বললেন, আর দেরি নয়। এগোন। এগোন।

পেইন-কিলার ট্যাবলেট কিছু কি দিয়ে দেব?

ঋজুদা হোয়াইট লেবেল-এর বোতলটা দেখিয়ে বলল, এই তো নিজৌষধি দিলেন। সর্বরোগহারী। আর কিছুই লাগবে না।

তারপর বলল, এবারে এদের কিছুই দেখাতে পারলাম না। শীত থাকতে থাকতেই আর একবার আসার ইচ্ছে আছে। তবে আমি কখন কোথায় থাকি, তা নিজেই জানি না। নিজে না আসতে পারলে এদের আপনার হেপাজতেই পাঠিয়ে দেব। ভাল করে সাতকোশীয়া গন্ড ঘুরিয়ে দেবেন।

পাঠাবেন। দেখিয়ে দেব। নিশ্চয়ই দেব। তবে আপনি এলে মজাই আলাদা। চেষ্টা করবেন আসবার অবশ্যই।

আমরা বিমলবাবুকে হাত নেড়ে এগোলাম। সিমলিপদা থেকে বড় রাস্তায় পড়েই অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম। তবে জিপে আশি কিলোমিটারের চেয়ে জোরে যানবাহন ভরা পথে যাওয়া বিপজ্জনক। এক বিপদ থেকে বেঁচে অন্য বিপদে না পড়ি।

ঋজুদা বলল, জিপটা বাঁদিকে করে একটু আস্তে কর রুদ্র। পাইপটা ধরাব।

ধরাও। বলে আমি অ্যাকসিলারেটর ছেড়ে দিয়ে সটাসট করে গিয়ার চেঞ্জ করে গতি কমালাম। বললাম, ভাল করে ধরাও তো। আর থামাথামি নেই। তিতিরের কাঁধে হেলান দিয়ে এবার একটু ঘুমিয়ে পড়ো।

একদম না।

মহান্তিবাবু বললেন। চোখের পাতা একেবারে এক করবেন না। গল্প করতে করতে চলুন।

ঋজুদা বলল মহান্তিবাবুকে, রাইট ইউ আর।

তারপর আমাকে বলল, আফ্রিকার 'গুগুনোগুম্বারের দেশে'র কথা মনে পড়ে রুদ্র? সেই সেরেঙ্গেটি প্লেইনস-এ ভুষুন্ডার বিশ্বাসঘাতকতার কথা?

আদিগন্ত ঘাসবনে পথ হারাবার কথা? হায়নাদের আক্রমণের কথা। তুই যে কতবার আমাকে কতভাবে বাঁচাবি রুদ্র, তুই-ই হচ্ছিস আমার বিপদে মধুসূদন।

তিতির বলল, 'গুগুনোগুম্বারের দেশে' বইটাও তুমি দারুণ লিখেছিলে রুদ্র।

তারপর আর কথা না বলে, জিপ চালাতে চালাতে আমি ভাবছিলাম, যুধিষ্ঠিরের অমন মর্মান্তিক মৃত্যু না হলে আমরা এতক্ষণে মহানদী পেরিয়ে, মানে মহানদীর গণ্ড পেরিয়ে কোথায় না কোথায় চলে যেতাম। বৌধ, নয়তো ফুলবানীতে। ফুলবানী অনেক উঁচু জায়গা। নয়তো চারছক হয়ে দশপাল্লা। যেখানে টাকরা গ্রামে পৌঁছে বুরতং নালাকে ডানপাশে রেখে, চলে যেতাম সুউচ্চ বিরিগড় পাহাড়শ্রেণীর নীচের ছোট্ট গ্রাম বুরুসাইতে। সেখান থেকে পাহাড়ে চড়তাম। এই সব অঞ্চলে খন্দ উপজাতিদের বাস—যাদের পূর্বপুরুষরা মেঘের ভেলাতে চড়ে এসে ওই সুউচ্চ পাহাড়ে নেমে বসতি স্থাপন করেছিল।

যখনই আমার মন খারাপ হয়, আমি রুদ্র রায়, নিজেই নিজের লেখা 'ঋজুদা সমগ্র'র পাতা খুলে বসে পড়ি। আর কোথায় না কোথায় চলে যাই। কত কথাই যে মনের কোণে ভেসে ওঠে। ভাগ্যিস ঋজুদা ছিল আমাদের!

ল্যাংড়া পাহান। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৮। পৃ. ৮০। মূল্য ৩৫.০০।

উৎসর্গ ॥ তিতলি-কে।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

ঋজুদার সঙ্গে বক্সার জঙ্গলে এবং। ঋজুদার সঙ্গে বক্সার জঙ্গলের এবং-এর অন্তর্গত **ঋজুদার সঙ্গে অচানকমার-এ**। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃ. ১৩২। মূল্য ৪৫.০০।

উৎসর্গ ॥ শ্রীসুশান্ত ভট্টাচার্য।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

সূচি ॥ ঋজুদার সঙ্গে বক্সার জঙ্গলে, ঋজুদার সঙ্গে অচানকমার-এ।

কাঙ্গপোকপি। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৯৩। পৃ. ১৯২। মূল্য ৩৫.০০।

উৎসর্গ ॥ লিপিলেখা ও বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ সুধীর মৈত্র।

ভূমিকা ॥ মণিপুরে আমি বহুবার গেছি, কাজে এবং বেড়াতে। মণিপুরের পটভূমিতে আমার কিছু গল্প এবং একটিমাত্র উপন্যাস আছে। সেই উপন্যাসের নাম, বাবলি। এটি দ্বিতীয় উপন্যাস। অসুস্থতার মধ্যে এবং শয্যাশায়ী অবস্থাতেই ঋজুদার এই কাহিনী বড়ই কষ্টে এবং ডাক্তারদের নিষেধ না শুনেই লিখলাম, আমার অগণ্য পাঠক-পাঠিকাদের এই পুজোতে আনন্দ দেবার জন্যে।

কোনও পুজো সংখ্যাতেই আমি ব্যক্তিগত কারণে উপন্যাস লিখছি না, গত তিনবছর হল। তাই পাঠক-পাঠিকারা চান যে, তাঁদের জন্যে পুজোতে একটি উপন্যাস অন্তত লিখি। তাঁদের ন্যায্য দাবি মেটাতেই এই কষ্টকর প্রয়াস।

এখনও অসুস্থই আছি। অফিসে যোগ দেওয়ার দিন আজও স্থিরীকৃত হয়নি।

মানুষের মস্তিষ্ক যেহেতু ব্লাস্ট-ফারনেসেরই মতন, একবার তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিলে আমৃত্যু তা কাজ করে যায়ই। তাই শরীরের বিশ্রামের কথা

ডাক্তারেরা নিশ্চিত করতে পারলেও মনুষ্যপদবাচ্য মানুষের মস্তিষ্কের কোনও বিশ্রাম তাঁরা নিশ্চিত করতে পারেন না। বিশ্রাম হয়তো নেওয়া যাবে শুধু সেদিনই, যেদিন চিতার আগুনে সমস্ত শরীরটাই ছাই হয়ে যাবে।

এটি আমার তৃতীয় গোয়েন্দা-উপন্যাস। এর আগে 'অ্যালবিনো' এবং তারও আগে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে ফিরে এসেই, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে হাওয়াই-এর পটভূমিতে "ওয়াইকিকি" লিখেছিলাম।

শরীর সুস্থ থাকলে হয়তো আর একটু মনোযোগ দেবার চেষ্টা করা যেত, এই উপন্যাসের প্রতি। পাঠক-পাঠিকারা নিজগুণে দোষত্রুটি মার্জনা করবেন।

এই বই ছাপা আদৌ হত না, যদি না আমার অশেষ গুণগ্রাহী রূপা দত্ত ও ডঃ কৌশিক লাহিড়ীর সাহায্য পেতাম।

প্রকাশক, দে'জ পাবলিশিং আমার শত দাবী ও "কুখ্যাত মেজাজ" সত্ত্বেও সবকিছু সহ্য করে নিয়ে সমাদরে এই যে এই বই ছেপেছেন যে, সে জন্যে ধন্যবাদ তাঁদেরও অবশ্যই প্রাপ্য।

শ্রীসুধীর মৈত্র অত্যন্ত সম্মানিত ও অগ্রজ শিল্পী। বিকাশ ভট্টাচার্য তাঁর ছাত্র ছিলেন। সুধীরবাবু যে এবারেও আমার অনুরোধ রক্ষা করে প্রচ্ছদ এবং অলংকরণ করে দিয়েছেন "কাঙ্গপোকপি"র, সে জন্যে তাঁর কাছে এবং আমার প্রকাশকের সঙ্গে আমিও অশেষ কৃতজ্ঞ।

যদি কেউ মতামত জানাতে ইচ্ছে করেন, তা হলে তাঁদের ভাল বা মন্দ লাগাও, পোস্ট বক্স নং ১০, ২৭৬ কলকাতা-৭০০ ০১৯, এ জানাতে পারেন।

আপনাদের প্রত্যেককে পুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানিয়ে,

প্রীতিধন্য বুদ্ধদেব গুহ
১৫/৯/৯৩
কলকাতা-৭০০ ০১৯

ঋজুদার সঙ্গে স্যেশেলসে। সাহিত্যম্। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৮। পৃ. ৯৫। মূল্য ২৫.০০।

উৎসর্গ ॥ শুভলক্ষ্মী ও ধ্রুবজ্যোতি নন্দীকে।

ভূমিকা ॥ ঋজুদার প্রত্যেকটি কাহিনী শুধুমাত্র কিশোর-কিশোরীদের জন্যেই নয়, পরিবারের বড় ছোট প্রত্যেকেরই জন্যে। বাংলা সাহিত্যে অনন্য ঋজুদার একজনও প্রতিযোগী নেই।

ভারত মহাসাগরের স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে লেখক নিজে গেছিলেন এই বই লেখার আগে। সেখানে পৃথিবীর নানা দেশের জলদস্যুদের গুপ্তধন পোঁতা আছে যে সবের পুরো হদিশ মানুষে এখনও পায়নি। কোনও একটি দ্বীপের কোনও অজ্ঞাত জায়গাতে পুঁতে-রাখা গুপ্তধন নিয়ে কয়েকজন ফরাসি জলদস্যুর বংশধরদের মধ্যে বাদবিবাদ ঘটে। সেই দস্যুদের প্রধান ছিল বিশ্ববিখ্যাত 'ইঁদুল'।

সেই প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা ঋজু বোস-এর কাছে মঁসিয়ে পঁপাদু আসেন কলকাতাতে। তারপর ঋজুদা তাঁর দুই সাগরেদ রুদ্র এবং ভটকাইকে সঙ্গে নিয়ে স্যেশেলসে যান। সেই অভিযানের উপাখ্যানই এই গোয়েন্দা উপন্যাস।

এই সরস অথচ রোমাঞ্চকর আখ্যান যাঁরাই পড়বেন তাঁদের প্রত্যেকেরই ঘরে বসেই স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে বেড়ানোও হবে।

ঋজুদার সঙ্গে ম্যাকল্লাস্কিগঞ্জে। প্রথম প্রকাশ : শারদীয় আজকাল ১৯৯৯।

ঋজুদার সঙ্গে পুরুণাকোটে। প্রথম প্রকাশ : শারদীয় তথ্যকেন্দ্র ১৯৯৯।